বংশ-পরিচয়

দ্বাদশ খণ্ড

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত

আশ্বিন—১৩৩৯

মূল্য ৫৲

মহারাজাধিরাজা—কামেশ্বর সিং

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠ

বংশ-পরিচয়

খারসওয়ান রাজবংশ

খারসওয়ান রাজ্য বি-এন্ রেলওয়ের আমদা ষ্টেশন হইতে চারি মাইল দূরে স্থবর্ণরেখার শাখা সোনা নদীর উপর অবস্থিত। এই রাজ্যের পরিধি একশত তিপ্পান্ন বর্গ মাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা ৩৮,৮৫২। এই রাজ্য ছোটনাগপুর বিভাগের একটি করদ রাজ্য। বর্ত্তমানে ইহা বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের অন্তর্গত। এই রাজ্যের উত্তরে রাঁচি এবং মানভূম জেলা, পূর্ব্বে সরাইকেলা রাজ্য পশ্চিমে সিংহভূম জেলা। এই রাজ্যের উত্তরাংশ পার্ব্বত্য। পর্ব্বতের চূড়া বান্দীতে সমুদ্র হইতে ২৪৩১ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এই রাজ্যের দক্ষিণাংশ চাষের উপযুক্ত জমিতে পরিপূর্ণ। এই রাজ্যে তামা, অভ্র শিলিম্যানাইল (silimanile), কায়ানাইল (kayanile) প্রভৃতি খনিজ পদার্থ আছে। অতি প্রাচীনকালে এই রাজ্যে যে মনুষ্যের বসতি ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশের পঁচিশ তিরিশ মাইলের মধ্যে রোম সম্রাটদিগের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

আর্য্যেরা যখন প্রথম ভারতেবর্ষে আগমন করেন তখন এই স্থান গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল এবং বন্য অসভ্য লোক ও পশুরা বসবাস করিত। উত্তর ভারতের আর্য্যেরা এ রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সংবাদ রাখিতেন না। এমন কি, যখন আর্য্য-সভ্যতা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়াছিল, তখনও এই রাজ্যে বিতাড়িত অনার্য্যেরা অর্দ্ধস্বাধীন অবস্থায় বাস করিত এবং তাহাদের সহিত মগধ, কিকট, তামিয়া, লিপ্টি, উৎকল, কর্ণ-সুবর্ণ প্রভৃতি আর্য্য-শাসিত রাজ্যের কোনই সম্বন্ধ ছিল না।

এই রাজ্যের প্রায় তিরিশ মাইল দূরে কিচিং নামক স্থানে কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। সেই শিলালিপি-পাঠে জানা যায় যে, শশাঙ্ক নামে কর্ণসুবর্ণের রাজা ছয় শত হইতে ছয় শত পঁচিশ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, সিংহভূম জেলার সুবর্ণরেখা নদীর তীরে তাঁহার রাজধানী ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজ্য সম্ভবতঃ শশাঙ্ক-রাজধানীর অন্তর্ভূত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজপুত জাতির উত্থান হয়। সম্ভবতঃ সেই সময়ে বিখ্যাত ভঞ্জবংশ নিকটবর্ত্তী ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ইতিহাসে জানা যায় যে, রাঠোর রাজপুতেরা দক্ষিণ ভারতের চালুক্য বংশকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের নিজের রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই রাঠোর রাজপুতেরা দাক্ষিণাত্য জয় করায় ছোটনাগপুরে রাজপুতরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

খারসওান রাজ্যের রাজা কদম্ববংশীয় রাঠোর রাজপুত। এই বংশ সিংহভূম-রাজদিগের প্রাচীন রাজবংশের একটি শাখা। সিংহভূম এই নাম হইতে জানা যায় যে, ইহা সিংহদিগের অধিকৃত ভূমি। ইহা কখনও মোগলদিগের অধিকারে আসে নাই, পরন্তু বায়ান্ন পুরুষ ধরিয়া বর্ত্তমান রাজবংশীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে অধিকৃত

ও শাসিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি, মাহারাট্টারা পর্য্যন্ত এই রাজ্যের উপর কোনরূপ ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে নাই। ব্রিটিশের সহিত যখন সন্ধি হয়, তখনও এই রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। সিংহভূমের সিংহরাজারা কোল-সাঁওতাল-প্রমুখ আদিম অধিবাসী ও আর্য্য উপনিবেশের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ছোট-নাগপুরের অন্যান্য অংশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বিক্রমসিংহ নামে সিংহভূম রাজার কনিষ্ঠ পুত্র সিংহভূমে একটি জায়গীর লাভ করিয়া ছলেন। তিনি যুদ্ধ করিয়া অতি দ্রুত তাঁহার রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে খারসওয়ান রাজ্য স্থাপিত সেই স্থান তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করেন।

সিংহভূমের রাজা ছত্রপতি সিংহ দেও বংশানুক্রমে ত্রয়োদশ অধ্যায় নিম্নে খরসওয়ান-রাজগণের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল :—
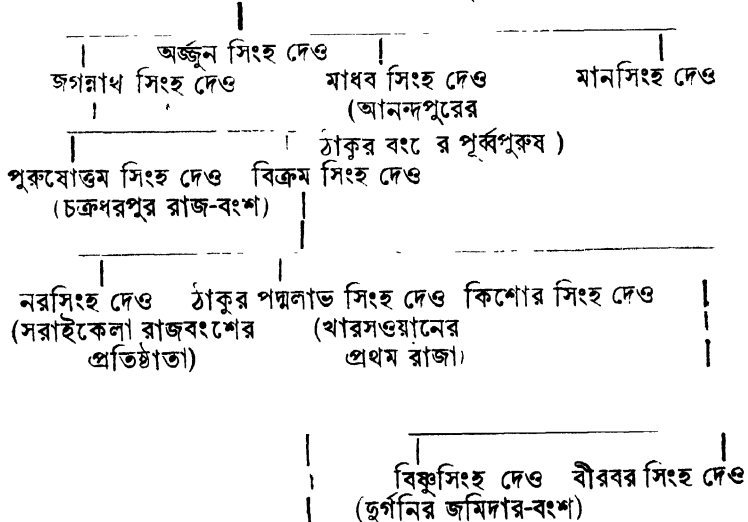
ঠাকুর যশোবন্ত সিংহ দেও (২)

ঠাকুর লোকনাথ সিংহ দেও (৩

ঠাকুর মোহনলাল সিংহ দেও (৪)

ঠাকুর চৈতন সিংহ দেও (৫)

ঠাকুর উপেন্দ্র সিংহ (৬)

ঠাকুর গঙ্গারাম সিংহ দেও (৭) ঠাকুর রঘুনাথ সিংহ দেও (৯)

ঠাকুর রামনারায়ণ সিংহ দেও (৮) ঠাকুর মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দেও (১০)
(১৮৯০-১৯০২)

রাজা শ্রীরামচন্দ্র সিংহ দেও (১১)
(বর্ত্তমান রাজা)

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এই রাজ্যের রাজাদিগের সহিত ব্রিটিশ জাতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কি সূত্রে এই সখ্য স্থাপিত হয় তাহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যে স্থানকে ধনঙ্গম বলে সেই স্থান পূর্ব্বে জঙ্গলমহল নামে অভিহিত ছিল। ইহাই তাৎকালিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যের সীমান্ত। এই সীমান্ত প্রদেশে যাহারা ব্রিটিশদিগের উপর অত্যাচার করিত তাহারা আসিয়া খরসওয়ান রাজ্যে আশ্রয় লইত। কিন্তু এই সন্ধির ফলে স্থির হইল যে, খরসওয়ান-অধিপতি ব্রিটিশ রাজ্য হইতে আর কোন পলাতককে আশ্রয় দিবেন না।* ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রিটিশ শক্তি নাগপুরের ভোঁসলাদিগের সহিত যুদ্ধে

* Vide George Vansitart's note to the Government of Calcutta in 1767.

ব্যাপৃত হন তখন খরসওয়ান-অধিপতি ইংরেজকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তদ্বিনিময়ে ইংরেজরাজ তাঁহাকে আশা দিয়াছিলেন যে, ইংরেজ চিরদিন তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা ও সম্মান রাখিয়া চলিবে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের পর এই সখ্যতা দ্বিগুণরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

খারসওয়ান-অধিপতি ইংরেজের আধিপত্য স্বীকার করিতে লাগিলেন এবং ইংরেজও তাঁহাদিগকে স্বাধীন রাজা বলিয়া সম্মান করিতে লাগিলেন। আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ সরকারকে এই রাজ্য হইতে এক কপর্দ্দকও রাজস্ব দিতে হয় নাই এবং বরাবরই আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাজা গঙ্গারাম সিংহ দেও ব্রিটিশ শক্তিকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন এবং বিদ্রোহীদিগের কবল হইতে চাঁইবাসা পুন-রধিকার করিবার জন্য লেপ্টন্যাণ্ট গবর্ণরকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ তিনি চিরকালের জন্য পোড়াহাট রাজাদিগের নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত চারিটি গ্রামের নিষ্কর জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই রাজবংশ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক এবং অকৃত্রিম বন্ধু।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসী ছিল কোল-ভূমিজ সাঁওতাল। কোলেরা একটী অদ্ভুত জাতি। তাহারা আচারে, ব্যবহারে আপনাদিগের সভ্যতারই অনুবর্ত্তন করে। ইহা ছাড়া ভূঞা নামেও এক জাতি আছে। ঐতিহাসিকদিগের বিশ্বাস তাহারাই দাক্ষিণাত্যের হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত দ্রাবিড়। এই দুই জাতির আগমনের পর কুর্ম্মি নামক জাতি আসিয়া বসবাস করে। পরিশেষে আর্য্যজাতিরা এখানে আসিয়া অনেক আদিম অসভ্য জাতিকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করে।

এক্ষণে খারসওয়ান রাজ্যের অর্দ্ধ লোক হিন্দু ও অপরার্দ্ধ আদিম অধিবাসী।

এ রাজ্যের শাসন-কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটীশ সরকারের কোন হাত নাই। সম্বলপুরে ব্রিটিশ সরকারের একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি (Political Agent) থাকেন। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের সমস্ত করদ রাজ্যের শাসনকার্য্যাদি তিনি পর্য্যবেক্ষণ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি খারসওয়ান-অধিপতিকে একখানি "সনদ" প্রদান করেন। এই সনদের অনেক স্থান পরে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় রাজ্যের বিবিধ কুশল সাধনে সহায়তা করিয়াছে। ভূমি-রাজস্বই এই রাজ্যের প্রধান আয়। তাহা ছাড়া আবগারী, বন ও অন্যান্য বিভাগেও আয় আছে। এই রাজ্যের নিজস্ব পুলিশ, জেল, স্কুল ও হাসপাতালাদি আছে।

খারসওয়ান রাজ্যের বর্ত্তমান রাজা শ্রীরামচন্দ্র সিংহ দেও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে দশবৎসর বয়সে পিতা ঠাকুর শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দেওএর স্বর্গারোহণের পর গদীতে আরোহণ করেন। তাঁহার মাতা বঙ্গের বিখ্যাত পঞ্চকোটাধিপতির কন্যা। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্রীরামচন্দ্র রায়পুর রাজকুমার কলেজে অধ্যয়নার্থ প্রেরিত হন। সেখানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক মিঃ অস্‌ওয়েলের নিকট তিনি নানাবিধ নৈতিক শিক্ষা লাভ করেন। কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে তিনি ভারতের নানা স্থান পরিদর্শন করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনারের তত্ত্বাবধানে শাসনকার্য্য-সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ছোটনাগপুরের কমিশনার একটী দরবার করিয়া রাজা শ্রীরামচন্দ্র সিংহকে পৈতৃক গদীতে প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যশাসনে তাঁহার ক্ষমতা-দর্শনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুরুষানুক্রমিক "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে প্রদত্ত সনদের পরিবর্ত্তন করিয়া

তাঁহাকে আরও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করেন। বর্ত্তমান রাজা মহাশয় পুত্র-কন্যা-সম্পদে অতি সম্পদশালী। ইহার চারি পুত্র ও চারি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহদেও ১৯১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।* ছোটনাগপুরের প্রসিদ্ধ ঝরিয়া রাজকন্যার সহিত বর্ত্তমান রাজা মহোদয়ের শুভ বিবাহ হয়। এই খারসওয়ান রাজবংশের সহিত ভারতের বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত বড় বড় রাজপুত-বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। কেওঞ্ঝোড়, ময়ূরভঞ্জ, গাঙ্গপুর, পঞ্চকোট, ছোটনাগপুর, বামড়া, শোনপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থানের শ্রেষ্ঠ রাজপুতগণেরই সহিত ইঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে।

* ইনি এখন রায়পুর রাজকুমার কলেজে অধ্যয়ন করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কেওঞ্ঝরের মহারাজের সম্প্রতি শুভবিবাহ হইয়াছে।

হেতমপুর-রাজবংশ

হেতমপুর-রাজবংশ পশ্চিম বাঙ্গালার অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজবংশ। এই রাজবংশের রাজধানী বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুর। এই রাজবংশের আদিপুরুষের নাম স্বর্গীয় মুরলীধর চক্রবর্ত্তী। ইঁহার আদি নিবাস বা জন্মভূমি ছিল বাঁকুড়ায়। তথা হইতে অনুমান ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বীরভূমে আগমন করেন এবং রাজনগরের স্বাধীন ভূপতির অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

মুরলীধরের পুত্র চৈতন্যচরণ ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। চৈতন্যচরণ সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রভূত পারদর্শী হইয়া উঠেন। পাঠান নৃপতিগণ তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি অতঃপর হেতমপুর দুর্গের অধ্যক্ষ হাফিজ খাঁর অনুরোধে বীরভূম হইতে হেতমপুরে বসবাস স্থাপন করেন।

চৈতন্যচরণের চারি পুত্র। তন্মধ্যে রাধানাথ মুসলমান শাসনকালে বীরভূম জেলার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইয়া উঠেন। যখন বীরভূমের মুসলমান নৃপতিগণের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, সেই সময়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বীরভূম রাজ্যের কুণ্ডোহিত জমীদারী ক্রয় করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাকী রাজস্বের জন্য এই জমীদারী নিলামে বিক্রয় করিয়া দেন। তিনি জীবিতকালে বহু জন-হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

রাধানাথের দুই পুত্র—বিপ্রচরণ ও গঙ্গানারায়ণ। গঙ্গানারায়ণের শৈশবেই মৃত্যু হয়। সুতরাং জ্যেষ্ঠ বিপ্রচরণই সমস্ত জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। তিনি জমিদারী কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া অল্প

স্বর্গীয় মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

দিনের মধ্যেই পিতৃদত্ত জমিদারীর পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া তুলেন। সাঁওতাল-বিদ্রোহের সময়ে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য দান করেন। তিনি তাঁহার জমিদারীর এলেকার ভিতরে সাঁওতাল-বিদ্রোহ শীঘ্রই প্রশমিত করিয়াছিলেন বলিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহার কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা করেন। নিম্নলিখিত পত্রখানিই উহার নিদর্শন :—

No. 2667

From

The Under-Secretary to the
Government of Bengal

To

I. Richardson Esqr.
Collector of Birbhum.

Dated Fort William, the 22nd Oct/66

Judicial

I am directed to acknowledge the receipt of your Diary of the 28th ultimo, and with reference to the intimation therein contained of the public spirit evinced by Babu Bipra Charan Chackravarty in raising a force at his own cost from among his dependents to aid the military in the suppression of the Sonthal insurrection to inform that the Lt.—Governor would be glad to hear more of the circumstance.

I have &c.

(Sd) A. U Rupen.

এই পত্রের মর্ম্ম :—

নং ২৬৬৭

বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের অণ্ডার-সেক্রেটারীর নিকট হইতে –

বীরভূমের কলেক্টর

আই রিচার্ডসন এস্কোয়ার বরাবরে

তারিখ, ফোর্ট উইলিয়াম, ২২শে অক্টোবর, ১৮৬৬

আমি আদিষ্ট হইয়া গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের আপনার ডায়ারী বা রোজনামচার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি এবং উহাতে লিখিত বিষয় হইতে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী লোক-হিতৈষণা-বশে সাঁওতাল বিদ্রোহ-দমনার্থ সরকারী সমর-বিভাগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে নিজ ব্যয়ে একদল সৈন্য গঠিত করিয়াছিলেন। আমি আদিষ্ট হইয়া আরও জানাইতেছি যে, ছোটলাট বাহাদুর এ বিষয়ে আরও অধিক সমাচার অবগত হইলে আনন্দিত হইবেন।”

বিপ্রচরণ “গোবিন্দ-সায়র” নামক একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। ইনি একটি প্রাসাদতুল্য বিশাল সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া উহা দেবী সরস্বতীর নামে উৎসর্গীকৃত করেন। এক্ষণে সুবৃহৎ হেতমপুর কলেজ এই বাটীতে অবস্থিত। তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইনি .৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র দানবীর ছিলেন। প্রভূত বদান্যতার জন্য তিনি অতীব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার দানের বিষয় প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অকালে অর্থাৎ মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে ইংরেজী ১৮৬২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। ইহার বয়স যখন মাত্র ১১ বৎসর সেই সময়ে ইনি পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরা-

হেতমপুর — রঞ্জন প্রাসাদ
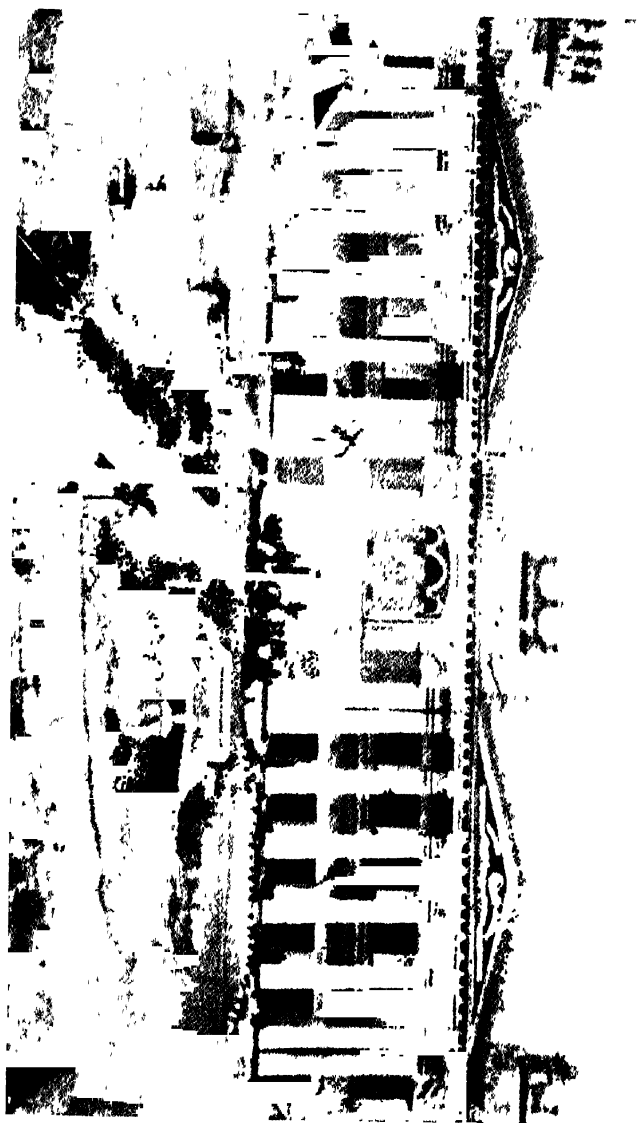
ধিকারী হন। তিনি যতদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, ততদিন তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়াডসের পরিচালনাধীন ছিল। তিনি প্রথমে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে চালিত কলিকাতা ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসনে শিক্ষালাভ করেন; পরে বারাণসীর ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসনে তাঁহাকে শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করা হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া স্বহস্তে জমিদারী-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তিনি আদর্শচরিত্র, করুণহৃদয় এবং ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন বলিয়া বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুলাভ করিয়াছিলেন। যে সকল রাজপুরুষ তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাহারাই বুঝিতে পারিতেন যে, রামরঞ্জন ন্যায়নিষ্ঠ ও উদারহৃদয় ভূম্যধিকারী। তিনি তাঁহার দরিদ্র প্রজাগণের অভাব-অভিযোগের প্রতীকার অবিলম্বে করিতেন। এইজন্য তিনি তাহাদের সম্মান, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি তাহাদিগকে অনেক টাকা খাজনা রেহাই দেন এবং অন্যান্য বহুপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করেন। ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক রামরঞ্জনের এই বদান্যতার জন্য তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করেন এবং তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। মহামান্য সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের গৌরবময় শাসনকালের স্মৃতিরক্ষাকল্পে রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর তাঁহার জমিদারীর কল্যাণকল্পে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করেন। বিগত দিল্লী দরবার উপলক্ষে তিনি মহামহিমান্বিতা সাম্রাজ্ঞীর হস্তে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং নিবেদন করেন যে, সাম্রাজ্ঞীর ইচ্ছামত যে কোনও লোকহিতকর কার্য্যে ইহা ব্যয়িত হইবে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের দিল্লী দরবারে তিনি উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দের দিল্লী দরবারে অসুস্থতার জন্য যোগদান করিতে পারেন নাই। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে তিনি "মহারাজা"

উপাধি লাভ করেন। যোগ্য পাত্রেই যে এই যোগ্য উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী হেতমপুরে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি একটী দাতব্য এলোপ্যাথিক, একটী দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ও একটি দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ তিনটির পরিচালনার্থ যাহা কিছু ব্যয় হইত তাহা তিনি করিতেন। একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীও তাঁহারই অর্থসাহায্যে পরিচালিত হইত। পরবর্ত্তীকালে তিনি একটী কলেজও প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করা হইয়া থাকে। এই কলেজ-পরিচালনের জন্য তাঁহাকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইলেও তিনি তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত মধ্য ইংরেজী মধ্য বাঙ্গালা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাঠশালা-সমূহকে উপেক্ষা করেন নাই; ঐগুলির কার্য্য-সৌকর্য্যার্থও পর্য্যাপ্ত অর্থসাহায্য তিনি করিতেন।

বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী সাঁওতাল-বিদ্রোহের সময়ে ব্রিটিশ গবমেণ্টকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার আমোল হইতেই হেতমপুর রাজবংশ ব্রিটিশ-রাজের পরম অনুরাগী। রাজভক্তিই এই বংশের বিশিষ্ট লক্ষণ।

মহারাজা কাশীধামে একটি শিবমন্দির এবং বৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরাসবিহারী জীউর জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু যাত্রী এই দুই মন্দির দর্শন করেন। মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতার ভোগ হইতে নিত্য অতিথি-সেবা হয় এবং সেবান্তে দক্ষিণা দেওয়া হইয়া থাকে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজার বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবী পরলোক গমন করেন। ইনি যেমন সুশিক্ষিতা, তেমনই উদার-

হেতমপুর— কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ
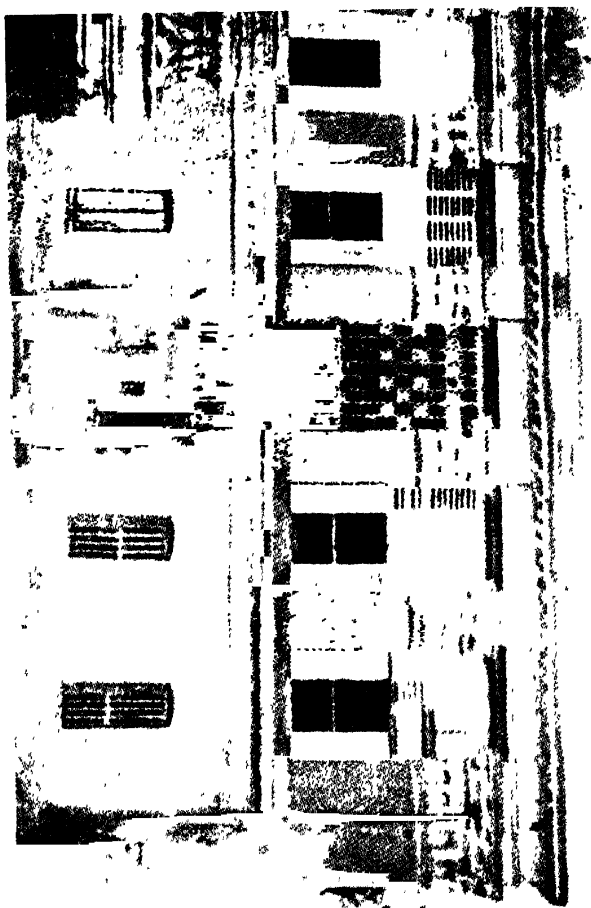
হৃদয়া ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে প্রজাগণ গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিল। ইনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং মহাপ্রভুর সেবা ও ভোগ-রাগাদির জন্য বহুমূল্য সম্পত্তি দান করিয়া যান। এই সম্পত্তির আয় হইতে এই মন্দিরে নিত্য দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইয়া থাকে। মহারাণী কলেজের উন্নতিকল্পে বার্ষিক ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

ইনি নবদ্বীপে ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠা করেন; এখানে সকল সময়েই গঙ্গাস্নানার্থীগণ আশ্রয় পাইয়া থাকে।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী স্বর্গারোহণ করেন।

মহারাজা রামরঞ্জনের পাচ পুত্র। প্রথম পুত্র—মহারাজকুমার নিত্যনিরঞ্জন; দ্বিতীয়—মহারাজকুমার সত্যনিরঞ্জন; তৃতীয় মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন; চতুর্থ—মহারাজকুমার সদানিরঞ্জন এবং পঞ্চম—মহারাজকুমার কমলানিরঞ্জন।

মহারাজা রামরঞ্জনের উইল অনুসারে তাঁহার বিপুল জমিদারী তদীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে।

জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ-কুমার নিত্যনিরঞ্জন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র—জ্ঞাননিরঞ্জনকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীমান্ জ্ঞাননিরঞ্জনও মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

দ্বিতীয়পুত্র কুমার সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সত্বরেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় হেতমপুর কলেজ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হইয়াছে। তাঁহারই উদ্যোগে আজ ছাত্রগণ এই কলেজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পারিতেছে। ইহাতে এই অঞ্চলের

উচ্চশিক্ষা-সম্বন্ধীয় একটী বিশেষ ও বহুদিনের অভাব দূরীভূত হইয়াছে। বীরভূম জেলা কেবল বীরভূম কেন বাঙ্গালার অন্যান্য জেলা হইতেও ছাত্রগণ এই কলেজে অধ্যয়নার্থ আগমন করিতেছে; কারণ, এই কলেজে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে লেখাপড়া শিখান হইয়া থাকে। কৃতী ছাত্রগণকে এই কলেজে বিনা বেতনে পড়াইবার ব্যবস্থা আছে।

ইঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি প্রখর এবং জমিদারী-পরিচালনায় ইঁহার পারদর্শিতাও প্রভূত। ইঁহার জমিদারী এরূপ সুপরিচালিত যে অপব্যয় হইবার উপায় নাই। পক্ষান্তরে, কয়লা খনির ও কলকারখানা ইত্যাদির দ্বারা জমিদারীর আয় ইনি এক্ষণে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন।

উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ ইঁহার সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। যাঁহারাই ইঁহার সহিত একবার আলাপ করেন, তাঁহারাই ইঁহার রাজভক্তির প্রশংসা করিয়া থাকেন। গত ১৯১৬ খৃঃ কুমার সত্যনিরঞ্জন 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। মহামহিম যুবরাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম এবং রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তিনি ভিক্টোরিয়া-স্মৃতি-ভাণ্ডারে ২৫ হাজার টাকা দান করেন: ইতিপূর্ব্বে তিনি আরও ১০ হাজার টাকা ভিক্টোরিয়া-স্মৃতি-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। যুবরাজ প্রীতির সহিত এই দান গ্রহণ করেন।

জর্ম্মণ-মহাযুদ্ধের সময়ে রাজা সত্যনিরঞ্জন সৈনিক-সংগ্রহে সহায়তা করিবার জন্য ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রজাদের মধ্যে যাঁহারা সৈন্যদলভুক্ত হইয়া ভারতের বাহিরে যুদ্ধ করিতে যাইবে তাহাদিগকে তিনি নানারূপে অর্থসাহায্য করিবেন। এই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষাও করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট সৈনিক-সংগ্রহে তাঁহার এই সাহায্যের বিষয় আনন্দের সহিত লিপিবদ্ধ করেন।

রাজা শ্রীসত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর

সিউড়ি চেরিটেব্‌ল ডিস্পেন্সারীতে রাজা সত্যনিরঞ্জন ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং গবর্মেণ্ট তাঁহাকে "বাহাদুর" উপাধিও প্রদান করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যে দরবার হয় সেই দরবারে বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করেন :—

অতঃপর গবর্ণর দরবারের কার্য্যারম্ভের অনুমতি প্রদান করেন। চীফ সেক্রেটারী রাজা সত্যনিরঞ্জনকে প্রদত্ত রাজা বাহাদুর উপাধির সনন্দ পাঠ করিলে গবর্ণর রাজা বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলেন,— "আপনি বাঙ্গালীর প্রধান রাজভক্ত জমিদারগণের অন্যতম। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আপনি রাজ-উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তদবধি আপনি জনসাধারণের কল্যাণকর বহু কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিয়া আপনার বংশের সদনুষ্ঠানের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আপনি স্বয়ং সাধারণহিতকরকার্য্যসমূহে বিশেষরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বীরভূম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান-রূপে আপনি প্রভূত সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। আপনার "রাজা বাহাদুর" উপাধি-প্রাপ্তিতে আমি আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।"

সিউড়ি হইতে দুবরাজপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইতেছে সেই রাস্তায় বক্রেশ্বর সেতুনির্ম্মাণের জন্য রাজা বাহাদুর সত্যনিরঞ্জন ৯০০০৲ টাকা বীরভূম জেলা-বোর্ড-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। দুবরাজপুর ইল্লামবাজার রাস্তায় শাল নদীর উপর একটি সেতু (causeway) নির্ম্মাণ করিবার জন্য তিনি ৪০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। সাধারণের কল্যাণকল্পে তাঁহার এই সকল ও অন্যান্য দান গবর্মেণ্ট কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বীরভূম জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে রাজা বাহাদুর সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্মেণ্ট বাঙ্গালার

জেলাবোর্ড-সমূহের কার্য্যবিবরণীর সমালোচনা-প্রসঙ্গে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন :—

"নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদগণ জেলা বোর্ডের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন বলিয়া মন্ত্রী তাহার গুণ উপলব্ধি করিতেছেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বীরভূম

রাজা বাহাদুরের এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম—কুমার ব্রহ্মনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এবং কন্যার নাম শ্রীমতী ভানুবালা দেবী। ইহাদের উভয়ের বিবাহ হুগলী উত্তরপাড়ায় প্রসিদ্ধ জমিদার-বংশে হইয়াছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, শ্রীমতী ভানুবালা একমাত্র পুত্র কুমার প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়কে রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

কুমার ব্রহ্মনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর এক পুত্র কুমার রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস পরীক্ষাও পাশ করিয়াছেন।

কুমার ব্রহ্মনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এক্ষণে তাঁহার পিতার সহিত জমিদারীর কার্য্যতত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং এই অল্প বয়সেই জমিদারী পরিচালনায় তাঁহার যোগ্যতার আভাস ও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর দুই কন্যা—(১) শ্রীমতী বেদবালা দেবী ও (২) শ্রীমতী তপোবালা দেবী। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ আসামের অন্তর্গত বিলাসীপাড়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী-বংশীয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহিত হইয়াছে। কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন বরিশালের বিখ্যাত জমীদার-বংশের শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়চৌধুরী। ইনি সুকবি

কুমার শ্রীব্রহ্মনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

কুমার শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী

স্বর্গীয় দেবকুমার রায় চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। মহারাজার চতুর্থ পুত্র কুমার সদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী প্রমোদবালা দেবীর দুই পুত্র ও তিন কন্যা। ইহারা সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক।

মহারাজার পঞ্চম পুত্র কুমার কমলানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর একটী মাত্র পুত্র কুমার বিশ্বনিরঞ্জন উচ্চশিক্ষিত যুবক। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এল্-পরীক্ষোত্তীর্ণ। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত বেহালার জমিদার-বংশের কন্যা শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে।

হেতমপুর-রাজবংশ-তালিকা

ছান্দড় (বাৎস্যগোত্র)
|
কাব (শিমলাঞী গাঞী)
|
ভয়াপহ
|
কিরণ
|
গৌতম

কর্ণবাল | দয়া | দশরথ

গঙ্গাধর | বিকর্ত্তন | রবিকর | রজনী

(গঙ্গাধর)

ভগীরথ | মহীমণ্ডল | চন্দ্রচূড় | শুক্লাম্বর

রাম | অচ্যুত | ধর | ধীর | গোবিন্দ

রাম
(১) (রাজা)
রুদাই বা রুদ্র
লব
কুশ
বিষ্ণু
চক্রপাণি
চতুর্ভুজ
শঠাই
লম্বোদর
অর্জ্জুন
শ্রীমান
(২) মধুসূদন (হাজরা)
কৃষ্ণ
দমনক
মকরন্দ
নারায়ণ
ত্রিবিক্রম
যদুনন্দন
নিঃশঙ্ক
সুবুদ্ধি
গোপাল
(অকৃতদার)
(৩) কমলাকর
(বিদেশস্থ)
গোপা
(অপুত্রক)
হার
(নির্ব্বংশ)
(৪) মুরলীধর
(৫) চৈতন্যচরণ
প্রসাদ
ব্রজমোহন
রাধানাথ
কুচিল
সনাতন
বিপ্রচরণ
গঙ্গানারায়ণ
(কন্যা) রুক্মিণী
রামমণি
কৃষ্ণমণি
শ্যামমণি
প্রমথনাথ
আশুতোষ
কৃষ্ণচন্দ্র
(কন্যা) দোল-গোবিন্দমণি
কৃষ্ণবিনোদিনী
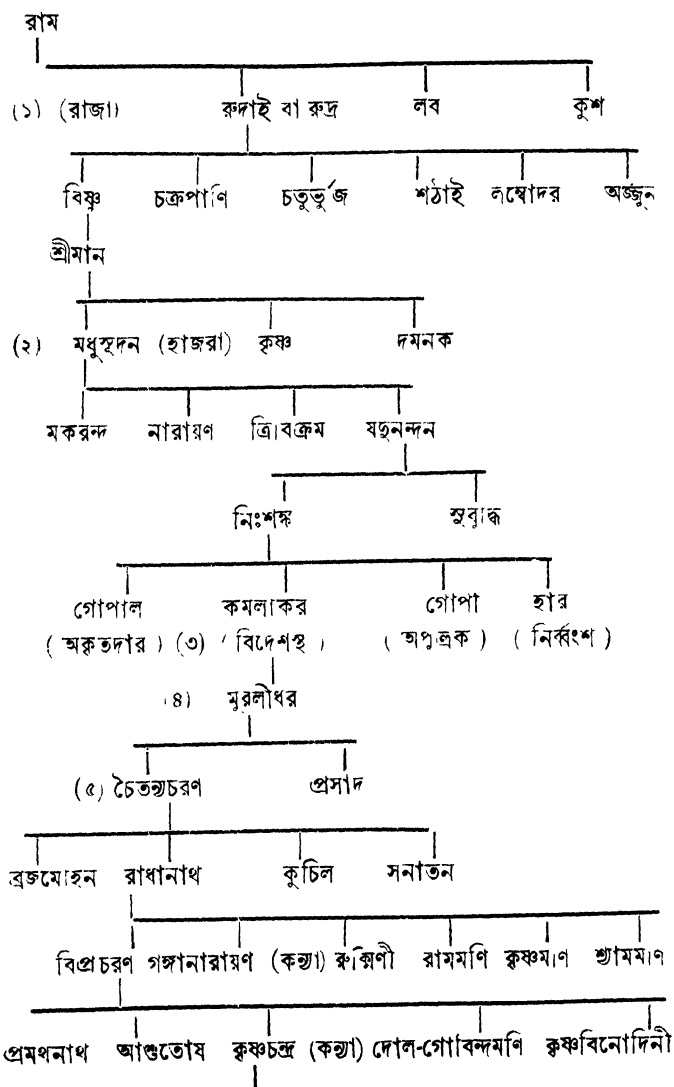
কৃষ্ণচন্দ্র

রাজবালা সৌদামিনী (৬) (মহারাজা) রামরঞ্জন রাখাল বাগাল

৺নিত্যনিরঞ্জন ৺ভূপবালা (৭) রাজা সত্যনিরঞ্জন ৺মহিমানিরঞ্জন

৺জ্ঞানরঞ্জন

ব্রহ্মনিরঞ্জন ভানুবালা কার্ত্তিকদাসী রাণী

শ্রীরাধিকারঞ্জন

৺নৃপবালা সদানিরঞ্জন কমলানিরঞ্জন রাসবালা অমিলাবালা

শ্রীমতী প্রমোদবালা শ্রীবিশ্বনিরঞ্জন

১) "রুদ্রস্তু পৃথিবীপালো রাজল্লোঁকহিতে রতঃ" (পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি-সঙ্কলিত সম্বন্ধনির্ণয়-ধৃত শ্লোক)।

(২) "শ্রোত্রিয়াণাং মধু শ্রেষ্ঠো ঋষীণাং হি যথা ভৃগুঃ" (ইনি সহস্র সৈন্যের অধিপতি ছিলেন বলিয়া "হাজরা" উপাধি প্রাপ্ত হন)।

(৩) "বাঁকুড়ায়" বাস করেন।

(৪) বীরভূম—রাজনগরে বাস করেন।

(৫) বীরভূম—হেতমপুরে বাস করেন। তদবধি এই বংশ হেতমপুরে বাস করিতেছেন।

(৬) ইং ১৮৭৫ খৃঃ ১৭ই মার্চ্চ ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রাজা", ইং ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী "রাজা বাহাদুর" এবং ইং ১৯১২ খৃঃ ১৩ই জুন "মহারাজা"।

(৭) ইং ১৯১৬ খৃঃ ৩রা জুন (এম্পারার্স বার্থডে উপলক্ষে) ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহারাজকুমার রায় সদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর

মহারাজকুমার রায় সদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বীরভূম জেলার বিখ্যাত ৺মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর চতুর্থ পুত্র। ইনি ১২৮৬ সালে ২৫শে কার্ত্তিক তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজা বিখ্যাত হেড মাষ্টার শিবচন্দ্র সোমকে ইহার গার্জ্জেন-টিউটর নিযুক্ত করিয়া দেন এবং তাঁহার শিক্ষায় ও সাহচর্য্যে ইনি অতি অল্প বয়স হইতেই সকলের প্রিয়পাত্র হন। ইনি আঠার বৎসর বয়সে বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বধূরাণী পঙ্কজিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী প্রমোদবালা দেবীর সহিত কলিকাতার বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়ের একমাত্র প্রপৌত্র ও ওয়ারীস শ্রীযুক্ত বাবু ধরণীমোহন রায়ের শুভ বিবাহ হয়। উক্ত কন্যার বর্ত্তমানে তিনটী কন্যা ও দুইটী পুত্র বিদ্যমান।

মহারাজকুমার রায় সদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর নিজের ব্যবহারের মাধুর্য্যে বীরভূম-জনসাধারণের স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ইঁহার প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ। তজ্জন্য তিনি বীরভূম সদর সহরে (অর্থাৎ সিউড়িতে) প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয়ে একটী (R. T. Girl School) নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং উক্ত স্কুলের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক অনেক টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। বীরভূম জেলার সিউড়ি সহরে Indoor রোগীদের থাকিবার বিশেষ অসুবিধা ও কষ্ট দেখিয়া তিনি করুণার্দ্র হইয়া প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে "Sada Niranjan Hospital" নির্ম্মাণ করিয়া

মহারাজকুমার রায় সদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর

দেন। সিউড়ির ভদ্রসাধারণ একটী Clubএর জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহার সিউড়িস্থিত ভবনটী মায় তৎসংলগ্ন পতিত ভূমি ও বাগান সাধারণকে দলিল দ্বারা দান করিয়াছেন। তাহা এখন "Lees Club" নামে পরিচিত। উক্ত বাটী ও তৎসংলগ্ন বাগান আদির মূল্য চল্লিশ হাজার টাকার উপর হইবে। তাঁহার দান চিরকালই নিঃস্বার্থ। তিনি গোপনে দান করিতেই বিশেষ সমুৎসুক। দেশস্থ কত নিঃসহায় দরিদ্র পরিবার এবং বিধবা যে তাঁহার নিকট এই গোপন দানের দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তিনি যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্টকে আট হাজার টাকা ব্যয়ে একটী "Motor Ambulance" দান করেন। তাঁহার প্রজাবর্গ এই কলিকালেও রাম-রাজত্বে বাস করার ন্যায় পরম সুখে আছে। তিনি নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া প্রজাদের হিতকল্পে বহু ন্যায্য প্রাপ্য টাকা তাহাদিগকে মাপ করায় প্রজারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করে। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাহার এই দানে ও অমায়িক সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "Rai Bahadur" উপাধি দান করিয়াছেন। তিনি পরের হিতার্থ কত সহস্র টাকা যে দান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন প্রার্থীকে তাঁহার নিকট নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয় না। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সকলের মূলে তাঁহার উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বধূরাণী পঙ্কজিনী দেবীর সহানুভূতিই মহারাজকুমারকে সকল প্রকার সৎকার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছে। দৈনন্দিন প্রার্থীদের উক্ত বধূরাণীর নিকট সাহায্যার্থ আগমনে এই রাজ-অন্তঃপুর মুখরিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত বধূরাণীর অকাতর গোপন দান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও সরল ব্যবহার তাঁহাকে কমলাদেবীর ন্যায় শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ

অদম্য অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তির প্রভাবে যে সকল মহাত্মা অত্যন্ত অস্বচ্ছলতার ভিতরে প্রতিপালিত হইয়াও এই কর্ম্ম-বিমুখ বাঙ্গালী-সমাজে উন্নতির চরম সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন, রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম।

নিবারণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত খলিসানী গ্রামে। ইঁহার অতিবৃদ্ধ পিতামহ কল্যাণচরণ মুখোপাধ্যায় ঐ গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হইতে ২০ মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং শ্রীরামপুর হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর থানার অধীন বড়া গ্রামে বসু জমিদার-বংশের যজন-যাজন প্রভৃতি পুরোহিতের কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ আসিয়া বাস করেন। গ্রামটী ক্ষুদ্র হইলেও পূর্ব্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং অন্যান্য প্রায় সকল জাতিরই লোকের বাস ছিল। ঐতিহাসিক পরিচয়—বহু প্রাচীন কাল হইতেই এই বড়া গ্রাম ধনে জনে শিক্ষাদীক্ষায় বিখ্যাত ছিল। এই ক্ষুদ্র পল্লীখানি বহু কৃতী সন্তানের জন্মভূমি। বাঙ্গালার প্রথম সংবাদপত্রিকার সম্পাদক যে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা সাহিত্যে ও শিক্ষায় নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন তাঁহার জন্মস্থান এই বড়া গ্রামে। উনবিংশ শতাব্দীর পল্লীকবি দাশরথি রায়ের সমসাময়িক পাঁচালীকার রসিকচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি এই বড়া গ্রাম। অস্ত্রচিকিৎসায় সুনিপুণ রামপুরহাট ই-আই-রেল হাসপাতালের বিখ্যাত ডাক্তার কেদার মিত্রের জন্মভূমি এই বড়া গ্রাম। এখনও বীরভূম বর্দ্ধমান জেলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট

কেদারবাবুর নাম সুপরিচিত। ইষ্ট বেঙ্গল ও আসামের কেমিক্যাল পরীক্ষক ডাক্তার রায় সাহেব প্রিয়নাথ বসুর জন্মভূমিও এই বড়া গ্রাম।

বড়া গ্রামের বসু বংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমীদার; ইঁহারা মাহিনগরের বসু নামে পরিচিত। এই বংশের আদিপুরুষ জয়কৃষ্ণ বসু মহাশয় খলিসানী হইতে প্রথমে এই বড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তৎকালীন তিনিই কল্যাণচরণ মুখোপাধ্যায়কে ঐ খলিসানী গ্রাম হইতে আনাইয়া এই বড়া গ্রামে বাস করান। কল্যাণচরণ ভরদ্বাজগোত্রীয় বল্লবা মেলে দুর্গাবর পণ্ডিতের সন্তান। ইনি কুলীন ছিলেন না বটে, কিন্তু ইহার একমাত্র পুত্র নন্দদুলাল এবং তিন পৌত্র—বারাণসী, দেবী-প্রসাদ এবং রামনারায়ণ—ইঁহারা সকলেই পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক ও শুচিপরায়ণ লোক ছিলেন; ইঁহারা পাণ্ডিত্যে কুলীন অপেক্ষা বেশী সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কল্যাণচরণের পাঁচ প্রপৌত্র—চণ্ডীচরণ, হলধর, কার্ত্তিকচন্দ্র, কাশীনাথ এবং বিশ্বনাথ। ইঁহারা সকলেই গুণী, পণ্ডিত এবং নিরতিশয় নিষ্ঠাবান্ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বারাণসীর পুত্র চণ্ডীচরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইনি সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন এই মহাপুরুষ অগাধ পাণ্ডিত্য ও উন্নত চরিত্রের প্রভাবে দেশ ও সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্যে উন্নতির উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত চণ্ডীচরণ অপুত্রক ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে তদীয় সাধ্বী পত্নী স্বামীর চিতারোহণে সহমরণে গমন করিয়া সতীধর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনপূর্ব্বক নিজেকে এবং স্বামীর বংশকে গৌরবান্বিত ও চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলধর ধর্ম্মপিপাসু, বুদ্ধিমান, তেজস্বী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎকালে উঁহার পত্নী দিগম্বরী দেবীর মত পরোপ-কারিণী ও লোকপ্রিয়া স্ত্রীলোক অতি বিরল ছিল। হলধর অপুত্রক

হইলেও তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রতি যেমন পুত্র নির্ব্বিশেষে ব্যবহার করিতেন, পত্নী দিগম্বরী দেবীও তেমনি তাঁহাদিগকে ততোধিক স্নেহে ও যত্নে লালন-পালন করিতেন।

এখন দেখা যাইতেছে যে, দেবীপ্রসাদের পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র হইতেই উপস্থিত বড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কার্ত্তিকচন্দ্রের চারি পুত্র—নবীন, মধুসূদন, যদুনাথ ও কেদারনাথ অল্প বয়সে ইঁহাদের মাতৃবিয়োগ হওয়াতে এই চারি ভ্রাতা ও এক ভগিনী চঞ্চলা দেবী খুল্লতাত-পত্নী দিগম্বরীর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বিবাহের পর সকলেই পৃথকভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

কার্ত্তিকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র নবীনচন্দ্র পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বিবাহের পর শ্বশুরালয়ের ভূসম্পত্তি পাইয়া বৈদ্যবাটী গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র নেপালচন্দ্র এবং হারাণচন্দ্র উভয়েই অপুত্রক অবস্থায় জীবনলীলা শেষ করেন। নবীনচন্দ্র ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

কার্ত্তিকচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র মধুসূদন অবস্থার দুর্ব্বিপাকেই হউক অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক, জীবনে বিশেষ সুখ-শান্তি ও আনন্দের মুখ দেখেন নাই। তিনি এই বড়া গ্রামে জমীদারী সেরেস্তায় সামান্য বেতনের কর্ম্ম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন তদ্দ্বারা অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মধুসূদন পরম ধার্ম্মিক, সদাসন্তুষ্টচিত্ত এবং শুচিপরায়ণ লোক ছিলেন। তাঁহার বিনয়ে, অমায়িকতায় এবং সদ্ব্যবহারে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আপ্যায়িত এবং আনন্দিত হইত। যখন তিনি খুল্লতাত-পত্নীর সংসারে ছিলেন তখন কখনও ঠিকমত সময়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতেন না, প্রত্যহই অতিথি-অভ্যাগতদের প্রতীক্ষায় থাকিয়া পরে আহার করিতেন। যদি কোন দিন অতিথির সংখ্যা বেশী

থাকিত সেদিন আর তাঁহার আহার হইত না। খুল্লতাত-পত্নীর নিকট নিজ শারীরিক অসুস্থতা জানাইয়া নিজের অন্নে অতিথি-সেবা করিয়া পরম আনন্দানুভব করিতেন। এ স্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করিলে মধুসূদনের চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিতে পারা যাইবে। কোন সময়ে জমীদারদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ লইয়া একটা দেওয়ানী উপস্থিত হয়। ঐ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য মধুসূদনের উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন হয়। মধুসূদন জীবনে কখনও হলপ করে নাই এবং এ ক্ষেত্রেও করিবেন না—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া গোপনে পদব্রজে কাশীধামে চলিয়া গিযাছিলেন (অবশ্য সেই সময়ে রেলগাড়ী হয় নাই) এবং যতদিন ঐ মোকদ্দমা চলিয়াছিল ততদিন তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন নাই।

মধুসূদন বঙ্গাব্দ ১২৮১ সালের ১৩ই বৈশাখ তারিখে তিন পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া সজ্ঞানে ৺ গঙ্গালাভ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রমানাথ, মধ্যম নিবারণচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ শশিভূষণ। রমানাথ গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে বড়া বঙ্গবিদ্যালয় হইতে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন ও পরে কোন বিশেষ শাস্ত্রাভিজ্ঞের নিকট কিছুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক ঐ বড়া স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে বৃত হইয়া বহুকাল সম্মানের সহিত শিক্ষাবিভাগে অতিবাহিত করেন। রমানাথের তিন পুত্র ও চারি কন্যা বর্ত্তমান ; জ্যেষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চাকরী-জীবনে প্রবিষ্ট হন। ইনি প্রথম উদ্যমেই ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে খুল্লতাতের নিকট গমন করিয়া কোনও গভর্ণমেণ্ট আফিসে কার্য্যে নিযুক্ত হন। তথায় প্রায় চব্বিশ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিবার পর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে কলিকাতায় বদলি করিয়া আনাইয়াছেন। এখন ইনি Survey-General Office-এ

Pay and Account Section এর Superintendent এর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রের তিন পুত্র ও দুই কন্যা; জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাতকুমার বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ অধ্যয়ন করিতেছেন, দ্বিতীয় পঙ্কজ এবং কনিষ্ঠ সুধাংশু স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে।

রমানাথের দ্বিতীয় পুত্র রামচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই যেরূপ সাংসারিক এবং সামাজিক, তেমনই কর্ম্মপটু; ইনি দেশের বাড়ীতে থাকিয়া সাংসারিক ও বৈষয়িক সমস্ত কাজ-কর্ম্মের তত্ত্বাবধান এবং পৈতৃক ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকেন। ইঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যা,—জ্যেষ্ঠ অনিলকুমার, দ্বিতীয় সত্যচরণ, তৃতীয় লক্ষ্মীকান্ত এবং কনিষ্ঠ নিরাপদ। জ্যেষ্ঠ ও দ্বিতীয় পুত্রদ্বয় গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, তৃতীয় ও কনিষ্ঠ অতি শিশু।

রমানাথের কনিষ্ঠ পুত্র তারকনাথ গ্রাম্য স্কুলে বাল্য শিক্ষা শেষ করিয়া ব্রহ্মদেশে গমন করেন। তথায় High School Final, I. Sc., B. Sc.—এইসকল পরীক্ষায় সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ও বৃত্তি লাভ করিয়া পরে B. E. পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মদেশে রেলওয়েতে ইঞ্জিনীয়ারের কর্ম্ম করিতেছেন। ইঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা; জ্যেষ্ঠ পুত্র রবি, দ্বিতীয় অমিয়কুমার—ইহাদের এখন শৈশবাবস্থা।

মধুসূদনের দ্বিতীয় পুত্র নিবারণচন্দ্র বঙ্গাব্দ ১২৭৬ সালের ২০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে নিবারণচন্দ্রের লেখাপড়া শিখিবার বহু অন্তরায় ঘটিয়াছিল। ইঁহার উচ্চ শিক্ষায় প্রবল ইচ্ছা ও যত্ন সত্ত্বেও অবস্থার দুর্ব্বিপাকে কার্য্যে সফলতা-লাভ ঘটে নাই। একদিকে সংসার-চিন্তা, অন্যদিকে প্রবল অধ্যয়নেচ্ছা ইঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় এবং মধ্য

ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া দেশে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকায় মাতুলের আশ্রয়ে বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া জনাই ট্রেনিং স্কুলে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন শেষ করিয়া ছাত্র-জীবনের যবনিকা টানিয়া দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। নিবারণচন্দ্র চাকুরীর জন্য বহু অন্বেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া শেষে সামান্য বেতনেই ই-বি রেলওয়েতে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। পাঁচ ছয় মাস কাজ-কর্ম্ম হইয়াছে এমন সময় স্নেহময়ী সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপিণী জননী বঙ্গাব্দ ১২৯৭ সালের ৫ই পৌষ তারিখে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। জননী প্রসন্নময়ী দেবী সংসার-ক্ষেত্রেও প্রসন্নময়ী ছিলেন। ইনি সকল গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। জ্ঞানে, ধীরতায়, বিশ্বস্ততায় ইনি ছিলেন শান্তিময়ী দেবী, ইঁহার নিকট শত্রু-মিত্র বলিয়া কোন পার্থক্য ছিল না। প্রসন্নময়ী সকলকেই সমান যত্নে, আদরে ও সদ্ব্যবহারে আপ্যায়িত ও আনন্দিত করিতেন; তাঁহার দেবীতুল্য মূর্ত্তিদর্শনে চক্ষু ভক্তিভরে আপনি নত হইত।

মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর নিবারণচন্দ্র সংসার শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন এবং হৃদয়ে কর্ম্মদেবীর মন্দির গঠন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্রই হইল কর্ম্ম। কর্ম্মই তাঁহার উপাস্য, কর্ম্মই তাঁহার সাধনা, কর্ম্মই তাঁহার আরাধ্য ও আরাধনার বস্তু। এই সাধনা দৃঢ় করিয়া, সংসার ভুলিয়া, শোকজ্বালা ভুলিয়া একুশ বৎসর বয়সে নিবারণচন্দ্র আত্মীয়-স্বজন ও রেলওয়ের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে একাকী সমুদ্রযাত্রা করিয়া আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব-বর্জ্জিত ব্রহ্মদেশে যাইয়া উপস্থিত হন। তাঁহার একমাত্র ভবিষ্য চিন্তা কিসে নিজের অবস্থার উন্নতি হয় এবং দশের ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। এক বৎসরকাল ব্রহ্মদেশের নানা বিপদসঙ্কুল স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর

মাসে ঐ দেশের পূর্ত্তবিভাগের কার্য্যে প্রবিষ্ট হন এবং ঐ সময়ে ব্রহ্ম-দেশের লাট ভবন নির্ম্মাণকার্য্যে ব্রতী হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও ন্যায়নিষ্ঠার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই তিনি সাধারণের নিকট তাঁহার কার্য্যদক্ষতার এবং কার্য্যকুশলতার জন্য সুপরিচিত হইয়া উঠেন। ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ যে কোন কার্য্যে তিনি সমান যত্ন, অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমশক্তির নিয়োগ করিতেন। তাঁহার সংগঠনশক্তি ছিল অদ্ভুত। তিনি বিশেষ দক্ষতা এবং যশের সহিত তেত্রিশ বৎসর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া যে অফিসে প্রথম নিযুক্ত হন সেই অফিস হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের যে কোন সামান্য ও বৃহৎ কার্য্যে কদাচ আলস্য করেন নাই। এই সকল কারণে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের লর্ড কর্জ্জনের দিল্লীতে যে দরবার হয় সেই বিরাট দরবারের রাজ কার্য্য-পরিচালনের জন্য দুইজন ইঞ্জিনীয়ার ব্রহ্মদেশ হইতে মনোনীত হইয়া দরবার-কার্য্য-পরিচালনার্থ প্রেরিত হন। কিন্তু তৎকালীন যিনি Officer-in-charge (Captain J. S. S. Dunlop) হইয়া দরবার-কার্য্য দেখা-শুনা করিতেছিলেন তিনি উহা দর কার্য্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পরে ইনি উক্ত কার্য্যে মনোনীত হন এবং সেখানে গমন করিয়া প্রায় আট মাস তথায় অবস্থানপূর্ব্বক খুব সতর্কতার সহিত ও ব্যয়বাহুল্য না করিয়া সকল কার্য্য সুন্দররূপ নির্ব্বাহ করেন। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট বড়ই প্রীত হইয়া ইহাকে উপযুক্ত পুরস্কার-দানে উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট করেন। সুশৃঙ্খলায় রমণীয়ভাবে দরবার-কার্য্য শেষ করিয়া ইনি যেরূপ গবর্ণমেণ্টের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন সেরূপ সৌভাগ্য অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। ইনি সাধারণ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন না; ইট-পাথরের ভিত্তির মধ্যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও তাহার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠাই ইঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশেষত্ব। প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ খাপছাড়া করিয়া দৃষ্টিকটু সৌন্দর্য্যসৃষ্টি

ইঁহার অভ্যাস ছিল না। এইখানেই ইনি ছিলেন বিশেষ ইঞ্জিনীয়ার।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের ভারত-আগমন-উপলক্ষে দিল্লীতে পুনরায় যে বিরাট দরবার হয় সেই বৃহৎ কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে ইনি একাকী দিল্লীতে গমন করিয়া প্রায় এগার মাস অবস্থান করিয়া বিরাট অনুষ্ঠানের যাবতীয় কার্য্যগুলি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সদাশয় Sir G. Fell I. C. S., C. I. E. যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার অবিকল নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

Burma Camp

Coronation Durbar

Delhi 7. 1. 12

Babu N. C. Mukerji of Burma Public Works Department has been employed on the Burma Camp since the beginning of May. He came over here in June and was in sole charge of the Camp until my arrival at the beginning of October.

I cannot find terms of praise sufficient to express my appreciation of the work he has done in this Camp. He had an exceptionally difficult task and carried it out with complete success. His roads, lawns &c. were the best in the whole Durbar area. He never spared himself but did the work of three men. He is conspicuously honest, straightforward, energetic and capable. He manages men well and earns the respect of all

classes alike. Without his help it would have been impossible to carry through the heavy work of preparing and running this large Camp.

I have known him for many years and my opinion of him increases the larger I know him and the more I see of his work. I donot believe there is a better supervisor in India.

I sincerely trust that his admirable work will be recognized by special promotion in his Department.

(Sd) G. Fell, I. C. S.

c/o Burma Camp.

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যখন দিল্লীতে নূতন রাজধানী প্রস্তুত-কার্য্য আরম্ভ হয় সে সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট, ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টকে তারযোগে অনুরোধ করিয়া জানান যে, ইঁহাকে যেন দিল্লীর কার্য্যের জন্য পাঠান হয়। সে সময়ে শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন দিল্লীর কার্য্যে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট যে টেলিগ্রাম ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টকে করিয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল :—

Burma Works Telegram N. 213E. dated the 23rd April 1915, To the Superintending Engineer Rangoon Circle Rangoon.

Government of India suggest that N. C. Mukerji relieves Kerwick at Delhi he would draw usual Deputation and conveyance allowances admissible to Upper Subordinates and Sub Divisional allowance if placed in Sub Divisional Charge. Please wire whether you agree to the exchange and whether Mukerji is willing to go.

নিবারণচন্দ্র ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগের একজন বিশিষ্ট দক্ষ কর্ম্মচারী। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তিনি সর্ব্বদা পরোপকারে যত্নবান্ ও অহঙ্কারশূন্য ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি প্রদান করিয়া ইঁহার কার্য্যকুশলতায় আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ঐ বৎসর ৭ই জুলাই তারিখে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী (Chief Secretary Mr. W. F. Rice) তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Dear Sir,

The Lieutenant-Governor has been authorized by His Excellency the Viceroy to distribute a number of silver medals among the leading non-official and Official gentlemen in Burma in commemoration of the Coronation Durbar held by his Majesty the King Emperor at Delhi in December 1911. I am desired to inform you that His Honor has been pleased to include you in the list of persons selected to receive the medals.

I am to forward a silver medal for your acceptance and I am to ask you to be so good as to sign the enclosed form of acknowledgment and return it to me.

(Sd) W. F. Rice.

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই তারিখে গভর্ণমেণ্ট হাউসে যে দরবার হয় সেই দরবারে ব্রহ্মের লাট সাহেব রায় সাহেবকে নিম্নলিখিতভাবে সম্বোধন করিয়া তাঁহার হাতে সনদ ও মেড্যাল প্রদান করেন :—

You rendered excellent service in the Public

Works Department. You are a man of resource and equally good at every branch of your work. In view of the good work which you did in the Burma Camp at the Delhi December of 1903 you were specially selected for the same employment at the Durbar of 1911. You are in sole charge of the Burma Camp from June to October 1911 and carried out an exceptionally difficult task with complete success. Your industry, energy and ability were warmly acknowledged by all the officer with whom you came in contact.

নিবারণচন্দ্র প্রকৃতই লোকহিতকর কার্য্য ও দেশসেবার ভার নিজ শিরে বহন করিয়া দেশকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শে বঙ্গদেশ অনুপ্রাণিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। ইহার ন্যায় আদর্শ কর্ম্মী ও বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান বিরল। ইনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে নিজ বড়াগ্রামে স্বর্গীয় পিতার পবিত্র স্মৃতি-রক্ষণার্থ সারা জীবনের উপার্জ্জিত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটী দ্বিতল সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তদীয় পিতার নামে "বড়া মধুসূদন" উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং যাবতীয় আসবাব এবং স্কুল-পরিচালনার খরচ এ তাবৎ বহন করিয়া গ্রামবাসীদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া তাঁহার স্বর্গগত পিতার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন।

ইনি নিজগুণে জনসাধারণের সম্মানভাজন ও অশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার দেশ-ভালবাসার সীমা নাই, যুবকবৃন্দকে নানা প্রকার সৎকার্য্যে উৎসাহিত করিতেছেন। বালকবৃন্দের শরীরচর্চ্চার নিমিত্ত একখণ্ড জমী দান করিয়া খেলার মাঠ প্রস্তুত করিয়াছেন।

স্থানীয় বড়া ইউনিয়ন ক্লাবের সহিত বিশেষ ভাবে লিপ্ত থাকায় ছেলেরা মহা উৎসাহে ও উদ্যমে সকল শুভকার্য্যে অগ্রণী হইয়া উঠিতেছে। মধুসূদন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতে ইঁহার বহুদিনের বাসনা যে দেশের ছেলেদের কর্ম্মিষ্ঠ, দক্ষ, বলিষ্ঠ, সত্যবাদী এবং জনপ্রিয় করেন। এ সব কার্য্য ভগবানের হাতে, তবে মানুষ কেবল ভুল ধারণা করিয়া থাকে মাত্র। ইনি চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে বড়া স্কুলে Agricultural Training Class খুলিয়া ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়; কারণ আজকাল যেরূপ সময় পড়িতেছে তাহাতে বর্ত্তমান সামান্য সাধারণ শিক্ষা বেশী ফলপ্রদ নহে। দেশের সাধারণ লোক যেরূপ অবস্থায় উপস্থিত, তাহাতে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিদের বেশী উচ্চশিক্ষা দিতে সক্ষম এরূপ শতকরা ৯৫ জন লোকের আশা অতি কম। Agricultural Training পাইলে আশা করা যায় যে, দেশের ছেলেপুলেরা ভবিষ্যতে কর্ম্মক্ষম হইবে এবং পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বকৃত উপার্জ্জনে নিজ পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে পারিবে। দেশের মঙ্গল-কামনায় তাঁহার অশেষ যত্ন, দুঃস্থ জনসাধারণের আর্থিক সাহায্য-কামনায় ও কসাই মহাজনদিগের হাত হইতে গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বড়া-বেগমপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া সুশৃঙ্খল-ভাবে কার্য্য-পরিচালনা হইতেছে।

বঙ্গাব্দ ১৩৩০ সালের ১৭ই পৌষ তারিখে বড়া মধুসূদন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এই পল্লী অঞ্চলে প্রথম জ্ঞানালোক সঞ্চারিত করে। যে সময়ে এই বিদ্যাধাম উৎসর্গিত হয় সে সময়ে ইনি উপস্থিত ছিলেন না, শারীরিক অসুস্থতা হেতু কাশীধামে ভগ্ন শরীর লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। উৎসর্গপত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

পিতৃদেব ঃ—

আটচল্লিশ বরষ গেল পায় পায়।
দেখি নাই শান্তিময় মূরতি ধরায়॥
হৃদিপটে চিরতরে অতীতের স্মৃতি।
আঁকিয়া রেখেছে কিন্তু প্রশান্ত মূরতি॥
যে দিন পতন তব হ'ল চিরতরে!
জীবনের যবনিকা জাহ্নবীর তীরে॥
সেই দিন হ'তে সদা ভাবিতেছি চিতে।
আর কি পাইব তাত! তোমারে তুষিতে!
উদরান্ন-তরে আছি ব্রহ্মবাসী হয়ে
শ্রদ্ধা নাই তাহে শ্রাদ্ধ করিব কি দিয়ে!
হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা জানাব কেমনে,
আজি তাই বিদ্যাধাম নিবেদি চরণে,
লও পিত! বিদ্যাধাম ভক্তির তর্পণ
তৃপ্ত হও এই বর মাগে **নিবারণ**॥

গ্রামবাসিগণ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার দিনে সর্ব্বসমক্ষে সভা-প্রাঙ্গণে রায় সাহেবকে যে অভিনন্দনপত্র দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১

দীন দুঃস্থ গ্রামবাসী উৎসুক নয়নে
চেয়েছিল এত দিন যাঁকে লক্ষ্য করি
আজি সেই ধ্রুবতারা উদিত গগনে
তমসা নাশিতে ঘোর আলোক সঞ্চারি।

২

মহাপ্রাণ স্বার্থত্যাগী হে পুরুষবর
পাইতেছি পরিচয় প্রতি কার্য্যে তব,

বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠান নিত্যশুভকর,
এ নহে নূতন কিছু তোমাতে সম্ভব।

৩

ভরসা মোদের তুমি দেশের গৌরব,
তুমি হে স্বনামধন্য পুরুষ-প্রধান,
লভিয়াছ সুসম্মান অতুল সৌরভ,
মাতৃভূমি ধন্য আজি লভি সুসন্তান।

৪

বাণীর সাধক তুমি বাণীপূজাতরে
বাণীর মন্দির যাহা করিলে স্থাপন
নহে কীর্ত্তি বিনশ্বর বিশ্বচরাচরে,
তোমার মহিমা চির করিবে জ্ঞাপন।

৫

অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন যুবা শত শত
লভিয়া জ্ঞানের আলো এ মন্দির হ'তে
মাতৃভূমি-মুখ তারা করি উদ্ভাসিত
হইবে মহান্ বলি খ্যাত এ জগতে।

৬

সহজ সরলপ্রাণ উন্মত্ত উদার,
করুণার জ্যোতির্ময় নয়নে বিকাশে,
পরদুঃখে কাঁদে প্রাণ, সদা মুক্তদ্বার,
ঝর ঝর করি নেত্র গরিমা প্রকাশে।

৭

সুযোগ্য সন্তান তুমি সুযোগ্য পিতার,
অতুল তোমার পিতৃভক্তি-পরিচয়,

যেবা কার্য্য নিলে বরি ইঙ্গিতে স্রষ্টার
স্বর্গগত পিতৃনাম রহিবে অক্ষয়।

৮

হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাব কেমনে ?
পূর্ণ প্রাণ রুদ্ধবেগে ভাষার অভাবে,
ভক্তি-অশ্রু অবিরাম বহিছে নয়নে
ঢালি দিতে শ্রদ্ধাভরে ও পদ পল্লবে।

৯

লভহ জীবন দীর্ঘ করি এ কামনা,
থাকে যেন লক্ষ্য তব দেশের উপর,
লভ যশঃ সুনির্ম্মল সতত প্রার্থনা.
তুমি দরিদ্রের আশা অনন্যনির্ভর।

বড়া
১৭ই পৌষ ১৩৩০ সাল } গ্রামবাসিগণ

প্রকৃত পক্ষে রায় সাহেবকে ঐ অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. I. B. Kindersley, I. C. S. মহোদয় এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বিদ্যালয় সম্বন্ধে তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন সেই বিবরণ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

The High English School by the munificence and sympathetic efforts of Rai Sahib Nibaran Chandra Mukerji. This large-hearted gentleman who is now the President of the Managing Committee of the School

erected at an enormous cost this huge and palatial building to accomodate the School and provide it with suitable furnitures and appliances. He contributed about forty thousand rupees, practically all his life's saving for this institution in the sacred hope that the children of the locality may be benefitted by having their primary education.

The public in recognition of this great sacrifice for the cause of education reciprocated their gratitude by consecrating the School after the name of his late lamented father and "The Bora Modhusudon High English School" stands today and will continue to stand as an everlasting monument of his sacrifice and generosity, diseminating culture and education to our posterity from generation to generation.

রায় সাহেব ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি করিতে পারিতেন, সে সময়ে সম্পত্তির মূল্য এত অধিক ছিল না। কিন্তু তাঁহার সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার উপার্জ্জনের অধিকাংশই সাধারণ-হিতকর কার্য্যে এবং সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার্থে ব্যয় করিয়াছেন। নিজ পৈতৃক সম্পত্তির উপর ভূসম্পত্তির বৃদ্ধি করিয়া ভদ্রাসনের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তিন সহোদরের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বাসগৃহ ও আনুসঙ্গিক অপরাপর আবশ্যকীয় ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং যেখানে শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপ ও বাৎসরিক ৺দয়াময়ী শ্রীশ্রীশ্যামা মার পূজা হয় সেই সাধারণ স্থানে পূজা-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।

রায় সাহেবের হিতকর অনুষ্ঠানগুলির অধিকাংশ কার্য্যভার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্রের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। দেশে তাঁহার বার্দ্ধক্যের বারাণসী "কুটীর বাগান" রমনীয় উদ্যান, বাসগৃহ এবং "শান্তি-সরোবর" দেখিবার সামগ্রী, এমন শান্তিপ্রদ স্থান এ অঞ্চলে অতি বিরল।

বড়া মধুসূদন স্কুলের প্রতিষ্ঠার দিনে যে উৎসব হয় সেই সময়ে বড়া-নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ বসু মজুমদার মহাশয় ঐ উৎসব-উপযোগী যে একটী কবিতা (গান) রচনা করিয়া সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে শুনাইয়া আনন্দিত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

ধন্য তুমি নিবারণ করে অর্থ উপার্জ্জন
করিলে কীর্ত্তি স্থাপন বিদ্যালয় মধুসূদন
তোমা হ'তে বড়া গ্রাম সুযশে পূরিল নাম
বহু পরিশ্রমে রাম করে নির্ম্মাণ বিদ্যাধাম ;
প্রতিষ্ঠা ক'রে পিতৃনাম পূর্ণ করিলে মনস্কাম
বসাইয়ে রাধাশ্যাম বাঁকা মদনমোহন।
আনন্দিত হ'য়ে মনে আশিষ করে সাধারণে
থাক দীর্ঘ জীবনে ল'য়ে পুত্রকন্যাগণে
মতি রাখি রামচন্দ্রে নিবেদি তাঁর চরণে
গাইবে জগজ্জনে তোমার গু· কীর্ত্তন।
হয়েছ জগতে গণ্য, পেয়ে রায় সাহেব মান্য,
জন্মভূমি হ'ল ধন্য, সবে বলে ধন্য ধন্য,
দীন দেবেন্দ্র সামান্য, চাহে না সে কিছু অন্য
সদা তুমি দেশের জন্য কর মঙ্গল সাধন।

রায় সাহেবের দুই বিবাহ। প্রথম তিনি ইংরাজি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর থানার অধীন গোপাল নগর গ্রাম-নিবাসী ৺শ্রীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা

প্রভাসিনী দেবীকে বিবাহ করেন। এই পত্নী ইংরাজী ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রেল তারিখে এক সন্তান প্রসব করিয়া দশ ঘণ্টার মধ্যে পরলোকে গমন করেন। মাতৃহীন শিশুর জীবন রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্রহ্মদেশের তদানীন্তন লাট পত্নী Lady Fryer দক্ষ নার্স Miss Anthonyকে নিযুক্ত করেন। উক্ত পুত্র শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ (ডাক নাম এণ্টনী) ব্রহ্মদেশে বাল্যশিক্ষা শেষ করিয়া রেঙ্গুন গভর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে সম্মানের সহিত আই এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৎপর কলিকাতায় আসিয়া বি এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজী ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-বি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এখন ইনি ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের অধীনে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া অতি সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতেছেন। ইংরাজী ১৯২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিজয়কৃষ্ণ বীরভূম জেলার সদর সিউড়ি-নিবাসী স্বনামধন্য জমীদার ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী শান্তিলতা দেবীকে বিবাহ করেন।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে রায় সাহেব ইংরাজী ১৯০০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন চাতরা গ্রাম-নিবাসী ৺গগন-চাঁদ চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী হেমনলিনী দেবীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই পত্নীর গর্ভে তিন সন্তান ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম সন্তান শ্রীমান্ প্রমথনাথ ইংরাজী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং-শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী আছেন এবং বি-আই-এস-এন কোম্পানীর মেল ষ্টীমারে ইলেট্রিকের কার্য্য পরিচালন করেন; প্রমথনাথ কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন কবিরাজ ৺শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

পৌত্রী ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী উমারাণীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় সন্তান শ্রীমান্ বসন্তকুমার ইংরাজী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বাল্য জীবনে প্রায় চারি বৎসর বিষম রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বহু অর্থব্যয়ে এবং বহু চিকিৎসকের অধীনে থাকিয়া রোগমুক্ত হন। এখন ইনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জিতেন্দ্রলালের জন্ম ইংরাজী ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে। এই বালকটী উপস্থিত বয়েজ নার্সারী হোমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে।

রায় সাহেবের দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর জন্ম ইংরাজী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রেল। হুগলী জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া গ্রাম-নিবাসী স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তার শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস সি, এম-বির সহিত রাজলক্ষ্মী দেবীর বিবাহ হইয়াছে; ইঁহার দুই পুত্র ও চারি কন্যা। প্রথম পুত্র শ্রীমান্ মোহিত-কুমার, দ্বিতীয় শৈলেন্দ্রনাথ, প্রথমা কন্যা আভারাণী, দ্বিতীয়া স্নেহলতা, তৃতীয়া পদ্মরাণী এবং চতুর্থা তারাসুন্দরী।

রায় সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর জন্ম ইংরাজী ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রেল তারিখে। হাবড়া জেলার অধীন সালকিয়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এর সহিত ইন্দিরা দেবীর বিবাহ হইয়াছে; ইঁহার এক পুত্র সন্তান শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র।

মধুসূদনের কনিষ্ঠ পুত্র শশিভূষণ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া চাতরা নন্দলাল

ইনষ্টিটিউসনে প্রবেশিকা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। পরে ব্রহ্মদেশে দ্বিতীয় ভ্রাতার নিকট গমন করিয়া একটী সদাগরি আফিসে কেরাণীর কর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। এখন ইনি ঐ আফিসের কেসিয়ারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং প্রায় ৩৮ বৎসর ঐ আফিসে সুনামের সহিত কর্ম্ম করিতেছেন। ইঁহার চারি পুত্র ও চারি কন্যা বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র অনাদিচরণ আই এস-সি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন শেষ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; দ্বিতীয় ভোলানাথ ও তৃতীয় তুলসীচরণ—ইঁহারা ডাক্তারি শিক্ষা করিতেছে এবং কনিষ্ঠ দেবব্রত ইংরাজী বিদ্যালয়ে ব্রহ্মদেশে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে।

কার্ত্তিকচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র যদুনাথ নিরতিশয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, তিনি সদাচার এবং কর্ম্মনৈপুণ্যে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি খর্ব্বকায় বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন অতি অল্প বয়সে চারি বৎসরের পুত্র হরিনাথ এবং দুই বৎসরের কন্যা জগৎতারিণীকে রাখিয়া যদুনাথ পরলোকে গমন করেন। ইঁহার পত্নী কামিনী দেবীও স্বামীর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই স্বর্গারোহণ করেন। পুত্র হরিনাথ ও কন্যা জগৎতারিণী—ইঁহারা অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া, ইঁহাদের পিতার খুল্লতাত-পত্নী দিগম্বরী দেবীর নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। হরিনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ও শিক্ষা শেষ করিয়া কিছুদিন কলিকাতায় কোনও সদাগরি আফিসে কর্ম্ম করিয়া পরে বড়ায় স্বনামধন্য দাশরথি রায়ের সমসাময়িক পাঁচালীকার কবিবর স্বর্গীয় রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেনারাম রায় মহাশয়ের নিকট কিছু দিন জমীদারি সেরেস্তায় কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া তৎকালীন প্রবলপ্রতাপান্বিত জমীদার যজ্ঞেশ্বর বসু মজুমদার মহাশয়দিগের তরফে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া উঁহাদের জমীদারির কাজকর্ম্ম দেখা শুনা ও বিলি-ব্যবস্থা কার্য্যে নিযুক্ত হন। হরিনাথের সাত পুত্র ও তিন কন্যার

মধ্যে পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান। হরিনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌর-মোহন, ইনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ; ইঁহার মুখে কবি রসিকচন্দ্র রায়ের রচিত দক্ষযজ্ঞ, সীতার বনবাস এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি পৌরাণিক, রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা ও আবৃত্তি শুনিলে বিশেষ সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। ইনি রেডিওতে প্রত্যেক সপ্তাহে কবি রসিকচন্দ্র রায়ের পাঁচালী আবৃত্তি করিয়া জনসাধারণকে মোহিত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালে গৌরচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। হরিনাথের দ্বিতীয় পুত্র নরেন্দ্রনাথ গ্রামে ডাক্তারি করিয়া স্বাধীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ভ্রাতাদের সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। ইঁহার দেহ রুগ্ন, সে কারণ বিবাহ করেন নাই। চতুর্থ পুত্র কিশোরচন্দ্র হাবড়ার সন্নিকট শিবপুর গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলিয়া শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন। কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতা জেনারেল পোষ্টাফিসে কর্ম্ম করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন।

কার্ত্তিক চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ অতি অল্প বয়সে বিবাহের পাঁচ বৎসর পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার পত্নী নবকুমারী দেবী একমাত্র শিশু কন্যা গোলাপসুন্দরীকে পাইয়া জীবনের সুখ-দুঃখ বিস্মৃতা হইয়া গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। নবকুমারী কর্ত্তব্য-পরায়ণা আদর্শ হিন্দু রমণী ছিলেন। ইনি প্রত্যহ সংসারের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পল্লীস্থ প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকদিগের সহিত সদালাপ ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করিয়া ইংরাজী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

কল্যাণচরণের তিন পৌত্রের মধ্যে বারাণসী এবং দেবীপ্রসাদের বংশ-পরিচয় শেষ হইল; এখন কনিষ্ঠ পৌত্র রামনারায়ণের বংশ-তালিকা

বর্ণনা করিলেই বড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ-পরিচয় শেষ হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রামনারায়ণ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ছিলেন, ইঁহার দুই পুত্র কাশীনাথ ও বিশ্বনাথ; ইঁহারা উভয়েই অতীব সরলপ্রকৃতি, সদাশয় ও ধর্ম্মভীরু সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাশীনাথের একমাত্র পুত্র গোলোকচন্দ্রকে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন এবং বিশ্বনাথ অপুত্রক অবস্থায় ইহসংসার ত্যাগ করেন। কাশীনাথের পুত্র গোলকচন্দ্রও দীর্ঘজীবন লাভ করেন নাই। ইনি যৌবনে পদার্পণ করিয়া একমাত্র পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ এবং এক কন্যা ক্ষীরোদিনীকে রাখিয়া অকালে অনন্তধামে গমন করেন। ত্রৈলোক্যনাথ অপুত্রক ও যৌবনে পদার্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কন্যা ক্ষীরোদিনীর বিবাহ বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সংসারে হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহার সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় ক্ষীরোদিনীর স্বামী গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ঘরবাড়ি বিষয় সম্পত্তি যাবদীয় পৈতৃক ভূসম্পত্তি দান করিয়া স্বামী স্ত্রীতে কাশীবাসী হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তথায় বাস করিয়া সাধু-সেবা ও ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিয়া জীবন-লীলা শেষ করেন। রামনারায়ণের বংশ নির্ম্মূল হওয়াতে ঐ বংশে বিশ্বনাথের দৌহিত্র পণ্ডিত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় (ইনি কথক ছিলেন) হুগলী জেলার অন্তর্গত গজা গ্রাম ত্যাগ করিয়া বড়া গ্রামে মাতামহের সম্পত্তির মালিক হইয়া বাস করেন। এখন তাঁহার পুত্র হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার বংশধরেরা বড়া গ্রামে বাস করিতেছেন

বড়া মুখোপাধ্যায়-বংশের বংশ-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জেলা হুগলী শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন বড়া গ্রামের মুখোপাধ্যায়-বংশের বংশ-তালিকা

(খ) নিবারণচন্দ্র (জাত ১২৭৬ সাল ২১শে ফাল্গুন)

প্রথমা স্ত্রী প্রভাসিনী　　দ্বিতীয়া স্ত্রী হেমনলিনী

বিজয়কৃষ্ণ　প্রমথনাথ　রাজলক্ষ্মী কন্যা　বসন্তকুমার　ইন্দিরা

অবনীকান্ত০　জিতেন্দ্রলাল

(গ) শশিভূষণ

অনাদিচরণ　ভোলানাথ　তুলসীচরণ　দেবব্রত

(ঘ) তারকনাথ

রবি　অমিয়কুমার

চিহ্নিত * অপুত্রক　　০ শৈশবে মৃত

বেহালার রায়-বংশ

বঙ্গভূমি বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশের জন্মভূমি। যে সকল প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ জন্মভূমি বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন বেহালার রায়-বংশ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

বেহালা অতীব প্রাচীন ও ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। অতীতের বহু কীর্ত্তি ইহার বক্ষে বিরাজমান। বেহালার উপর দিয়া মোগল, পাঠান ও বর্গীর অভিযান হইয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার বিবরণ আছে। প্রাচীন সভ্যতার যখন সূচনা হয়, তখন হইতেই বেহালা সর্ব্ববিষয়ে উন্নত ছিল। বেহালার শিল্প-সমৃদ্ধিও প্রাচীন যুগে উল্লেখযোগ্য ছিল।

বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র যখন বর্গীর আক্রমণ চলিতেছিল, অধিবাসীরা প্রায় সকলেই যখন ধন-প্রাণ লইয়া বিপন্ন, সেই সময় সকলেই নিজ নিজ বাসভূমি ছাড়িয়া—স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে বর্গীদের হাঙ্গামা হইতে আত্মরক্ষার জন্য এক নিষ্ঠাবান্ ন্যায়পরায়ণ ব্রাহ্মণ যুবক দমদমার নিকটবর্ত্তী আলেয়ারপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া বেহালায় উপস্থিত হন এবং এখানে বসবাস স্থাপন করেন।

রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ রায়

কেহ কেহ বলেন,—ইনিই বেহালার রায়-বংশের আদি পুরুষ। ইঁহারা কাশ্যপগোত্রজ ব্রাহ্মণ। এই বংশের আদি ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, ইঁহাদের পূর্ব্ব উপাধি ছিল চট্টোপাধ্যায়। এই বংশের গজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত কর্ম্মকুশল ও

ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। ইনি দিল্লীশ্বর সম্রাট শাজাহান বাদশাহের দরবারের বিশিষ্ট পারিষদ ছিলেন। সম্রাট ইঁহার কর্ম্মনৈপুণ্য, নির্ভীকতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া ইঁহার উপর এরূপ প্রীত হন যে, ইঁহাকে 'রাজা' ও 'রায়' উপাধি প্রদান করিয়া ইঁহাকে স্বীয় মন্ত্রিপদে বৃত করেন। তদবধি তিনি রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নামে পরিচিত হইতে থাকেন। ইঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ক্রমে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে এবং বেহালার রায়-বংশের বাসও বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। প্রসিদ্ধি আছে—এই রাজা গজেন্দ্রনারায়ণই প্রকৃত প্রস্তাবে বেহালার রায়-বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের নাম জগৎরাম রায়। ইঁহার পর হইতে রায়-বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

জগৎরাম ও দুর্গাপ্রসাদ

জগৎরামের পুত্রের নাম দেবকীনন্দন রায় ও তাঁহার পৌত্রের নাম দুর্গাপ্রসাদ রায়। দুর্গাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সত্যবাদিতা ও ন্যায়-পরতার খ্যাতি দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। দুর্গাপ্রসাদের পাঁচ পুত্র সকলেই কৃতী ছিলেন। তাঁহাদের নাম—ভগবতীচরণ রায়, অভয়াচরণ রায়, অম্বিকাচরণ রায়, গৌরীচরণ রায় ও বামাচরণ রায়।

ভগবতীচরণ রায়

ইনি ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ওকালতি করিতেন। ইঁহার দুই পুত্র; ৺যোগেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথের এক পুত্র বর্ত্তমান; তাঁহার নাম যতীন্দ্রনাথ।

অভয়াচরণ রায়

ইনি আদালতের কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহার এক পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র এক্ষণে পরলোকগত।

অম্বিকাচরণ রায়

ইনি দুর্গাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি বেহালায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুপণ্ডিত, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং বিবিধ সৎ কার্য্যের দ্বারা বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ এবং পরদুঃখকাতর ছিলেন। দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং পরে কলিকাতা হাইকোর্টের আপীল বিভাগের প্রধান অনুবাদকের পদে উন্নীত হন। তিনি বহুকাল প্রধান অনুবাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে ইনি পূর্ত্তবিভাগের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। এই সময়ে তিনি বিদ্যালয়-স্থাপন, পুষ্করিণী-খনন প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য্য করেন। তিনিই বেহালা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দেশের হিতকল্পে আপনার জীবন একরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারত রাজ-রাজেশ্বরী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জুবিলী উপলক্ষে অম্বিকাচরণকে গবর্মেণ্ট রায় বাহাদুর উপাধি ও সুবর্ণ পদকে বিভূষিত করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই কৃতী পুরুষের কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

গৌরীচরণ রায়

ইনি দুর্গাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র। ইনি আদালতের কর্ম্মচারী ছিলেন।

বামাচরণ রায়

ইনি দুর্গাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনিও আদালতে কর্ম্ম করিতেন। ইনি পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। ইঁহার সাত পুত্র—(১) ৺পূর্ণচন্দ্র (২) ৺শ্রীশচন্দ্র (৩) ৺সুরেশচন্দ্র (৪) ৺সতীশ

স্বর্গীয় রায় অম্বিকাচরণ রায় বাহাদুর

চন্দ্র (৫) শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র (৬) ৺নরেশচন্দ্র এবং (৭) ৺ক্ষিতীশচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের দুই পুত্র ; শ্রীমান্ হরিদাস ও তুলসীদাস। শ্রীশচন্দ্রের এক পুত্র ; ইঁহার নাম বিজনকুমার ; ইনি পরলোকগত। সতীশচন্দ্রের এক পুত্রের নাম শ্রীমান্ অরুণকুমার। জ্যোতিষচন্দ্রের চারি পুত্র ; প্রথম কালিদাস, দ্বিতীয় তারাদাস, তৃতীয় কৃষ্ণদাস ও কনিষ্ঠ গুরুদাস।

অম্বিকাচরণের চারি পুত্র ; সুরেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ ও সৌরীন্দ্রনাথ।

সুরেন্দ্রনাথ রায়

ইনি রায় অম্বিকাচরণ রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১২৬৮ সালের লা বৈশাখ শুক্রবার (১৮৬২ খৃষ্টাব্দ) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতে ইঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহাকে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। তখনও তাহার পূর্ণ নয় বৎসর বয়ঃক্রম হয় নাই ; সেই সময়ে ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ বেশী ছিল না। সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে তখন মাত্র কয়েকজন হিন্দু ছাত্র পড়াশুনা করিত। আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু এই সময়ে এই স্কুলে পড়িতেন। পাটনার মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাক্তার স্যাণ্ডার্স সুরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণাতে পাঠকালে বার্ষিক পরীক্ষার সময় সুরেন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করেন ; তাঁহার সহপাঠী আবদুল সালাম (পরে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কাউন্সিলের সদস্য) দ্বিতীয় স্থান এবং ডাক্তার স্যাণ্ডার্স তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

এই সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় রায় অম্বিকাচরণকে বলেন,—আপনি সুরেন্দ্রকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিন। তদনু-

সারে তাঁহাকে হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। হিন্দু স্কুল হইতে তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর সুরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে এম-এ পড়িতে থাকেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য সুরেন্দ্রনাথ এম-এ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন ও সসম্মানে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ওকালতিতে তিনি সবিশেষ সাফল্যলাভ করেন ও পরে এডভোকেট হন। কিন্তু দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ওকালতিতে অধিক সময় ব্যয় করিতে পারেন নাই। আসাম অঞ্চলে তাঁহার ওকালতির পশার-প্রতিপত্তি খুবই ছিল।

কাশ্মীরের রাজবংশের সহিত ভারত-সরকারের এক গণ্ডগোল হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ কাশ্মীরের মহারাজের উকীল ছিলেন। তিনি চেষ্টা করিয়া সেই গণ্ডগোল মিটাইয়া দেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনাররূপে তিনি কর্ম্মশক্তি ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি গার্ডেন রীচ মিউনিসিপ্যালিটীর প্রথম নির্ব্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলাবোর্ডের ও চব্বিশ পরগণা সদর লোক্যাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ তাঁহার মৃত্যুদিবস পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল তিনি তাঁহার পিতার স্থলে সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। এই মিউনিসিপ্যালিটীর
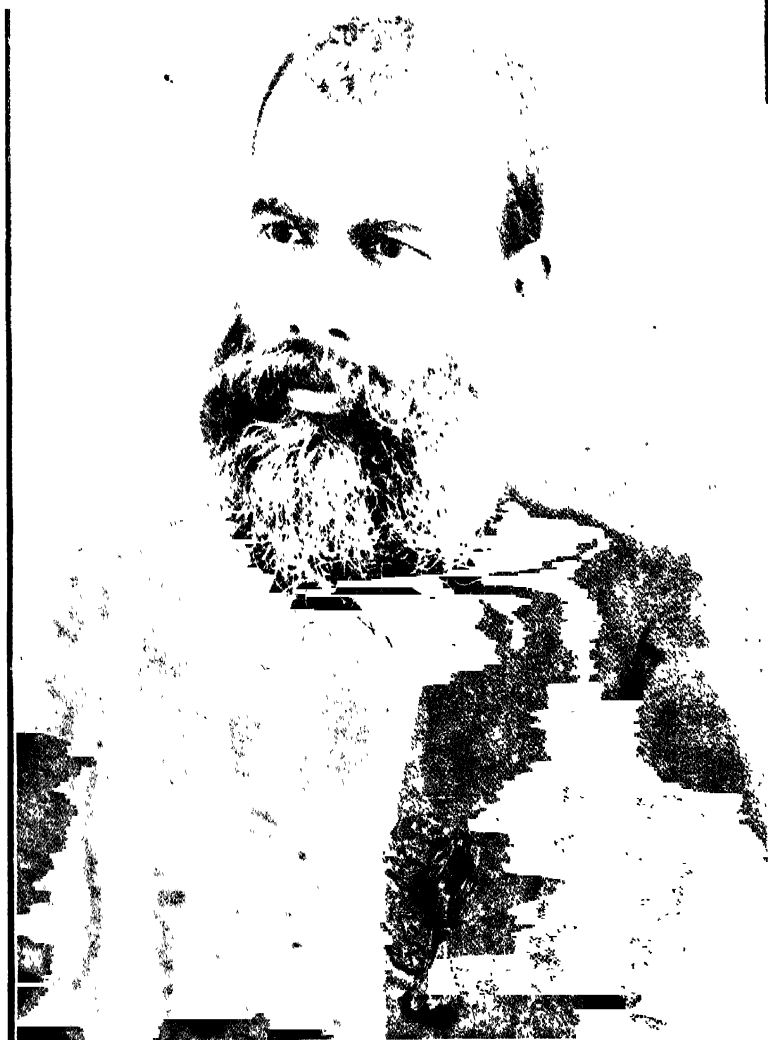
স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায়

চেয়ারম্যান থাকিবার সময়ে তিনি বেহালায় প্রথম ট্রাম, কলের জল, ইলেকট্রিক আলো ও বাস্ (Bus) আনয়ন করেন এবং তাঁহারই একান্ত আগ্রহে বেহালা মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকায় ডায়মণ্ড হারবার রোড যতখানি পড়িয়াছে তাহা পিচ দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হয়। তিনি ৩০ বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটীর আয় প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন। বাঙ্গালা দেশে এত দীর্ঘকাল তিনি ভিন্ন আর কেহ কোনও মিউনিসিপ্যালিটীর স্থায়ী চেয়ারম্যানের কার্য্য করেন নাই। তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের মিউনিসিপ্যাটী-সমূহের পক্ষ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে প্রথম নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৬ বৎসর কাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনিই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন ও তিন বৎসরকাল এই পদে কার্য্য করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট নবাব স্যর সামস-উল হুদা অবসর গ্রহণ করিলে তিনি ঐ পদে দেড়বৎসর কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। কি প্রেসিডেণ্টের পদে, কি ডেপুটী প্রেসিডেণ্টের পদে, বেতন হিসাবে এক কপর্দ্দকও তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—আমার এই বেতনের টাকা জনহিতকর কার্য্যের জন্য ব্যয় করা হউক। এই মহানুভবতা ও সহৃদয়তার জন্য বাঙ্গালার তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড লিটন ব্যবস্থাপক সভা-গৃহে তাঁহার প্রভূত প্রশংসাবাদ করেন এবং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। *

I am deeply grateful to Mr. Roy for his admirable spirit he has shown throughout. I am sure that all the members of the Council will join me in appreciation of his services.

—Lord Lytto

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সুরেন্দ্রবাবু বাঙ্গালা দেশে স্যানিটারী বোর্ড গঠন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। গবর্মেণ্ট এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভোটের আধিক্যে সুরেন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। সুরেন্দ্রবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পেশ করেন যে, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব নাকচ করা হউক। বলা বাহুল্য, তিনি এ সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ইহা শুনিয়া গবর্মেণ্ট উক্ত কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

স্যর আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান হাইকোর্ট রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটির সভাপতি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এই কমিটিতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। মহীশূর রাজ্যে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। বর্দ্ধমান সহরে অল বেঙ্গল মিনিষ্টিরিয়্যাল অফিসার্স কনফারেন্সের যে অধিবেশন হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলা-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। গবর্মেণ্টের প্রস্তাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা-সংক্রান্ত যে অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছিল সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় উহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দান করিবার সম্পর্কে যে সভা স্থাপিত হইয়াছিল তিনি তাহার সভাপতি ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা বাঙ্গালার জমীদার সভার সহকারী

সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েসনের অনারারি সেক্রেটারী, বেঙ্গল সায়েন্টিফিক ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এসোসিয়েসনের কোষাধ্যক্ষ এবং আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক ছিলেন। তিনি কলিকাতা রিপণ কলেজের ও কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের গভার্ণিং বডির সদস্য ছিলেন। তিনি দার্জ্জিলিং লুইস জুবিলি স্যানাটেরিয়মের পরিচালক-সমিতির সদস্য ছিলেন। এইসকল ভিন্ন তিনি বহু বিদ্যালয়, পাঠাগার ও টোল-চতুষ্পাঠীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বেহালা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা ছিল। পুষ্করিণী-খনন, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার-সাধন প্রভৃতি সৎকার্য্যে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েসনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এল এর পরীক্ষক ছিলেন। গবর্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার মেষ্টন এওয়ার্ড সম্বন্ধে তিনি তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং এবিষয়ে তাঁহার অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'শাস্ত্রবাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের খসড়া পেশ করেন এবং বিপুল পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উহা পাশ করাইয়া লন। এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময়ে তিনি বাঙ্গালার অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানগণের অভিমত উদ্ধৃত করেন। সেগুলি বাঙ্গালা দেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তনের অনুকূলই ছিল।

বঙ্গদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের পাণ্ডুলিপি

পেশ করিবার সময়ে তিনি এক তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি, বাঙ্গালা দেশের সকল মিউনিসিপ্যালিটী এবং জেলাবোর্ডের যে সকল এলেকায় ইউনিয়ন কমিটী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৩৮ ধারা অনুসারে গঠিত হইয়াছে সেই সকল কমিটির চতুঃসীমার মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য আমি একটী আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিতেছি। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রত্যেক সভ্যদেশের গবর্মেণ্টের একটি প্রধান সমস্যা; কিন্তু তাহা হইলেও সকল সভ্যদেশের সরকারই তাঁহাদের সাধ্যমত এই সমস্যা-সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মানব-জাতি যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে, ততই শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও ক্রমে ব্যাপক হইতেছে এই সভ্য যুগে জীবন-সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। এই যুগে অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না, তাহাদিগকে মরিতেই হইবে। যে রেড ইণ্ডিয়ান জাতি এক সময়ে সমগ্র আমেরিকাখণ্ড ছাইয়া ফেলিয়াছিল তাহাদিগের কথা এখন আর শুনা যায় না। যোগ্যতমের বাঁচিয়া থাকার জন্য যে তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে একমাত্র শিক্ষিত জাতিই টিকিয়া থাকিতে পারিবে। যদি ভারতের জনসাধারণ শিক্ষার আলোক বা সঞ্জীবনী শক্তি না পায়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহারা পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু জনসাধারণ একদিনে শিক্ষিত হইতে পারে না অথবা তাহারা অল্প কয়দিনের মধ্যেই যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে ইহা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান যুগলক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, ভারতের অধিবাসীদিগকে যদি শীঘ্র শীঘ্র অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত করা না যায়, তাহা হইলে জাতি হিসাবে তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না।

ভারতের জনসাধারণকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম—কৃষক শ্রেণী; দ্বিতীয়—শ্রমিক সম্প্রদায়। শিক্ষা দ্বারাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত ও পুষ্ট হয়; শিক্ষা পাইলে মানুষের অভ্যাস সুনিয়ন্ত্রিত হয়। এই দুইটী গুণই কৃষক ও শ্রমিকের ভবিষ্যৎ জীবনের যে প্রভূত উন্নতিকারক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিক্ষা যতই প্রাথমিক হউক—লেখাপড়া ও সাধারণ পাটীগণিত ও শুভঙ্করী জনসাধারণকে শিখাইলে উহা যে কেবল তাহাদিগকে প্রভূত সাহায্য করিবে তাহা নহে, অদূর ভবিষ্যতে এদেশের কৃষিজীবী ও শিল্পীরা বৈদেশিক প্রতিযোগিতাকে পরাহত করিয়া কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

জর্ম্মণী ও ফ্রান্সে শিক্ষা—বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাথমিক শিক্ষা জর্ম্মণীর কোনও কোনও ক্ষুদ্র রাজ্যে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাকে ফসল কাটিবার সময় ব্যতীত বৎসরের সমস্ত সময়ই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিতে হাজিরা দিতে হইত। প্রথম প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় খুবই বাধা পড়িয়াছিল। অভিভাবকেরা দারিদ্র্য ও আত্মম্ভরিতার জন্য এইরূপ বাধা দিয়াছিলেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভে বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-সংখ্যা অত্যধিক হইবার জন্য ও শিক্ষকগণের শিক্ষাদান-ক্ষমতার অল্পতার জন্য উহাতে বাধা ঘটিয়াছিল। সরকারী স্কুল ব্যতীত বহুসংখ্যক বে-সরকারী স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তখন লোকের মনে বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। যদিও এই শতাব্দীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বিদ্যালয়-নামের যোগ্য ছিল না, তথাপি ছাত্রগণকে যে বাধ্য হইয়া উপস্থিত হইতে হইত—এই সুনিয়মিত

অভ্যাসের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণের যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। এই সময়কার প্রধান বৈশিষ্ট্য—জনসাধারণের অভ্যুদয় ও গণতান্ত্রিকতার প্রসার এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব প্রাধান্যের লোপ। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আইন-সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক ব্যাপারে অভিজাতগণের সমান হইয়া উঠেন। পার্লামেণ্টে জনসাধারণের প্রতিনিধি-প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধনী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে প্রভাবশালী করা। শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগে একটী নূতন দলের প্রভাব অনুভূত হয়—উহার নাম শ্রমিক সম্প্রদায়। বৃহৎ বৃহৎ নগর-প্রতিষ্ঠার ও বিপুল মূলধনে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের জীবনযাত্রার ও শিক্ষার আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সম্প্রদায় দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের একটি অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

জর্ম্মণীর লোকের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, বালক-বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার নামই সমগ্র জাতিকে প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত করা এবং ইহা একটি পবিত্র কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসের জন্য জর্ম্মণীর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে ও এখনও উহার বিরাম নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার সমাদর অত্যন্ত অধিক। প্রাথমিক শিক্ষার পরেই মাত্র এই দেশেই শিক্ষক তৈয়ারী করিবার বিপুল চেষ্টা হইয়া থাকে। এই রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রদেশই স্বতন্ত্রভাবে অধিবাসিগণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা সমগ্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান। কোনও কোনও প্রদেশে শিক্ষা একেবারে বাধ্যতামূলক। এখানকার

অধিবাসীরা শিক্ষার মূল্য এরূপ বুঝেন যে, বিদ্যালয়ে উপস্থিতির জন্য কোনও বিধান করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস বড় স্পষ্ট নহে। প্রাচীন ভারতে আমাদের যে শিক্ষায়তন বা বিদ্যাপীঠ ছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনকার যুগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় ঠিক তাহা এদেশে ছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। দেশের জনসাধারণ কতদূর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিত তাহা বলা যায় না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্বীকার করা হইয়াছে যে, সংস্কৃত টোল ও মুসলমানদের মক্তবের জন্য স্থায়ীভাবে নিষ্কর জমী দান করা ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসন-কালে এদেশে সে সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল তদ্বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে তদন্ত হইয়াছিল। এই তদন্ত-ব্যাপারের অধ্যক্ষ ছিলেন মিষ্টার আডামস্। তিনি বলেন,—সেই সময়ে নিম্ন বঙ্গে প্রায় এক লক্ষ পাঠশালা ও গ্রাম্য বিদ্যালয় ছিল। তিনি জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধও করিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক দিন দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করার বা উহাদিগের উন্নতি-সাধনের কোনও ব্যবস্থা সরকার হইতে করা হয় নাই। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে "সার্কেল সিষ্টেম" (Circle System) প্রবর্ত্তিত হয়; ইহার উদ্দেশ্য ছিল অবিলম্বে দেশীয় বিদ্যালয় ও শিক্ষকগণের উন্নতি-সাধন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশনের রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাই— ১৮৭০—৭১ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৮,৫০০; অবশ্য ইহাদের ভিতরে মধ্য বা উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রগণকে ধরা হয় নাই। ১৮৮১—৮২ খৃষ্টাব্দে কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংখ্যা হইয়াছিল ৯ লক্ষ। ছাত্র-সংখ্যার অনুপাতে প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট

লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী যে টাকা খরচ করেন, তাহা ভারতের সকল প্রদেশেই খুবই সামান্য।

এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন তাঁহাদের ধারণা মর্ম্মর-প্রাসাদ, সেগুন কাঠের চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চি, আধুনিক উৎকৃষ্ট মূল্যবান্ পুস্তক-সমন্বিত লাইব্রেরী এবং স্মিথ প্রাইজ-ধারী শিক্ষক ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে না। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, যে শ্রেণীর ছাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পড়িতে আসিবে তাহারা মৃৎ কুটীরে থাকে। ইহাদের জন্য যদি আটচালাতে প্রাথমিক বিদ্যালয় বসান হয়, তাহা হইলে ইহাদের অসম্ভ্রম হইবে না। বাড়ীতে ইহারা মাদুরে বসে, মাদুরেই শয়ন করে; সুতরাং বিদ্যালয়ে যদি ইহারা মাদুরে বসে, তাহা হইলে তাহাদের মানের হানি হইবে না। বর্ত্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে যে সকল প্রাচীন গুরুমহাশয় ও শিক্ষক-গণ শিক্ষা দিতেন তাঁহাদের দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইতে পারিবে। আমরা অতিব্যয়মূলক বোর্ড-স্কুল চাই না। দরিদ্র দেশের বালকগণের জন্য যত অল্প ব্যয়ে ও সহজে স্কুলের সাজ-সজ্জা ও গৃহ হইতে পারে, তাহাই হউক। এই ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে শিক্ষাদানের কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন যুগের ঋষিরা প্রাসাদে বসিয়া শিক্ষা দিতেন না। ন্যায়, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মৃৎকুটীরে মাটীর মেঝেতেই শিক্ষা দেওয়া হইত। বিদ্যালয়ের গৃহ ও সাজ-সজ্জা দরিদ্রোচিত ছিল বলিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় এদেশে আমাদের বা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কোনও বাধাই ঘটে নাই। এদেশের সর্ব্বত্র এক্ষণে মিউনিসিপ্যালিটির এলেকায় ও পল্লীগ্রামসমূহে প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলি বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক জেলা-বোর্ডে একটি করিয়া এডুকেশন কমিটি আছে। এই প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষার আইনটি পাশ হইলে এই শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে

এবং মিউনিসিপ্যালিটীর ও ইউনিয়ন কমিটির এলেকা-বাসী বালকগণকে ঐ সকল বিদ্যালয়ে হাজির হইতে বাধ্য করিবে।

সমালোচকেরা আরও বলিয়া থাকেন যে, ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না; কারণ, ভারতের জনসাধারণ অশিক্ষিত। কিন্তু দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইলে ইহারাই কতকগুলি অসম্ভব সর্ত্তের কথা তুলিয়া বলে—মাত্র এই সকল সর্ত্তে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে ও দেওয়া উচিত।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, প্রাথমিক শিক্ষার যেরূপ উন্নতি কোনও কোনও দেশীয় রাজ্যে হইয়াছে সেইরূপ উন্নতি ব্রিটীশ ভারতে হয় নাই। বরোদা রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের কমিশনার আমার প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছিলেন :—

১। বরোদা রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।

২। বরোদা সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সকল ব্যয় বহন করিয়া থাকেন।

৩। প্রাথমিক শিক্ষা বালক ও বালিকা উভয়ের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

৪। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার সময়ে বালকের ও বালিকার বয়স পূর্ণ ৭ বৎসর হওয়া চাই; স্কুল ছাড়িবার বাধ্যতামূলক বয়স বালকের পক্ষে ১৪ ও বালিকার পক্ষে ১২ হওয়া চাই।

মহীশূর গবর্মেণ্ট হইতে তথাকার শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী আমার প্রশ্নের উত্তরে আমাকে লিখিয়াছিলেন :—

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ২৩৮টী কেন্দ্রে প্রবর্ত্তিত করিবার অনুমোদন মহীশূর সরকার করিয়াছেন। ১৪৪টি কেন্দ্রে এই ব্যবস্থা পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সকল সরকারী স্কুলেই

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হইয়াছে ; কেবল সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত গ্রাম্য স্কুল-সমূহে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে সামান্য চাঁদা লইয়া প্রাথমিক শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অনেকে বলেন,—বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনটী পাশ করাইয়া লওয়া স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের মহতী কীর্ত্তি।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করেন ঃ—

ভারত গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিবার জন্য এই ব্যবস্থাপক সভা স-পরিষদ গবর্ণর বাহাদুরকে সুপারিশ করিতেছেন যে—

(১) বাঙ্গালা দেশে যাহাতে লবণ প্রস্তুত হয় সে পক্ষে উৎসাহ দিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং

(২) লোকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য যে লবণ তৈয়ারী করিবে তাহার উপর যেন শুল্ক গ্রহণ করা না হয়।

এই প্রস্তাব উত্থাপন-প্রসঙ্গে তিনি যুক্তি-তর্কপূর্ণ এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। নিম্নে আমরা উহার মর্ম্ম প্রদান করিলাম ঃ—

লবণ একটি অপরিহার্য্য আহার্য্য সামগ্রী। সম্প্রতি এই লবণের মূল্য অতিরিক্ত রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার ফলে গত দুই মাস ধরিয়া বাঙ্গালা দেশের কয়েকটি জেলায় হাট-বাজার লুঠ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ; এমন কি এখনও হইতেছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৪৯টি হাট লুঠের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। যে প্রদেশের লোক স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় এবং বিধি-ব্যবস্থার সম্মানকারী, তাহারা হঠাৎ এরূপ লুণ্ঠনপ্রিয় হইয়া উঠিল কেন? ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এদেশের জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র। বাজারে এখন লবণের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এত চড়া দামে তাহারা লবণ ক্রয় করিতে অসমর্থ। এইজন্য তাহারা হাট-বাজার লুঠ করিয়া

লবণ সংগ্রহ করিতেছে। রঙ্গপুর স্পেশ্যাল ট্রিবিউন্যালে কতকগুলি আসামীর বিচারারম্ভের সময়ে সরকারী উকীল বলেন,—লুঠ হইতেছে কেবল কাপড় ও লবণ; কারণ এই দুইটী জিনিষের মূল্য অত্যন্ত অধিক হইয়াছে।

লোকে দেখিতেছে যে, তাহাদের দেশে লবণ যথেষ্ট রহিয়াছে এবং তাহারা লবণ তৈয়ারী করিতেও পারে। গবর্মেণ্টের নিষেধ আছে বলিয়াই তাহার এই অত্যাবশ্যক দ্রব্যটি তৈয়ারী করিতে পারিতেছে না। যে অপরিহার্য্য আহার্য্যসামগ্রী তাহাদের গৃহদ্বারে পাওয়া যায়, সেই দ্রব্যটীর জন্য তাহাদিগকে ১০ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী চেশায়ার, লিভারপুল ও জর্ম্মণীর উপর নির্ভর করিতে হয়। লোকেরা জানে যে বংশ-পরম্পরাক্রমে এদেশে লবণ তৈয়ারী হইতে এবং তাহাদিগকে লবণ তৈয়ারীর অধিকার হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে। লবণ তৈয়ারী করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার এদেশের লোকের আছে। লোকে কোনও বিলাসদ্রব্য চাহিতেছে না; তাহারা অপরিহার্য্য আহার্য্যসামগ্রী তৈয়ারী করিতে চাহিতেছে। সুতরাং সাধারণ লোকের ভিতর যে অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। সেই অসন্তোষই এইসকল লুঠতরাজের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এক্ষণে বাঙ্গালা দেশে যত লবণ আবশ্যক সে সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের নেতৃত্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লবণ তৈয়ারীর একটী পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; উহা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। এতদনুসারে লোকে কোম্পানীর কুঠিতে লবণ তৈয়ারী করিত এবং কোম্পানীর কুঠি হইতে সেই লবণ বিক্রয় হইত।

বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীরা বরাবরই নিজদের প্রয়োজনীয় লবণ নিজেরাই তৈয়ারী করিত। সুন্দরবন, কাঁথি, ডায়মণ্ডহাবার মহকুমা,

নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ—এই সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে লবণ তৈয়ারী হইত। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগকে তাহাদের প্রাত্যহিক লবণের জন্য বিদেশজাত লবণের উপর নির্ভর করিতে হইত না।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা দেশে লবণ তৈয়ারী বন্ধ হইয়াছে; এক্ষণে ইহা নিষিদ্ধ। বাঙ্গালা দেশের জলবায়ু আর্দ্র এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বঙ্গোপসাগরে বিপুল মিষ্টবারিরাশি ঢালিয়া দেয় বলিয়া বাঙ্গালা দেশের সমুদ্রকূল লবণ তৈয়ারীর অযোগ্য। এইরূপ একটি কারণ আমাদিগকে শুনান হয়। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করা যায় না। হিমালয় হইতে যত মিষ্টজলধারাই বঙ্গোপসাগরে নিপতিত হউক না কেন, তাহাতেই যে উহার জলের লবণাক্ততা কমিয়াছে ইহা মনে হয় না।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ বাঙ্গালা গবর্মেণ্ট বাঙ্গালা দেশে লবণ তৈয়ারী সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত ভারত সরকারে প্রেরণ করেন। উহাতে এই সকল কথা লিখিত ছিল:—

বাঙ্গালা দেশে পুনরায় লবণ তৈয়ারী আরম্ভ করিবার প্রসঙ্গ মধ্যে মধ্যে উত্থাপিত হইয়া থাকে এবং গবর্মেণ্টের মনোযোগও সেদিকে আকৃষ্ট হয়। গত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এ সম্বন্ধে শেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তদানীন্তন ছোটলাট তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, লবণ-প্রস্তুত-শিল্পের পুনঃ প্রবর্ত্তন-চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। এক সময়ে এ দেশে লবণ তৈয়ার হইত।

বাঙ্গালা দেশ স্থায়ীভাবে এই শিল্পের পুনঃ প্রবর্ত্তন আশাপ্রদ নহে এবং ভারতবাসীদিগের প্রয়োজনীয় লবণ সরবরাহের জন্য বাঙ্গালায় পুনরায় লবণ তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিবার দরকার নাই।

যখন উক্ত অভিমত ভারত সরকারে প্রেরিত হইয়াছিল তখন দেশের যে অবস্থা ছিল এখন ১৯১৭ সালে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সমগ্র ভারতের অধিবাসীদিগকে লবণ সরবরাহ করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার লবণ-প্রস্তুত-শিল্প পুনর্জ্জীবিত করুন, ইহা আমরা চাহি না। আমরা চাহি, একমাত্র বাঙ্গালার লোকদিগের প্রয়োজনীয় লবণ বাঙ্গালা দেশেই প্রস্তুত হউক।

কলিকাতা মিউনিসিপাল মার্কেটে মাংস-বিক্রেতারা যখন ধর্ম্মঘট করিয়াছিল সেই সময় কলিকাতা সহরে ইউরোপীয় অধিবাসী-দিগকে মাংস সরবরাহের জন্য কর্পোরেশনের তদানীন্তন ডেপুটী চেয়ারম্যান দানাপুর হইতে মাংস আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাছে দুই চারিদিন ইউরোপীয়গণ মাংস খাইতে না পান সেইজন্য অস্থায়ীভাবে এই ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং এজন্য অর্থব্যয়ে কার্পণ্য প্রকাশ করা হয় নাই। সিমলা শৈলে বাড়ীভাড়া যাহাতে বাড়িতে না পারে সে জন্য ভারত গবর্মেণ্ট আইন পাস করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা অল্পসংখ্যক লোকের জন্য। অথচ লবণের মূল্য অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় বহুসংখ্যক লোকের কষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য গবর্মেণ্টের আরও উচিত বাঙ্গালা দেশের লোককে লবণ তৈয়ারী করিবার অধিকার দেওয়া। আর একটি কারণ দেখান হয় যে, এ দেশে প্রস্তুত লবণ প্রতিযোগিতায় বিদেশের লবণের নিকট দাঁড়াইতে পারিবে না। গবর্মেণ্ট স্বয়ং লবণ প্রস্তুত করিলে এ বিষয়ে বিবেচনা করা যাইতে পারিত। এ দেশের লোককে যদি নিজেদের প্রয়োজনীয় লবণ তৈয়ারী করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

আমরা চাহিতেছি না যে, গবর্মেণ্ট লবণ-প্রস্তুত-ব্যাপারে অর্থ-সাহায্য করুন। জাপান গবর্মেণ্ট যেমন জাপানী শিল্পীদিগকে অর্থ-

সাহায্য করেন, অথবা চিনি-শিল্পের প্রসারের জন্য জর্ম্মণী চিনিওয়ালা-দিগকে যে ভাবে অর্থসাহায্য করেন সেইরূপ অর্থসাহায্য লবণ-তৈয়ারকারীদিগকে করিতে আমরা বাঙ্গালা সরকারকে বলিতেছি না। আমাদের অনুরোধ, সরকার লবণ তৈয়ারীর অবাধ অধিকার বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগকে দিউন এবং যাহারা নিজদের সংসারের প্রয়োজন অনুযায়ী লবণ তৈয়ারী করিবে তাহাদিগকে যেন শুল্ক দিতে না হয়।

আডাম স্মিথ হইতে আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ একবাক্যে বলিয়া আসিতেছেন যে, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদির উপর কর ধার্য্য বা শুল্ক ধার্য্য করা উচিত নহে; ইহা নিন্দনীয় ব্যাপার। অধ্যাপক ফকেট বলিয়াছেন যে, পানীয় জল ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে গৃহীত বায়ুর মত লবণও লোকের অবাধ অধিকারভুক্ত হওয়া উচিত। আয়র্লণ্ডের লোকের নিকট আলু যেরূপ, ইংরেজ ও স্কচদিগের নিকট মাংস ও চা যেরূপ, বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদের নিকট লবণ তদপেক্ষা অধিক। এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষক; ভাতের সহিত একটু লবণ ইহাই এ দেশের কৃষকের প্রধান ও প্রাত্যহিক খাদ্য। লবণের শুল্ক বন্ধ করিয়া দিলে লবণের ব্যবহারও যে বৃদ্ধি পায় ইহা গবর্মেণ্ট লক্ষ্য করিয়াছেন।

লবণ যে কেবল মানুষেরই অপরিহার্য্য খাদ্য তাহা নহে, গো-মহিষাদিরও ইহা অন্যতম খাদ্য। ইদানীং গো-মহিষাদির স্বাস্থ্য যে ক্রমেই অবনতির দিকে চলিয়াছে, ইহার কারণ পর্য্যাপ্ত লবণ উহাদিগকে খাইতে দিতে পারা যায় না।

সুতরাং এই দুর্দ্দিনে গবর্মেণ্টের উচিত বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে লবণ তৈয়ারী করিবার অবাধ অধিকার প্রদান করা ও যাহারা নিজ নিজ পরিবারের আহারের জন্য লবণ তৈয়ারী করিবে, তাহাদিগের নিকট তজ্জন্য কোনও রূপ শুল্ক আদায় না করা।

সরকার ও জনসাধারণ উভয়ের নিকটেই সুরেন্দ্রনাথের প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে বাঙ্গালার তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল তাঁহার বেহালার প্রাসাদতুল্য ভবনে আগমন করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ যে কেবল ইংরাজীতে পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, সংস্কৃতেও তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল। সংস্কৃতশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে "শাস্ত্রবাচস্পতি" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের স্বভাব ছিল বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমের মত কোমল। শিশুদিগের তিনি ছিলেন বন্ধুবিশেষ—বৃদ্ধ বয়সেও তিনি শিশুদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস করিতেন। তাঁহার মধুর স্বভাবের জন্য ভারতের ও বিদেশের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ পুরুষ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। দরিদ্র ও শরণাগতের রক্ষা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ; বহু দরিদ্র তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত, বহু ছাত্র তাঁহার দয়ায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছে। তাঁহার কাছে আসিলে কেহ বিমুখ হইয়া ফিরিত না। তাঁহার গুপ্ত দানের সীমা ছিল না।

বর্দ্ধমানের মহারাজা, কাশ্মীরের মহারাজা, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বিহারের গবর্ণর স্যর হিউ ষ্টিফেনসন, আসামের গবর্ণর মান্যবর কার সাহেব, মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু,স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মিঃ এস-আর দাশ, স্যর সামস্-উল হুদা, স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্র, স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, দ্বারবঙ্গের মহারাজা, নাটোরের মহারাজা, কৃষ্ণনগরের মহারাজা, মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, মহারাজা স্যর প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ

তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহারা ইঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন।

বঙ্গদেশের এমন কোনও ব্রাহ্মণ রাজা, মহারাজা, জমিদার নাই যাহাদের সহিত ইনি আত্মীয়তা-সূত্রে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। কৃষ্ণনগরের মহারাজা, কাশিমবাজারের রাজা আশুতোষনাথ রায়, উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন ও রাজা জ্যোৎকুমার এবং বিখ্যাত জমীদার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈচির মুখোপাধ্যায়-বংশ, হেমনগরের জমীদার বংশ, জনাইয়ের মুখোপাধ্যায়-বংশের সহিত ইঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

সুরেন্দ্রনাথের এইরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখিয়া বাঙ্গালার গবর্ণর তাঁহাকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন—আপনি চেষ্টা করিলে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি লোকমতকে উপেক্ষা করিয়া গবর্ণরের এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। ইহা যে কত বড় নির্লোভতার পরিচায়ক তাহা অনুমানেই বুঝিতে পারা যায়।

সুরেন্দ্রনাথ কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) Native States of India (Vol. I Gwalior)

(২) Native States of India (Vol. II Indore)

(৩) Native States of India (Vol. III Kashmir)

(৪) Suggestions for the present Economic Problems.

(৫) Some thoughts on Local Self-government in Bengal.

(৬) Financial Condition in Bengal.

তিনি বহু সংবাদ ও সাময়িক পত্রে লিখিতেন ; বলা বাহুল্য, তাঁহার রচনায় সংবাদ ও সাময়িক পত্রের গৌরব ও সৌষ্ঠববৃদ্ধি হইত।

১৩৩৬ সালের (১৯২৯ খৃষ্টাব্দ) ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার কর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ স্বর্গারোহণ করেন।

জনৈক লোক স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মময় জীবনের এক সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রেখা দ্বারা যেমন ছবিকে ফুটাইয়া তোলা যায়, এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর ভিতর দিয়া তেমনই সুরেন্দ্রনাথের এমন পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহার সাহায্যে সুরেন্দ্রনাথকে স্পষ্ট চিনিতে ও বুঝিতে পারা যায়। আমরা এই স্থলে উক্ত লেখক মহাশয়ের রচনা উদ্ধৃত করিলাম :—

"সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার গ্রামবাসীগণের নিকট এত সুলভ ছিলেন যে, তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার ধনবৈভব ও আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আমাদের স্থূলচক্ষে তাঁর চরিত্রের আর কোন দিক প্রতিভাত হয় নাই। আজ তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, তিনি সাধারণের চেয়ে কত বড় ছিলেন। ভগবান তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছিলেন ; ভগবান যাঁকে সর্ব্বস্ব দেন, তিনি ভাগবত শক্তি লাভ করেন। সুরেন্দ্রনাথ ভগবানের বরপুত্র।

"বড়লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি 'কমলবিলাসী' ছিলেন না। সাহিত্য-সাধনা ও দেশসেবা তাঁহার ব্রত ছিল। কতদিন দেখিয়াছি তিনি নির্জ্জনে ইংরাজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন। একাধারে ত্রিশ বৎসর কাল সাউথ সুবার্ব্বান্ মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতির পদে বৃত থাকিয়া দেশের নানা সমস্যার সহিত তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি রক্ষণশীল দলের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। থিয়েটার, বায়োস্কোপ ও নব্যতন্ত্রের সস্তা আধুনিকতা তাঁহার মনের বজ্রবেষ্টনী ভেদ করিতে পারে নাই। তাই বলিয়া তিনি পাষাণ

ছিলেন না। তাহার প্রমাণ নব্যতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে তাঁর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একটী স্মৃতি-তর্পণ। আধুনিক ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। Edmund Burkeএর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা তাঁহার মুখে আবৃত্তি শুনিয়াছি, আবার তাঁর টেবিলে Oppenhiem, Bernard Shaw, Sir Oliver Lodge প্রভৃতিও দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন সেকালের একখানি দামী সোণার কাজ করা কাশ্মীরী শালের মত—বহুমূল্য, দুর্লভ, নয়নমোহন ও লোভনীয়। একালের সস্তা কারুশিল্প তাঁহাতে ছিল না। তাঁহার বাটীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ হইত, তিনি দেশের কথা ভাবিতেন; গ্রামের বয়োবৃদ্ধগণের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে সদা হাস্যময় মুখে আসিয়া তিনি পরের শোক আপনার করিয়া লইতেন; নমন্ত্রণ করিলে তিনি কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

"তাঁহার চরিত্রে সর্ব্বোত্তম বিশেষত্ব—তাঁহার কাল্‌চার বা মানস-সম্পদ্। পাকা আঙ্গুরের মর্ম্মকোষে যেমন স্বাদু রসধারা সঞ্চিত থাকে, তাঁর মনে তেমনি একটী ভাবের রসধারা চিরবর্ত্তমান ছিল। এই মর্ম্ম-সুধা তাঁহাকে সাহিত্যিক প্রেরণা দিয়াছিল ও সর্ব্বগুণমণ্ডিত করিয়াছিল। গত যুগের যাঁরা দেশসেবক, তিনি তাঁহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্য। গত যুগের ভাবগঙ্গার তিনি ছিলেন ভক্ত ভগীরথ, আজ তাঁহার তিরোধানের সহিত সেই যুগের একটী বিশিষ্ট "স্মারক" লুপ্ত হইল। বাঙ্গালাদেশের রাজনীতির ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, তখন সুরেন্দ্রনাথ তাহাতে যোগ্য আসন লাভ করিবেন। তাঁহার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আইন পাশ হয় ঠিক দশ বৎসর পূর্ব্বে; আজ দেশবাসীর মনে এই শিক্ষানীতির সাড়া জাগিয়াছে। বেহালায় ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে নলকূপের প্রচলন ও এইখানে ১৫টী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থাপনা করেন সুরেন্দ্রনাথ; আজ তাঁহার দেশবাসিগণ ইহার ফলভোগ করি-

তেছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল বেহালাগ্রামে একটী 'প্রার্ক' তৈরি করা ও মটর লরি সাহায্যে জল সিঞ্চন করিয়া রাস্তার ধূলা নিবারণ করা ও এই গ্রামে বালিকাদের জন্য একটি হাইস্কুল স্থাপন করা। তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই ; তাঁহার পরিত্যক্ত কাজের যাঁহারা ভারগ্রহণ করিবেন, আশা করি এ বিষয়ে তাঁহারা অবহিত হইবেন।

"এই গ্রামটীকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসিতেন। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না, বড় বড় বন্ধু ও অন্তরঙ্গের অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি যেখানেই থাকিতেন তাঁর প্রাণ পড়িয়া থাকিত এই ধূলা, মশক ও ম্যালেরিয়া-পূর্ণ গ্রামখানির দিকে। তাঁর ছেলেদের প্রতি বিশেষ আদেশ ছিল যে, যেখানেই তাঁহার মৃত্যু হউক না কেন, যেন তাঁহার দেহাবশেষ তর্পণ-ঘাটে অগ্নিসাৎ করা হয়। এই যে মাটীর প্রতি মানুষের টান—ইহাও সেই গতযুগের অতিমানুষদের একটী মনোভাব। তিনি এই গ্রামটীকে যে কতখানি ভালবাসিতেন তা' তাঁহার গ্রামবাসিগণ ঠিক জানে না। বর্ত্তমান লেখকের তাঁহাকে জানিবার অনেকখানি সুযোগ ঘটিয়াছিল। ঠিক বিশ বছর পূর্ব্বে তাঁহারই চেষ্টায় এই গ্রামে ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম আসে ; এখানে জলের কল ও ইলেক্‌ট্রিক আলোর প্রবর্ত্তক সুরেন্দ্রনাথ। নূতন করিয়া ইংরাজি স্কুলের পত্তন করেন সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুজ সত্যেন্দ্রনাথ।

"সুরেন্দ্রনাথের বন্ধুপ্রীতি অসাধারণ ছিল। বন্ধুর জন্য তিনি সব করিতে পারিতেন। এইরূপ বন্ধুবৎসল লোকের বন্ধুর সংখ্যা বেশী হয় না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি অন্তরের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শৈশবের বন্ধুদের প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। এই সূত্রে ৺কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্বের কথা মনে পড়ে। এখনকার যুগে এইরূপ বন্ধুতার নিদর্শন একান্ত বিরল।

"তিনি পরের গুণানুরাগী ছিলেন। বিদ্যালাভে উৎসাহ তাঁহার ঐকান্তিক ছিল। তাঁহার মনের ফুলবাগানে যে সব বসোরাই গোলাপ ফুটিয়াছিল, তার মধুর সৌরভ তাঁহার বাড়ীময় ভরিয়া আছে। তাঁহার মুখের সেই শান্ত হাসিটী এখনও সকলের মনে জাগিয়া আছে—সে হাসির সৌম্য বিকাশ তাঁর চিরনিদ্রাচ্ছন্ন মুখেও সেদিন শ্মশানঘাটে প্রতিভাত দেখিয়াছিলাম। তাঁহার লাবণ্যপূর্ণ দেহের গঠন, লীলায়িত শ্মশ্রু, কাঞ্চনলাঞ্ছন দেহসৌন্দর্য্য ও গম্ভীর ও উদার কণ্ঠধ্বনি বেহালার লোকে সহজে ভুলিবে না। কিন্তু এই সবের পিছনে যে একটী অতন্দ্রিত ও নিরলস মন প্রচ্ছন্নভাবে নিরহঙ্কার হইয়া দেশসেবা করিয়া চলিত সে কথার সন্ধান কয় জনে জানিত? তিনি বেহালাকে বেশী ভালবাসিতেন বলিয়া বেহালার নিকটস্থ অপর গ্রামবাসিগণের দুঃখ হইত।

"তাঁহার প্রাসাদোপম পুরাতন ভবনে যখন বহু বর্ষ পূর্ব্বে জেলা কনফারেন্স হয় তখন যুবা সুরেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্টের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সে যুগে তিনি যে নির্ভীকতা দেখাইয়াছিলেন, এ যুগে তাহা সুলভ নয়। গ্রামের সকল বড় কাজে তিনি গ্রামের মুকুটমণি ছিলেন। বেহালার পরিচয় ছিল—সুরেন রায়। এ কথা সুদূর কাশ্মীরে গিয়াও সেখানকার বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের মুখে শুনিয়াছি, কারণ কাশ্মীরের স্বর্গীয় মহারাজাও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানিতেন। এই গ্রামের ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া তিনি যে সকলের কাছে সাদর পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, তার কারণ তাঁহার ধনবৈভব নয় বা বংশগৌরব নয়। ইহার কারণ তাঁর দেশপ্রীতি ও মানস-সম্পৎ।"

"শেষ জীবনে তিনি গভীর পারিবারিক শোকে ভগ্নমনা হইয়া পড়েন। মৃতদার হইয়া তাঁর জাগতিক কোন কর্ম্মে আর উৎসাহ ছিল না। কোন পারিবারিক কথা তুলিলেই তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসজল হইয়া পড়িত। অনেকের মনের ক্ষত মিলাইয়া যায়, তাঁহার মনের ক্ষত

চিরনবীন হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের হাসিটী বোধ হয় পরলোকবাসিনীর জন্য উদ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার এই শোক সাধারণের কপট শোক নয়। ইন্দুমতীর শোকে মহারাজ অজের মতই তিনি বলিতে পারিতেন—

"করুণা বিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ?"

"গত দশ বৎসরে এই বেহালার যা কিছু উন্নতি হইয়াছে, সকলেরই মূলে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁহার নামধেয় ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কোন বিদ্যোৎসাহী ও দেশসেবক নাই যাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। এই পরিচয়ের জন্য তিনি কোন পরিচায়ক-পত্র লইয়া তাঁহাদের দ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়ান নাই,—তাঁহার নিজস্ব গুণানুরাগে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। ফুল ফুটিলে যেমন গন্ধের টানে কোথা হইতে ভ্রমর আসিয়া জুটে, তাঁহার মনের গুণসম্পদে আকৃষ্ট হইয়া বড় বড় রাজা-মহারাজা, দেশসেবক ও কর্ম্মী, সকলেই তাঁহার ভবনে সমবেত হইতেন। Lord Lytton তাঁহাকে মন্ত্রীদল গঠনের জন্য আহ্বান করেন; সে সময় এমন কতকগুলি সুযোগ ঘটিয়াছিল যাহাতে সহজেই তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইতে পারিতেন। কিন্তু এই সময় তিনি যে উচ্চ দেশপ্রীতি দেখাইয়া সকল প্রলোভন দূরে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা বিস্ময়কর। তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা সকল কাজেই দেখা যাইত। তাঁহার ব্রাহ্মণ-প্রতিভা এই গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান।"

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয় সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"সুরেন্দ্রবাবু রূপে গুণে সমান ছিলেন। তিনি শান্তমূর্ত্তি, সৌম্যপ্রকৃতি, সদাশয় ও সহাস্যবদন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত একবার কথা কহিতে আরম্ভ করিলে সহজে উঠিয়া আসা যাইত না। তিনি

অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। যখন তিনি উত্তরপাড়ায় যাইতেন, তখন তিনি রাসবিহারীবাবু ও শিবনারায়ণবাবুর সহিত সেক্সপিয়ার ও মিল্টনের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেন। প্রাচীন কবিওয়ালার গান শুনিলে তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। আমি বরাহনগরে নিমন্ত্রণে গিয়া ' ভোলা ময়রা"র কয়েকটী নূতন গান ও ছড়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা লিখিয়া লইলেন। প্রাচীন কবিওয়ালাদের গান ও ছড়া সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু বিষম দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ছাপান হইল না। তিনি ইহা ছাপাইয়া বঙ্গবাসিগণের হস্তে প্রদান করিলে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষরূপ পুষ্টিসাধন হইত।"

সুরেন্দ্রনাথের দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ রায় ও কনিষ্ঠ শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ রায় এবং কন্যা শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী। শ্রীমতীর সহিত উত্তরপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠপুত্র কুমার ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার দুই পুত্র তাঁহার দানসাগর শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে দুইটী হস্তী, নৌকা ও অশ্বদান করা হইয়াছিল এবং বঙ্গদেশের ও কাশীধামের বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যথোপযুক্ত বিদায় দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়

ইনি স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি ১২৯৫ সালের ১৫ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষার সময় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই জন্য তিনি পরীক্ষা দেন নাই। ভূপেন্দ্রনাথ মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। ইনি নিরভিমান, সত্যসন্ধ এবং করুণহৃদয়।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি, এল এম এল, সি

ভূপেন্দ্রনাথের দুইটী পুত্র ; জ্যেষ্ঠ অজিতকুমার ও কনিষ্ঠ দিলীপ-কুমার। ইঁহারা স্কুলে পড়িতেছেন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়

ইনি স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র। ইনি ১২৯৮ সালের ২০শে শ্রাবণ, শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি সুকবি। ইঁহার রচিত বহু কবিতা ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্ম্মবাণী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি অমায়িক, সত্যপ্রিয় ও পরোপকারী। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ও কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েসনের সদস্য।

মণীন্দ্রনাথের দুই পুত্র এবং দুই কন্যা ; জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাতকুমার ও কনিষ্ঠ মিহিরকুমার। প্রভাতকুমার এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই-এ পড়িতেছেন ; এবং অল্প বয়সেই ইঁহার সাহিত্য-প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। এবং মিহিরকুমার স্কুলে পড়িতেছেন। প্রথমা কন্যার সহিত কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, জে-পি, আই-পি-এসের পুত্র শ্রীমান্ মুনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এর বিবাহ হইয়াছে। মুনীন্দ্রনাথ এক্ষণে লণ্ডন কিংস কলেজে এল-এল-বি ও লিনকন্স ইনে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছেন। কনিষ্ঠা কন্যা এখনও অবিবাহিত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়

ইনি স্বর্গীয় রায় অম্বিকাচরণ রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৎপরে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য এম-এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইনি বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন ও পরে এডভোকেট হন। ইনি চব্বিশ পরগণা জেলা-বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এক্ষণে ইনি বেহালা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ও বঙ্গ বিদ্যালয় পাঠাগার ও টোলের পৃষ্ঠপোষক। ইনি বহুদিন যাবৎ অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সম্প্রতি ইঁহাকে অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত করা হইয়াছে। অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে ইনি গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সাউথ সুবার্ব্বান মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়্যারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং তদবধি এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। সুরেন্দ্রনাথের পরলোকগমনে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যপদ শূন্য হয়; ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সেই শূন্যপদে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি স্পষ্টবাদী, দয়ার্দ্র-হৃদয় ও সত্যনিষ্ঠ।

সত্যেন্দ্রনাথের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ সুধীন্দ্রনাথ, মধ্যম রবীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ জিতেন্দ্রনাথ এবং এক কন্যা।

সুধীন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গণিতে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছেন এবং এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজেই এম-এ পড়িতেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসে অনার্স লইয়া বি-এ পড়িতেছেন। জিতেন্দ্রনাথ স্কুলে পড়িতেছে। ইঁহার কন্যার সহিত উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুত প্রবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রামদাস মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এলের বিবাহ হইয়াছে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

ইনি স্বর্গীয় অম্বিকাচরণবাবুর তৃতীয় পুত্র। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি-এ ও এম-এ পাশ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি বেহালা উচ্চ ইংরেজী স্কুলের অনারারি সেক্রেটারী। ইনি নিরহঙ্কার,

ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যবাদী। ইঁহার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি একালে দুর্ল্লভ। ইঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ এক্ষণে স্কুলে পড়িতেছে। কন্যাদ্বয়ের এখনও বিবাহ হয় নাই।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ রায়

ইনি রায় বাহাদুর স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইতিহাসে অনার্স লইয়া বি-এ. পরীক্ষায় ইতিহাসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ইনি সত্যপ্রিয় ও সরল-প্রকৃতি।

ইঁহার চারি পুত্র – প্রথম বীরেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় শচীন্দ্রনাথ, তৃতীয় রমেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ রণেন্দ্রনাথ এবং চারি কন্যা।

বীরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যায় অনার্স লইয়া বি-এস সি পড়িতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। বেতার (wireless) সম্বন্ধে ইঁহার জ্ঞান অতীব গভীর। ইনি "ঘূর্ণীপথে" "গল্পে বিজ্ঞান" "চলচ্চিত্র" 'যন্ত্রপুরী" "খেয়ালী" "বেতার যন্ত্রনির্ম্মাণ" "Encyclopoedia of Facts and Figures" প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইনি "বিশ্ববার্ত্তা" ও "পাততাড়ি" নামক দুইখানি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রের প্রথম সম্পাদক। ইনি "মেঘদূত' মাসিক পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ Physical semiuarএর এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী ও উক্ত কলেজের ড্রামাটিক ক্লাবের ম্যানেজার ছিলেন। ইনি বেহালা আর্য্য সমিতি, বেহালা লাইব্রেরী ও বেহালা স্পোর্টসের অনারারি জেনেরাল সেক্রেটারী ছিলেন। ইনি গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ঐ বৎসর নভেম্বর মাসেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শচীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়া এক্ষণে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস সি পড়িতেছেন। শ্রীমান্ রমেন্দ্র ও রণেন্দ্র স্কুলে পড়িতেছেন।

ইঁহার প্রথমা কন্যার সহিত বরাহনগরের প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। অন্য তিন কন্যা অবিবাহিতা।

শুঁড়িপুষ্করিণীর সাহানা-বংশ

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় ইন্দাস থানার অন্তর্গত শুঁড়ি পুষ্করিণী গ্রাম প্রায় দুই শত বৎসরকাল সাহানাগণের এক শাখার বাসভূমি। সাহানাগণ জাতিতে জানৌ বা জানা উগ্রক্ষত্রিয়। জানৌ শব্দের অর্থ উপবীত। উগ্রক্ষত্রিয়গণের এই শাখা উপবীতী এবং ক্ষত্রিয়াচারী। ত্রাতৃবর্ম্মা ও দেবী উল্লেখে ইঁহাদের দৈব ও পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং ইঁহারা দ্বাদশাহ অশৌচ ধারণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের বিবাহের প্রাক্কালে উপনীত হওয়ার কিম্বদন্তী-অবলম্বনে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অনেক ক্ষত্রিয় শাখাই বিবাহের সময়ে উপনয়নের ব্যয়-সংক্ষেপকর প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকেন। জানৌ উগ্রক্ষত্রিয়গণেরও উপনয়ন-সংক্রান্ত বৈদিক ক্রিয়াদি বিবাহের আভ্যুদয়িকাদির সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

উগ্রক্ষত্রিয়গণ মানসিংহের দ্বারা মোগলগণের সৈনিকরূপে পাঠানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালাদেশে আনীত ও গৌড় হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বাদসাহী রাস্তার উভয় পার্শ্বে স্থাপিত হন। আজও ঐ জাতি বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার কতকাংশে মাত্র নিবেশিত। আগরা প্রদেশ হইতে আগত বলিয়া উগ্রক্ষত্রিয়গণ বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মাড়োয়ারী প্রভৃতির ন্যায় আগরী (উচ্চারণ-দোষে আগুরী) আখ্যা লাভ করিয়াছেন। দীর্ঘ তিন শত বৎসরের অধিককাল বাঙ্গালার "সেঁতো মাটি" ও "ভিজা হাওয়া"র মধ্যে থাকিলেও আগরীর যোদ্ধৃরক্ত যে একবারে শীতল হয় নাই "আগুরী গোঁয়ার" প্রবাদই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পরে উগ্রক্ষত্রিয়গণ বাঙ্গালা দেশে আগত হওয়ায় এই জাতির মধ্যে কৌলিন্যপ্রথার অস্তিত্ব লক্ষিত

হয় না। এই জাতি দেব-দ্বিজে ভক্তিমান আনুষ্ঠানিক হিন্দু। অতি অল্প কয়েক ঘর মলিনাবস্থ উগ্রক্ষত্রিয়ও যে স্থানে বাস করিয়া আছেন তাঁহাদের তৃণকুটীরেও শালগ্রাম শিলা ও শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। উগ্রক্ষত্রিয়গণ সাধারণ বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক বলবান্ ও সাহসী; ইঁহাদের দেহ সাধারণতঃ সুপুষ্ট ও মাংসল; ইঁহারা পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, সরল এবং আত্মনির্ভরশীল।

উগ্রক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগকে রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া প্রকাশ করেন; "রঘুনাথী লাঠি'র কথা বর্দ্ধমান অঞ্চলে প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত; "রঘুনাথী লাঠি" মানে উগ্রক্ষত্রিয়ের লাঠি। ঐ কথার একটা বিশেষ ভিত্তিও লক্ষিত হয়। হিন্দুর পঞ্চাশোর্দ্ধ পীঠস্থানের কথা বহু পুরাতন। ঐ পীঠস্থানসমূহের মধ্যে "যুগাদ্যা" অন্যতম। যুগাদ্যায় দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হইয়াছিল; ইহাতে দেবী মহামায়া এবং ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। কিম্বদন্তী—যুগাদ্যা পাতালদেশস্থিত মহীরাবণের রাজপুরী। নৈশযুদ্ধে রামলক্ষ্মণকে অপহৃত করিবার পর মহীরাবণ হনুমানসহায় রামলক্ষ্মণের দ্বারা সবংশে বিনষ্ট হইলে দেবী অর্থাৎ মহামায়া স্বীয় আদেশানুসারে রামচন্দ্রের দ্বারা আনীতা ও নিজবংশে প্রতিষ্ঠাতা হন। পীঠস্থানের পরিবর্ত্তন হিন্দুর নিকট অসামান্য ব্যাপার; ইহা হিন্দুসাধারণের স্মরণোদ্দেশ্যেই যেন দেবীকে বর্ত্তমানে যুগাদ্যা দেবী বলা হয়; দেবীর প্রকৃত আখ্যা যে মহামায়া তাহা অনেকেই অবগত নহেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপনিবিষ্ট রঘুবংশীয়গণের দ্বারা দেবী সম্ভবতঃ বহুস্থানেই নীতা হইয়াছিলেন; শেষে মানসিংহের সহিত যোদ্ধৃরূপে বঙ্গদেশে আগত রঘুবংশীয়গণ বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় যে গ্রামে তাঁহাদের রক্ষয়িত্রী দেবতারূপে পূজিতা যুগাদ্যা দেবীর স্থাপনা করেন তাহা ক্ষীরগ্রাম—বর্দ্ধমানের ১৮।২০ মাইল উত্তরে—বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেল লাইনের ধারে অবস্থিত এবং হিন্দুসাধারণের দ্বারা

একান্ন পীঠের অন্যতম বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। নবাগতা পীঠ মহাদেবী যুগাত্মা যে বাঙ্গালীর শ্রদ্ধার দৃষ্টি বহুল পরিমাণেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়; দেবীর বাঙ্গালায় আগমনের পর হইতে ভারতচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত লেখকগণের গ্রন্থে দেববন্দনায় প্রায় সর্ব্বত্রই "যুগাত্মা" বা "যোগাত্মা"র বন্দনা দৃষ্ট হয়। এই যুগাত্মা দেবী জানৌ বা জানা উগ্রক্ষত্রিয়গণের একচেটিয়া দেবতা বলিলেও চলে। ক্ষীরগ্রামের যুগাত্মার দেউলিয়া ও সেবাইত জানা উগ্রক্ষত্রিয়গণ। যুগাত্মা-সম্বন্ধীয় যে সকল কবিতা প্রচলিত আছে তাহাতে দেখা যায়, দেবীর আদি সেবক উগ্রক্ষত্রিয় রাজা হরিদত্ত নিত্য নরবলি দিয়া দেবীর পূজা করিতেন; অন্য বলির অভাবে পর পর নিজের ছয়টি পুত্রকে বলি দিয়া, কুণ্ঠিতভক্তি ও ব্যথিতহৃদয় হইয়া, সপ্তম পুত্রটিকে লইয়া নিশাযোগে স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে এক রমণী তাঁহার পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সকল কথাই প্রকাশ করেন; তখন দেবী তাঁহার সম্মুখে প্রকটিতা হইয়া বলেন, "যার ভয়ে পলাও তুমি সেই দেবীই আমি। আমি তোমার ভক্তি ও মনের বলে পরিতুষ্টা হইয়াছি। তোমাকে পলাইতে হইবে না, অদ্য হইতে নরবলি বন্ধ করিয়া ছাগবলির ব্যবস্থা করিও।" রাজা হরিদত্তের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং উগ্রক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সম্মানের আসন লাভ করেন। জানা উগ্রক্ষত্রিয়গণের মধ্যে আর একটি বিশেষ আচরণ দৃষ্ট হয়; যেখানে এক ঘরও ঐ জাতি বাস করিয়াছেন তিনিও বর্ষান্তে একদিন যুগাত্মা পূজা করিতে বাধ্য, না করিলে তাঁহার উগ্রক্ষত্রিয়ত্বে সংশয় জন্মে। ক্ষীরগ্রামের যুগাত্মার সমারোহ-সহকারে পূজা বৈশাখী সংক্রান্তিতে হয়; ভিন্ন গ্রামস্থ জানা উগ্রক্ষত্রিয়গণ দেবীর পূজা সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিনে সম্পন্ন করেন। হিন্দুর সুপবিত্র পঞ্চাশোর্দ্ধ পীঠ-স্থানের একটিতে সংখ্যায়, শিক্ষায়, ঐশ্বর্য্যে, সম্পত্তিতে ও সম্মানে নগণ্য

একটি জাতির এই যে একাধিপত্য, কে জানে ইহার মধ্যে অতীত ইতিহাসের কোন সূত্র লুকায়িত রহিয়াছে !

আগরা প্রদেশ হইতে আগত এই উগ্রক্ষত্রিয় যোদ্ধৃগণের মধ্যে উৎসাহ-সাহস-সম্পন্ন বিদ্বাংশগোত্রীয় রাজা পরশুরাম কোঙারের (কুমারের) সন্তানগণকে পাঠানগণের আক্রমণ-মুখে স্থাপিত করা হয়। বর্দ্ধমানের দক্ষিণ, বর্দ্ধমান-মেদিনীপুর রাস্তার উপর উচালনের কিঞ্চিৎ উত্তরে মোগলমারি গ্রাম অবস্থিত। কিম্বদন্তী—এই স্থানে মোগল-বাহিনী পাঠানগণের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। রাজা পরশুরাম কোঙারের বংশধরগণ ঐ মোগলমারির প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে, দ্বারকেশ্বর নদীর কিঞ্চিৎ উত্তরে কেন্দুড়গ্রামে স্থাপিত হন। এই কেন্দুড়গ্রাম পাঠানগণের অধিকৃত গড়মান্দারণের ৬।৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। কালক্রমে পাঠানগণ ওড়িষায় পলায়ন করে এবং বঙ্গদেশে মোগলের একাধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় যুদ্ধকার্য্যের অবসর কমিয়া যায়। সে সময়ে বর্দ্ধমান হইতে আগরায় প্রত্যাগমন ক্লেশ ও বিঘ্ন-বহুল থাকায় এবং সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের যথেষ্ট আকর্ষণ থাকায় অনেকেই বাঙ্গালাদেশে উপনিবিষ্ট হন। রাজা পরশুরাম কোঙারের সন্তানগণও কেন্দুড়েই বাস করেন এবং বাঙ্গালাদেশের প্রথানুসারে নামের শেষে উপাধিরূপে "কোঙার" শব্দ ব্যবহার করিতে থাকেন।

ঐরূপে উপনিবিষ্ট যোদ্ধৃগণের মধ্যে অনেকেই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য জায়গীররূপে প্রাপ্ত ভূমি লইয়া কৃষিবৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরশুরাম কোঙারের সন্তানগণ কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্যেই অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। লাদ্‌না বয়েল বা ছালা গরুর পৃষ্ঠে পণ্য বোঝাই করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া মুদ্রা মূল্যে বা বিনিময় প্রথায় বিক্রয় করাই সে সময়ের স্থলবাণিজ্যের প্রধান অঙ্গ ছিল। কেন্দুড়-নিবাসী রাজা পরশুরাম কোঙারের সন্তানগণও ঐ প্রথায় ব্যবসা করিতে

আরম্ভ করেন। তাঁহারা তমলুক প্রভৃতি স্থান হইতে লবণ, মশলা, শঙ্খ প্রভৃতি গরুর পৃষ্ঠে বে ঝাই করিয়া বহিচটী এবং সময়ে সময়ে গয়া পর্য্যন্ত গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিতেন। ঐ ব্যবসায়ে তাঁহারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। দুর্ল্লভ কোঙারের সময়ই ঐ বংশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইয়াছিল। শুনা যায়, দুর্ল্লভ কোঙারের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত গোগৃহগুলিতে দশ সহস্র গরু থাকিত। এক স্থানে অধিক-সংখ্যক গরু রাখার অসুবিধা দেখিয়া তিনি গোচারণ ভূমির প্রাচুর্য্যযুক্ত বিভিন্ন স্থানে গোঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; গোগণের স্নান ও পানের জলের জন্য স্থানে স্থানে বাঁধ ও পুষ্করিণী আদি খনন করাইয়াছিলেন। কালক্রমে গোঠ গিয়াছে; ঐ সকল বাঁধ পুষ্করিণীও অন্যহস্তগত হইয়াছে।

দুর্ল্লভ কোঙার অর্থশালী ব্যবসায়ী এবং রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। পূর্ত্তকার্য্যেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি কেন্দুড় গ্রামে কয়েকটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন; সেগুলি এখনও বর্ত্তমান। তন্মধ্যে 'মন্দির সায়র'টি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহাতে এখনও বড় বড় কুম্ভীরের আবির্ভাব হয়। উহার ঘাটে দুর্ল্লভের জনক-জননী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম 'মন্দির সায়র'। আর একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা 'আগুনখাকীর সায়র'। দুর্ল্লভ কোঙারের জননী সহমৃতা হওয়ায় তাঁহার স্মরণোদ্দেশে তিনি এই সায়র খনন করাইয়াছিলেন। সহমৃতা রমণীকে সাধারণতঃ "সতী" এবং স্বেচ্ছায় আগ্রহসহকারে সহমৃতাকে "আগুনখাকী" বলা হইত। দুর্ল্লভের জননী স্বেচ্ছায় সাগ্রহে সহমৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার "আগুনখাকী" আখ্যা হইয়াছিল।

দুর্ল্লভ কোঙার যে বৎসর এই "আগুনখাকীর সায়র" খনন করাইতেছিলেন সে বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং পাঠানগণ উড়িষ্যায়

উৎপাত করিতে আরম্ভ করায় মোগল-প্রতিনিধি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। মোগল-প্রতিনিধি অর্দ্ধখনিত "আগুনখাকীর সায়রে"র নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত মাঠে শিবির সন্নিবিষ্ট করেন এবং কৌতূহল-বশে জিজ্ঞাসা করেন, "এখানে এরূপ ধনবান ব্যক্তি কে আছে যে, এই দুর্বৎসরে এত বড় পুষ্করিণী খনন করাইতেছে?" দুর্লভ যখন শুনিলেন যে, নবাব পুষ্করিণীর মালিকের খোঁজ লইতেছেন তখন তিনি স্বর্ণমুদ্রার উপহার লইয়া নবাবের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি সে সময়ের পল্লীগ্রামের ভদ্রলোকের বেশে গিয়াছিলেন বলিয়া নবাব তাঁহাকে পুষ্করিণীর ধনবান্ মালিকের কোন কর্ম্মচারী মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার মনিব কি এখানে নাই?" তদুত্তরে দুর্ল্লভ বলেন, "আমার কেহ মনিব নাই, আমিই নিজ অর্থে ঐ পুষ্করিণী খনন করাইতেছি।" ইহা শুনিয়া নবাব দুর্ল্লভের বিশেষ সম্মান করেন। শিবিরে দরবারের কায়দা-কানুন রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া নবাব দুর্ল্লভের যে সম্মান করেন তাহা একটু বেশী রূপই হয়। পল্লীবাসী সরলচিত্ত দুর্ল্লভ ঐ সম্মানে এরূপ উৎফুল্ল হন যে, ছাউনির সেদিনের সমস্ত রসদ যোগাইবার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিবার জন্য নবাবকে অনুরোধ করেন। ঐ অনুরোধ শ্রবণে নবাব অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দুর্ল্লভের সম্মুখেই ওমরাহগণের কাছে দুর্ল্লভের দাতৃত্বের বহু প্রশংসা করেন এবং দুর্ল্লভের কোন প্রার্থনা আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। ওমরাহগণ দুর্ল্লভকে কোন বিস্তৃত জায়গীর প্রার্থনা করিতে বলেন। কবিকঙ্কন, ঘনরাম প্রভৃতি হইতে জানা যায়, অনেক উগ্রক্ষত্রিয় বা আগরীই জায়গীর ভোগ করিতেন। ঘনরাম লিখিয়াছেন, "বাইস আগুরী আছ্য, বিজয় জাইগিরী যার গাঁ।" দুর্ল্লভ কিন্তু কোনরূপ জায়গীর প্রার্থনা করেন নাই। নবাবের দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে আদিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমার দশ সহস্র গরু আছে;

আমাকে এইরূপ সনন্দ দেন যে, আমার গরু চরাইবার জন্য যেখানেই গোষ্ঠ স্থাপন করি কেহ বাধা দিবে না এবং গরুর স্নান-পানের জন্য কোন স্থানে পুষ্করিণী খনন করিবার আবশ্যক হইলে নিষ্কর ভূমি পাইব।” নবাব তদনুসারে দুর্ল্লভকে নিজের স্বাক্ষর ও মোহর-অঙ্কিত একটী পাঞ্জা পাট্টা বা সনন্দ দেন। আজও সেই সনন্দটী বর্ত্তমান আছে।

দুর্ল্লভের নির্লোভিতা ও দানশৌণ্ডতা দেখিয়া নবাব বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেইজন্য পূর্ব্বোক্তরূপ সনন্দ দিবার পর তিনি দুর্ল্লভকে “সাহানা” (The Royal) উপাধি দেন। দুর্ল্লভ সাহানার সময় হইতেই ঐ বংশের “কোঙার” উপাধি লুপ্ত হইয়া “সাহানা” উপাধি প্রচলিত হয়। দুর্ল্লভ সাহানা ও তাঁহার বংশধরগণ নবাবদত্ত সনন্দেরও যে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঁকুড়া সহরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে “সাহানা বাঁধ” বা ‘সানা বাঁধ” নামে একটী গ্রাম আছে, সাহানা বা উচ্চারণ-শৈথিল্যে “সানা”দের বাঁধ আশ্রয় করিয়া গ্রামটীর প্রতিষ্ঠা বলিয়াই উহার নাম “সানাবাঁধ”। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের জামতাড়া ষ্টেশনের কিছুদূরে একটী গ্রাম আছে তাহার নাম “সাহানা”। মেদিনীপুর যাইবার পথে অনেকগুলি পুষ্করিণী “সাহানা”দের খনিত বলিয়া পরিচিত; ঐ পথে “নেড়ামন্দির সায়র” বলিয়া একটি পুষ্করিণী ও তৎসংক্রান্ত কিম্বদন্তী আছে যে, কেন্দুড়-নিবাসী আত্মারাম সাহানা ঐ পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। আরও বহুস্থানে সাহানাদের পুষ্করিণীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

দুর্ল্লভ সাহানার এক বংশধরের নাম ছিল কুড়ারাম সাহানা। অধিক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্রাদি না হওয়ায় গ্রামের কেহ কেহ তাঁহার পরোক্ষে তাঁহাকে “আঁটকুড়ারাম” বলিত। কথাটা ক্রমে গ্রামে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অপুত্রকবাচক “আঁটকুড়া” ও “নির্ব্বংশ” শব্দদ্বয় নিন্দা ও

গালিরূপেই সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়। অপুত্রক কুড়ারাম "আঁটকুড়া" আখ্যায় বিশেষ মনোকষ্ট ভোগ করিতেন; এই অবস্থায় তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। তালগাছ যাইলেও তালপুকুরের নাম যায় না; পুত্রবান্ হওয়ার পরও তাঁহাকে কেহ কেহ 'আঁটকুড়া' বলিত। ইহাতে তাঁহার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হয় এবং তিনি ক্রোধ ও বিরক্তির বশে গ্রামত্যাগ করিয়া মল্লভূমাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। মল্লরাজ কুড়ারামকে মল্লরাজগণের পূর্ব্বতরফী ঘাট ইন্দাসের নিকটবর্ত্তী একটী চারি পাঁচশত বিঘা পরিমাণের বেহপ্পর ক্ষুদ্র মৌজা বা চক্ নামমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত দেন। কুড়ারাম ঐ স্থানে একটী পুষ্করিণী খনন ও শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া উহাতে বাস করেন। ঐ মৌজা বা চকে অতীতে বিলুপ্ত কোন শুঁড়িবংশের একটি পুষ্করিণী বিদ্যমান থাকায় লোকে ঐ স্থানকে শুঁড়ি পুষ্করিণীর চক্ বলিত। কুড়ারামও গ্রামটির শুঁড়িপুষ্করিণী নাম বজায় রাখিয়া উহাতে বাস করিয়া পতিত স্থানকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়া জন-মজুরের সাহায্যে চাষ করাইতে থাকেন। কৃষি তাঁহার প্রধান উপজীব্য থাকিলেও তিনি বংশগত ব্যবসায় ত্যাগ করিতে পারেন নাই; সামান্য কয়টী "লাদনা বয়েল"-সাহায্যে দূরদেশে ব্যবসায়ও করিতেন।

কুড়ারাম যে প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন সেই প্রণালীই ভগীরথ সাহানার সময় পর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়া আসিয়াছিল। তবে ঐ বংশের হৃদয়বত্তার কথা অতীত নীরবতার মধ্যেও কখনও কখনও শুনা যায়। ধামুড় এবং শুঁড়িপুষ্করিণী সংলগ্ন গ্রাম। শুঁড়িপুষ্করিণী অতি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিয়া ঐ দুই মিলিত গ্রামে শুঁড়িপুষ্করিণী ধামুড় গ্রামের অংশরূপে গণিত এবং গ্রামবাসিগণের দ্বারা "সানাপাড়া" নামে উক্ত হয়। ঐ ধামুড়গ্রামের কোন স্বভাবকবি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে গ্রামবাসিগণের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে একটী ছড়া রচনা

করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগীরথ সাহানার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি ছিল,—

"ভগীরথ সানা ভাত খেয়ে পেটে বুলয় হাত,
নিজে খায় আর জোগায় দশজনের ভাত।"

ভগীরথের সময় পর্য্যন্ত কুড়ারাম-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺শিবঠাকুরের নিত্যসেবা, গাজন ইত্যাদিই অনুষ্ঠিত হইত এবং বৎসরের মধ্যে একদিন, বৈশাখী সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন, যুগাদ্যার পূজা হইত। ভগীরথ আপন গৃহে শ্রীশ্রী৺দুর্গা দেবীর পূজা স্থাপনা করেন এবং শ্রীশ্রী৺শ্রীধর জীউ নামক শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ দেবতার নিত্যপূজা নিজেই করিতে থাকেন। পরে তাঁহার গুরুদেব আসিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে ও অসুস্থ অবস্থায় পূজার ব্যাঘাত হইবে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত যখন রহিয়াছেন তখন ভিটায় পুরোহিতের নিত্য আগমন বাঞ্ছনীয় প্রভৃতি কথা বলায় শ্রীশ্রী৺শ্রীধর জীউর জন্য ব্রাহ্মণ পূজক নিযুক্ত করেন।

ভগীরথের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র গোঁসাইদাস অতিশয় উদ্যোগী, বলবান ও সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। বাল্যে তিনি বাঙ্গালা ও পার্শীভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন; পরে কার্য্যসৌকর্য্যার্থ তিনি গোরক্ষপুরী হিন্দী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও তেজো-ব্যঞ্জক ছিল। চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুত্র প্রাণকৃষ্ণের জন্ম হয়। ঐ বৎসরই তিনি অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় শুঁড়িপুষ্করিণী হইতে একাকী তারকেশ্বরের পথে পদব্রজে কলিকাতায় গমন করেন। তাঁহার বলবান সুন্দর দেহ এবং পল্লীসুলভ সরলতা একজন উচ্চমনা পশ্চিমদেশীয় ধনবান্ ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ীর স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ীর উপাধি ছিল তর্কনায়ক; তিনি গোরক্ষপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। বড় বড় শাল কাষ্ঠ (বাহাদুরী মাজ) পার্ব্বত্য নেপাল প্রদেশের জঙ্গল হইতে প্রথমে হস্তীর দ্বারা টানাইয়া আনিয়া

চাও বাঁধিয়া নদীতে ভাসাইয়া বারাকপুরে (বর্ত্তমান বেলুড় মঠের নিকটবর্ত্তী স্থান) বিক্রয় করাই তাঁহার ব্যবসায় ছিল। খুচরা কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীরা ঐ সকল বৃহৎ কাষ্ঠ খরিদ করিয়া করাত দ্বারা আবশ্যক আকারে পরিণত করিয়া বিক্রয় করিতেন। তর্কনায়ক গোঁসাইদাসকে সামান্য বেতনে খুচরা ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায়ের ও হিসাব-রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। দুই প্রস্থ হিসাব রক্ষা করিতে হইত—এক প্রস্থ বাঙ্গালা অক্ষরে, এবং কারবারের মালিক তর্কনায়কের বোধ-সৌকর্য্যার্থ অন্য প্রস্থ গোরক্ষপুরী হিন্দীতে। গোঁসাইদাস প্রথমে গোরক্ষপুরী হিন্দী জানিতেন না; তিনি বাঙ্গালাভাষায় যে হিসাব রক্ষা করিতেন তাহাই একজন গোরক্ষপুরী কর্ম্মচারী হিন্দীতে লিখিয়া লইতেন। ঐ ব্যবস্থায় নানারূপ অসুবিধা হয় দেখিয়া গোঁসাইদাস অতি অল্প সময়ে গোরক্ষপুরী হিন্দী শিক্ষা করেন এবং দুই প্রস্থ হিসাবই নিজে প্রস্তুত করিতে থাকেন।

তর্কনায়ক প্রথম হইতেই গোঁসাইদাসকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, পরে গোঁসাইদাসের সততায় ও কর্ম্মশক্তিতে তাঁহার কারবারের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় তিনি গোঁসাইদাসকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং কি করিলে তাঁহার আর্থিক উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেন। একদিন তিনি বলেন, "দেখ গোঁসাইদাস, আমি তোমাকে বেশী বেতন দিতে পারি না, তোমারও অর্থ আবশ্যক। তোমার উপর যে কার্য্যের ভার দেওয়া আছে তাহা সম্পন্ন করিয়াও তোমার অনেকটা সময় থাকে। তুমি আমার গোলা হইতে কাষ্ঠ লইয়া তাহা ফাড়াইয়া বিক্রয় করিলে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পার। তোমাকে নগদ মূল্যে কাষ্ঠ লইতে হইবে না, তুমি কাষ্ঠ ফাড়াইয়া বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় আমার কাষ্ঠের মূল্য শোধ করিবে, তাহাতে যাহা লভ্য হইবে তাহাই ক্রমে তোমার মূলধনে পরিণত হইবে।"

গোঁসাইদাস স্নেহশীল মনিবের ঐ কথায় কয়েক দল করাতি লইয়া একটী ফাড়াই কাষ্ঠের কারবার করেন এবং তাহাতে তাঁহার কিছু কিছু অর্জ্জনও হয়। তিনি ঐরূপে অর্জ্জিত অর্থের দ্বারা রাণীগঞ্জে একটী কারবারের পত্তন করিয়া তাঁহার স্বগ্রামবাসী পিসতুতো ভাই রূপদাস সামন্তের সহায়তায় তাহা চালাইতে থাকেন। রূপদাসের সততায় ও কর্ম্মিত্বে ঐ কারবার প্রথমাবধিই লাভজনক হইয়াছিল। ঐ কারবার প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে গোঁসাইদাস দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

গোঁসাইদাসের মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণকৃষ্ণের বয়স ১৭ বৎসর এবং কনিষ্ঠপুত্র রাজকৃষ্ণের বয়স ছয় বৎসর মাত্র ছিল। প্রাণকৃষ্ণের ১১ বৎসর ও রাজকৃষ্ণেব ছয় মাস বয়সে তাঁহাদের সাধ্বী জননী ক্ষেমঙ্করী দেবীর মৃত্যু হইয়াছিল। প্রাণকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণের মাতুলালয় বাঁকুড়ার নিকটবর্ত্তী ছাতারকানালী গ্রামের প্রসিদ্ধ সর্দ্দার সামন্ত-বংশে। এই সামন্তগণ পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের উত্তর কুড়মুন পলাসীতে অবস্থিত ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির সময়ে ঐ স্থানে যুদ্ধকার্য্যের কোনরূপ সুযোগ না পাইয়া জানকীনাথ সামন্ত ও তাঁহার ভ্রাতা মল্লভূমে আগমন করিয়া মল্লরাজগণের অধীনে সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। সে সময়ে মল্লভূমে বর্গীর হাঙ্গামায় প্রতিনিয়তই যুদ্ধকার্য্যের অবসর ছিল। বিষ্ণুপুরাধিপতির সেনাপতি দামোদর সিংহের অবিবেচনায় মুর্শিদাবাদ-আক্রমণোদ্দেশে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে পরিচালিত মারাঠা বাহিনীকে বাধা দেওয়া হয়। ইহাতে মারাঠার ক্রোধ পুনঃ পুনঃ মল্লভূম-আক্রমণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই জানকীনাথ ছাতারকানালীর সামন্তগণের আদিপুরুষ। তাঁহার কর্ম্মিত্বে ও বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট হইয়া মল্লরাজ তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতাকে কতক ভূমি সর্দ্দারী জায়গীররূপে দিয়া ছাতারকানালী ও কোটালপুর গ্রামে ঘাটরক্ষকরূপে স্থাপিত করেন। প্রাণকৃষ্ণ ও

রাজকৃষ্ণের মাতুল, সর্দ্দার গঙ্গানারায়ণ সামন্ত, সর্দ্দার ঈশানচন্দ্র সামন্ত ও সর্দ্দার রামচাঁদ সামন্ত এবং তাঁহাদের একান্নবর্ত্তী পিতৃব্যপুত্র সর্দ্দার শিবপ্রসাদ সামন্ত ও সর্দ্দার দুর্গাপ্রসাদ সামন্ত বহুপরিবারী এবং অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের নিত্য পাঁচ ছয় মণ দুগ্ধ হইত। বাগানের ফল, পুকুরের মাছ এবং ক্ষেত্রের নানাপ্রকার শস্যেরও প্রাচুর্য্য ছিল। শৈশবে মাতৃহীন প্রাণকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন।

প্রাণকৃষ্ণ দশ বৎসর বয়সে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তিনি স্কুলের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক লেথব্রিজ সাহেবের প্রিয় শিষ্য বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন বাঁকুড়ার তদানীন্তন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙ্গলাভাষা শিখিবার জন্য বিশ্বনাথের নিকট একজন শিক্ষক চাহেন। বিশ্বনাথ প্রাণকৃষ্ণের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা অবগত থাকায় তাঁহাকেই ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন এবং সাহেবকে বলেন, "আমার ছাত্র আপনাকে বাঙ্গালা শিখাইবে আপনিও তাহাকে ইংরাজী ভাষা-শিক্ষায় কিছু কিছু সাহায্য করিবেন।" কয়মাস ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় প্রাণকৃষ্ণের ইংরাজী ভাষায় অধিকার সহপাঠিগণ অপেক্ষা কিছু বেশীই হইয়াছিল।

পিতার জীবদ্দশায় প্রাণকৃষ্ণ অচির-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন; তিনি ইংরাজীভাষা ভালরূপ জানিলেও এবং মেধাবী ছাত্র হইলেও কোন কারণে তাঁহার লিখিত উত্তরপত্রের কতকগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। সে সময়ে এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া অনেকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরী পাইতেন, গোঁসাই দাসও পুত্রের জন্য একটী ডেপুটী-পদ সংগ্রহ করেন। কিন্তু ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ

গোঁসাই দাসের মৃত্যু হওয়ায় প্রাণকৃষ্ণ ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শিশু সহোদরের লালন-পালনে, রাণীগঞ্জের কারবার ও পিতৃত্যক্ত ভূসম্পত্তির উন্নতি-সাধনেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন মধ্যে অনেকেই বলিতেন যে, তাঁহার সরকারী চাকরীতে প্রবৃত্ত না হওয়া তাঁহার ও তাঁহার বংশাবলীর পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছিল।

রাণীগঞ্জের কারবারে বেশ লভ্য হইতে থাকায় কারবারটীর ক্রমোন্নতি হয়। লভ্যের টাকা হইতে প্রাণকৃষ্ণ দেশে ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করেন এবং মধুপুর হইতে গিরিডি পর্য্যন্ত রেল লাইন যে বৎসর খোলা হয় সেই বৎসরই পচম্বায় একটী এবং তৎপর বৎসরে গিরিডিতে একটী কারবার স্থাপন করেন। ঐ সকল কারবারের এবং ভূসম্পত্তির আয় হইতে শৈশবে পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতৃদ্বয় বেশ অর্থশালী হইয়া উঠেন।

প্রাণকৃষ্ণ বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, সদালাপী ও হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন। প্রজাগণের ও অন্য লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার সহৃদয়তা-পূর্ণ ছিল। তিনি অন্নদানে অকাতর ছিলেন বলিলে ঠিক কথা বলা হয় না। যেদিন একজন অতিথি তাঁহার গৃহে না থাকিত, সেদিন তিনি কোন আনন্দই পাইতেন না। এবিষয়ে তাঁহার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন তাঁহার সাধ্বী পত্নী দাক্ষিণ্যবতী হৃদয়বাসিনী দেবী (অন্য নাম অম্বিকা দেবী)। অম্বিকা দেবী কেন্দুড়-নিবাসী কমলাকান্ত রায়ের একমাত্র পুত্র দুর্গাচরণ রায়ের কন্যা ছিলেন। কমলাকান্ত রায় এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন যে, অনেকে তাঁহাকে রাজা কমলাকান্ত রায় বলিত। তাঁহার ইজারা মহল সকলের আয় লক্ষাধিক টাকা ছিল। তাহা ছাড়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী গরুটিতে, বর্দ্ধমানের সে সময়ের প্রধান অংশ নান্‌কায় (বর্ত্তমান কাঞ্চননগরে) এবং সীতরামপুরের নিকটবর্ত্তী সাম্‌ডিলালগঞ্জের বিস্তৃত কারবারে এবং তেজারতিতে তাঁহার ২৫।৩০ লক্ষ টাকা খাটিত। কমলাকান্তের দেউ-

ড়ীতে ২৫।৩০ জন পশ্চিমা দ্বারবান এবং আস্তাবলে ১০।১৫টি তাজী ঘোড়া থাকিত। তাঁহার স্থাপিত শিবমন্দির'চতুষ্টয়ের নিকটস্থ দরজার উপরের গোল নহবৎখানায় নিত্য নহবৎ বাজিত এবং ফটকের সম্মুখে নিত্য কামান দাগা হইত। তাঁহার শেষ বয়সে গৃহবিবাদে সব নষ্ট হইয়া তিনি অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

অম্বিকা দেবীর মধ্যে মাতৃভাব এরূপ সুপরিস্ফুট ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুতে তিন চারিখানি গ্রামের লোক বলিয়াছিল "আজ কেবল সত্য বাবুর মা মরেন নাই, তিনচারিখানি গ্রামবাসী আমাদের সকলেরই মা মরিয়াছেন।" অম্বিকা দেবী অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন; পুরোহিত, কর্ম্মচারী, আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীকে প্রায় প্রত্যহই বাগানের ফলমূল, পুষ্করিণীর মাছ প্রভৃতি কিছু কিছু বিতরণ করিতেন। দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে কাহারও অসুখ হইলে তাহার জন্য সাগু, বার্লি, মিছরী, বাতাসা, কাগজি লেবু প্রভৃতি পাঠাইয়া দিতেন; কখনও কখনও স্বহস্তে সাগু, বার্লি প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া দিতেন। কাহারও পীড়ার কথা শুনিলে নিজে যাইয়া সংবাদ লইতেন এবং আবশ্যক হইলে স্বহস্তে পীড়িতের শুশ্রূষা করিতেন। দরিদ্র প্রজাদের কাহারও পীড়া হইলে অন্নপথ্যের দিন প্রত্যেকের জন্য পাঁচপোয়া পুরাতন সরু চাউল, কয়েকটি কাঁচকলা, এবং কয়টি বাটামাছ পাঠাইয়া দিতেন।

দরিদ্রকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করানই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় ছিল বলিয়া মনে হয়। পূজার সময় জলপানের ভাঁড়ার তাঁহার জিম্মায় থাকিত; তিন চারিদিন তাঁহার প্রায় আহার-নিদ্রা থাকিত না। পূজাবাড়ীতে আগত পুরুষ, রমণী, বালক, বালিকা ও শিশুদের আঁচলে মুড়ি, মুড়কী চিঁড়া, খই লাড়ু, নারিকেল লাড়ু, সিড়ির লাড়ু প্রভৃতি ডালায় বা পিতলের সরায় লইয়া সমস্ত দিন নিরলসভাবে ঢালিয়া দিতেন। প্রাণকৃষ্ণের গৃহে বৎসরে কয়েকবারই ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি

ও গ্রামবাসীদের ভোজন করান হইত। ব্রাহ্মণভোজনের দিন তিনি স্বয়ং আহার্য্য প্রস্তুতের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। জ্ঞাতি ও গ্রামবাসীদের ভোজনে সাধারণতঃ অন্নকাণ্ডই হইত। ঐ দিনে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণেই সমস্ত কার্য্য হইত এবং দুই একখানা মাছের তরকারী ও পায়স তিনি স্বহস্তে পাক করিতেন। তিনি পরিবেশনেও যোগ দিতেন, পায়স এবং মিষ্টান্ন প্রায়শঃ নিজেই পরিবেশন করিতেন এবং সকলকে "আরও লও" "আরও খাও" বলিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন।

প্রাণকৃষ্ণ অনেকটুকু খাস জমি চাষের জন্য পৃথক চাষবাড়ীর ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। ধান্যরোপণের ও ধান্য ছেদনের সময় প্রজাদের একদিন করিয়া বেগার দিবার প্রথা আছে। বেগারগণের আহারের জন্য অম্বিকা দেবী প্রচুর মৎস্য,পায়স প্রভৃতি সংগ্রহ করাইতেন। সে সময়ে সবেমাত্র কলেজ-ছাড়া তাঁহার একমাত্র পুত্র সত্যকিঙ্কর একবার এই সম্বন্ধে জননীর উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শীতকালে ধান-কাটার সময় সে বৎসর প্রাণকৃষ্ণ গিরিডির কার্য্য পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। পরদিন ২৫।৩০ জন বেগার আসিবে জানিয়া অম্বিকা দেবী নায়েবকে বলিয়া পাঠাইলেন, "দশ বার সের মৎস্য এবং চারিপাঁচ সের খেজুর গুড় যেন কল্য প্রাতেই সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হয়।" সে সময়ে কৈবর্ত্তগণ ভেলার জন্য শোল সংগ্রহ করিতে মেমারী অঞ্চলে গিয়াছিল, দুই একজন বালক মাত্র ঘরে ছিল; ছোট পুকুর হইতে কোন রূপে ছোট মাছ ধরা ভিন্ন ভেলায় চড়িয়া বড় পুকুর হইতে বেশী পরিমাণ মৎস্য ধরিবার সাধ্য তাহাদের না থাকার কথা জানান হইলে অম্বিকা দেবী টানা জাল দ্বারা মাছ ধরাইতে বলেন। সত্যকিঙ্কর জননীর ঐ কথা শুনিয়া বলেন, "মা শীতকালে পুকুরে টানা জাল নামান বড় কষ্টকর। ছোট মাছ যখন কিছু পাওয়া যাবে তখন বড় মাছ নাই বা হলো? বেগাররা নেমন্তন্নে নয় যে, মাছের ঝোল পায়স না হলে তাদের খাওয়ান হবে না? তুমি মা

বেগারদের এত বেশী খাওয়াও যে, তারা বিকাল বেলায় আর কোন কাজ করতে পারে না।” এই কথা শুনিয়া অম্বিকা দেবী বলিয়া উঠিলেন, “তুই বলিস্ কি রে! গরীব প্রজারা শুধু কি তোর কাজ করতেই আসে? তারা আশা করে আসে যে, জমিদারের ঘরে একদিন পেট ভরে দুটো ভাল জিনিষ খাবে। ভরা পেটে কাজ করতে পারে না—সেদিকেও যদি নজর দিস, তা হলে আমরা গেলে তুই দেখছি প্রজা পাল্‌বি ভাল।” জননীর এই কথা শুনিয়া সত্যকিঙ্কর লজ্জিত হইয়া তখনই আবশ্যক মাছ ও খেজুর গুড় সংগ্রহ করাইয়া দিয়াছিলেন। একদিনে সমস্ত বেগার লওয়া সুবিধাজনক নহে জানিয়া এবং প্রজাদেরও অবসর ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ৫।৭ দিন ধরিয়া ১৫ হইতে ৩০ জন পর্য্যন্ত বেগার লওয়া হইত। অম্বিকাদেবীর স্নেহ ও যত্নপূর্ণ ভোজন-ব্যবস্থার লোভে দুই এক জন প্রজা একদিনের স্থলে তিন চারি দিন বেগার দিতে আসিত। গোমস্তাগণ নিবারণ করিলেও শুনিত না, সহকর্ম্মীগণ পেটুক বলিয়া ঠাট্টা করিলেও মানিত না।

শৈশবে মাতৃপিতৃহীন রাজকৃষ্ণ স্নেহশীল অগ্রজ প্রাণকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন; প্রাণকৃষ্ণও অনুজের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। দুইভাইয়ের পরস্পরের প্রতি আনুরক্তি এত বেশী ছিল যে, রাজকৃষ্ণের ১৭।১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুই এক মাসের জন্য বিচ্ছিন্ন হইতে হইলেই দুই ভাইয়ের চোখে অশ্রু ঝরিয়া পড়িত। এদিকে ভাইয়ে ভাইয়ে এই স্নেহের টান, ও দিকে সে সময়ে শুঁড়িপুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এণ্ট্রান্স স্কুলের অনস্তিত্ব, কাজেই গ্রামের পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা এবং অগ্রজের নিকট দুই একখান ইংরাজী পুস্তকপাঠে কয় বৎসর অতিবাহিত করিবার পর কিছু বেশী বয়সেই রাজকৃষ্ণকে স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়। প্রাণকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে বাঁকুড়া জেলার কুচিয়া-কোল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। সেখানে দুই এক বৎসর

অধ্যয়নের পর রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী শেহাড়শোলে এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত হইলে সেই স্কুলে লইয়া যান। রাজকৃষ্ণ রাণীগঞ্জের কারবারের গৃহে থাকিয়া শেহাড়শোল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। ক্লাশে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বৎসরই তিনি প্রাইজ পাইতেন। নানা কারণে তিনি শেহাড়-শোল স্কুল হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। পচম্বার জল-বায়ুর উত্তমত্ব এবং পচম্বা স্কুলের তদানীন্তন শিক্ষক নবীনবাবুর যোগ্যতা অবলোকন করিয়া প্রাণকৃষ্ণ সহোদরকে পচম্বা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। রাজকৃষ্ণ পচম্বা স্কুল হইতে বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ১০৲ টাকার একটী বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতায় এফ-এ পড়িতে থাকেন এবং যথাসময়ে পরীক্ষাও দেন কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তিনি আর পড়িতে ইচ্ছা না করায় প্রাণ-কৃষ্ণ তাঁহাকে গিরিডিতে গিয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে বলেন।

প্রাণকৃষ্ণের স্থাপিত গিরিডির কারবারে আশানুরূপ অর্থাগমের পথ নাই দেখিয়া তিনি পূর্ত্তবিভাগে ঠিকাদারী কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার সততা, পবিত্রচরিত্রতা ও কার্য্যকুশলতায় প্রীত হইয়া সরকারী কর্ম্মচারীগণ তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিতে এবং তাঁহাকে বেশীরূপ কার্য্য দিতে থাকেন। ঐ কার্য্যে তাহার কিছু কিছু অর্থাগমও হইতে থাকে। পরে তিনি হাজারিবাগ জেলার সরকারী জঙ্গলে অভ্রখনির কার্য্য আরম্ভ করেন; তাহাতে বিশেষ রূপ লভ্য হইতে থাকে। তৎপরে তিনি রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী কয়লার খনিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণ অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন; কৈশোরে বা যৌবনে যাঁহাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত ঠিক সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। শেহাড়শোল স্কুলে পড়ি-বার সময়ে বর্ত্তমানে আসানসোলের বিজ্ঞতম ও প্রবীণতম উকিল শ্রীযুক্ত

গিরীশচন্দ্র মণ্ডল, পচম্বাস্কুলে পড়িবার সময়ে হাজারিবাগের সুপ্রসিদ্ধ উকিল রায় বাহাদুর কালীপদ সরকার, রাঁচির বহুসম্মানিত উকিল কালীপদ ঘোষ এবং হেয়ার স্কুলের বিচক্ষণ শিক্ষক গোন্দলপাড়া-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত দেবচরিত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং যৌবনে কর্ম্মলিপ্ত থাকা অবস্থায় গিরিডির অন্যতম প্রধান উকিল পবিত্রোদার-চরিত্র শ্রীযুক্ত ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের সহিত তাঁহার যে বন্ধুত্ব জন্মে তাহা চিরদিন এরূপ অনাবিল ও অক্ষুন্ন ছিল যে, উক্ত মহোদয়গণের পরিবারের সহিত রাজকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণের পরিবারের প্রীতিকর আত্মীয়তার বন্ধন আজও অটুট রহিয়াছে। সে সময়ে রাঁচি বা হাজারিবাগ যাইতে হইলে গিরিডি হইতে মানুষে টানা পুশ্‌পুশ্‌ গাড়ীতে যাইতে হইত। রাজকৃষ্ণের পবিত্রচরিত্রতায় ও সরলোদার ব্যবহারে রাঁচি ও হাজারিবাগ-প্রবাসী অনেক বাঙ্গালীই সপরিবারে তাঁহার বাসায় উঠিতেন, তিনিও বিশেষ যত্ন ও সমাদরের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন। এই সকল কারণে রাজকৃষ্ণ ছোটনাগপুর-প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে উচ্চ সম্মানের আসন লাভ করিয়াছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণের সৌভ্রাতৃত্ব অনুকরণের বিষয়; তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা উহা রামলক্ষ্মণের সৌভ্রাতৃত্বের সহিত তুলনা করিতেন। জীবনে দুই ভাইয়ে মনান্তর দূরের কথা, কখনও মতান্তরও হয় নাই। তাঁহাদের মৃত্যুতেও ঐ ভাব পূর্ণরূপেই রক্ষিত হইয়াছিল। প্রাণকৃষ্ণ কয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া-জ্বরাক্রান্ত হইতেন; ১৩১৪ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহার সাধ্বী পত্নী অম্বিকা দেবীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি দেহ-মনে ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং ম্যালেরিয়া-জ্বরে বিশেষ-রূপেই আক্রান্ত হন। দাদার চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য পূজার সময়ে দেশে আসিয়া রাজকৃষ্ণও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। দেশের ডাক্তার ও কবিরাজগণের চিকিৎসায় বিশেষ ফল হইতেছে না দেখিয়া দুই ভ্রাতা

পূজার পর চিকিৎসার জন্য বাহিরে গমন করেন। প্রথমে কিছুদিন বর্দ্ধমানে থাকিয়া সেখানকার চিকিৎসকগণের দ্বারা চিকিৎসিত হন; কিন্তু তাহাতেও ভাল ফল না হওয়ায় তাঁহারা মাঘমাসে কয়জন পুরাতন ভৃত্য ও আত্মীয় সহ কলিকাতায় গিয়া একটি বাসা করিয়া থাকেন এবং স্যর নীলরতন সরকার ও স্যর পাড়ি লিউকিসের চিকিৎসাধীনে স্থাপিত হন। এই সময়ে রাজকৃষ্ণের বন্ধু এবং প্রাণকৃষ্ণের সহোদর-প্রতিম শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় (তদানীন্তন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক) বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন।

চিকিৎসকগণের সুচিকিৎসায় তাঁহারা ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইলেও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন না। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিরাময় হইলে প্রাণকৃষ্ণের অবশিষ্ট কয়টি দাঁত তোলাইয়া সমস্ত দাঁত বাধান হয়। ঐ দাঁত প্রথম দিন ব্যবহার কালেই তাঁহার মাড়িতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় এবং জ্বর দেখা দেয়। দাদার ঐ অবস্থা দেখিয়া রাজকৃষ্ণ এত অধিক চিন্তিত হন যে, তাঁহারও জ্বর হয়। প্রাণকৃষ্ণের জ্বর বন্ধ হইল, কিন্তু রাজকৃষ্ণ প্লুরিসিতে আক্রান্ত হইলেন। ভাইয়ের এই কঠিন রোগের চিন্তায় প্রাণকৃষ্ণেরও পুনরায় জ্বর দেখা দিল এবং তাঁহার মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইল। সেই সময়ে তাঁহাদের আত্মীয় ভ্রাতা ভূপতিনাথ সামন্ত (রূপদাস সামন্ত মহাশয়ের পুত্র) নিজের বক্ষঃ রোগের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় তাঁহাদের বাসায় আসিয়া উঠিলেন এবং একদিন পরেই গৃহ হইতে কয়েক হস্ত মাত্র দূরে ছাদের উপর প্রস্রাব করিতে গিয়া হৃদ্‌যন্ত্ররোধে তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। ভূপতির ঐরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে প্রাণকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে এবং তাঁহাদের পীড়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ঐ ঘটনার ৩।৪ দিন পরেই, ১৩১৪ সালের ২৯শে ফাল্গুন প্রাণকৃষ্ণ লোকান্তর গমন করেন। রাজকৃষ্ণ সে সময়ে

অজ্ঞান অবস্থায় থাকায় প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যু ও তাঁহার দেহ নিমতলার ঘাটে লইয়া যাওয়ার কথা জানিতে পারেন নাই। সামান্যমাত্র জ্ঞানসঞ্চার হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কেমন আছেন?" তাঁহার শুশ্রূষাকারী যখন বলিল, "তিনি ভালই আছেন," তখন তাহার স্বরে বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, দাদা চলে গেছেন।" এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি চক্ষু মুদিয়া কর জপিতে লাগিলেন। ঐ যে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন আর তাহা উন্মীলিত করিলেন না। প্রাণকৃষ্ণের দেহত্যাগের ৩০ ঘণ্টা পরে ১লা চৈত্র সৌভ্রাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তিনিও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে প্রাণকৃষ্ণের বয়স ৬২ বৎসর এবং রাজকৃষ্ণের মাত্র ৫১ বৎসর হইয়াছিল। প্রাণকৃষ্ণ তাঁহার একমাত্র কন্যা চণ্ডীদাসী দেবীকে ও একমাত্র পুত্র সত্যকিঙ্করকে রাখিয়া যান এবং রাজকৃষ্ণ তাঁহার তিন কন্যা—জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী, ননীবালা দেবী ও রাধারাণী দেবী এবং চারি পুত্র—করুণাকিঙ্কর, বগলাকিঙ্কর, কমলাকিঙ্কর ও বিমলাকিঙ্করকে রাখিয়া যান।

প্রাণকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র সত্যকিঙ্কর ১২৮১ সালের বৈশাখী বা বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার ১০।১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনিই পরিবার মধ্যে একমাত্র বালক শিশু ছিলেন বলিয়া তিনি বিশেষ আদর-যত্নে লালিত-পালিত হন। পঞ্চম বৎসরে বিদ্যারম্ভ হইলে তাঁহাকে দূরস্থিত পাঠশালায় পাঠাইতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রাণকৃষ্ণ একজন সুযোগ্য গুরুমহাশয় আনাইয়া তাঁহার গোলাবাড়ীর একটী গৃহে পাঠশালা স্থাপন করেন। সত্যকিঙ্কর প্রায় দুই বৎসর কাল ঐ শিক্ষকের নিকট থাকিয়া বাঙ্গালাভাষা, হস্তলিখন ও অঙ্ক শিক্ষা করেন। সেই সময়ে শুঁড়িপুষ্করিণী ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। সত্যকিঙ্কর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় প্রাণকৃষ্ণ তাঁহাকে রাণীগঞ্জে লইয়া যান। সেখানে কয় মাস থাকিলে তাঁহার শরীর সারিয়া যায়;
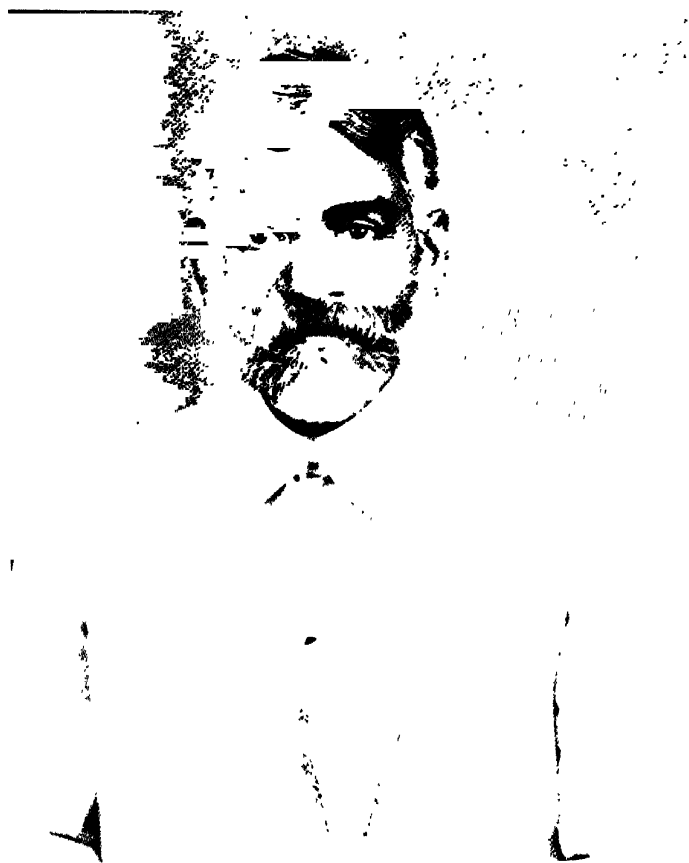
শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা বি, এ, এম, এল, সি

কিন্তু শুঁড়িপুষ্করিণীতে আসিতেই তিনি পুনরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। ঐ সময়ে সত্যকিঙ্করের জননীরও পীড়া হওয়ায় প্রাণকৃষ্ণ পত্নী ও পুত্রকে স্বাস্থ্যলাভের জন্য গিরিডিতে লইয়া যান। ঐ সময়ে দেড় দুই বৎসরকাল সত্যকিঙ্করের নিয়মিত শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। প্রাণকৃষ্ণ সব সময়েই গিরিডিতে থাকিতে পাইতেন না, কার্য্যান্তরোধে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইত। যখন গিরিডিতে থাকিতেন, তখন অবসর-সময়ে পুত্রকে আখ্যানমঞ্জরী, পদ্যপাঠ প্রভৃতি বাঙ্গালাপুস্তক এবং ইংরাজী ফাষ্টবুক পড়াইতেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা লিখাইতেন। জননীর প্রেরণায় তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইবার আগ্রহে সত্যকিঙ্করের ৬।৭ বৎসর বয়সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত-পাঠে অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। ঐ দেড় দুই বৎসরের মধ্যে অবসর পাইলেই ঐ দুই পুস্তক আগ্রহসহকারে পাঠ করিতে করিতে আখ্যায়িকাগুলি তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল এবং বাঙ্গালাভাষাতেও কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিয়াছিল।

সে সময়ে গিরিডিতে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম ছিল। যে কয়জন বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহাদের পুত্রগণের শিক্ষার জন্যও কোন বিদ্যালয় ছিল না। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব তীব্ররূপে অনুভূত হওয়ায় রেলের কর্ম্মচারী বিদ্যোৎসাহী পূর্ণচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালীগণের এবং কয়জন বিহারী ভদ্রলোকের সহযোগিতায় গিরিডি ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র খাপ্‌রার গৃহে অল্প কয়জন ছাত্র লইয়া একটী মাইনর স্কুলের পত্তন হয়। সত্যকিঙ্কর ঐ স্কুলের আদি ছাত্রগণের মধ্যে একজন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, পাঠে অনুরাগ এবং রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকাগুলি আয়ত্ত থাকা হেতু তিনি শিক্ষকগণের প্রিয় ছিলেন। দেড় দুই বৎসর পরে পচম্বার স্কুলটীর এরূপ অবনতি ঘটে যে, তাহার পরিচালনা সুকঠিন হইয়া উঠে। এই সুযোগে গিরিডি মাইনর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ

গিরিডিতে একটী এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপন করেন। প্রথমে স্কুলগৃহ না থাকায় শ্বেতাম্বরী জৈন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশালার সুদীর্ঘ চালাগুলিতে স্কুল হইত, পরে বর্ত্তমান স্কুলগৃহ নির্ম্মিত হইলে ঐ গৃহে স্কুল হইতে থাকে। অল্পদিন পূর্ব্বে স্থাপিত মাইনর স্কুলের ছাত্রগণই ঐরূপে স্থাপিত এণ্ট্রান্স স্কুলের প্রথম ছাত্র। সত্যকিঙ্করও ঐ কারণে ঐ স্কুলের একজন প্রথম ছাত্র এবং স্কুলের নিয়মিত ছাত্রগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ঐ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার টেষ্ট পরীক্ষার পরেই তাঁহার স্বল্পবিরাম জ্বর হইয়া ২৪ দিন পরে জ্বরত্যাগ হয় এবং এক মাস পরে তাঁহাকে অন্নপথ্য দেওয়া হয়। ডিবিজনাল স্কলারশিপ পাইবার আশা থাকায় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে সে বৎসর পরীক্ষা দিতে নিষেধ করেন। সে সময়ে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা মিলিত প্রদেশ থাকায় গিরিডি স্কুলের ছাত্রগণ বৰ্দ্ধমান কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারিত এবং ঐ বৎসর পরীক্ষার্থী সত্যকিঙ্করের সুবিধার জন্য হেডমাষ্টার বৰ্দ্ধমান কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন। গিরিডি হইতে শুঁড়িপুষ্করিণী যাইতে হইলে বৰ্দ্ধমান হইয়াই যাইতে হইবে, এই ভাবিয়া সত্যকিঙ্কর ঐরূপ দুর্ব্বল অবস্থাতেই পরীক্ষা দিতে মনস্থ করেন। বেঞ্চে বসিয়া উত্তর লিখিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতেছে দেখিয়া একজন গার্ড তাঁহার জন্য একখান চেয়ারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তিনি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও পাঁচ সাত নম্বর কম হওয়ায় ডিবিজনাল স্কলারশিপ পান নাই, রাঁচি স্কুলের একজন ছাত্র তাহা পাইয়াছিলেন।

সত্যকিঙ্কর ১৮৯১ সালে ঐরূপে বৃত্তি না পাইয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য কতকটা মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইবার পূর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে তদানীন্তন জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি করিয়া দেন। স্কুলে পড়িবার সময় হইতে তাঁহার বাঙ্গালাসাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল।

কলিকাতায় কলেজের পাঠে বেশী মনোযোগ না করিয়া তিনি অচির-প্রতিষ্ঠিত চৈতন্য লাইব্রেরীতে বাঙ্গালা পুস্তক-পাঠেই বেশী সময় কাটাইতেন এবং নিত্যই দুই একখানি পুস্তক গৃহে আনিয়াও পড়িতেন। এ জন্য কলেজে ভাল ফল হয় নাই। ১৮৯৪ সালে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৯৬ সালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি বি-এ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। ১৮৯৭ সালে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পুনরায় জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে আইসেন এবং ১৮৯৮ সালে ঐ কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর তিনি ঐ কলেজে ইংরাজীতে এম-এ এবং রিপন কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন এবং উভয় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। নানা কারণে তিনি ঐ দুই পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। তাঁহার বিলাত যাইবার বলবতী ইচ্ছা ছিল কিন্তু পিতামাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইতে স্বীকৃত হন নাই।

ঐ ভাবে কলেজ ত্যাগ করিবার পর তিনি পিতা ও পিতৃব্যের নিকট তাঁহাদের অভ্র ও কয়লার খনি ব্যবসায়ে ও জমিদারী-ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করেন। ঐ সময়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠেই তিনি অধিক সময় কাটাইতেন। অশ্বারোহণে এবং ছিপ্ ও বন্দুক দ্বারা শিকারেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঐরূপ অবস্থায় তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের ৩০ ঘণ্টা ব্যবধানে মৃত্যু হয়। রাজকৃষ্ণের পুত্রগণ তখনও কিশোরবয়স্ক, কাজেই সমস্ত বিষয়ের ভার সত্যকিঙ্করকেই বহন করিতে হয়। সংসারে প্রবেশ করিয়াই তাহার যে মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল তাহা বড়ই অপ্রীতিকর। প্রাণকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ যে সকল নিঃসম্বল লোককে হাতে ধরিয়া নিজেদের কোন কোন কারবারের অংশীদাররূপে বা কর্ম্মচারীরূপে উন্নতির পথে স্থাপিত করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই কেহ কেহ সত্যকিঙ্করের ও রাজকৃষ্ণের

পুত্রগণের বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একই সময়ে বিষ্ণুপুর, বাকুড়া, বর্দ্ধমান, গিরিডি, হাজারিবাগ, রাঁচি, আলিপুর, হাইকোর্ট প্রভৃতি আদালতে অনেকগুলি মামলা চলিতে থাকে। ঐ সময়ে সত্যকিঙ্কর একদিন এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "মামলা আমার ধাতে সইবে না বলে উকীল হলাম না, এখন দেখি ভগবান আমার ঘাড়েই মামলার মস্ত একটা বোঝা চাপালেন।" আর এক বন্ধুকে একবার হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "এবার সেন্সাসে লেখাব মামলা করে বেড়ানই আমার পেশা।" মামলায় বিতৃষ্ণা থাকিলেও আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে ৫।৬ বৎসর বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

ঐ সকল মামলা চলিবার সময়েও সত্যকিঙ্কর অভ্র ও কয়লা-খনি কারবারের ও জমিদারীর অনেক উন্নতি সাধন করেন এবং অনেকগুলি নূতন তালুক অর্জ্জন করেন। ঐ সময়ে কয়েকজন আত্মীয়রূপীর চক্রান্তে ১৩২১ সালে তিনি পিতৃব্যপুত্রগণের সহিত পৃথকান্ন হইতে বাধ্য হন। তখন দুই পরিবারই তাহাদের গিরিডির বাড়ীতে থাকিতেন। ১৩২৩ সালের পৌষ মাসে বাকুড়া-দামোদর রেল লাইন খোলা হয়। উহা শুঁড়িপুষ্করিণী হইতে অর্দ্ধ মাইল মাত্র ব্যবধান দিয়া গিয়াছে। বহু স্মৃতি-বিজড়িত পল্লীভবনটি সত্যকিঙ্করের বড়ই প্রিয়; উহার সহিত যোগরক্ষা করিয়া উহার উন্নতি সাধন করা তাঁহার প্রাণের কামনা। কিন্তু পল্লীবাসে থাকিলে কারবারের পর্য্যবেক্ষণ হয় না, ছেলেদের শিক্ষা হয় না, পরিজনেরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কর্ম্মশক্তির বাধক হয় দেখিয়া তিনি গিরিডি ও বর্দ্ধমানেই থাকিতেন; বর্দ্ধমানে একটি গৃহও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে শুঁড়িপুষ্করিণী মাত্র ৭ ক্রোশ দূরে হইলেও পথ সুগম নয় বিশেষতঃ বর্ষাকালে; কারণ মধ্যে দামোদর নদ ব্যবধান। বি, ডি, আর রেল লাইন হওয়ায় বাঁকুড়া হইতে শুঁড়িপুষ্করিণী সুগম হইয়াছে; বাঁকুড়া হইতে তাঁহার মানভূম জেলার

কয়লা-খনি এবং হাজারিবাগ জেলার অভ্রখনিও সহজগম্য হইয়াছে; এদিকে বাঁকুড়ার জলবায়ু এবং স্কুল-কলেজও ভাল; এই সব ভাবিয়া বি, ডি, আর লাইন খুলিবার কয় মাস পরেই বাঁকুড়ায় একটি গৃহ ক্রয় করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাস হইতে তাহাতে সপরিবারে বাস করিতেছেন।

বাকুড়ায় আসিবার পর হইতে কর্ম্মিত্ব ও চরিত্রগুণে তিনি জন-সাধারণের ও সরকারী কর্ম্মচারিগণের শ্রদ্ধা-সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জনমঙ্গলকর অনেকগুলি কার্য্যের সহিতই তাঁহার সংস্রব রহিয়াছে। তিনি বাঁকুড়া ওয়েশলিয়ান কলেজের ও জেলাস্কুলের গভার্ণিং বডির মেম্বর, মিউনিসিপালিটির সদস্য, কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের অন্যতম ডিরেক্টর, বোরষ্টল ইনষ্টিটিউট এবং বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সব-জেলের পরিদর্শক, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বিষ্ণুপুর হইতে নির্ব্বাচিত সভ্য।

বংশানুক্রমিক ব্যবসায়বুদ্ধিও সত্যকিঙ্করের মধ্যে সুপরিস্ফুট; বাকুড়া সহরে বাঙ্গালীর দ্বারা ধান্যকল-স্থাপনে তিনিই পথপ্রদর্শক। রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরে দ্বারকেশ্বর নদীতীরে তাঁহার গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺ শ্রীধর জীউর নামে তিনি একটি ধান্যকল-স্থাপন করিয়াছেন; ঐ "শ্রীধর রাইস মিল" লাভজনক হইয়া অন্য কয়জন বাঙ্গালী বণিককে ধান্যকল-স্থাপনে উৎসাহিত করিয়াছে। কৃষির উন্নতিসাধনেও তিনি বিশেষ চেষ্টিত; শুঁড়িপুষ্করিণীতে তাঁহার একটি চাষ-বাড়ী আছে; "আনন্দ-কুটীর" নামক যে বাড়ীতে বাঁকুড়ায় তিনি সপরিবারে বাস করেন তৎসংলগ্ন ৮০।৯০ বিঘা কঙ্করময় ভূমিতে তিনি কয়টি কূপ ও দুইটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া, ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া, নানাজাতীয় ফল-ফুলের বাগিচা এবং উর্ব্বর সবজিবাগ তৈয়ার করিয়াছেন এবং সম্প্রতি বাঁকুড় হইতে ৭।৮ মাইল উত্তরে বাঁকুড়া-রাণীগঞ্জ রাস্তার ধারে কয়েক

শত বিঘা জঙ্গল ভূমি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে একটি আদর্শ কৃষিশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

সত্যকিঙ্কর আনুষ্ঠানিক হিন্দু এবং গুরুবাদে বিশ্বাসী। তিনি সপরিবারে মহাপ্রভাবশালী মহাত্মা বাবা গম্ভীরানাথজীর চরণাশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শুঁড়িপুষ্করিণীতে শ্রীশ্রী৺ দুর্গাপূজার সময় তিনি প্রায়ই দিবসত্রয় সংযত থাকিয়া চণ্ডীপাঠ করেন। গীতা ও উপনিষদ পাঠে তিনি অনেক সময় ব্যয়িত করেন। তিনি উপনিষদোক্ত অদ্বৈতমতাবলম্বী হইলেও অধিকারিভেদ এবং প্রতীকোপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। প্রতীকোপাসনার সমর্থনকল্পে তাঁহার মুখে

"চিন্ময়াস্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং হিতার্থং ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা॥"

ও

"এবং গুণানুসারেন রূপানি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥"

বাক্যদ্বয় উচ্চারিত হইতে শুনা যায়।

বাল্যকাল হইতে সত্যকিঙ্করের বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ। ১২/১৩ বৎসর বয়সে তিনি কবিতা ও প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন। প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাতে তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধাদি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাঁহার লিখিত "মহাভারতে অনুশীলন-তত্ত্ব" সুধীগণের মনোরঞ্জনে সক্ষম হইয়াছে।

মোগলমারির দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত পাঁইটাগ্রামের প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত দত্ত-বংশে সত্যকিঙ্করের বিবাহ হয়। তাঁহার গুণবতী সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী আশুতোষ দত্ত মহাশয়ের কন্যা। নয় বৎসর বয়সে সপ্তদশবর্ষীয় সত্যকিঙ্করের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

স্নেহশীলা অম্বিকা দেবী একমাত্র পুত্রবধূকে ছাড়িয়া থাকিতে কষ্টবোধ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে শৈশবাবধি প্রায় সমস্ত জীবনই শ্বশুরালয়ই কাটাইতে হইয়াছে। অম্বিকা দেবীর স্নেহ-যত্নে পালিতা বলিয়া পুত্র-বধূতেও শ্বশ্রূদেবীর সহৃদয়তা, দানশীলতা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সংক্রামিত হইয়াছে। বাঁকুড়ার বাড়ীর অনতিদূরে যে সকল দরিদ্রলোক বাস করে তাহাদের অসুখের সংবাদ পাইলেই তিনি সাগু, বার্লি, কাগজি লেবু প্রভৃতি দিয়া থাকেন এবং অন্নপথ্যের দিন নিজগৃহে পাচক ব্রাহ্মণের দ্বারা পথ্য তৈয়ারী করাইয়া পাঠাইয়া দেন। বিজয়ার দিন বাঁকুড়ার যে পল্লীতে সত্যকিঙ্কর বাস করেন সেই পল্লীর লোহার, খয়রা, বাউরী প্রভৃতি জাতির স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেই তাহাদের "মা"কে বিজয়া-প্রণাম করিতে আইসে, বিনোদিনী দেবীও সকলকে মিষ্টান্নাদি দিয়া স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন।

বিনোদিনী দেবী অত্যন্ত সন্তানবৎসলা এবং পতিপরায়ণা, পুত্র-কন্যাদের লালন-পালনের ভার দাসদাসীর উপর অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। পুত্রকন্যার লালন-পালনের জন্য রাত্রির পর রাত্রিজাগরণবশতঃ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি রক্ত-পিত্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘ আট নয় বৎসর কাল এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, হেকিমী প্রভৃতি চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন থাকেন। সেই অর্দ্ধমৃত শয্যাশায়িত অবস্থাতেও তিনি স্বামী ও পুত্র-কন্যাগণের আহারাদির জন্য এরূপ ভাবে লক্ষ্য রাখিতেন যে, পাচক ব্রাহ্মণ ও দাসদাসিগণকে সমস্ত কার্য্য তাঁহার আদেশক্রমেই করিতে হইত। পরিবারে দাস-দাসী ও পুত্র-কন্যার মধ্যে আহার্য্যের বিশেষ পার্থক্য নাই; তাঁহার ব্যবস্থায় দাসদাসীরা পর্য্যন্ত দধি দুগ্ধ পাইয়া থাকে। বাঁকুড়ায় আসিয়া তিনি মহিলা সমিতিতে যোগ দিয়াছেন এবং সমিতির যাবতীয় জনমঙ্গলকর কার্য্যে তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

তিনি হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী, নিত্য পূজা ও জপ না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। তাঁহার মিষ্টবাক্য ও উদার চরিত্রগুণে তিনি আত্মীয়-পরিচিত সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

সত্যকিঙ্করের ছয় পুত্র ও তিন কন্যা। কন্যাত্রয় (শ্রীমতী মঞ্জুমালিনী দেবী, শ্রীমতী পঙ্কজবাসিনী দেবী ও শ্রীমতী শান্তিভাষিণী দেবী) সকলেই বিবাহিতা ও সন্তানবতী। প্রথম জামাতা শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রনাথ সামন্ত, বর্দ্ধমান রায়নার জমিদার ; তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে ওভারসিয়ারের পরীক্ষা দিয়া নিজেদের বিষয় ও ব্যবসারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। দ্বিতীয় জামাতা নাসিগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোজমোহন রায় বি, এস্ সি, বি, এল, কিছুদিন কলিকাতা পুলিস কোর্টে ওকালতি করিয়া ঐ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করেন। তৃতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন রায় বি, এস্ সি, দ্বিতীয় জামাতার একান্নবর্ত্তী পিতৃব্যপুত্র ; তিনি তাঁহাদের বর্দ্ধমানের ব্যবসায় পরিচালনা করেন।

সত্যকিঙ্করের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেশবিজয় বি-এ পাশ করিয়া শ্রীধর ধান্যকল পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার বিবেচনা-পূর্ণ কর্ম্মিত্বে কলটি সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছিল। এক্ষণে তিনি হাজারিবাগ জেলার কোডারমায় অভ্রখনির কার্য্যের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্রগুণে অন্যান্য অভ্রখনির মালিকগণ (অধিকাংশই ইংরাজ) তাঁহাকে Kodarma Mica Mining Association-এর Honorary Secretary-পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন নাই। Whitley Commissionকে অভ্যর্থনা করিবার এবং কমিশনের শ্রমিক সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের সাহায্য করিবার ভার ঐ Asscciation এবং হাজারীবাগের ডেপুটী কমিশনার দেবেশ-

বিজয়ের উপর অর্পণ করেন এবং তিনিও তাহা বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন।

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশবিজয় দুর্ভাগ্যক্রমে জন্মজড়।

তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশবিজয় বাঁকুড়া কলেজ হইতে I. A. পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া পুনঃ কলেজ-প্রবেশের প্রাক্কালেই দেবেশবিজয়কে কোডারমা অভ্রখনিকার্য্যের ভার লইতে হয়; সেইজন্য সত্যকিঙ্কর রমেশবিজয়কে আর কলেজে না দিয়া শ্রীধর ধান্যকলের কার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত করিয়াছেন; তিনিও বিশেষ যোগ্যতার সহিত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত ধনেশবিজয় বাঁকুড়া কলেজে বিএ অধ্যয়ন করিতেছেন।

পঞ্চম পুত্র শ্রীমান রণেশবিজয় এবং ষষ্ঠ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান পরেশবিজয় বাকুড়া জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করে।

রাজকৃষ্ণের পুত্রগণ এক্ষণে গিরিডিতেই বসবাস করেন; তবে শুঁড়িপুষ্করিণীর সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করেন নাই। তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত এবং নিজেদের জমিদারী ও ব্যবসায়কার্য্য পরিদর্শন করেন। জ্যেষ্ঠ করুণাকিঙ্করের অতি অল্পবয়সেই মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান। দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত বগলাকিঙ্করের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। তৃতীয় শ্রীযুক্ত কমলাকিঙ্কর অধিকাংশ সময় সপরিবারে কোডারমায় থাকিয়া অভ্রখনিকার্য্য পরিচালনা করেন; তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা। কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিমলাকিঙ্কর অধিকাংশ সময় গিরিডিতে থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে কোডারমায় গিয়া অভ্রখনিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। বন্দুক দ্বারা শিকারে তাঁহার বিশেষ আনন্দ। তিনি গিরিডি মিউনিসিপ্যালিটির একজন নির্ব্বাচিত সদস্য। তাঁহার তিনপুত্র ও এক কন্যা।

তুলারামের পুত্র মহাভারতের এবং ভগীরথের পুত্র হরিনারায়ণ ও হৃদয়নাথের বংশধরগণ অনেকগুলি গৃহস্থে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শুঁড়িপুষ্করিণীতে বাস করেন, তবে কেহ কেহ সত্যকিঙ্কর ও বগলাকিঙ্কর প্রভৃতির অভ্রখনিতে কার্য্য করিবার জন্য কোডারমায় থাকেন; তাঁহাদের পরিবারবর্গ শুঁড়িপুষ্করিণীতেই থাকেন।

কুড়ারামের বংশলতা
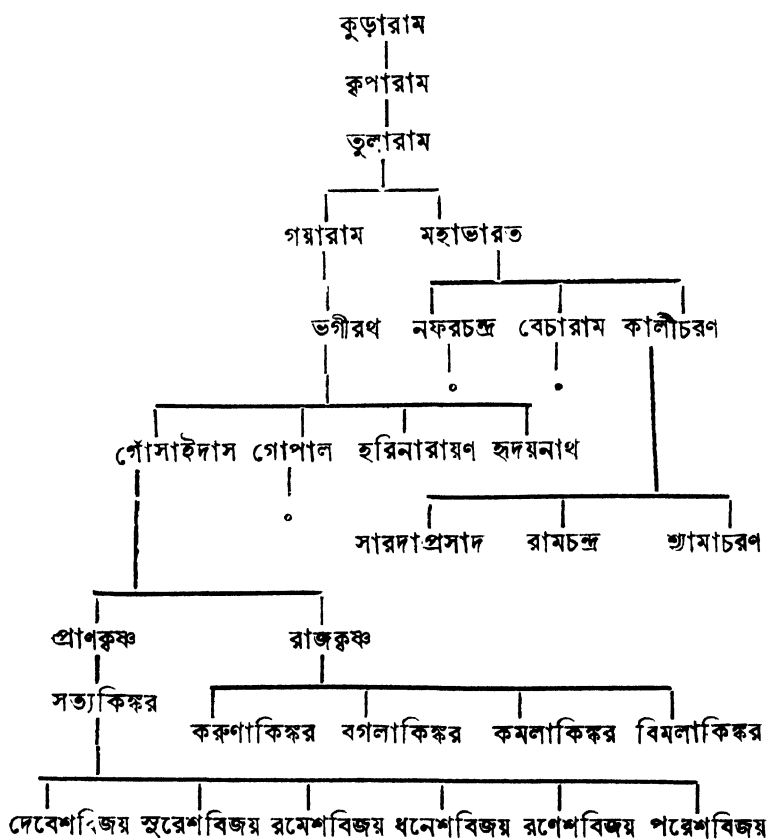
স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত

(বাগবাজার)

কলিকাতার অন্তর্গত বাগবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয় ইহ-সংসারে মহাপ্রতিপত্তিশালী ও বিদ্বান্ বলিয়া যে খ্যাতনামা ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী, ভক্তি-রসাপ্লুত সঙ্গীতসমূহ অনেকের কণ্ঠেই গীত হইতে শুনা যায় ও তাঁহার দয়া-ধর্ম্মপরায়ণ জীবন অনেকের নিকট বিশেষ আদরণীয় ছিল জানা যায়। লক্ষ্মীনারায়ণবাবু হাবড়া জেলার ব্যাঁট্রা গ্রামের উত্তরাংশের এক অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ ঠাকুরদাস দত্ত। ঠাকুরদাস দত্ত মহাশয়ের নাম সেকালকার সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। তিনি সুকবি, পাঁচালী-যাত্রা-নাটকাদি-রচয়িতা ও গীত-কর্ত্তা বলিয়া বঙ্গদেশের বহু স্থানের অধিবাসিগণের নিকট সমাদৃত ও সম্মানিত ছিলেন।

প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ৺ লোকনাথ দাস ঠাকুরদাসের রচিত তিনটী পালা 'কমলে-কামিনী', 'কলঙ্কভঞ্জন' ও 'নলদময়ন্তী' গান করিয়া বহু প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

"এই যে ছিল, কোথায় গেল
কমলদলবাসিনী,"

ও

"তোর রাজার কি রাজ্য,
করিস তার কি মাৎসর্য্য"

প্রভৃতি সেকালের সুবিখ্যাত গীতগুলি কবি ঠাকুরদাসের রচিত।

'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,' 'সাহিত্য,' 'বঙ্গভাষার লেখকগণ,' 'সাহিত্য-সেবক' ও 'যমুনা' নাম্নী সাময়িক পত্রিকাসমূহে ও 'চরিতাভিধানে' কবি ঠাকুরদাসের জীবনী ও কবি-প্রতিভার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনন্যকর্ম্মী, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"কবি ঠাকুরদাস কীর্ত্তি-মন্দিরে পাঁচালী-ওয়ালা নামে সুপ্রতিষ্ঠ থাকিলেও তাঁহাকে কেবলই পাঁচালি-কার বলিতে পারা যায় না। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যতটা বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের ধারণা এই যে, তাঁহাকে কেবল পাঁচালি-কর্ত্তা বলিলে তাঁহার প্রভূত কবিত্ব-শক্তির একাংশের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। তিনি "হরু ঠাকুরাদির" ন্যায় গীত-কর্ত্তা, দাশরথি রায়ের ন্যায় পাঁচালী-কর্ত্তা এবং গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির ন্যায় যাত্রার সাট-(পালা) রচয়িতা ছিলেন। তাঁহাকে জানে না, তাঁহার নাম শুনে নাই, এরূপ লোকের মধ্যে কিন্তু শত সহস্র লোক তাঁহার গীতি-মালা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কতকগুলি কবিতা যেমন বাঙ্গালার অনেকাংশে প্রবাদ-বাক্য-রূপে চলিয়া গিয়াছে, সেইরূপ কবি ঠাকুরদাসেরও কতকগুলি গান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিতেছে। অথচ কে তাহার রচয়িতা, তাহা অনেকেই জানে না। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্য-ভাণ্ডারে এখন অনেকগুলি মুদ্রিত গীত-সংগ্রহ পুস্তক দেখা যায়, তাহাদের অনেকের মধ্যেই কবি ঠাকুরদাসের গীতমালা সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কোনটীতে রচয়িতার নাম নাই। "সঙ্গীত-মুক্তাবলী"তে আবার ঠাকুরদাসের গান অপরের নাম সংযোগে প্রকাশিত হইয়াছে। (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩০৫ সাল)।

"কলিকাতার পশ্চিমে গঙ্গার পারে ব্যাঁটরা একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরাংশে দত্ত মহাশয়দিগের বাস। কবির

পৌত্র পর্য্যন্ত গণনা করিলে এই গ্রামে ইঁহাদের বাস ২০শ পুরুষ, প্রায় ৫০০ বর্ষকাল। ঠাকুরদাস কোন্ সালে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু মৃত্যুর তারিখ ২২এ বৈশাখ, ১২৮৩ সাল। কবি ঠাকুরদাস দাশরথি রায়ের সমসাময়িক, কিন্তু তিনি দাশরথি রায় অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং দাশরথির পূর্ব্বেই কবিখ্যাতি লাভ করেন। ঠাকুরদাসের পিতৃপিতামহের অবস্থা মন্দ ছিল না। বাড়ীতে খড়ো চণ্ডী-মণ্ডপ হইলেও "বারো মাসে তের পার্ব্বণ" হইত। কবির পিতা তখনকার ফোর্ট উইলিয়মে কেরাণীগিরি করিতেন। কবি ঠাকুরদাস ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল।" (সাহিত্য ১৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা)।

লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয় ১২৬৮ সনের পৌষ মাসে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির-পুণ্য বাসরে ব্যাটরা গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দুই ভাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ সুকবি ও নানা গীত-রচয়িতা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গীতাবলী 'উপাসনা'য় শ্যামাচরণের কয়েকটী ভক্তি-রসাত্মক সদ্ভাব পূর্ণ গীত প্রকাশিত হইয়াছে। পিতা ঠাকুরদাস সঙ্গীতামোদে পিতৃপরিত্যক্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি ব্যয় করিলেও পুত্র দুইটিকে মোটামুটি শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নাই। লক্ষ্মীনারায়ণ ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ কলিকাতায় কিছুকাল ইংরাজী ও বাঙ্গালা পড়িয়া চাকুরি গ্রহণ করেন। শ্যামাচরণ কলাছড়া-নিবাসী ৺ চণ্ডীচরণ বসু মহাশয়ের কন্যা বিহারী-মণির সহিত পরিণীত হন। লক্ষ্মীনারায়ণ আন্দুলগ্রামের নিকটবর্ত্তী কোলড়া-গ্রাম-নিবাসী পুরাতন বসু বংশের ৺ বেণীমাধব বসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যা ত্রিপুরা-সুন্দরীকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ প্রথমে হাবড়ার ই, আই, রেলওয়ে (E. I. Railway) আফিসে কার্য্য করিয়া পরে জামালপুরের Loco Office-এ কার্য্য করিতে থাকেন। কিছু

দিনের জন্য হাবড়া জেলার নানা গ্রামের ব্যবসায়ের Asst. License Officer হইয়াছিলেন। পরে কিছুদিনের জন্য ই, আই, রেলওয়ের কলিকাতাস্থ এজেন্ট আফিসে চাকরি করেন। শেষে তিনটী পাটের মহাজনের অফিসে নানা কার্য্য ও ঠিকাদারী (Contractor) কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার জীবনাবসান হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ পিতার আদেশে ভ্রাতার সহিত পৃথক হইয়াছিলেন। পৃথক্ হইলেও লক্ষ্মীনারায়ণবাবু জ্যেষ্ঠের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ও অনুরাগী ছিলেন এবং পিতাকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। কিন্তু মাতৃ-ভক্তিতে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন। চাকুরীহীন অবস্থাতেও লক্ষ্মীনারায়ণ বিশেষ সমারোহ করিয়া প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া বংশ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ 'মেসার্স ট্যাম-ভাকো' কোম্পানীর পাটের গুদামে গুদাম সরকারের (Godown Superintendent) পদ প্রাপ্ত হন। সৎকার্য্যে ও সদনুষ্ঠানে তিনি চিরকালমুক্ত হস্ত ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার আহার, বেশভূষা ও আলাপ সকলই সংযত ও নিয়মিত ছিল। ১৮৭৯।৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লক্ষ্মীনারায়ণবাবু "গোলাবাড়ী প্রেস হাউস" নামক পাটের কলের ছোট বাবু, বড় বাবু ও ঠিকাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার শেষ জীবনে তিনি গোলাবাড়ী প্রেস হাউসের কার্য্য ও তৎসঙ্গে মেসার্স রালি ব্রাদার্সের কাশীপুর পাটের কলের 'রাণী প্রেসে'র ঠিকাদার রূপে (Contractor) ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হন। এখানেও তিনি সুনামের সহিত কার্য্য করিয়া উভয় স্থানে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণবাবু মধ্য-জীবনে চন্দননগর—ব্যাজ্ড়া-নিবাসী কুলগুরু ৺গুরুচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট ইষ্ট-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি খাঁটি হিন্দু ছিলেন; বাটীতে সনাতন হিন্দুত্বের ধারা বজায় রাখিয়া হিন্দু আদর্শে

পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতেন। তিনি দেবদেবীর ভক্ত ছিলেন; কর্ম্মাবসানে ভগবানের নামকীর্ত্তন শুনিয়া সময় কাটাইতেন। তাঁহার তিন পুত্র—(১) শ্রীযুত হরিপদ দত্ত (ইনি গোলাবাড়ী প্রেসে পিতার কার্য্য ১৯২৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত চালাইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।) (২) ৺নগেন্দ্রনাথ দত্ত (২১ বৎসর বয়সে একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন (৩) শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত (ইনি কাশীপুরের রালি ব্রাদার্সের কণ্ট্রাক্টরী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন)। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু মধ্য বয়সে বিপত্নীক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন ও স্নেহে পুত্রগণ কখনও মাতৃ-স্নেহের অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। তিনি কর্ম্ম-স্থানের অতি নিকটে রামকান্ত বসুর ১ম লেনে একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া যান। তাঁহার দেহাবসানের পর স্থানীয় অধিবাসিগণের আবেদনে লেনটী "লক্ষ্মী দত্ত" লেন নামে পরিবর্ত্তিত হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। "উপাসনা" নামক পুস্তকে তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ সে সমস্ত সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এ স্থলে কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি:—

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু নিজের অন্তিমকালের জন্য রোগশয্যায় নিম্নলিখিত গীতটি রচনা করেন এবং এই গানটি শুনিতে শুনিতে গঙ্গা-জলে দেহ ত্যাগ করেন।

বড় সাধ হয় মা মনে,
আঁখি মুদে হেরি তোমায় হৃদি-শ্মশানে।
মানসেতে পুষ্প-চয়ন, মিশাইয়ে ভক্তি-চন্দন,
প্রেম-বারি রেখে গোপন দিব চরণে॥
জ্ঞানাগ্নিরে জ্বালাইব, অভিমান আহুতি দিব,
বিবেক-অসিতে ছেদিব রিপু ছ'জনে॥

লক্ষ্মী গেলে অন্তর্জলে তুমি দাঁড়াইবে কূলে,
প্রাণ যাবে "জয় কালী" ব'লে হেরে নয়নে ॥

উপরোক্ত সঙ্গীত-পাঠেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ কিরূপ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু ঘটিলে বহু সংবাদপত্রে তাহার গুণাবলী-সম্বলিত শোক-সংবাদ প্রকাশিত হয়। পল্লীবাসী মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ লক্ষ্মীনারায়ণের অন্যতম বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র 'উদ্বোধন' নামক রামকৃষ্ণ মিশনের মুখ-পত্রে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিকৃতির নিম্নে উপরোক্ত গীতটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"উপরোক্ত গানটী শয্যাগত অবস্থায় আমার একজন বন্ধু রচনা করেন। রচনার কয়েকদিন পরে (২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ সাল) জাহ্নবী-তীরে জনৈক (আত্মীয়) গায়কের মুখে গানটী শুনিতে শুনিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি একজন সংসারী, সকল কার্য্যেই তাঁহার সুবন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়া জীবন-বিসর্জ্জন দেওয়া একমাত্র ইষ্টদেবের মহিমা। এরূপ মৃত্যু-ঘটনা শুনিলে মৃত্যুর ভয় দূর হয়। সেই নিমিত্তই ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করিলাম। আমার স্বর্গগত বন্ধু সংসারে বিশেষ খ্যাতনামা ছিলেন না। কিন্তু এ পরীক্ষা-স্থলে তিনি গুরুকৃপায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।" (উদ্বোধন)

শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত

ইনি লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এমন অমায়িক সরল-চিত্ত সদালাপী সুজন ব্যক্তি আজকালকার যুগে বিরল। ইঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা অপূর্ব্ব। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা করা তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে নিজ গৃহে পূজার্চ্চনা-পরিচালন তাঁহার ব্যবস্থা। এরূপ নিষ্ঠা দেখা যায় না। তাঁহার সহিত যে কেহ একবারমাত্র পরিচিত হইয়াছেন তিনিই তাঁহার

স্বর্গীয় গুণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত

সৌজন্যে মুগ্ধ। তিনি পরদুঃখকাতর, দয়াশীল, হৃদয়বান, পল্লীবাসিগণের সম্মাননীয় বন্ধু—তাঁহার সখ্যতা সকলের বাঞ্ছনীয়। এমন আদর্শচরিত্র হিন্দুসন্তান এখনকার কালে কচিৎ পাওয়া যায়—৪১ বৎসর যোগ্যতার সহিত বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুশৃঙ্খলে সমাপ্ত করিয়া ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সুবৃহৎ সংসারের ভার ও দায়িত্ব এখনও ইঁহার স্কন্ধেই ন্যস্ত আছে। আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই ইঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করেন। সকলের প্রতি ইঁহার সমান দৃষ্টি ও প্রেম স্নেহ এবং দয়া ব্যতীত অন্য কিছু নাই।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (এম্, আর্, এ, এস্)

লক্ষ্মীনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বনামখ্যাত সুধী। পিতার যাবতীয় গুণগ্রামের তিনি অধিকারী হইয়াছেন। দেশের বহু সাহিত্যিক ও হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত কিরণবাবু বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি নানা সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের তিনি সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও কার্য্যকারী সদস্য। কলিকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটীর তিনি দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী সম্পাদক থাকিয়া বিগত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিরণবাবুর সম্পাদকতা-কালে এই সোসাইটীর আয়োজনে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া সাধারণ ধর্ম্ম সভা হইত, ঐসকল অধিবেশনে বহু মনীষী অধ্যাপক ও ধর্ম্মাচার্য্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন এবং এই সোসাইটীর পুস্তকালয়ে বহু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বিপন্ন ছাত্রগণের সাহায্য ও আর্ত্তনারায়ণের সেবারও কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছিল। মাতৃভাষা ও স্বধর্ম্মের প্রতি সবিশেষ অনুরাগী হইয়াও তিনি স্বজাতির সেবায়ও একনিষ্ঠ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহিত তিনি প্রথম হইতেই সংশ্লিষ্ট। কয়েক বৎসর ঐ সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যরূপে

নির্ব্বাচিত হইয়া পরে অন্যের সহ চারি বৎসর অন্যতম মূল সম্পাদকপদে ব্রত হয়েন এবং পরে বিগত ১৩২৯ ও ১৩৩০ সালে তিনি একক ঐ সভার প্রধান সম্পাদকের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। ১৩৩১ ও ১৩৩২ সালে ঐ সভার মুখপত্র 'কায়স্থ পত্রিকা'র তিনি সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৩৩৬ সাল হইতে আবার তিনি ঐ পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐ সালেই তিনি রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সোসাইটীর মুখ-পত্র 'বিশ্ববাণী'র সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। কিরণবাবু সুকবি, সুবক্তা ও সুলেখক। অনেক বড় বড় সাহিত্য, সামাজিক ও ধর্ম্ম সভায় তাঁহার রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত এবং তাঁহার বক্তৃতা হইয়া থাকে। তাঁহার রচনায় ও বক্তৃতায় তিনি যাহা লিখেন ও বলেন তাহা যেমনই সারগর্ভ, তেমনই সহজ ও প্রাঞ্জল। কিরণবাবু ইংরাজী, বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত। তিনি ইংরাজী ভাষাতেও বেশ সুন্দর রচনা ও সময়ে সময়ে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন। 'পূর্ণিমা', 'নাট্য মন্দির', 'উদ্বোধন', 'কায়স্থ-পত্রিকা' ও 'বিশ্ববাণী' প্রভৃতি ২০।২২ খানি মাসিক ও সাময়িক পত্রে তাঁহার অনেক কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। 'নাট্যমন্দিরে' ও সাপ্তাহিক 'বসুমতী'তে তাঁহার লিখিত 'গিরিশচন্দ্রের জীবনালোচনা' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ইংরাজি ভাষায় লিখিত গিরিশচন্দ্রের জীবনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছাত্রজীবনে তিনি বন্ধুবান্ধবসহ 'বীণাপাণি' পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণবাবুর জন্মতিথি-উপলক্ষ্যে তিনি প্রতি বৎসর তাঁহাদের বাগবাজারস্থ "লক্ষ্মী নিবাসে' 'উত্তরায়ণ সম্মেলন' নামক এক সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়া সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যিক-গণকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চার সুযোগ দিয়া থাকেন। আর এক কথা—তিনি নাট্যকলায় বিশেষ অভিজ্ঞ। বহু নাট্য-

প্রতিষ্ঠানের তিনি অগ্রণী এবং 'বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়নে'র তিনি নাট্যাচার্য্য ও পরিচালক। 'বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়নে'র নাট্যাভিনয় যে কেহ দেখিয়াছেন তিনিই এই সম্প্রদায়ের নাট্য শিক্ষকের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এরূপ সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত নাট্যসম্প্রদায় আজকাল কলিকাতায় বিরল। তিনি মাত্র শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত হ'ন নাই; প্রথম জীবনে তিনি বন্ধুবান্ধবগণসহ মিলিত হইয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্সটিটিউটে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রথম বাঙ্গালা নাটকাভিনয় করেন। 'মেঘনাদবধে' রাম-চরিত্র ও 'কুরুক্ষেত্রে' অর্জ্জুনের ভূমিকা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করেন। তাঁহার অভিনয়-নৈপুণ্য সর্ব্বজন-প্রশংসিত। ১৯৩০ খৃঃ তিনি বঙ্গীয় নাট্য-পরিষদের সভাপতি।

কিরণবাবুর 'গিরিশ-গৌরব,' 'চারু-স্মৃতি,' 'পিতৃবিয়োগ-শোকাষ্টক' নামক তিনখানি কবিতা-পুস্তক-পুস্তিকা বহুপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ১৭খানি মাসিক পত্র-পত্রিকায় পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রকাশিত কিরণবাবুর রচিত সুললিত গীতি-কবিতাকুঞ্জ "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় 'বন্দনা' নামে প্রকাশ করিয়াছেন। কিরণবাবুর কর্ম্মবহুল জীবনের মধ্যেও সারস্বত-সেবার পরিচয় পাঠকগণ এই কবিতা-গ্রন্থে পাইবেন। ইহাতে নবযুগের ভাব-সাধনার পরিচয় আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকখানি মাসিক পত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া তাঁহার লিখিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় সন্দর্ভ ও গীতাবলী "সাধনা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় নানা পরিচয় কথা এই পুস্তকে আছে। তাঁহার সাংসারিক জীবন নানা তাপক্লিষ্ট—স্ত্রী কন্যা-পুত্রবিয়োগে তিনি মুহ্যমান। তাহাদেরও স্মৃতি তিনি নানাভাবে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'সুধীরা-শিবরাণী-স্মৃতি'-পাঠ করিয়া সন্ন্যাসীরাও অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। পুত্রের বিয়োগে তাঁহার ব্যথা

ও তদীয় বন্ধুবান্ধবগণের সমবেদনা-বোধ 'সঙ্ঘ'-পত্রের সংখ্যাবিশেষে 'কালাকৃষ্ণ কথা'য় মুদ্রিতাকারে সংরক্ষিত হইয়াছে। ১৩৩৭ সালের দেবীপক্ষে বন্দনা'য় প্রকাশিত রচনাগুলির পরে প্রকাশিত ও রচিত কবিতাগুলি 'অর্চনা' নাম্নী কবিতাগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। উদ্বোধনে, নাট্যমন্দিরে কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধ ও সমালোচনাগুলি বহুতথ্যপূর্ণ। প্রথমে 'রঙ্গালয়ে' পরে বর্দ্ধিতাকারে 'নাট্যমন্দিরে' প্রকাশিত তাঁহার লিখিত ও সংগৃহীত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' সকলের পাঠ্য।

কিরণবাবু কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সহিত বর্ত্তমানে সংশ্লিষ্ট আছেন ও পূর্ব্বে ছিলেন তাহার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইবে—তৎপূর্ব্বে তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের একটি বিশেষ কার্য্যের উল্লেখ না করিলে তাঁহার কথা অসম্পূর্ণ থাকে। গত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাস হইতে তিনি ৺রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর সম্পত্তির অবৈতনিক 'রিসিভার'-পদে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়েন। ১৯২৯ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত সুশৃঙ্খলার সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ছয়বৎসর-ব্যাপী তাঁহার এই বহুঋণগ্রস্ত সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত উভয় স্থানের দেবসেবা (দক্ষিণেশ্বর ও রাণীগঞ্জ কাছারীস্থ দেবসেবা) পরিচালনের যোগ্যতা ও নৈপুণ্য সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। দেবসেবার উন্নতি-সাধনের সঙ্গে তিনি ঋণ-পরিশোধ, মন্দির মেরামত ও অন্যান্য ব্যয়-বাবদে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

যে সকল সাহিত্যিক, সামাজিক, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সভার সহিত কিরণবাবু জড়িত ছিলেন ও আছেন তাহাদের নামোল্লেখ নিম্নে করা গেল :—

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৩০৭—১৩০৮), আয়-ব্যয়-পরীক্ষক (১৩০৯—১০), সহকারী সম্পাদক (১৩২ —১৩২৬),

কাঃ নিঃ সদস্য (১৩২৭), কোষাধ্যক্ষ (১৩২৮), সহকারী সম্পাদক (১৩২৯—১৩৩৩), গ্রন্থাধ্যক্ষ(১৩৩৪—৩৫), সহকারী সম্পাদক ১৩৩৬।৩৭ এবং পরিষদের বহুশাখায় আহ্বায়ক ও সম্পাদক। এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সদস্য-রূপে ১৩০৩ সাল হইতে যোগদান করিয়া ১৩৩৭ সালে 'আজীবন সদস্য' (Life-member) হইয়াছেন।

২। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা—বহুবর্ষ যাবৎ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য (১৩২০—২১), মূল সম্পাদক একক (১৩২৯—৩০) ও সহযোগী (১৩২২—১৩২৪, ১৩২৯—১৩৩১), পত্রিকা-সম্পাদক (১৩৩২—১৩৩৩), বর্ত্তমানে সহযোগী পত্রিকা-সম্পাদক—১৩৩৬,৩৭ ও সভার আজীবন সদস্য (Life-member) ও অন্যতম ট্রাষ্টি।

৩। বিবেকানন্দ সোসাইটী—সম্পাদক (১৯১৭ মার্চ্চ হইতে ১৯২৯ এপ্রেল পর্য্যন্ত) ১২ বৎসর, আজীবন সদস্য (Life-member) ১৯১৫—১৬ ও ১৯২৯ কাঃ নিঃ সঃ সভ্য।

৪। রামমোহন লাইব্রেরীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ১৯১৩ খৃঃ হইতে চলিতেছে ও আজীবন সদস্য (Life-member)।

৫। শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর ১৯২২—১৯২৫।

৬। শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুল—ম্যানেজিং কমিটীর সদস্য ১৯১৭ হইতে ১৯২৪, কোষাধ্যক্ষ ১৯২৫—১৯২৯ (৭ই জুলাই), সেক্রেটারী ১৯২৯ জুলাই ৮ই হইতে।

৭। সংঘ (সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান,বাগবাজার)—মুখপত্র-সংঘ (হস্তলিখিত সচিত্র মাসিকপত্র) সভাপতি ২য় বর্ষ হইতে। স্থায়ী সভাপতি (Life-President) ১৩৩৭ সালের শ্রাবণ হইতে ১০ম বর্ষে পড়িয়াছে। এই পত্রিকার সেবকগণ এক্ষণে সুলেখক এবং ইহার চিত্রশিল্পীগণ সুপ্রতিষ্ঠ।

৮। কাঁটাপুকুর লাইব্রেরী ও স্পোর্টিং ক্লাব—অন্যতম সহকারী সভাপতি ১৯২৬ হইতে।

৯। বাগবাজার ইউনাইটেড ক্লাব (সুইমিং) সহকারী সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ (১৯২৪—২৬) ও কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য ১৯২৭ হইতে।

১০। নারী-শিক্ষা-সমিতি শ্যামবাজার শাখা, পরে মূল সভার পরিচালক সমিতির সভ্য ১৯২৫ হইতে।

১১। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর আজীবন সদস্য (Life-member) ও এক সময়ে কিছুকালের জন্য গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৯ খৃঃ ১লা জুলাই হইতে ইহার সম্পাদক (Secretary) নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১২। এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল এর সদস্য।

১৩। ১৯২৬ খৃঃ ডিসেম্বর হইতে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অব গ্রেট বৃটেন ও আয়রল্যাণ্ডের সদস্য (এম, আর, এ, এস)।

১৪। ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটীর ইণ্ডিয়ান কমিটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য।

১৫। কলিকাতা অনাথ আশ্রমের (Calcutta Orphanage) কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য।

১৬। সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতির কোষাধ্যক্ষ (১৯২২) পরে সহকারী সভাপতি ১৯২৩ হইতে।

১৭। কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভা—কাঃ নিঃ সমিতির সভ্য ও কোষাধ্যক্ষ ১৩৩৩ হইতে।

১৮। কলিকাতা হিন্দু সভার কোষাধ্যক্ষ ১৯২৫ হইতে।

১৯। বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার প্রথমে কোষাধ্যক্ষ (১৯২৪—২৬) ও পরে কার্য্যকরী সমিতির সদস্য।

২০। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাকালাবধি সংশ্লিষ্ট ও আজীবন সদস্য (Life-member)।

২১। নিজ পল্লীস্থ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ১৩২২ হইতে ১৩৩২ সাল পর্য্যন্ত।

২২। শান্তি-সমিতির কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য ১৯২০ হইতে ও ট্রাষ্টি (Trustee) ১৩৩৬ সাল হইতে।

২৩। গিরিশচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক ও পরে অন্যতম সম্পাদক ১৩৩৩ (সমিতি কর্ত্তৃক মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান উদ্যোক্তা)।

২৪। অর্দ্ধেন্দু-নাট্য-পাঠাগার—প্রতিষ্ঠাকালাবধি কাঃ নিঃ সমিতির সভ্য।

২৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী—এক বৎসর সহকারী সম্পাদক ও কয়েক বৎসর কাঃ নিঃ সমিতির সভ্য ছিলেন।

২৬। বাগবাজার আনন্দময়ী কালীকীর্ত্তন সমিতির সভাপতি।

২৭। বাগবাজার পল্লী-মঙ্গল সমিতির কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য ও ১৩৩৬ হইতে সহকারী সভাপতি।

২৮। বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য।

২৯। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটীর কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য ও সোসাইটীর মুখ পত্র 'বিশ্ব-বাণী'র অন্যতম সম্পাদক ১৩৩৬ সালে।

৩০। সাহিত্য সভার কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য (১৩২৮—২৯)।

৩১। বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়ন (১৯০৮—১৯২২) প্রতিষ্ঠাতা, নাট্যাচার্য্য ও পরিচালক।

৩২। বাগবাজার নাট্যসমাজের সভাপতি পরে নাট্যাচার্য্য।

৩৩। ক্ষীরোদ-স্মৃতি-সমিতির সভাপতি।

৩৪। কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইন্সটিটিউটের সাধারণ সমিতির সভ্য।

৩৫। ইণ্টারন্যাশন্যাল স্পোর্টস এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি (১৯২৫ হইতে)।

৩৬। বাগবাজার জীমন্যাসিয়ামের কাঃ নিঃ সমিতির সভ্য (১৯২১ হইতে) ও ১৯৩১ হইতে সহকারী সভাপতি।

৩৭। বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের সহকারী সভাপতি (১৯২৫ —২৬)।

৩৮। অল বেঙ্গল ডন বৈঠক প্রতিযোগিতা সমিতির কাঃ নিঃ সমিতির সভ্য ১৯২৬ হইতে।

৩৯। শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর নৈশ বিদ্যালয়ের কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য ও বর্ত্তমানে সভাপতি ১৩৩৬ হইতে।

৪০। বাগবাজার বয়েজ রিডিং ক্লাব—সহকারী সম্পাদক (১৮৯১ —১৮৯৫)।

৪১। 'বীণাপাণি' সাহিত্য-সমিতি ও পত্রিকা—সহকারী সম্পাদক (১৩০৩—১৩০৫)।

৪২। বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক ১৯২৯ হইতে ও আজীবন সদস্য (Life-member) ১৯৩০ এবং ট্রাষ্টি (Trustee)

৪৩। কলিকাতা আতুরাশ্রমের (The Refuge) অন্যতম গভর্ণর ও আজীবন সদস্য (Life-member)।

৪৪। বঙ্গীয় নাট্য পরিষদের সভাপতি ১৯৩০ হইতে।

৪৫। বামুনপাড়া এম, ই স্কুলের সভাপতি, ১৯৩১।

৪৬। বামুনপাড়া অনাথ ভাণ্ডারের পেট্রন ১৩৩৬ হইতে।

৪৭। ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ স্মৃতি-সমিতির অন্যতম সম্পাদক ১৯২৯।

৪৮। 'অমৃত-চক্রে'র—প্রথমে কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য পরে ১৩৩৬ হইতে সহকারী সভাপতি।

৪৯। কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মন্দির-সংস্কার সমিতির অন্যতম ট্রাষ্টি (Trustee)

৫০। নিখিল বঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি।

৫১। বিবেকানন্দ নারী-মন্দিরের কাঃ নিঃ সমিতির সভ্য।

৫২। ১নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য সমিতির বিশিষ্ট (Honorary) ও আজীবন সদস্য (Life-member) এবং সহকারী সভাপতি ১৯২৯ হইতে।

৫৩। কলকাতা টেম্পারেন্স ফিডারেসন কাউন্সিল সদস্য ১৯৩০ হইতে ও উত্তর কলিকাতা টেম্পারেন্স ইউনিয়নের সভ্য।

৫৪। মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্নিক্ ইনষ্টিটিউটের ম্যানেজিং কমিটির সভ্য ১৯৩১।

পলাশীর (বর্ত্তমানে) চুঁচুড়ার পালবংশ

চুঁচুড়ার পালবংশ সুপ্রাচীন বংশ। বর্ত্তমানে ইহার কয়েকটী শাখা চুঁচুড়ায় এবং কোন কোন শাখা কলিকাতায়ও বাস করিতেছেন। ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার সাহাবাদ পরগণার অন্তর্গত পলাশী গ্রামে এই বংশের আদি বাসস্থান ছিল। এই পলাশী গ্রাম বর্দ্ধমান সহরের প্রায় ৬।৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই বংশের একটী শাখা এখনও পলাশীগ্রামে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে উক্ত পলাশীগ্রাম সোণা পলাশী ও কুড়মণ পলাশী এই দুই নামেও পরিচিত। গ্রামখানি পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড লালবিহারী দের জন্মভূমিও এই গ্রামে। তাঁহার রচিত "গোবিন্দ সামন্ত" নামক পুস্তকে পলাশীগ্রামবাসী "সুবর্ণবণিক" বলিয়া যাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা পলাশীগ্রামবাসী এই পালবংশীয় লোক। ইহারা জাতিতে বৈশ্য, সাবর্ণ গোত্র।

এক সময়ে পালবংশীয়েরা বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। সুবৃহৎ "বড়বাগান", বিরাট ভদ্রাসন, দীঘি, পুষ্করিণী, দেবালয় এবং অন্যান্য ভূসম্পত্তি প্রভৃতি এখনও তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনের শেষভাগে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীরা ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বঙ্গদেশে আসিয়া চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন ও অত্যাচার করিতে থাকে। তাহাদের ভীষণ অত্যাচারে পশ্চিম-বঙ্গবাসী বহু লোক অত্যন্ত ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তখন পালবংশীয়দের কেহ কেহ চুঁচুড়ায় আসিয়া আশ্রয় লন। সে সময়ে

চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের কারবারের কুঠি ছিল এবং চুঁচুড়া ওলন্দাজদিগেরই শাসনাধীন থাকায় তথায় বাস করিলে বর্গীর হাতে নিপীড়িত হইবার কোন আশঙ্কা ছিল না।

৺রামমোহন পাল

পালবংশীয়দিগের মধ্যে রামমোহন পাল মহাশয় চুঁচুড়া বড়বাজারে গঙ্গাতটে একটী সুবৃহৎ প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণও তাঁহার বাটীর চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। রামমোহন পাল তাঁহার কারবারের সুবিধার জন্য কলিকাতার বড়বাজারে একটী কুঠিবাটী নির্ম্মাণ করিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণও কেহ চুঁচুড়ায়, কেহ কলিকাতায় এবং কেহ বা মুর্শিদাবাদে কারবার করিতেন। সে সময়ে সুবর্ণবণিকগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয় করিতেন। আজকালকার মত দাসত্বের জন্য কাহাকেও লালায়িত হইতে দেখা যাইত না।

৺রাজকৃষ্ণ পাল

রামমোহন পাল মহাশয়ের দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম রাজকৃষ্ণ পাল ও কনিষ্ঠের নাম জীবনকৃষ্ণ পাল। জ্যেষ্ঠ রাজকৃষ্ণ অত্যন্ত বলশালী ছিলেন; শারীরিক ব্যায়ামে তাঁহার যথেষ্ট আসক্তি ও অনুরাগ ছিল। তিনি কয়েকজন কুস্তীগীর রাখিয়া একটী কুস্তীর আখড়া প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সকাল সন্ধ্যা দুই বেলাই কুস্তী করিতেন। রাজকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন।

৺জীবনকৃষ্ণ পাল

রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র জীবনকৃষ্ণ পাল বিশেষ খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ফুলের গাছের চাষ আবাদ করিতে

ভালবাসিতেন। ভাল ভাল সুগন্ধি ফুলের গাছে তাঁহার উদ্যানটী সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত। তাঁহার বাটী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে হুগলী ষ্টেসনের নিকটে একশত বিঘা জমি লইয়া তিনি একটী পুষ্পোদ্যান তৈয়ার করেন। উদ্যানটীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য তিনি ইহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর তৈয়ার করাইয়া দেন। নানাস্থান হইতে বহুপ্রকার ফলের গাছ ও বীজ আনিয়া তিনি এই বাগানে রোপণ ও বপন করেন। আম্র-বৃক্ষের ও পুষ্প বৃক্ষের কলম প্রথা তিনিই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তন করেন। এই বাগানে এখনও এত কলমের আম উৎপন্ন হইতেছে যে, তাহা অন্যত্র কদাচিৎ দেখা যায়। বস্তুতঃ তাঁহাকে কলমের আমের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখনও "জীবন পালের বাগানে"র নাম বঙ্গদেশের বহুস্থানে পরিচিত। তাঁহার বাগানে উৎপন্ন আম কলিকাতার বাজারে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। হিংসা-বদ্বেষ কাহাকে বলে তাহা তিনি মোটেই জানিতেন না। কোন প্রতিবেশী উদ্যান অথবা বাগান করিতে অভিলাষী হইলে তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া ও নিজ বাগানের কলম দিয়া প্রতিবেশীর বাগানটীকে সাজাইয়া দিতেন। এমন কি সুদূর পল্লীগ্রাম অথবা বিদেশ হইতে কেহ বাগান করিবার অভিলাষ জানাইলে তিনি নিজ ব্যয়ে তথায় আমের কলম পাঠাইয়া দিতেন। জীবনকৃষ্ণ পালও নিঃসন্তান ছিলেন।

পালবংশের দৌহিত্র ৺লালবিহারী দত্ত

রামমোহন পালমহাশয়ের দৌহিত্রগণ জীবনকৃষ্ণের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র লালবিহারী দত্ত মহাশয় সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তিনি মাতুলের নিকট হইতে মূলধন লইয়া রেশমের কুঠি স্থাপন করিয়া ব্যবসায়

স্বর্গীয় রাম গোপাল ঘোষ

করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি হয় এবং ঘাঁটাল, মনোহরপুর ও জঙ্গীপুরে তাঁহার যে তিনটি রেশমের কুঠি ছিল তাহা চালাইয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। কলিকাতার বড়বাজারেও তিনি আর একটি কুঠি স্থাপন করিয়া ছলেন। তিনি তাঁহার মাতুলের সম্পত্তি ও বাগানটি বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বাগানটির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

লালবিহারী বাবু দানে মুক্তহস্ত ছিলেন, কিন্তু দানের কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেন না। প্রার্থী কখনও তাঁহার বাটী হইতে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিত না। তিনিও নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে দিয়া যান এবং অবশিষ্টাংশ দ্বারা চুঁচুড়ায় একটি সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সদাব্রতের ফলে বহু দীন দুঃখী প্রতিপালিত হইতেছে।

৺রাজকিশোর পাল

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ৺রামমোহন পাল মহাশয়ের চুঁচুড়াস্থ বাটীর চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার বহু আত্মীয়স্বজন বাস করিতেন। রাজকিশোর পাল মহাশয় রামমোহন পাল মহাশয়ের পিতৃব্যপুত্র ছিলেন। তিনি অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের সহিত একত্র এক বাটীতে বাস করিতেন এবং তাঁহার পিতা আনন্দমোহন পাল জাতীয় ব্যবসায় করিতেন। রাজকিশোর বাবু বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং পার্সী ভাষাও কিছু কিছু জানিতেন। তিনি একাই অর্দ্ধ সম্পত্তির মালিক হওয়ায় অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের ঈর্ষ্যার পাত্র হইয়াছিলেন। এই জ্ঞাতি-বিরোধে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তিনি একদিন একখানি গামছা মাত্র লইয়া চুঁচুড়া কামারপাড়া বাজারে শ্যালক পদ্মলোচন মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পদ্মলোচন তৎকালে বালেশ্বরের কালেক্টারীতে

চাকুরী করিতেন। রাজকিশোরবাবু তাঁহার সহিত বালেশ্বরে যান এবং কালেক্টারীতে একটী চাকুরী পান। ঐ চাকুরী করিতে করিতে তিনি কালক্রমে কালেক্টারীর খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষ (Treasurer) হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ ২৭।২৮ বৎসর কালেক্টারীতে কার্য্য করিবার পর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি চুঁচুড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু স্বীয় বাটীতে আর গমন করেন নাই। তাঁহার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই বড়বাজারে ৺জীবনকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহার জন্য একটি বাটী তৈয়ারী হইয়াছিল। তিনি সেই নবনির্ম্মিত বাটীতে আসিয়া উঠিলেন। বলা বাহুল্য, পৈতৃক সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও তিনি স্পর্শ করেন নাই রাজ-কিশোর পাল মহাশয় কর্ম্মত্যাগের পর হইতে চুঁচুড়ার বাটীতেই বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা পৌত্র ও দৌহিত্রদিগকে লইয়া মহানন্দে দিনযাপন করিতেন। রামায়ণ ও মহাভারত তাঁহার একরূপ কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি তাহাদের নিকট রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলিতেন এবং গ্রন্থদ্বয়ের অংশবিশেষ সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার একটী পৌত্র (জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র) সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিবার বহু পূর্ব্বেই রাজকিশোরবাবুর নিকট রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী ও চাণক্য শ্লোক শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজকিশোর বাবু নবতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পুত্র-পৌত্র ও কন্যাগণকে রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

রাজকিশোর পাল মহাশয়ের চারি পুত্র ও তিনটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারিকানাথ পাল মহাশয় হিন্দু কলেজে পড়িতেন এবং জুনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপর সংসারের দায়িত্ব ও ভ্রাতৃগণের লেখাপড়া-নির্ব্বাহের ভার পড়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া চাকুরী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বংশের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হওয়ায় একান্নবর্ত্তী পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিতেন।
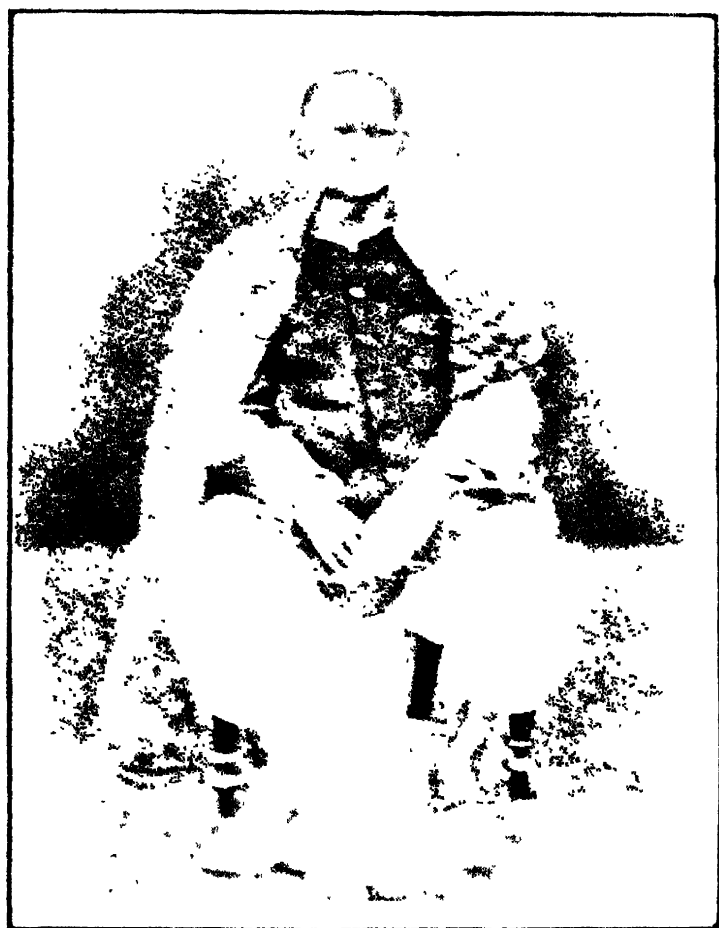
মধ্যমপুত্র অটলবিহারী পাল বালেশ্বরের কালেক্টারীতে কিছুকাল কার্য্য করিয়া ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছিলেন। তৎপরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তাঁহাকেও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় যাইতে হইয়াছিল।

তৃতীয় পুত্র ক্ষেত্রমোহন পাল মহাশয় হুগলী কলেজে পড়াশুনার পর সরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হন এবং যোগ্যতার সহিত কাজ করিবার পর পেনসন্ লইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করেন।

৺বৈকুণ্ঠনাথ পাল

চতুর্থ পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ পাল মহাশয় কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেন। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া পরিশেষে ওকালতী পরীক্ষায় পাশ করেন। তাহার পর হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরেই তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। সুবর্ণবণিক সমাজের মধ্যে তিনিই প্রথম হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারিকানাথ পাল তাঁহার ব্যবসায়ের সাহায্য করায় এবং সাংসারিক খরচের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করায় তিনি ক্রমে ক্রমে উক্ত ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে সরকারী চাকুরী লাভ করা যদিও অনায়াসসাধ্য ছিল এবং রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট জজ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি সরকারী চাকুরী করিতেন কিন্তু বৈকুণ্ঠবাবু কোনদিন চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। তিনি সাধারণের উন্নতির জন্য অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন এবং চুঁচুড়ার ও স্বজাতিবর্গের কল্যাণ-সাধনার্থ অনেক সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন। তিনি কায়মনোবাক্যে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া স্বদেশবাসীর সেবা করিতেন।

সে সময়ে বহু বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নামক প্রহসন অভিনীত হয়। তিনি উক্ত প্রহসনে বন্ধুগণের সহিত যোগদান

করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় উপযুক্ত ঔষধ ও চিকিৎসকের অভাবে চুঁচুড়াবাসিগণ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। বৈকুণ্ঠবাবু এই অভাব দূর করিবার জন্য কয়েকজন বন্ধুর সমবায়ে একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে "ইউনাইটেড্ মেডিক্যাল হল" নামে একটী ঔষধালয় স্থাপন করেন। উক্ত ঔষধালয়ের অংশীদারগণও উহা হইতে বেশ দু'পয়সা লাভ পাইতেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে বৈকুণ্ঠ বাবু চারি পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর পাল বি, এল্ প্রথমে কিছুদিন সরকারী কার্য্য করিয়া অল্পদিন হুগলী কোর্টে ওকালতী করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি মেসার্স ম্যাকিনটস্ বার্ণ কোং-র আফিসে কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করেন। এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পুত্র ইন্দুশেখর পাল কিছুদিন চাকুরী করিয়া অল্পবয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার একটী পুত্র বর্ত্তমান।

তৃতীয় পুত্র ডাক্তার শশীশেখর পাল, এম্ বি মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃতিত্বের সহিত ডাক্তারী করিতেছেন।

চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত অমৃতশেখর পাল কলিকাতায় দালালী কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র পাল

দ্বারিকানাথের দুই পুত্র ও চারি কন্যা। জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র পাল বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর হুগলী জজ আদালতে ওকালতী করেন। হুগলীতে ওকালতী ব্যবসায়ের প্রথমাবস্থায় তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। পরে

তিনি কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। দ্বারিকানাথ এই সময়ে বাধ্য হইয়া একান্নবর্ত্তী পরিবার হইতে পৃথক হন এবং গিরিশবাবুর যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল তৎসমস্তই গৃহনির্ম্মাণাদি কার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলেন। অধিকন্তু তিনি এই জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এ অবস্থাতেও তিনি ভ্রাতৃগণের ব্যয়ভার বহন করিতেন। দ্বারিকানাথের মত এই ছিল যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে লালনপালন ও সাহায্য করা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্ত্তব্য; তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যই করিতেছেন. তাঁহার পরিবারবর্গের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য একাকী আসে না। একদিন দ্বারিকাবাবু হঠাৎ ট্রামগাড়ী হইতে পড়িয়া যান; তাঁহার পা এরূপ জখম হইয়া যায় যে, তিনি আর চাকুরী করিতে পারিলেন না। সামান্য ক্ষতিপূরণ লইয়া তিনি বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধবা হইয়াছিলেন; সেই কন্যার কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি পিতৃগৃহে থাকিয়া পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। ইতি-মধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটায় দ্বারিকানাথ ঋণমুক্ত হইয়া পড়েন। সেই ঘটনাটি এই যে, গিরিশচন্দ্র যখন ওকালতী করিতেন তখন তাঁহাদের এক প্রতিবেশী এক খাতকের নিকট হইতে ২০ হাজার টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে উকীল নিযুক্ত করেন। গিরিশবাবু প্রায় দুই মাসকাল লক্ষ্ণৌ সহরে অবস্থান করিয়া উক্ত টাকা আদায় করেন। ফলে মহাজন তাঁহাকে যে পরিমাণ টাকা পারিশ্রমিকস্বরূপ প্রদান করেন, তাহাতেই তাঁহার পিতার ঋণ-পরিশোধ হয়। দ্বারিকানাথ বাবু এইভাবেই ঋণমুক্ত হইয়া শেষ জীবনে অনেকটা শান্তি-লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গিরিশবাবু কটকে গিয়া উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিয়া তথায় ওকালতী আরম্ভ করেন। উত্তরোত্তর ওকালতী

ব্যবসায়ে পসার হইতে থাকায় তিনি পিতার অনুমতিক্রমে পুত্রকলত্রসহ কটকে বাস করিতে লাগিলেন। দ্বারিকানাথের নিকট তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র পাল রহিলেন। পূর্ণচন্দ্র তখন লেখাপড়া শেষ করিয়া কলিকাতায় চাকুরি করিতেছিলেন। চারি বৎসরের মধ্যেই গিরিশবাবু কটকে প্রভূত পসার করিলেন। কিন্তু অধিক দিন কটকে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। তাঁহার পিতৃব্য বৈকুণ্ঠনাথ পালের মৃত্যু হওয়ায় তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

হাইকোর্টে তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যে পসার করিয়া ফেলিলেন। কটকে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি থাকায় তিনি উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত মামলা মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রাপ্ত হইতেন। ফলে তাঁহার কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার সুবিধা না হওয়ায় তিনি কলিকাতায় বাসা করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় বিহার ও উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পাটনায় একটি নূতন হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়। তখন বিহার ও উড়িষ্যা দেশের সব মোকদ্দমা কলিকাতা হাইকোর্টে না আসিয়া পাটনা হাইকোর্টে যাইতে লাগিল এবং কটকে একটি সার্কিট হাইকোর্ট গঠিত হইয়া তথায় বিচার চলিতে লাগিল। এই নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে গিরিশবাবুর প্রায় সমস্ত মামলা মোকদ্দমা কটকের সার্কিট কোর্টে চলিয়া গেল। তিনি মক্কেলদের অনুরোধে পুনরায় কটকে গেলেন। সেখানে সার্কিট কোর্ট ছাড়া আরও অন্যান্য কোর্টে তাঁহাকে মামলা চালাইতে হইত। গুরুতর পরিশ্রমের ফলে
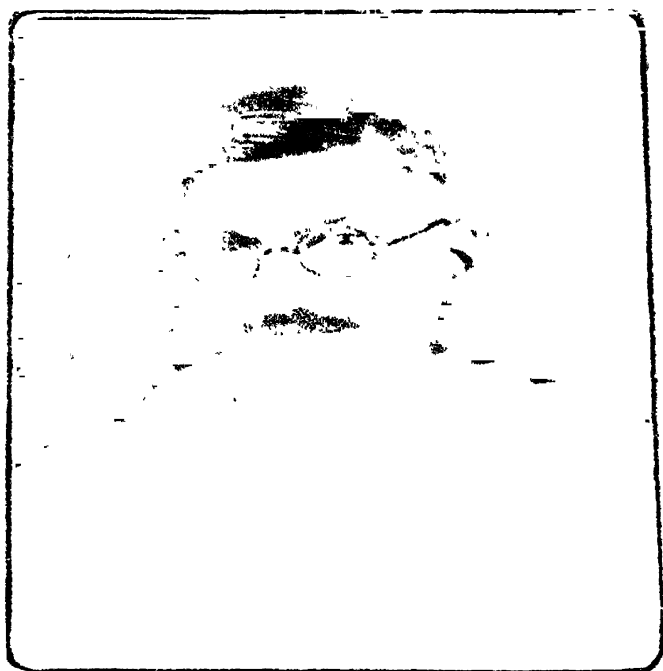
তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি বাধ্য হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং এখনও কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল

গিরিশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বি এল্ পাশ করেন। পর বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ। বি-এ পড়িবার সময় তিনি ফার্সী সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণদাস লাহা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র লাহা মহাশয়ের একমাত্র কন্যার সহিত নলিনচন্দ্রের বিবাহ হয়। নলিনচন্দ্রের দুই পুত্র।

নলিনচন্দ্র ওকালতী ব্যবসায়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা ওরিয়েন্টেল প্রেস নামক সুবিখ্যাত ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এই ছাপাখানা স্থাপিত হয়। এই ছাপাখানা হইতে সুপ্রসিদ্ধ Indian Historical Quarterly, প্রকৃতি, সুবর্ণবণিক সমাচার প্রভৃতি সাময়িক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে নলিনচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর আছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট—

১। কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল।

২। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

৩। বিদ্যাসাগর বাণীভবন।

৪। রামমোহন লাইব্রেরী।

৫। কলিকাতার কর্পোরেশনের মোটর ড্রাইভারস্ ইউনিয়ন (সভাপতি)।

নলিনচন্দ্র অমায়িক প্রকৃতিসম্পন্ন ও সর্বজনপ্রিয়। তাঁহার চরিত্রে ও ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। অবসর সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে সাহিত্য-চর্চাও করিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত কোন কোন প্রবন্ধ তাঁহাদের জাতীয় পত্রিকা "সুবর্ণ-বণিক সমাচারে" প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত, সর্বগুণসম্পন্ন ও হৃদয়বান্ ব্যক্তির নিকটে দেশ ও জাতি অনেক আশা করে। তিনি বর্তমান পালবংশীয়দিগের গৌরবস্বরূপ।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রায় বাহাদুর।

রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর

প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে নদীয়া জেলায় চক্রদ্বীপের (চাকদহের) নিকট মনসাপোতা গ্রামে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বাস করিতেন। তাঁহার আদিনিবাস বর্দ্ধমান জেলায় বাগনাপাড়ার নিকট একটী ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে। ঈশ্বরচন্দ্র মনসাপোতায় বিবাহ করিয়া অধিকাংশ সময় সেই স্থানেই থাকিতেন। তিনি বেগের গাঙ্গুলী এবং হরিরাম গাঙ্গুলীর সন্তান। একশত বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কুলীন ব্রাহ্মণ যে কেবলমাত্র একটী বিবাহ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন ইহা ধারণা করা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্রও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। বালি, রাণাঘাট প্রভৃতি নানা স্থানে তিনি আরও দশটী বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আক্ষেপ ছিল—আর একটী বিবাহ করিয়া দ্বাদশটী পূর্ণ করিলে বৎসরে একমাস করিয়া প্রত্যেক শ্বশুরালয়ে জামাই-আদরে কাটাইতে পারিতেন।

সমৃদ্ধিশালী রাণাঘাটে বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। এই বংশে রামকুমার, প্রাণহরি ও মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় তিন সহোদর ভ্রাতা বিশেষ সম্মানশালী ও তৎকালীন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। ঈশ্বরচন্দ্র ইহাদিগের সহোদরা চণ্ডীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সাধ্বী রমণী পতির আদরে বঞ্চিতা না হইলেও কখন শ্বশুর-গৃহে বাস করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। চিরকাল ভ্রাতাদের সংসারে থাকিতেন এবং তাহাই নিজের সংসার মনে করিতেন। ভ্রাতাগণও খ্যাতনামা কুলীনের হস্তে

ভগিনীকে সমর্পণ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং এরূপ স্নেহময়ী ভগিনী তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিবেন, ইহা তাঁহাদের অনভিপ্রেত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র শ্যালকদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান ও যত্ন পাইতেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্রের ঔরসে ও চণ্ডীদেবীর গর্ভে একটী পুত্রসন্তান হয়। সদ্যোজাত শিশুর তেজোপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, এই পুত্র অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন স্বনামধন্য পুরুষ হইবে। দুঃখের বিষয়, চণ্ডীদেবী এই অলোকসামান্য পুত্রমুখ-দর্শনের আনন্দ অতি অল্পদিন ভোগ করিয়াছিলেন। বালবিধবা ভগিনী ব্রহ্মময়ীর হস্তে শিশুপুত্রকে অর্পণ করিয়া তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন। শিশু রামলাল মাতুলালয়ে মাসীমাতার দ্বারা লালিত-পালিত হন। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র মধ্যে মধ্যে তাহাকে দেখিতে আসিতেন। মাসীমাতার যত্নে রামলাল পঠদ্দশায় জানিতে পারেন নাই, তিনি শৈশবে মাতৃহীন। পিতার বিশেষ সাহায্য না পাইলেও মাতুলগণ তাঁহার কোন অভাব কখন রাখেন নাই। পিতা মধ্যে মধ্যে তাহাকে মনসাপোতায় লইয়া যাইতেন এবং অপুত্রক বিমাতা সপত্নীপুত্রের প্রতি অসাধারণ স্নেহময়ী হইলেও বালক রামলাল মাসীমাতাকে ছাড়িয়া দুই এক দিনের বেশী সেখানে থাকিতে পারিতেন না।

স্থানীয় বিদ্যালয়ে রামলাল অতি যত্নের সহিত লেখাপড়া করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি নিরীহ ছিল; তিনি সহপাঠীদের সহিত কখন কোনরূপ কলহ করিতেন না। তাঁহার এক সহপাঠী কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী শিক্ষা করিতে আসেন। তিনিও সেই সঙ্গে মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। দুঃখের বিষয়, দৈব-দুর্ব্বিপাকে তিনি ডাক্তারী পরীক্ষা শেষ করিতে পারেন নাই। হঠাৎ তাঁহার মধ্যম মাতুল প্রাণহরি বন্দ্যোপাধ্যায় পক্ষাঘাতরোগাক্রান্ত হইয়া অবশাঙ্গ হইয়া

পড়েন। এই অবস্থায় কলিকাতায় ডাক্তারী শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলন করা রামলালের পক্ষে অসম্ভব হইল। অধিকন্তু পীড়িত মাতুলের শুশ্রূষার জন্য তাঁহার বাড়ী থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মধ্যম মাতুল অবিবাহিত ছিলেন। বৃদ্ধা ভগিনী ব্রহ্মময়ী দ্বারা সুশৃঙ্খলে তাঁহার সেবা হওয়া সম্ভব নহে। অগত্যা রামলালকে বাড়ী ফিরিতে হইল। তিনি মাতুল ও মাসীমাতার কষ্ট দেখিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ যতই তিমিরাচ্ছন্ন হউক, তিনি মাতুলকে ত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইবেন না। প্রাণহরি এইপ্রকার শয্যাশায়ী অবস্থায় প্রায় ২০ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং এই দীর্ঘকাল রামলাল একদিনের জন্যও তাঁহার সেবার ত্রুটী করেন নাই। শয্যা হইতে উঠিবার বা হস্তাদি অঙ্গ চালনা করার শক্তি প্রাণহরির ছিল না; তথাপি ভাগিনেয়ের যত্নে তিনি কোন অভাব অনুভব করেন নাই। লোকে আশ্চর্য্য হইত, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, একরূপ ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিয়মিতভাবে শুশ্রূষা, অপরিণতবয়স্ক যুবকের দ্বারা কি প্রকারে সম্ভব হইত!

মাতুলগণ নিকটবর্ত্তী উলাগ্রামে অল্পবয়সে রামলালের বিবাহ দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে রাণাঘাটের সংলগ্ন হিজুলী গ্রামে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর অন্যতম বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী প্রাণহরি মুখোপাধ্যায়ের তৎকালীন একমাত্র কন্যা এবং নদীয়া জেলার স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ও রাণাঘাট টোলের প্রধান অধ্যাপক স্বর্গীয় সর্ব্বেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের দৌহিত্রী শ্রীমতী শশীমুখী দেবীর সহিত রামলালের দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হয়। শশীমুখী যেমন উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার মনও সেইরূপ উদার ছিল। তিনি স্বামিগৃহে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার স্বামী সর্ব্বক্ষণই পীড়িত মাতুলের সেবায় ব্যস্ত থাকেন; অন্য

কোন কার্য্যের জন্য তাঁহার বিন্দুমাত্র অবসর নাই। এমন কি, নিয়মিত সময়ে আহার বা বিশ্রামের অবকাশ হয় না। সেইজন্য তিনি প্রথম প্রথম স্বামীর সাহায্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। কারণ মামাশ্বশুরের গৃহে প্রবেশ করা, এমন কি তাঁহার স্পর্শিত দ্রব্যে হাত দেওয়াও তখনকার সমাজ-প্রথার বিরোধী। অগত্যা সামাজিক প্রথার কোন প্রকার অবমাননা না করিয়া মাতুলের সেবা-কার্য্যে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব হইত তিনি তাহাই করিতেন। মামাশ্বশুরদিগের বৃহৎ সংসার; অতিথি-অভ্যাগত প্রতিদিনই আছে। এই সংসারের রন্ধনকার্য্যের ভার শশীমুখী গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য গৃহস্থালী কার্য্যও তাঁহাকে করিতে হইত। তিনি থাকিতে স্বামীর মামী বা মাসী সংসারের কার্য্য করিবেন ইহা নববধূর চক্ষে বিসদৃশ বলিয়া মনে হইত। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি অতি প্রত্যূষে গৃহস্থালী কার্য্য সমাপন করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতেন।

এদিকে রামলাল তাঁহার ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবন কি উপায়ে চলিবে—সেই বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবিবাহিত পীড়িত মাতুল তাঁহাকে বাড়ীর অংশটুকু দিতে পারেন। অপর দুই মাতুল বিবাহিত এবং তাঁহারা ঐ বাড়ীতে আপনাদের আবশ্যকমত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রাণহরি স্বীয় কৃত বৈঠকখানা গৃহের এক অংশে বাস করিতেন; তাঁহার অপর গৃহাদি নির্ম্মাণের কোন প্রয়োজন ছিল না। একটী গৃহের অংশমাত্র লইয়া কি প্রকারে চলিবে এবং পরিবার ভরণ-পোষণ কি উপায়ে হইবে—এই সকল চিন্তা যুবক রামলালকে অস্থির করিয়া তুলিল। অপর দিকে মাতুলকে ত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য স্থানান্তরে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এই ভাবে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, ডাক্তারীতে তাঁহার যে

শিক্ষা হইয়াছে এবং এতদিন বাড়ীতে চেষ্টা করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাতে পীড়িত মাতুলের শুশ্রূষার ত্রুটী না করিয়াও তিনি রাণাঘাটেই পরিবার প্রতিপালনোপযোগী অর্থার্জ্জন করিতে পারিবেন। মাতুলদিগের অনুমতি লইয়া তিনি অবিলম্বে প্রথম পক্ষের স্ত্রী-পরিত্যক্ত অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া বাড়ীতে একটী ডাক্তারখানা স্থাপন করতঃ চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ডাক্তারখানাই রাণাঘাটের প্রথম এলোপ্যাথিক ডিস্পেনসারি। তাঁহার ধীর প্রকৃতি, রোগ-নির্ণয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা ও ঔষধ-নির্ব্বাচনের অপূর্ব্ব পারদর্শিতার জন্য অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট পসার হইল। পাছে মাতুলের কোন অসুবিধা হয় বা তাঁহার সেবার ত্রুটী হয়—এই আশঙ্কায় তিনি অনেক সময় বেশী রোগীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন না এবং এই কারণে মফঃস্বলের রোগী তিনি প্রায়ই ত্যাগ করিতেন। এই সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও দিন দিন তাঁহার পসার ও অর্থোপার্জ্জন বাড়িতে লাগিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান হয়। এই পুত্রই 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই সময় রামলাল মধ্যম মাতুল-প্রদত্ত জমিতে স্বীয় পরিবারের বাসোপযোগী একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন।

কিছু দিন পরে মধ্যম মাতুল প্রাণহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ভোজন, অধ্যাপক নিমন্ত্রণ, দরিদ্র-সেবা ইত্যাদিতে রামলাল অনেক অর্থ ব্যয় করেন এবং মহাসমারোহে এই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মাতুলের সেবার জন্য তিনি যে সময় নিযুক্ত থাকিতেন এখন হইতে সে সময় তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিলেন এবং ডিস্পেনসারির অনেক উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ছিল। টিংচার প্রভৃতি অনেক ঔষধ তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত

করিতেন এবং সেজন্য মূল্যবান যন্ত্রাদি আনাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, তাহার স্বহস্ত প্রস্তুত ঔষধ বিলাত হইতে আনীত ঔষধ অপেক্ষা আশুফলপ্রদ। তিনি অবস্থানুসারে দরিদ্রগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতেন। নতুবা স্বেচ্ছায় যে যাহা দিত তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। আবশ্যক হইলে পথ্যাদি পর্য্যন্ত নিজে দিতেন। তাঁহার কর্ম্মচারগণ বিনামূল্যে ঔষধাদি বিতরণ করিতে বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিতেন—"ইহার মূল্য নারায়ণ অপরের হাতে পাঠাইবেন—তোমরা ব্যস্ত হইও না।'

রামলাল নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই সহায়তা করিতেন। তিনি রাণাঘাটের মিত্রসভার অন্যতম অনুষ্ঠাতা। এই সভা হইতে স্থানীয় অনেক দুঃস্থ পরিবারকে মাসিক সাহায্য করা হয়, সহায়হীন বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার্থে বৃত্তি দেওয়া হয়, অসহায় ভদ্র বিধবা ও অক্ষম ব্যক্তিবর্গের জন্য মাসিক বৃত্তি ও চাউল দান করা হয়। তিনি গভর্ণমেণ্ট-মনোনীত মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন এবং সহরের উন্নতি-সাধনে ও স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ সহায়তা করিতেন। তাঁহার সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় জমিদার সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে বড়লাট লর্ড রিপণ রাণাঘাটে আসেন এবং মিউনিসিপাল কমিশনারগণের সহিত পরিচিত হন। জগদ্ধাত্রী পূজা এবং সাবিত্রী ও অন্যান্য ব্রতোপলক্ষে তিনি প্রতি বৎসর অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। রাণাঘাট ভট্টাচার্য্য-পল্লীতে অত্যন্ত জলকষ্ট ছিল। তিনি তথায় এক খণ্ড জমি খরিদ করিয়া একটা বৃহৎ ইন্দারা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহা স্বীয় সহধর্ম্মিণী পতিব্রতা শশীমুখী দেবীর দ্বারা শাস্ত্রীয় বিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে অধ্যাপক-নিমন্ত্রণ, ব্রাহ্মণ-ভোজন ও দরিদ্র-নারায়ণ-সেবায় অনেক অর্থব্যয় হয়। এই ইন্দারা এখনও সাধারণে ব্যবহার করিতেছেন।

প্রতি বৎসর রাসযাত্রার সময় অদ্বৈত মহাপ্রভুর লীলাস্থল শ্রীধাম শান্তিপুরে বহুসহস্র লোকের সমাগম হয়। তখন শান্তিপুর যাওয়ার জন্য রেলওয়ে লাইন হয় নাই। পূর্ব্ব বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, শ্রীহট্ট, আসাম প্রভৃতি স্থানের শান্তিপুর-যাত্রী লোক রাণাঘাট ষ্টেশনে নামিতেন এবং সেখান হইতে পদব্রজে দশ মাইল পথ যাইয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হইতেন। এই সকল যাত্রী প্রায়ই রাণাঘাটে একদিন অপেক্ষা করিতেন এবং ফিরিবার সময় ট্রেণে স্থানাভাব-বশতঃ দুই তিন দিন অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন। রামলাল তাঁহার বহির্ব্বাটী ও বাগান-বাড়ীতে এইসকল লোককে স্থান দিতেন, পীড়িতগণের চিকিৎসা করিতেন এবং তীর্থ-দর্শনে আসিয়া অপরের অন্নগ্রহণে যাহাদের বাধা ছিল না তাহাদিগের সেবার ব্যবস্থা করিতেন।

বিশিষ্ট কুলীনবংশে জন্মগ্রহণ করায় তিনি রাণাঘাট ব্রাহ্মণ-সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌলীন্য-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন না। রাণাঘাটের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ভাগলপুর-নিবাসী বিলাত-প্রত্যাগত কোন খ্যাতনামা আত্মীয়ের সংসারে অনেকদিন বাস করেন। পরে তিনি রাণাঘাটে আসিলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে বদ্ধপরিকর হন। তখন বিলাত-ফেরতের সংস্পর্শের জন্য সমাজের কঠোর শাসন ছিল। বিপন্ন ভদ্রলোক উদারচেতা রামলালের সহায়তা লওয়ায় তিনি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বাড়ী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দায়মুক্ত করেন। এই প্রকার উদারতার অনেক নিদর্শন তাঁহার চরিত্রে পাওয়া যায়।

চুয়াডাঙ্গার সন্নিকট কোন এক পল্লীগ্রামের একটী রোগক্লিষ্ট নীচজাতীয় লোক একদিন সপরিবারে রামলালবাবুর দ্বারে উপস্থিত হয়।

ভৃত্য সংবাদ দিলে রামলালবাবু স্বয়ং আসিয়া দেখিলেন, লোকটী আশু মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তাহার সাধ্বী স্ত্রী সজলনয়নে বলিল যে, তাহার স্বামী বহুদিন হইতে দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে। দৈবানুগ্রহ না হইলে জীবনের আর কোন আশা নাই দেখিয়া সে তাহার কঙ্কালসার স্বামীকে লইয়া ৬ তারকেশ্বরের দ্বারে হত্যা দিয়া জানিয়াছে রামলাল বাবুর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ খাওয়াইলে তাহার স্বামী রোগমুক্ত হইবে। আশ্চর্য্য বিশ্বাস দেখিয়া সকলে অবাক্ হইলেন। যাহা হউক, রামলাল সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মরণোন্মুখ সেই রোগীকে সস্ত্রীক তাঁহার বাড়ীতে স্থান দিলেন এবং সযত্নে তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ৬ তারকনাথের কৃপায় এক সপ্তাহের মধ্যে এই মরণাপন্ন রোগী সবল শরীরে বাড়ী ফিরিয়া গেল। সে রাজমিস্ত্রীর কার্য্য করিত এবং এই ঘটনার পূর্ব্বে তাহারা আর কখন রাণাঘাটে আসে নাই। দুই মাস পরে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া সে তাহার জীবনদাতা রামলালবাবুর বাড়ী ও তাঁহার জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে একাদিক্রমে প্রায় এক বৎসর কাল রাণাঘাটে রাজমিস্ত্রীর কার্য্য করে এবং তাহার পরও মধ্যে মধ্যে তাহার জীবনদাতার প্রসাদের জন্য আসিত।

রামলালের প্রগাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল। তাঁহার এক মাতুলানীর আদ্যকৃত্যে তাঁহার পুত্র তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেন। বৃদ্ধা মাতুলানীর পারলৌকিক ক্রিয়া অসম্পূর্ণ হইবে—ইহা রামলালের অসহ্য। তিনি যথারীতি বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ও দরিদ্র-সেবার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করেন।

রামলালের মাতুলের জনৈক বন্ধু তাঁহার নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোটে কিছু টাকা কর্জ্জ করেন। পরে কোন লোকের প্ররোচনায় এই দেনা ও হ্যাণ্ডনোট সমস্তই অস্বীকার করেন। অনন্যোপায় হইয়া রামলালকে

আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বিচারের পূর্ব্বদিন জয়লাভের আশায় উক্ত বন্ধু তাঁহার কুল-পুরোহিতের দ্বারা একটী বিরাট স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করেন। স্বস্ত্যয়ন শেষ হইলে পুরোহিতমহাশয়কে ফল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"। ইহাতে ভদ্রলোক মহাক্রুদ্ধ হইয়া চিরদিনের জন্য তাঁহাকে পৌরোহিত্য হইতে বিদায় দেন। এই ঘটনা রামলালের কর্ণগোচর হইলে তিনি পুরোহিত মহাশয়ের অবমাননায় আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তাঁহার ক্ষতি পূরণের জন্য বরাবর সাহায্য করিতেন। তাঁহার পুত্রগণও রামলালবাবুর নিকট অনেকদিন এইরূপ সাহায্য পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, বিচার-ফলে পুরোহিত মহাশয়ের বাক্য সফল হয় এবং ধর্ম্মেরই জয় হয়।

রামলাল ও তাঁহার পত্নী উভয়েরই ইচ্ছা তাঁহাদের একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রনাথের বিবাহ অল্প বয়সে দিবেন। উপনয়নের অল্পদিন পরেই শান্তিপুর-নিবাসী স্বনামখ্যাত সীতানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবীর সহিত নগেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সীতানাথ শান্তিপুর রামনগরপাড়ার একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ে অনেক উন্নতি করেন। তখনকার কালে তিনি বড়লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বৃহৎ অট্টালিকা, তৎসংলগ্ন নিজের স্থাপিত সুন্দর শিবমন্দির, পুষ্পোদ্যান ইত্যাদিতে তাঁহার বাড়ী সুশোভিত ছিল; দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত এবং বাড়ীতে অন্যান্য বিগ্রহের নিত্যসেবা হইত। বিবাহের কিছু দিন পরে বিশ্বেশ্বরী দেবী যখন প্রথম শ্বশুরালয়ে আসেন, সেই বৎসর রামলালবাবু কয়েক সহস্র শিশি কুইনাইন্ খরিদ করেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই ইহার দর প্রায় ছয়গুণ হওয়ায় তিনি যথেষ্ট লাভবান্ হন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, তাঁহার সুলক্ষণা পুত্রবধূকে গৃহে আনায় তাঁহার সংসারে লক্ষ্মী অবতীর্ণা হইলেন।

অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ায় অনেকেই মনে করিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথের লেখাপড়ার হানি হইবে। কিন্তু রামলালবাবু তাঁহার পুত্রের সুশিক্ষার জন্য এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত করেন যে, এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইতেন। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া তিনি অবসরমত অন্য পুস্তক যত্নের সহিত পড়িতেন; নদীয়া জেলা হইতে প্রকাশিত "নবনলিনী" নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় প্রতিমাসে প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি স্থানীয় Students' Associationএর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় "শুভঙ্করী সভা" নামে ছাত্রদিগের একটী Debating Club হয় এবং তিনি তাহার সম্পাদক ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ শিক্ষক ও ছাত্র সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তিনি যখন রিপণ কলেজে পড়িতেন তখন ভারতের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন যে, অনেকবার মণিরামপুরে স্বীয় বাটীতে আহ্বান করেন।

নগেন্দ্রনাথের কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়িবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্বীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা ও কষ্ট স্মরণ করিয়া পিতা রামলাল ইহাতে মত দেন নাই। এই সময় তাঁহার ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টারের অনুরোধে নগেন্দ্রনাথ স্থানীয় বিদ্যালয়ের জনৈক অনুপস্থিত শিক্ষকের স্থানে কয়েক মাস কার্য্য করিতে নিযুক্ত হন। পরে তিনি কিছুদিন ডাক বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পোষ্ট অফিসের কার্য্যে প্রায়ই স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয় শুনিয়া শশীমুখী এই কার্য্যে বেশী দিন পুত্রকে থাকিতে দেন নাই। রামলালবাবু তাঁহার জনৈক ডাক্তার বন্ধুর সাহায্যে নগেন্দ্রনাথকে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পোর্ট কমিসনার অফিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং প্রতিদিন রাণাঘাট হইতে অফিসে

যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কলিকাতা হইতে রাণাঘাট ৪৬ মাইল দূর এবং সে সময় ট্রেণের সংখ্যাও কম ছিল। তথাপি পিতামাতা তাঁহাদের একমাত্র পুত্রকে চক্ষের আড়ালে রাখিতে কষ্ট বোধ করিতেন বলিয়া নগেন্দ্রনাথ ১৬ বৎসর কাল বাড়ী হইতে যাতায়াত করিয়াছিলেন। তিনিই রাণাঘাট হইতে সর্ব্বপ্রথম দৈনিক প্যাসেঞ্জার ছিলেন। যদিও এতদূর হইতে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া যাইতে হইত, তথাপি অফিসের কার্য্যে নগেন্দ্রনাথের কোন ত্রুটী বা শৈথিল্য কেহ কখনও লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও সুশিক্ষা গুণে অফিসের সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। তত্রত্য সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালী কর্ম্মচারী স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র মিত্র নগেন্দ্রনাথকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপর এত বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার স্বাক্ষর দেখিলে তিনি সে কার্য্য পুনরায় দেখা আবশ্যক মনে করিতেন না। ইহাতে কোন লোক হিংসাপরায়ণ হইয়া একদিন নগেন্দ্রনাথের কার্য্যে দোষ দেখাইয়া সাহেবের নিকট অভিযোগ করেন। উত্তরে সাহেব বলিয়াছিলেন, "Don't you come to tell me anything against him. You must bear in mind that before long you will be required to work under him" এইরূপে প্রায় প্রতি বৎসর নগেন্দ্রনাথের পদোন্নতি হইতে লাগিল। পুত্রের অবাধ উন্নতির পথ প্রশস্ত দেখিয়া রামলালবাবু ক্রমে নিশ্চিন্ত মনে স্বীয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সস্ত্রীক নানা তীর্থ-পর্য্যটন এবং স্থানীয় খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ দ্বারা প্রতিদিন নিজগৃহে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা, দরিদ্রের সেবা ইত্যাদি সৎকার্য্যে পরমানন্দে দিনপাত করিতেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রামলাল ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা গিয়াছিল:তাঁহার দুইখানি হস্ত বক্ষস্থলে জপের অবস্থায় রক্ষিত আছে।

পিতার পীড়ার অবস্থা ভাল নহে বুঝিয়া নগেন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই অফিস হইতে ছুটী লইয়াছিলেন। ৮ বৎসরের মধ্যে এই তাঁহার প্রথম ছুটী। পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া নগেন্দ্রনাথ যখন বাড়ী ফিরিলেন তখন মাতার বৈধব্য-বেশ দেখিয়া শোকে অধীর হন। কিন্তু বুদ্ধিমতী মাতা সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা-বাক্যে তাহার সম্মুখে কি কঠোর কর্ত্তব্য আছে বুঝাইয়া দিলে তিনি এরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করেন যে, নিয়ম-ভঙ্গের দিন বৃষোত্তোলনের পূর্ব্বে আর কেহ তাঁহার চক্ষে একবিন্দু অশ্রু বা কোনরূপ ব্যাকুলতা দেখিতে পান নাই।

রামলাল বড়লোক না হইলেও নিঃস্ব ছিলেন না এবং তাঁহার একমাত্র পুত্রকে কোন প্রকার দায়গ্রস্ত করিয়া যান নাই। তাঁহার পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি মাতার হস্তে ন্যস্ত করিয়া নগেন্দ্রনাথ পুনরায় আফিসের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি মাসে মাহিনার টাকা মায়ের হাতে দিতেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতে বা বিনা অনুমতিতে কোন ব্যয় করিতেন না। পিতার দেওয়া বৃত্তিগুলি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

অফিসের প্রধান কর্ম্মচারী উক্ত গিরিশচন্দ্র মিত্র মহাশয় পেন্সন লওয়ার পর নগেন্দ্রনাথের উপর অনেক গুরুভার ন্যস্ত হইল। অমানুষিক পরিশ্রম-সহকারে ও স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে তিনি সুনাম ও যশের সহিত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। আজ যে কার্য্য সমাধা হওয়া সম্ভব, তিনি কখন তাহা পরদিনের জন্য রাখিতেন না। এইজন্য তাঁহার অনেক সময় ট্রেণে বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া যাইত। এইভাবে প্রায় ১৬ বৎসর কাল নিত্য যাতায়াতের পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় বাসা করিতে বাধ্য হইলেন। এজন্য পোর্ট কমিসনারগণ তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া বাড়া ভাড়ার অতিরিক্ত ব্যয় পূরণ করিয়া দেন।

নগেন্দ্রনাথের পারদর্শিতা অসাধারণ ছিল। একদিন তাঁহাকে অপরের সহিত প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বন্দরের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিজের স্মরণশক্তি হইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লিখিয়া দেওয়ার জন্য আদেশ হয়। তাঁহার বিবরণ এত সুন্দর হইয়াছিল যে, তাহাই বিলাত হইতে ফেরি সার্ভিস টাইম টেবলের সহিত মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করা হয়।

পোর্ট কমিশনার্সের খিদিরপুর ডকের জল আদিগঙ্গা হইতে সরবরাহ হয়। গঙ্গা হইতে জল লইলে পলি পড়িয়া ডকের সমূহ ক্ষতি হয়; সুতরাং বহুদিন হইতে এই বন্দোবস্ত চলিয়া আসিতেছে। আদিগঙ্গা খাস গবর্ণমেণ্টের অধীন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আদিগঙ্গা প্রশস্ত করিবার প্রস্তাব হয়। এই অনুকল্পে গভর্ণমেণ্ট পোর্ট কমিশনার্সের নিকট এককালীন ৫লক্ষ টাকা ও বাৎসরিক ৬০ হাজার টাকা ডকের জল সরবরাহের জন্য দাবি করেন। নগেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অকাট্য-যুক্তিপূর্ণ এমন একটী সুন্দর মন্তব্য লেখেন যে, তাহা মুদ্রিত করিয়া সেই মর্ম্মে গভর্ণমেণ্টের দাবির প্রতিবাদ করা হয়। তাহার পর এই প্রস্তাবের আর উত্থাপন হয় নাই। ইহাতে তদানীন্তন সেক্রেটারী সাহেব নগেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছিলেন—"I will not wonder if I find you one day sitting on the Secretary's chair and drawing my pay of Rs 2000 per month." মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। কিন্তু তিনি জীবিত থাকিয়া তাহা দেখেন নাই। স্বদেশপ্রাণ Hilary সাহেব ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন তারিখে শত্রুর গুলিতে নিহত হন।

নগেন্দ্রনাথের অগাধ মাতৃভক্তি ছিল এবং মাতাও সর্ব্বদা নিজের পূজা-অর্চ্চনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও গৃহকর্ম্মে কখন অবহেলা

করিতেন না। রোগীর শুশ্রূষা করিতে তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন। পৌত্র বা পৌত্রী কাহারও অসুখ হইলে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহাদের শুশ্রূষা করিতেন। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, তিনি উপর্য্যুপরি ৭।৮ রাত্রি অনিদ্রায় রোগীর নিকট অকাতরে বসিয়া কাটাইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই এমন সুশৃঙ্খলা ছিল যে, তিনি কাহাকেও কোন দ্রব্য কখন চাহিবার অবসর দিতেন না; সমস্তই পূর্ব্ব হইতে যথাস্থানে রাখিতেন। তাঁহার এরূপ দূরদর্শিতা ছিল যে, তিনি উপস্থিত থাকিলে রন্ধন-গৃহে হউক বা দেব-মন্দিরে হউক, রোগীর পার্শ্বে কিম্বা অভ্যাগতের আহ্বানে কোথাও কোন দ্রব্যের অভাব থাকিত না। তাঁহার ন্যায় পুণ্যবতী স্ত্রীলোক বিরল। তিনি কোন কার্য্যে কখন আড়ম্বর করিতেন না। তীর্থপর্য্যটন, গ্রহণে পুরশ্চরণ, পল্লীস্থ ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন, দরিদ্র কন্যার বিবাহ-দান ইত্যাদি ধর্ম্মকার্য্যে মাতা ঠাকুরাণীর জন্য ব্যয় করিতে নগেন্দ্রনাথ মুক্তহস্ত ছিলেন। কাশীধামে ভাগবত পাঠ ও কথকতা দেওয়ার জন্য শশীমুখী দেবী ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নগেন্দ্রনাথ সেখানে একটী বৃহৎ অট্টালিকা ভাড়া করিয়া নিয়মিত কাল প্রতিদিন প্রাতে ভাগবত পাঠ ও অপরাহ্নে কথকতার ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার বাসায় প্রত্যহ অনেক ভদ্র লোকের সমাগম হইত। ব্রত-সমাপনান্তে কাশীধামে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী অধ্যাপককে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং তাঁহাদিগের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা, ব্রাহ্মণ-ভোজন ও দরিদ্রকে অর্থ-বিতরণে অনেক টাকা ব্যয় হয়।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ শারদীয় পূজার সঙ্গে কিছু দিন ছুটী লইয়া সপরিবারে বৈদ্যনাথধামে বেড়াইতে যান। কয়েক সপ্তাহ অতীত হইলে হঠাৎ একদিন সেই পুণ্যক্ষেত্র মহাপীঠস্থান বৈদ্যনাথ-ধামে শশীমুখী দেবী পুত্র, পৌত্র ও পুত্রবধূর সম্মুখে ৭২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও তিনি বৈদ্যনাথদেবের

মন্দিরে যাইয়া পূজাদি করিয়া আসেন। এই দুর্ঘটনার পরদিনই নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় ও শশীমুখী দেবীর বন্ধুবর্গ সকলেই বলেন যে, তিনি বৈদ্যনাথ-ধামে যাওয়ার পূর্ব্বে প্রত্যেককে বলিয়াছিলেন যে, এই তাঁহার শেষ যাত্রা। অশেষ গুণালঙ্কৃতা পুণ্যবতী রমণী বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকাল নিকট। তিনি একদিনের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হন নাই এবং প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিতেন। নগেন্দ্রনাথ মহাসমারোহে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ রাণাঘাটে সম্পন্ন করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কাশীধামে মাতার সপিণ্ডকরণ হয় এবং সে সুযোগ সহজেই উপস্থিত হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথের পরম আত্মীয় ও জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ডাক-বিভাগে একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সপরিবারে কাশীবাস করিতেছিলেন। ইঁহার যত্নে নগেন্দ্রনাথ তাঁহার বাসনা সফল করিতে সক্ষম হন। তিনি পরবৎসর অফিস হইতে ছুটী লইয়া সপরিবারে কাশী যান এবং সেখানে অমৃতলাল ও তাঁহার পরিবারবর্গের সাহায্যে মাতার সপিণ্ডকরণ সমারোহে সম্পন্ন করেন।

শশীমুখী দেবীর স্বর্গারোহণের পর নগেন্দ্রনাথ যেদিন প্রথম অফিসে আসেন সেই দিন হইতেই তাঁহার পদোন্নতি হয় এবং তিনি পোর্ট-কমিশনারগণের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি বলেন, ইহা স্বর্গ হইতে তাঁহার মাতার আশীর্ব্বাদের প্রত্যক্ষ ফল। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসীকে এই পদ দেওয়া হয় নাই। তিনি এরূপ যোগ্যতার সহিত এই কার্য্য করেন যে, তাঁহাকে একাধিকবার সেক্রেটারীর পদে officiate করিতে দেওয়া হয়। উচ্চপদস্থ হইয়াও নগেন্দ্রনাথ কিছুমাত্র গর্ব্বিত হন নাই। তিনি নম্র, বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী। দাম্ভিকতার লেশমাত্র তাঁহাতে নাই। পোর্ট কমিশনারগণের অসংখ্য

কর্ম্মচারীর মধ্যে কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দু,কি মুসলমান এমন কোন লোক নাই যিনি নগেন্দ্রনাথের সাহায্য বা পরামর্শ চাহিয়া বিফল হইয়াছেন। শত শত লোক তাঁহার সাহায্যে চাকরী পাইয়াছেন এবং কত লোক যে, চাকরী সংক্রান্ত বিপদ বা শাস্তি হইতে তাঁহার চেষ্টায় রক্ষা পাইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই জন্য উচ্চ নীচ সমস্ত কর্ম্মচারী তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মান্য করিয়া থাকেন। Sir Frederick Dumayne, Sir Clemont Hindley, Sir Charles Stuart-Williams প্রভৃতি উপরিতন সাহেবগণ তাঁহার অপূর্ব্ব স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অভাবনীয় পরিণামদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। সম্প্রতি মহামান্য বড়লাট বাহাদুর তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। এই সম্মান পোর্ট কমিশনারগণের আর কোন কর্ম্মচারী পূর্ব্বে পান নাই।

এতদুপলক্ষে বঙ্গের লাট মাননীয় Sir Stanley Jackson মহোদয় গত ৩ ডিসেম্বর তারিখের দরবারে নগেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—"Rai Nagendra Nath Ganguly Bahadur, you entered the service of the Commissioners of the Port of Calcutta 37 years ago and have worked your way up to the post of Senior Assistant Secretary. Your long, faithful and meritorious services have earned for you the distinction conferred upon you. I congratulate you."

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের উদ্দেশ্যে নগেন্দ্রনাথ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১ এপ্রিল হইতে দীর্ঘকালের জন্য ছুটী লইয়াছেন। তদুপলক্ষে পোর্ট কমিশনারগণের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মাননীয় Mr. Elderton, M. A. মহোদয় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"Rai Nagendra Nath Ganguli Bahadur first entered

the Commissioners' service in 1892 as a Clerk in the Secretary's office. By gradual promotion he rose to First Assistant iu 1908 and Head Assistant in 1918. He was appointed Assistant Secretary in 1922, and has twice officiated as Secretary. He was made a Rai Bahadur last year, and he is the first member of the Commissioners' service upon whom this honour has been bestowed.

"He is a man of exceptional mental ability, and his knowledge of the history of Port Trust affairs is extensive and accurate. I personally shall miss him very much. I have worked with him ever since I joined the Trust, and his help and advice have always been of the greatest assistance to me. The Commissioners are losing a very valuable officer, and his loss will be particularly felt in the Secretary's Department".

পোর্ট কমিশনারগণ উক্ত মন্তব্য তাঁহাদিগের 2059th Meeting Proceedings-এর সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া ১০ এপ্রিল তারিখে যে Resolution করেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"Resolution No. 216. Resolved that the Commissioners place on record their appreciation of the long, faithful and efficient services rendered by the retiring officer."

পরদিন "Statesman", "Amrita Bazar Patrika" "Advance", "Bengalee", "Liberty" প্রভৃতি সমুদয় দৈনিক সংবাদপত্র উক্ত মন্তব্য ও Resolution সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯ এপ্রিল তারিখের "অমৃত বাজার পত্রিকায়" নগেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ তাঁহার অফিসে Co-operative Credit Society প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। প্রথমে অনেকে এই সমিতির সেয়ার খরিদ করিতে সন্দিহান ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য স্বয়ং সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা সেয়ার খরিদ করিয়া সমিতির উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। ইহা হইতে কর্ম্মচারিগণের সহজে ও অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পাওয়ার অনেক সুবিধা হইয়াছে। এই সমিতির উপকারিতা এখন সকলেই সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ প্রায় ৮ বৎসর কাল এই সমিতির সেক্রেটারী-পদে নির্ব্বাচিত হইয়া ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং এখনও তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী অনুসারে ইহার কার্য্যাদি হইয়া থাকে। তিনি যে সময় প্রথম ইহার সেক্রেটারী-পদ গ্রহণ করেন, তখন সমিতির মূলধন ও ডিপজিট ১,৮৪,০০০৲ টাকা ছিল এবং তাঁহার পদত্যাগের সময় ইহা ৬,৩৩,০০০৲ টাকা হইয়াছিল। সমিতির এই উন্নতি নগেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক চেষ্টার ফল ও অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

নগেন্দ্রনাথ কলিকাতার দক্ষিণাংশে কালীঘাটের সন্নিকট বালিগঞ্জ এভেনিউ নামক নূতন প্রশস্ত রাস্তার উপর রাজপ্রাসাদতুল্য একটী সুরম্য ত্রিতল অট্টালিকা মনোরম উদ্যানসহ নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। তাঁহার বাড়ী এত সুন্দর হইয়াছে যে, সিনেমা সম্প্রদায় বায়স্কোপের জন্য ইহার ছবি লইয়াছেন এবং অনেকে ইহার নূতন নূতন ডিজাইন অনুকরণ করিবার জন্য নক্সা বা ফটোগ্রাফ লইয়া থাকেন। পিতার ন্যায় নগেন্দ্রনাথ দেশহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা উদ্যোগী। তিনি Word 27, Health Associationএর এবং East Club ও South Calcutta Instituteএর Vice-President থাকিয়া স্বীয় ওয়ার্ডের

অনেক উন্নতি করিতেছেন। একমাত্র তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতা কর্পোরেশন বালীগঞ্জ এভেনিউ ও লেক রোডের মোড়ে একটী বাজার স্থাপিত করিয়াছেন। দিন দিন এই বাজারের উন্নতি হইতেছে এবং এই অল্প দিনের মধ্যেই ইহার আয়তন বৃদ্ধি করা হইতেছে। পূর্ব্বে এইস্থানের সমস্ত লোককে প্রায় দেড় মাইল দূরে কালীঘাট হইতে বাজার করিতে হইত।

বাজারের ন্যায় এখানে একটী উচ্চ বিদ্যালয়ের অভাব ছিল। নগেন্দ্রনাথ এই অভাব মোচন করিবার জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার বাড়ীতে স্থানীয় ভদ্রলোকগণকে আহ্বান করেন। সভায় সকলেই স্কুলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন কিন্তু প্রচুর অর্থ সংগ্রহ না করিয়া ইহাতে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে, ইহাই স্থির হয়। নগেন্দ্রনাথ ইহাতে নিরস্ত না হইয়া স্থানীয় কয়েকটি বন্ধু ও স্বীয় পুত্রগণের সাহায্যে কয়েক দিনের মধ্যেই একটী উচ্চ শ্রেণীর স্কুল স্থাপন করেন। এখন ইহার ছাত্রসংখ্যা প্রায় চারি শত। এই স্কুল সত্বর নগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রগণের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী নগেন্দ্রনাথের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী। তিনি শাশুড়ীর ন্যায় দানশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা। কোন ভিক্ষুককে তাঁহার দ্বার হইতে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয় না। কয়েকটী দরিদ্র ছাত্র তাঁহার আবাসে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জনে সহায়তা পান। তিনি কাশী ধামে একাধিক দরিদ্র পরিবারের জন্য মাসিক ও সাময়িক বৃত্তি দিয়া থাকেন। ভদ্রবংশ-সম্ভূত কোন একটী উপায়াক্ষম অন্ধ দরিদ্র পিতার কন্যার বিবাহের সমস্ত ভার বিশ্বেশ্বরী দেবী নিজে বহন করেন। ইহার পিতা সীতানাথের স্বর্গারোহণের পর চতুর্থ শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন এবং নিজব্যয়ে তাঁহার ভ্রাতাগণকে কাশীধামে পাঠাইয়া

আগুকৃত্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া পিতার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করেন। দরিদ্রকে অন্নদান তাঁহার নিত্য কর্ম্ম এবং ব্রতাদি উপলক্ষে তিনি প্রতি বৎসর যথেষ্ট ব্যয় করিয়া থাকেন।

নগেন্দ্রনাথ ও বিশ্বেশ্বরী দেবীর একটী কন্যা ও তিনটী পুত্র। কন্যার বিবাহ ভাটপাড়ার স্বনামখ্যাত ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র চণ্ডীচরণের সহিত হইয়াছে। চণ্ডীচরণ পোর্টকমিশনার্স আফিসের উচ্চ কর্ম্মচারী।

প্রথম পুত্র কালিদাস মেডিক্যাল কলেজে আগু M. B. পরীক্ষায় খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী পরীক্ষার কয়েক দিন পূর্ব্বে Appendicitis রোগাক্রান্ত হইয়া পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। বহুদিন এই ব্যাধিতে কষ্ট পাইয়া অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। মিলিটারি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কণ্ট্রোলার শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী দুর্গা-রাণীর সহিত কালিদাসের বিবাহ হইয়াছে। পেন্সন লইয়া আশুবাবু হুগলিতে গঙ্গাতীরে বাড়ী করিয়াছেন। তাহার আদিনিবাস বলাগড়। দুর্গারাণী সুশিক্ষিতা এবং সংসারধর্ম্মে ও নানা প্রকার সূক্ষ্মশিল্পকার্য্যে সুনিপুণা। তাঁহার মত নম্রস্বভাবা, সর্ব্বগুণান্বিতা কর্ম্মিষ্ঠা পুত্রবধূ বিরল।

দ্বিতীয় পুত্র দুর্গাদাস প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বিশিষ্টতার সহিত B. Sc. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পোর্ট কমিশনার্স অফিসে উচ্চ বেতনে Auditorএর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত। প্রাতঃ-স্মরণীয় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত ভবদেবের একমাত্র কন্যা রেণুর সহিত ইঁহার পরিণয় হইয়াছে। এই বাঙ্গালী বালিকাই সর্ব্বপ্রথমে পিতার সহিত Aeroplaneএ উঠিয়াছিলেন এবং মোটরে কাশ্মীর যাত্রা করেন। রেণু কর্ম্মিষ্ঠা ও অসাধারণ বুদ্ধিমতী।

কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রদাস ইউনিভারসিটি কলেজ হইতে M. A. পরীক্ষার

জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই সময়ে অনেক চেষ্টার ফলে কলিকাতা কাষ্টম হাউসে Appraiserএর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালীকে এ কার্য্যে লওয়া হইত না। Indianisation-আন্দোলনের ফলে আজকাল সে অন্তরায় দূর হইয়াছে। দার্জ্জিলিং সহরের স্বনামখ্যাত সদাশয় উকীল স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী এবং বদান্য পিতার দানশীল পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম প্রধান ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিজয়ার সহিত ক্ষেত্রদাসের বিবাহ হইয়াছে। বিজয়া দয়াশীলা ও মিষ্টভাষিণী।

ভগবান্ নগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারবর্গের উত্তরোত্তর মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করুন।

বিশ্বামিত্র
|
বলায়ি
|
হেরম্ব
|
শৌরী

জগন্নাথ   পীতাম্বর   রবি
|
দামোদর
|
কুলপতি
|
শিশু (বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলীন্য-মর্য্যাদা-প্রাপ্ত)

আয়ু   হলধর   গদাধর   বিনায়   বল   শিব
|
পুরাই (পুরুষোত্তম)
|
ভৈরব

শ্রীধর   বিশ্বম্ভর   রাঘব   নবাই   রমাই
|
নীলকণ্ঠ (খড়দহ মেল)

শ্রীপতি   রঘু   যাদব   কেশব
|
রামনাথ
|
রাঘব (বিবাহ করেন বেগে বটব্যাল-কন্যা)
|
রামচন্দ্র   রঘুনাথ   শ্রীকৃষ্ণ   রামকৃষ্ণ

রামচন্দ্র
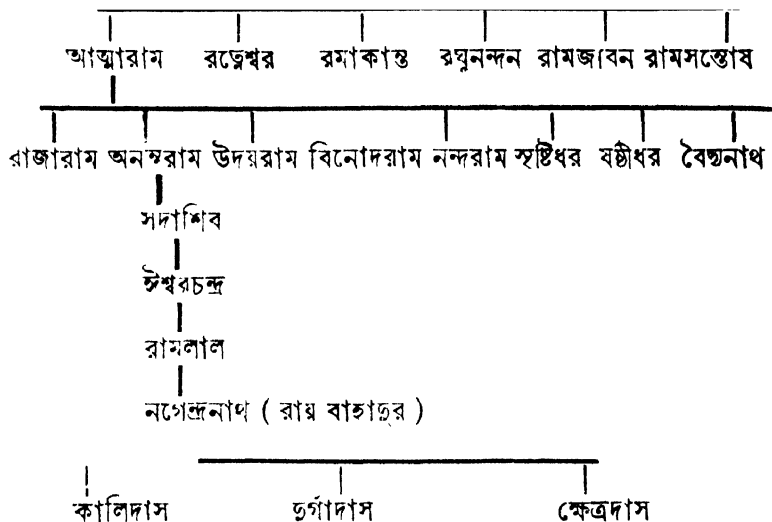
আরুহ্য পঞ্চ তুরগানসিবাণ তূণ
কোদণ্ড রম্য কবচাদি শরীর ভূষাঃ।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি বঙ্গে
শাকে শরাব্ধিঋতুমে জ্বলদগ্নি তুল্যাঃ ॥ ৫৪
আগচ্ছতো দ্বিজবরান্ প্রসমীক্ষ্য দূতো
রাজান্তিকে করপুটো বিনিবেদিতশ্চ।
ভূপস্থ হর্ষসলিলৈরভিষিক্ত দেহো
দূতায় কাঞ্চনময়ঞ্চ দদৌ সুহারম ॥ ৫৫

কুলতত্ত্বার্ণব

শর ৫ অব্ধি ৭ ঋতু ৬ অঙ্কস্তবামাগতি ৬৭৫ শাকে, ইং ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

মুখ্যগৌণাবরাশ্চৈব চকার স ত্রিধা কুলম্।
শাকে সপ্তাঙ্কশূণ্যেন্দুমিতে নরপতিঃ স্বয়ম্॥ ২০৯
ততো রাজা জগদাদৌচ্চৈ ব্রাহ্মণানাঞ্চ শৃণ্বতম্।
যয়া নির্ব্বাচ্যতে যদ্ যত্তত্তৎ সর্ব্বং বিধার্য্যতাম্॥ ২১০

*   *   *   *   *

উৎসাহ গরুড় খ্যাতৌ মুখবংশ প্রতিষ্ঠিতৌ।
গাঙ্গলীয়ঃ শিশুনামা কুন্দো রোষাকরস্তথা॥ ২১৪

৭৯০১ = ১০৯৭ শাকে অর্থাৎ ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪২২ বৎসর পরে কুল মর্য্যাদা স্থাপিত হয়।

ঢাকা জিলার মামুদপুরের জমিদার ও কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ ধনী মহাজন শ্রীযুক্ত সীতানাথ চৌধুরী

ঢাকা জিলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ মামুদপুর (মহম্মদপুর) গ্রামের বৈশ্য চৌধুরী জমিদার-বংশের ইতিহাস লিখিতে গেলেই 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা এবং স্বধর্ম্মানুরাগ ও পরোপকার-প্রভৃতিতে যে সাংসারিক উন্নতি সাধিত হয় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই বংশ বৈশ্যসমাজে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন, সম্মানভাজন বহু পুরাতন বনিয়াদি ঘর। এই বংশের আদি স্থাপয়িতা বৃন্দাবনচন্দ্র বৈশ্য চৌধুরী। ইঁহার চারি প্রপৌত্র মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মনোহর নিঃসন্তান; অবশিষ্ট তিন প্রপৌত্র যুগলকৃষ্ণ, কেবলকৃষ্ণ ও ব্রজমোহন।

বৈশ্যোচিত ব্যবসায়ের আকর্ষণে প্রাচীন কালের বাঙ্গালীদের চির-প্রিয় নীতি বিদেশ-গমন-বিমুখতা পরিত্যাগ ও অদম্য সাহসে নির্ভর করিয়া কেবলকৃষ্ণ ও যুগলকৃষ্ণ দুই ভাই বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত তখনকার দিনে ভীষণ জঙ্গলাদি পূর্ণ, হিংস্রপশুসমন্বিত দস্যু-তস্করাদি-অধ্যুষিত ঝিলনা ফরিদপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া বালাম চাউলের কারবার ও বন্দর স্থাপন করেন। ক্রমে কারবারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাখরগঞ্জের মধ্যে বন্দর ফরিদপুর নামক স্থানে গোলা নির্ম্মাণে সদর মোকাম স্থাপনে—ঝিলনা, ভূইরা, কানাইপুর, আমিরাবাদ প্রভৃতি স্থানে শাখা স্থাপনে এবং কেবলকৃষ্ণ কলিকাতা আগমন করতঃ হাটখোলা, গঙ্গার ধারে ২নং নয়ান সুর লেনে গদীবাড়ী স্থাপনে চাউলের

চালানী কাজ আরম্ভ করেন। যুগলকৃষ্ণ বাখরগঞ্জে থাকিয়া নানা স্থান হইতে প্রভূত চাউল খরিদ ক্রমে গোলাতে বাধাই করিয়া রাখিতেন এবং কেবলকৃষ্ণ কলিকাতায় থাকিয়া বাজারের অবস্থা অনুসন্ধানে চাউল পাঠাইতে সংবাদ দিলেই যুগলকৃষ্ণ চাউল পাঠাইয়া দিতেন এবং কেবল-কৃষ্ণ কলিকাতার বাজারে সুযোগ বুঝিয়া বিক্রি দিয়া প্রভূত লাভ করিতেন। সে সময় ইঁহাদের কাজ ভগবৎ কৃপায় এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে, ৫।৭ হাজার কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল এবং তিন শতাধিক বড় বড় চালানী নৌকা ইঁহাদের নিজেদের ছিল। কেবলকৃষ্ণের আমলে কলিকাতার চাউলের বাজারে তাঁহার এতদূর প্রতিপত্তি ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে চাউলের বাজার-দর উঠাইতে নামাইতে পারিতেন।

কিন্তু এতাধিক ধনার্জ্জনেও ইঁহারা অহঙ্কারে স্ফীত না হইয়া পূর্ব্ববৎ নিরভিমান, সরল ও বিনয়ী ছিলেন এবং স্বধর্ম্মানুরাগ ও সততাই ইঁহাদের ব্যবসায়ে উন্নতির মূলকারণ ছিল। পরোপকার-প্রবৃত্তি ইঁহাদের অনন্য-সাধারণ ছিল। এখনকার নব্য শিক্ষা না থাকিলেও তাঁহাদের ভাই ভাই ঠাই ঠাঁই ছিল না। তাঁহারা ব্যবসায়ে প্রভূত ধনসম্পত্তি লাভ করিয়া তাহা মাত্র আত্মসুখে, ঐহিক সম্ভোগে নিয়োজিত করিতেন না; ধর্ম্মানুরাগ ও পরোপকার-বৃত্তিতে উদ্দীপিত হইয়া মামুদপুর বাড়ীতে সদাব্রত অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এখনকার দিনের রিলিফ (Relief) কার্য্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অতি বৃহৎ বৃহৎ বিংশত্যাধিক দীঘি ও সাগর মামুদপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার জন্য খনন করাইয়া উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে রীতিমত সানবাঁধা ঘাটে পথিকের ব্যবহার জন্য তুলসীবৃক্ষ স্থাপিত, পুষ্পচন্দনাদির ব্যবস্থা ও চিড়া খাইবার জন্য পাথরের বাটী সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। পথিকদের বিশ্রামার্থ ঘাটের উপর পাকা চিল ছত্র করিয়া দিয়াছিলেন। নিজ গ্রামে মদনমোহন বিগ্রহ

স্থাপন করিয়া তাঁহার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও গঙ্গাধারে ২নং নয়ান সুর লেনস্থ বাড়ীর সংলগ্ন যে মহাপ্রভু স্থাপিত আছেন, তিনিও ইঁহাদের যত্নে ও অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হন। বহু ব্রাহ্মণের বিবাহ ও উপনয়ন কার্য্য ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ইঁহারা সম্পন্ন করিয়াছেন এবং পুরী, বৃন্দাবন ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে তীর্থগুরু পাণ্ডাগণের বাসের জন্য ইমারত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া ইঁহারা নানা প্রকার বৈদিক যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করান; তৎপর তুলাদান. পঞ্চাগ্নি, নবাগ্নি হিরণ্যগর্ভ অবশেষে স্বর্গারোহণ ও কল্পতরু দান পর্য্যন্ত করিয়া অসামান্য পুণ্য সঞ্চয় করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে জমিদারী, তালুকদারী খরিদ ক্রমে দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ হন।

কালের কুটীল গতিতে এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর অপ্রসন্নতায় যুগলকৃষ্ণ ও ব্রজমোহনের বংশধরগণের উপযুক্ত পরিদর্শন ও পরিচালনের ত্রুটীতে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে ও তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষাগত বৈশ্যদের জাতীয় ধর্ম্ম ব্যবসায় ত্যাগ করেন। ব্রজমোহনের বংশধরগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী বি-এল হাইকোর্টের উকিল এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চৌধুরী এম-বি ডাক্তার হইয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছেন।

কেবলকৃষ্ণের প্রথম পুত্র দ্বারিকানাথের শৈশবেই মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সীতানাথ চৌধুরী এখনও জীবিত আছেন। তাহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও, নানাপ্রকার ঝড়ঝঞ্জা সহ্য করিয়াও, বহুপ্রকার মানসিক ও শারীরিক কষ্ট অশান্তি ভোগ করিয়াও, স্বীয় অনন্য-সাধারণ প্রতিভা, কর্ত্তব্যানুরাগ, দৃঢ়তা, সততা, অধ্যবসায় ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা, স্বধর্ম্মানুরাগ এবং পরোপকার-প্রবৃত্তির গুণে তিনি কেমনে বৈশ্যদের জন্মাগত বৃত্তিব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর

কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই, বরং প্রভূত উন্নতিলাভে কলিকাতা হাটখোলার মধ্যে প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার বলিয়া সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছেন।

আশী বৎসর পূর্ব্বে ১২৫৮ সালের ২২শে শ্রাবণ, বুধবার সীতানাথের জন্ম হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের উদয়ে তাঁহার ১৩ দিন বয়ঃক্রম-কালেই পিতৃবিয়োগ ঘটিয়া তিনি অভিভাবকশূন্য হন সরিকগণ বঞ্চনা ও প্রতারণার বশবর্ত্তী হইয়া ১২৬০ সনে স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি ও কাজকারবার এবং চাউল খরিদের মোকামাদি পৃথক করিয়া দেন। নাবালক শিশু সীতানাথের পক্ষে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাগিনেয় মহিমচন্দ্র সাহা অভিভাবক-রূপে ম্যানেজার হইয়া বণ্টনভাগ যাহা পাইলেন বুঝিয়া লইয়া কাজকারবার চালাইতে থাকেন। সরিকগণের চক্রান্তে সীতানাথ উপযুক্তরূপ অংশ না পাইয়া গৃহে সঞ্চিত অসংখ্য সাবেকী নোট টাকা ও অস্থাবর সম্পত্তির সামান্য অংশই পাইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বারিকানাথের মৃত্যুতে তাঁহার মাতা শোকে এতাধিক অভিভূত হইয়াছিলেন যে, সীতানাথের প্রতি তেমন মনোযোগ দিতে পারিতেন না। জনৈক প্রতিবাসিনী পরিচারিকার প্রতি ইঁহার প্রতিপালনের ভার ছিল এবং ঐ পরিচারিকার বাড়ী মোটা চাউলের ভাত ও পুঁটী মাছের ঝোল খাইয়া শৈশবে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রায় দশম বর্ষ বয়সে বেলেটীর বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র বাবুর (ডিগুবাবুর) ভগিনী হরকুমারী চৌধুরাণীর সহিত মহাসমারোহে ইঁহার বিবাহ হয়। এ বিবাহে এই নাবালকের ষ্টেটের প্রায় ২৫।৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া যায়। দেশে পাঠশালায় সীতানাথের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়, পরে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য ডিগুবাবু ইঁহাকে ঢাকা পোগোজ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিন্তু নিয়ত

পারিবারিক অশান্তি হেতু আশাহত হইয়া তাঁহার আপন বলিতে কেহ নাই জানিয়া, শেষ জীবনে দেবসেবা ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপ গেরেট্ হস্পিটালে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার ও নিজ নামে দুইটী প্রসূতি ওয়ার্ড স্থাপন করিয়াছেন; তাহাতে সমাজে ঘৃণিতা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব-পরিত্যক্তা, দেশ ও সমাজ হইতে বিতাড়িতা এবং সর্ব্বপ্রকারেরই আসন্নপ্রসবা দুঃস্থা মাতৃজাতির সুপ্রসবের এবং প্রসবান্তে কিছুদিন পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া স্বাস্থ্যলাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং ইহার ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ জন্য গভর্ণমেণ্টের হস্তে উপযুক্ত অর্থ জমা রাখিয়াছেন। দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদীপ দরিদ্র ছাত্রগণের পঠন-পাঠনে সহায়তার জন্য ইনি ইঁহার ৭১এ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্স্থ বৃহৎ দ্বিতল বাটীখানা দরিদ্র ছাত্রগণের বিনাভাড়ায় বসবাসের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়া কলিকাতায় একটী নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন জিলার অন্ততঃ ২৫টী দরিদ্র ছাত্রের চির-আশীর্ভাজন হইয়াছেন। অনেক দরিদ্র ছাত্রের পরীক্ষার ফিস এবং পুস্তকাদির মূল্যও ইনি দিয়া থাকেন। স্বীয় প্রতিভা ও আত্মনির্ভরতা-বলে সীতানাথবাবু কর্ম্মজীবনে অসামান্য সাফল্য লাভ করিলেও পারিবারিক জীবনে আজন্ম দুর্ভাগ্যের ফলে বড়ই ভাগ্যহীন; যাহা হউক, এই শেষ জীবনে তিনি রোগ-খিন্ন ক্লান্তদেহে ও ভগ্নস্বাস্থ্যে এই প্রকার দেবসেবা ও জনসেবায় রত থাকিয়া ভগবানের নির্ম্মল করুণা ও হৃদয়ে পরিপূর্ণ শান্তিলাভ করিতে থাকুন, ইহাই কামনা।

বাগবাজারের সাহা-পরিবার

—◌:◌—
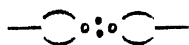
বঙ্গীয় হিন্দু জাতিগণের মধ্যে যে সমস্ত বৈশ্যসম্প্রদায় দেখা যায়, তন্মধ্যে বৈশ্যসাহা-সম্প্রদায় অন্যতম। স্মরণাতীত কাল হইতে অন্যান্য বণিক-সম্প্রদায়ের মত এই সাহাবণিকগণ নানাবিধ বাণিজ্যকার্য্য চালাইয়া আসিয়াছেন। আজিও ভূষিমাল, পাট ও শস্যাদির আমদানি রপ্তানি ব্যাপারে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতেছেন এবং সাধারণতঃ এই সম্প্রদায় বণিক-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হাটখোলা-পল্লীতে প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে ৺ফকিরচাঁদ সাহা মহাশয় বাণিজ্য-ব্যপদেশে যথেষ্ট বিত্ত ও সুনাম সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ফকিরচাঁদের পূর্ব্বপুরুষের আদিনিবাস বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামে ছিল। পরে সপ্তগ্রামের পতন-দশার প্রাক্কালে তাঁহারা সপরিবারে হুগলী জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত দশঘরা গ্রামের সন্নিকটস্থ কৃষ্ণপুর নামক গ্রামে আপনাদের বাসস্থাপন করেন এবং তথা হইতে শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানের সহিত বাণিজ্যকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। অতঃপর ইংরাজ-শক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কলিকাতার সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ-স্থাপনে যত্নবান্ হয়েন। এই সূত্রে বাধ্য হইয়া ফকিরচাঁদের পিতাকে বিগত শতাব্দীর প্রাক্কালে কলিকাতার হাটখোলায় স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে হয়। পিতার মৃত্যুর পর ফকিরচাঁদ স্বকীয় অধ্যবসায়ের বলে আপন ব্যবসায়ের অভূতপূর্ব্ব উন্নতিসাধন করতঃ আপনার সুদৃশ্য বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান। ইহাই হাটখোলার "পুরাতন বাড়ী"

নামে খ্যাত এবং তদনুসারে ফকিরচাঁদের বংশোদ্ভব অধস্তন ব্যক্তিগণ হাটখোলার "পুরাতন বাড়ী"র সাহা নামে পরিচিত।

ফকিরচাঁদের বংশ এক্ষণে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়া কলিকাতার নানা অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তন্মধ্যে যাঁহারা বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে গিয়া বাস স্থাপন করেন, তাঁহারাই বাগবাজারের সাহা নামে পরিচিত। হাটখোলার সেই পুরাতন বাটী আর বর্ত্তমানে নাই, তাহার কতকাংশে ৺ফকিরচাঁদের বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বনবিহারী সাহা মহাশয়দিগের নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ফকিরচাঁদের সুখময়, স্বরূপচাঁদ, প্রেমচাঁদ, বদনচাঁদ ও রাজীবলোচন নামে পাঁচ পুত্র ছিলেন। ফকিরচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণও কেহ পাটের, কেহ ভূষিমালের, কেহ চাউলের ব্যবসায় করিতে থাকেন। যে সময় বংশবিস্তারবশতঃ হাটখোলার পুরাতন বাটীতে স্থানাভাব ঘটে, সেই সময় ফকিরচাঁদের তৃতীয় পুত্র, প্রেমচাঁদের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ নবীনচাঁদ ও কনিষ্ঠ দয়ালচাঁদ, উভয়েই বাগবাজারের ৬ নং দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির ষ্ট্রীটস্থ তদীয় মাতুলালয়ে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মাতুলদের কোন উত্তরাধিকারী না থাকাতে, তাঁহারাই মাতুলদের ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। সেই সময় হইতে তাঁহারা বাগবাজারের সাহা নামে পরিচিত হন।

নবীনচাঁদ ও দয়ালচাঁদ কিছুকাল উক্ত বাটীতে কালাতিপাত করিবার পর, উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। তাহার ফলে কনিষ্ঠ দয়ালচাঁদ সমস্ত সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ নবীনচাঁদকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দিয়া, নিঃস্বভাবে আপন ভগ্নীপতি বাগবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী ৺লক্ষ্মীনারায়ণ খাঁর বাটীতে গিয়া আশ্রয় লাভ করেন।

দয়ালচাঁদ স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। কাজেই, ভগ্নীপতির গলগ্রহ হইয়া দীর্ঘকাল থাকা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর বোধ হইল এবং তিনি

আত্মোন্নতির জন্য যত্নবান্ হইলেন। আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে ও দক্ষতার গুণে তিনি অল্পকাল মধ্যেই ভুষিমালের ব্যবসায়ে যথেষ্ট বিত্ত সঞ্চয় করিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ছিল যেমন অসীম, তাঁহার সাহসও ছিল তেমনি অতুলনীয়। নিদারুণ কষ্টের সময় তিনি বিচলিত না হইয়া,—স্থির ও ধীরভাবে জীবনের প্রবল ব্যাত্যা ও ঝঞ্চার সহিত সাহসে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপন জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। স্বীয় ভাগ্যোদয়ের পর, তিনি ভগ্নীপতি ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ খাঁর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, বাগবাজার মুখুয্যেপাড়ায় নব বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সাধু ব্যবসায়ী-হিসাবে তাঁহার সুনাম স্থানীয় ব্যবসায়ী-মণ্ডলে বিস্তার লাভ করে। অদ্যাবধি কোন কোন প্রাচীন লোকের মুখে তাঁহার সুনাম ও যশ শ্রুত হওয়া যায়।

দয়ালচাঁদের দুই পুত্র—শ্যামাচরণ ও অভয়চরণ। দয়ালচাঁদের জীবদ্দশাতেই জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুতে বৃদ্ধ দয়ালচাঁদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। তথাপি শোকে আত্মবিস্মৃত না হইয়া তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের তিন পুত্র—নারায়ণ চন্দ্র, কমলকৃষ্ণ, নয়নকৃষ্ণ ও আপনার কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চরণকে অত্যধিক স্নেহ ও যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার ক্রমশঃ কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চরণের উপর পতিত হয়। তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন এবং বাগবাজার অঞ্চলের অনেকের সঙ্গেই তাঁহার একটা মধুময় প্রীতির সম্পর্ক ছিল। অভয়চরণ এই প্রীতির সম্পর্কটুকু দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন রাখিয়া বিগত ১৯১০ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে, ৬২ বৎসর বয়সে, আপনার একমাত্র পুত্র বিনয়কৃষ্ণ এবং তিন কন্যা—গৌরকিশোরী, রাধাকিশোরী ও ব্রজকিশোরীকে রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। কলিকাতা করপোরেশন তাঁহার বাসগৃহের সন্নিকটস্থ

একটা রাস্তার তাঁহার নামে নামকরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতিটুকু বজায় রাখিয়াছেন।

গৌরকিশোরীর বিবাহ হয় ৺ কাঙ্গালীচরণ সাধুখাঁর সহিত, রাধাকিশোরীর বিবাহ হয় ৺ রাধানাথ সামুইএর সহিত, এবং ব্রজকিশোরীর বিবাহ হয় ৺ শশিভূষণ মণ্ডলের সহিত। অভয়চরণের দৌহিত্রগণ এক্ষণে স্থায়ীরূপে বাগবাজারে বসবাস করিতেছেন।

শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণচন্দ্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়স হইতে নানাবিধ ব্যবসায়কার্য্যে লিপ্ত আছেন, কিন্তু তিনি কোন ব্যবসায়ই স্থায়ী করিতে পারেন নাই। কলিকাতার সন্নিকটস্থ গোরক্ষবাসী নামক গ্রামে তিনি একটী দীর্ঘ জলাশয় খনন করাইয়া, তথাকার অধিবাসীদিগের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া আপন মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন।

ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা ৺ কমলকৃষ্ণ সাহা। ৺ কমলকৃষ্ণ বাগবাজারের সাহা-পরিবারের কুলপ্রদীপ। জীবনের প্রভাতে সপ্তম বর্ষ বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। পিতামহের অপরিসীম স্নেহে এবং অক্লান্ত যত্নে তিনি পিতার অভাব কোন দিনই বুঝিতে পারেন নাই। তদীয় উপদেশে তিনি সযত্নে পাঠাভ্যাসে রত হন এবং যথাসময়ে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তদানীন্তন জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে এফ্-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েন। এফ্-এ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ স্বর্গলাভ করেন। এই পরিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁহার পাঠে বাধা পড়ে এবং তিনি সাংসারিক কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

আজ বাগবাজার অঞ্চলে যে বিপুল চূণের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কমলকৃষ্ণকে তাহার Pioneer বা প্রথম পথ-প্রদর্শক বলা চলে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ Gladstone Wyllie কোম্পানীতে কিছুকাল কর্ম্ম করিবার পর, কমলকৃষ্ণ চাকুরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া, স্বাধীনভাবে বাগবাজারে প্রথম চূণের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে

এক্ষণে বহু ব্যবসায়ী উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, কলিকাতার ঐ অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ টাকার এক বিপুল ব্যবসায়ের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছেন।

চূণ-ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কে, কে, সাহা এণ্ড কোম্পানীর নাম ও সুযশ আজিও সুপ্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত, কমলকৃষ্ণ কলিকাতা করপোরেশন, ই-আই রেলওয়ে প্রভৃতির কনট্রাক্টর ছিলেন এবং ঐ সকল কার্য্যেও যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পল্লীর সাধারণের কার্য্যের প্রতি কমলকৃষ্ণের একটা আন্তরিক অনুরাগ ছিল এবং সেরূপ কোন কার্য্যের একবার ভার গ্রহণ করিলে তিনি তাহাতে আপনার সমস্ত মন-প্রাণ নিয়োগ করিতে পারিতেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বাগবাজারের স্বনামধন্য ৺ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাতীরস্থ স্নানের ঘাটটি বিপুল অর্থব্যয়ে কলিকাতার পোর্ট কমিশনারগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। প্রাতঃস্মরণীয় কাশিমবাজারের মহারাজের প্রতিষ্ঠিত পলিটেক্‌নিক ইনষ্টিটিউটের গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে তিনি অর্থসাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অনেক গোপন দান ছিল। বিশেষ করিয়া, দুঃস্থ ছাত্র এবং দায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণ কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইতেন না। বিগত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ, সোমবার, ঊনষাট বৎসর বয়সে চারিপুত্র রাখিয়া কমলকৃষ্ণ ইহলোক ত্যাগ করেন।

কমলকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম পুত্র ভূপেন্দ্রকুমার ও হরেন্দ্রকুমার বর্ত্তমানে যোগ্যতার সহিত পিতৃ-ব্যবসায়ের অর্থাৎ K. K. Saha & Co.'র চূণ প্রভৃতির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র সুশীলকুমার পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনিলকুমার বর্ত্তমানে বঙ্গবাসী কলেজে I. Sc. ক্লাশে পড়িতেছেন।

ভূপেন্দ্রকুমারের বর্ত্তমানে দুই পুত্র—গোবিন্দচন্দ্র ও সন্তোষচন্দ্র এবং তিন কন্যা—যথা অন্নপূর্ণা, ঊষাবতী ও শোভাবতী। শ্রীমতী অন্নপূর্ণার

বিবাহ হইয়াছে গোঁদলপাড়ার ভূম্যধিকারী ৺ উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মণ্ডলের সহিত।

হরেন্দ্রকুমারের বর্ত্তমানে দুই পুত্র—শিবশঙ্কর ও শুকদেব এবং চারি কন্যা তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী দুর্গাবতীর বিবাহ হইয়াছে—গোঁদলপাড়ার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধীরকুমার মণ্ডলের সহিত; দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীর বিবাহ হইয়াছে মানকুণ্ডার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত পান্নালাল খাঁ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ গোবিন্দলাল খাঁয়ের সহিত।

শ্যামাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র ৺ নয়নকৃষ্ণ সাহা মহাশয়ের বিস্তৃত জুয়েলারির ব্যবসায় ছিল। ঐ ব্যবসায়ে তিনি কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিপন্নের দায়োদ্ধার করিতে তিনি যেমন আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন তাহা যথার্থই স্মরণযোগ্য। কাহারও পিতৃ, মাতৃ বা কন্যাদায়ের কথা শুনিলে তিনি নিজে দাঁড়াইয়া তাহা উদ্ধার করাইয়া দিতেন। সন ১৩০৭ সালে, জীবনের মধ্যাহ্নে, তিনি আপনার সপ্তমবর্ষীয় শিশুপুত্র হরিদাসকে রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নারায়ণচন্দ্র, কমলকৃষ্ণ, অভয়চরণের পুত্র বিনয়কৃষ্ণ এবং নয়নকৃষ্ণের পুত্র হরিদাস সকলেই একত্র থাকিতেন। উক্ত বৎসরে তাঁহারা পৈত্রিক বিষয় পরস্পরের মধ্যে আপোষে ভাগবণ্টন করিয়া লয়েন। তদনুসারে নারায়ণচন্দ্র এবং কমলকৃষ্ণ ২০ নং দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটে আপনাদের বাসভবন করেন, পৈত্রিক পুরাতন বাটী (১৮ নং দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট) লইলেন ৺ নয়নকৃষ্ণের পুত্র হরিদাস এবং ৺ অভয়চরণের পুত্র বিনয়কৃষ্ণ বাগবাজার রামকৃষ্ণ লেনে আপনার আবাস নির্ম্মাণ করিলেন।

বিনয়কৃষ্ণ একজন স্বনামধন্য পুরুষ। জীবনের যে সময়ে সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ছেলে সংসারের কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে শিখে না, সেই সুকুমার

কৈশোর হইতে তিনি বাগবাজারের কোন বিখ্যাত পাটব্যবসায়ীর আড়তে শিক্ষানবীশস্বরূপে প্রবেশ করেন। সেখানে দীর্ঘকাল অবিচলিত-চিত্তে কর্ম্মের ফলে, এবং অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে, তিনি যে কার্য্যকরী শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহা উত্তরকালে সাফল্য-অর্জ্জনে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। হাতে-কলমে শিক্ষা মানুষকে কতটা সফলতা দিতে পারে, বিনয়কৃষ্ণ তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দাসত্বের মায়া-মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া অনেকে আজ পৈত্রিক বৈশ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাপ লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। এদিকে উপযুক্ত চাকুরীর অভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্নসমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। অথচ, ব্যবসায়-শিক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বণিকবৃত্তিতে যথার্থ সাধুতার সহিত আত্মনিয়োগ করিলে, মানুষ যে শুধু ঋদ্ধিই লাভ করে এমন নহে, ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও তাহার মনুষ্যত্ব-বিকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

বিনয়কৃষ্ণের সেই কৈশোরের শিক্ষা তাঁহাকে সততাপরায়ণ ব্যবসায়ী এবং নিরভিমান সামাজিক ব্যক্তিতে পরিণত করিয়াছে। তিনি একদিকে স্বাধীনভাবে পাটের ব্যবসায় করিয়া যেমন বিত্ত উপার্জ্জন করিয়াছেন, অপরদিকে আপনার মধুর ব্যবহার ও আপ্যায়নে সহরের বহু বিশিষ্ট লোককে সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। উত্তর অঞ্চলের বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট। তাঁহার ন্যায় আশ্রয়বৎসল, আপনভোলা ব্যক্তি অধুনা বিরল। তিনি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অনেক সময় অপরের কার্য্যোদ্ধার করিয়াছেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ হরিদাস সাহা উভয়ে মিলিয়া Saha Nephew & Co. নামে একটি ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া চূণের কাজ করেন। কিছুকাল পরে সময়াভাববশতঃ বিনয়কৃষ্ণ উক্ত ফার্ম্মের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া আপনার অভীষ্ট পাটের কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে

আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সে সময়ে পাটের কাজে অনন্যচিত্ত হইয়া তিনি যে প্রভূত পরিশ্রম করেন, তাহাই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মীকে সাদরে বরণ করিয়া আনে।

বিনয়কৃষ্ণের ভাগ্যোদয়ের কথা বলিতে গেলে, অপর একজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অপরিহার্য্য। তিনি বিনয়কৃষ্ণের সুযোগ্যা মমতাময়ী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মঙ্গলাবালা। তাঁহার সুনিপুণ হস্তের পরিচালনায় বিনয়কৃষ্ণের সাংসারিক জীবন সুখময় হয় এবং তিনি অকুতোসাহসে সাংসারিক সকল দুঃখ, আপদ, বিপদ, ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হইতে পারিয়াছিলেন। মঙ্গলাবালা নবাবগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস মণ্ডল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা দুহিতা। পত্নীনিষ্ঠ বিনয়কৃষ্ণ আপন মঙ্গলময়ী ভার্য্যার নিকট হইতে সাংসারিক ব্যাপারে যে অকপট সাহায্য পাইয়াছেন, তাহাই স্মরণীয় করিবার জন্য আপন বাসস্থানের নাম দিয়াছেন, "মঙ্গল-আলয়।"

বিনয়কৃষ্ণের চারি পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভোলানাথ পিতার নির্দ্দেশক্রমে পাটের ব্যবসায়ে সম্প্রতি শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করিয়া, পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিতেছেন। অপর তিন পুত্র যথাক্রমে, বিশ্বনাথ, কৃষ্ণগোপাল ও মদনগোপাল বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী যমুনাবালার সহিত কম্বুলিয়াটোলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল সাহা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ চুনিলালের বিবাহ হইয়াছে। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা এক্ষণে শিশু।

কলিকাতার স্বনামখ্যাত S. D. Harry & Co.'র নাম আজ শুধু কলিকাতায় কেন, দক্ষিণ বঙ্গে সুদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই S. D. Harry & Co. বার্ড কোম্পানীর "বিসরা" চুণের একমাত্র এজেণ্ট। কলিকাতা ও সহরতলীর এমন অঞ্চল নাই, যেখানে আজকাল হ্যারি এণ্ড কোম্পানীর মালবাহী মোটরলরীর সাক্ষাৎ পাওয়া না যায়। এই সুবিস্তীর্ণ কারবারের একমাত্র সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা মহাশয়

বাগবাজারের সাহা পরিবারের কুলোজ্জলকারী সন্তান। ইনি ৺নয়নকৃষ্ণ সাহা মহাশয়ের একমাত্র পুত্র।

নামমাত্র মূলধন হাতে লইয়া হরিদাস বাবু আজ যেভাবে এই বিপুল বহু লক্ষ টাকার কারবার গড়িয়া তুলিয়াছেন, আজিকার দিনে সেরূপ কারবার সৃষ্টি বিরল এবং মানুষ আপন চেষ্টার বলে কিরূপে উন্নতিলাভ করিতে পারে, হরিদাস বাবুর অধ্যবসায় তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আজিকার এই অন্নসমস্যার দিনে তাঁহার জীবন হইতে অনেক বেকার যুবক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসের দিকে তাঁহার তেমন ঝোঁক ছিল না।, বরং ঝোঁক ছিল বেশী শরীর-চর্চ্চার দিকে। তাহার একটা সুফল তিনি উত্তরকালে পাইয়াছেন; উক্ত শরীর চর্চ্চা তাঁহাকে অটুট স্বাস্থ্য এবং অপূর্ব্ব কর্ম্মক্ষমতা দিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সামর্থ ও অর্থ তাঁহাকে দিয়াছে। পাঠ্যপুস্তকের ভারে অবনতদেহ ব্যায়ামবিমুখ বাঙ্গালার কিশোর ও যুবকগণ আজ কোন্ পথে চলিয়াছে?

কৈশোরে হরিদাস বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কে, কে, সাহা এণ্ড কোম্পানীর কারবারে শিক্ষা-নবীশ-স্বরূপে প্রবেশ করেন। তথায় কিছুকাল কার্য্য করিবার পর, তিনি খুল্লতাত বিনয়কৃষ্ণ সাহা মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া সাহা নেফিউ এণ্ড কোং নামে একটি স্বতন্ত্র চূণের ব্যবসায়ের ফার্ম্ম করেন। কিছুকাল পরে বিনয়কৃষ্ণ উক্ত সাহা নেফিউ এণ্ড কোংর সংশ্রব ত্যাগ করিলে, হরিদাস বাবু উক্ত কারবারের একমাত্র সত্বাধিকারী হন। উক্ত ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে, তিনি কারবারের 'সাহা নেফিউ এণ্ড কোং' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া S. D. Harry & Co. নাম রাখেন এবং বিসরা চূণের একমাত্র Selling Agent হন।

কলিকাতার বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে সিলেট চূণের কারবার এক সময়ে বিস্তৃত ছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পুরুষসিংহ হরিদাস সিলেট চূণের কারবারে

হস্তক্ষেপ করিয়া বাগবাজারে সিলেট চূণের একটী ক্ষুদ্র কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাহার ফলে বাগবাজার আজ সিলেট চূণের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার সিলেট চূণের ব্যবসায় আজ সমব্যবসায়ীগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিয়াও হরিদাস কোন দিন আত্মবিস্মৃত হন নাই। তাঁহার স্বভাবসুলভ সৌজন্য, বিনয় ও অভিমানশূন্যতা, তাঁহার সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা-প্রণালী ও সর্ব্বোপরি নিরঙ্কুশ চরিত্র তাঁহাকে সকলের কাছে আদরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি বিলাসের স্রোতে গা ভাসান দেন নাই; দুঃখীর ক্রন্দন এবং আর্ত্তের নিবেদন কোন দিনই তাঁহার নিকট বিফলে যায় নাই। সদ্ব্যয়ে তিনি মুক্তহস্ত, দেবদ্বিজে তিনি ভক্তিমান। কালীঘাটের মন্দিরাভ্যন্তর এবং বাগবাজারের ৺ ব্যোমকালী মাতার মন্দিরে তিনি মর্ম্মর-প্রস্তর-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। বৈদ্যনাথের বিদ্যাপীঠ, বাগবাজারের নিবেদিতা স্কুল, মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক্‌ইনষ্টিটিউটের গৃহনির্ম্মাণ তহবিল এবং গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

সম্প্রতি মেয়ো হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ তদীয় চিৎপুর শাখা চিকিৎসালয় (সুবিখ্যাত নেলার সাহেবের হাঁসপাতাল) উপযুক্ত অর্থাভাবে বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। সহৃদয় হরিদাসবাবু এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে অকস্মাৎ লোপ না পায়, তজ্জন্য উক্ত হাঁসপাতাল গৃহের ভবন নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্টের হস্তে বিশ হাজার টাকা দান করিবার জন্য, হাঁসপাতাল কমিটির সভাপতি মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্যার জর্জ্জ রাঙ্কিনকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তদনুসারে নূতন প্ল্যান প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহা বর্ত্তমানে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের বিচারাধীন

ভগবান হরিদাসবাবুকে দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করুন এবং তিনি উত্তরোত্তর এরূপ জনহিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকুন।

হরিদাস পাথুরিয়াঘাটা মণ্ডল ষ্ট্রীট নিবাসী ৺বীর নৃসিংহ সাধুখাঁ মহাশয়ের পৌত্রী ৺ নিকুঞ্জবিহারী সাধুখাঁ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী শ্রীরতিমঞ্জরী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন।

হরিদাস বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বেণীমাধব বারবৎসর বয়সে পিতামাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বঙ্কুবিহারী এক্ষণে সেণ্ট জেভিয়ার স্কুলে পড়িতেছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কাত্যায়নীর বিবাহ হইয়াছে মানকুণ্ডার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মণিলাল খাঁ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ খাঁয়ের সহিত। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শিবানী এক্ষণে অষ্টমবর্ষীয়া।

বাগবাজার সাহা-পরিবারের বংশলতা

- ৺ ফকিরচাঁদ
  - ৺সুখময়
  - ৺স্বরূপচাঁদ
  - ৺প্রেমচাঁদ
    - ৺নবীন
      - ৺রসিকলাল
        - ৺ক্ষেত্রনাথ
          - ৺মণি
          - ৺বনোয়ারী
          - চুণী
          - কেবল
          - পচা
          - দুলাল
    - ৺দয়াল
      - ৺শ্যামাচরণ
        - নারায়ণ
        - ৺কমলকৃষ্ণ
          - ভূপেন্দ্র
            - অন্নপূর্ণা
              - (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
            - গোবিন্দ
            - উষাবতী
            - সন্তোষ
            - শোভাবতী
          - হরেন্দ্র
            - দুর্গাবতী
              - (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
            - প্রভাবতী
              - (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
            - শিবশঙ্কর
            - লীলাবতী
            - শুকদেব
            - উমাবতী
          - ৺সুশীল
          - অনিল
        - ৺নয়নকৃষ্ণ (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
      - ৺অভয়চরণ (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
  - ৺বদনচন্দ্র
  - ৺রাজীবলোচন

৺অভয়চরণ

গৌরকিশোরী ৺রাধাকিশোরী ৺ব্রজবালা বিনয়কৃষ্ণ

যমুনাবালা ভোলানাথ বিশ্বনাথ কৃষ্ণগোপাল মদনগোপাল অন্নপূর্ণা

(স্বামী চূণীলাল সাহা) (প্রামাণিক) পিতা নন্দলাল সাহা (প্রামাণিক)
কম্বুলিয়াটোলা

৺নয়নকৃষ্ণ

হরিদাস

৺বেণীমাধব কাত্যায়নী বঙ্কুবিহারী শিবানী

(স্বামী ধীরেন্দ্রনাথ খাঁ
মানকুণ্ডা
মনিলাল খাঁর পুত্র)

অন্নপূর্ণা
(স্বামী অক্ষয়কুমার মণ্ডল
গোঁদলপাড়ার
৺উপেন্দ্র মণ্ডলের পুত্র)

দুর্গাবতী
(স্বামী সুধীরকুমার মণ্ডল
গোঁদলপাড়ার
যোগীন্দ্র মণ্ডলের পুত্র)

প্রভাবতী
(স্বামী গোবিন্দলাল
মানকুণ্ডের
পান্নালাল খাঁর পুত্র)
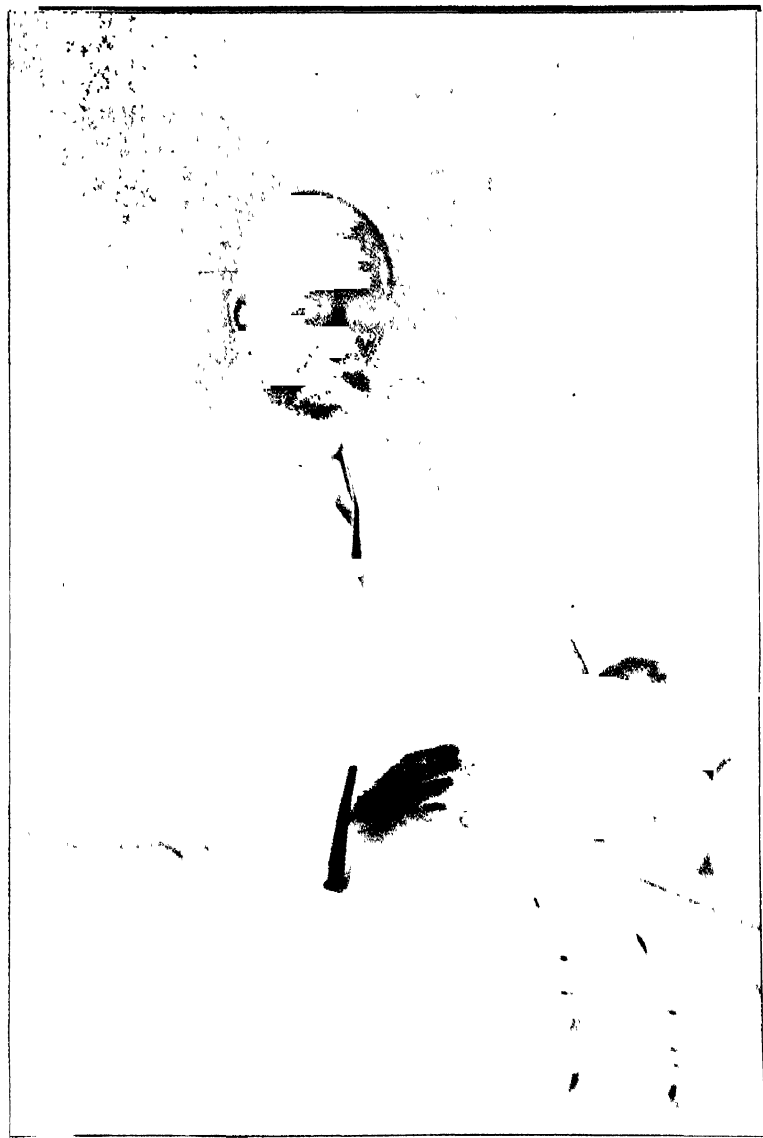
স্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারকানাথ রায়

স্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারকানাথ রায়

ঢাকা নগরী হইতে প্রায় ক্রোশ খানেকের মধ্যে বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ অপর পারে শুভাঢ্যা গ্রামে বাঙ্গালা ১২৬১ সনের ২২শে কার্ত্তিক (ইংরাজী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর) সোমবার বেলা ১০টা-১১টার সময়ে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার দ্বারকানাথ রায় (ডাঃ ডি-এন্ রায়) জন্মগ্রহণ করেন।

জন্ম

ডাক্তার দ্বারকানাথ রায় মহাশয়ের আত্মজীবনীতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ও বংশপরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"অতি পূর্ব্ব সময়ে পাঠান কি মোগল নবাবদের শাসন-কালীন রাঢ় দেশ হইতে লালা-বংশীয়েরা নবাবদের দ্বারা আনীত হন ও নবাব সরকারে কার্য্যকালীন তাঁহারা ঢাকার উত্তরাংশে পুরাতন পল্টন নামক স্থানের অন্তর্গত অধুনা দেওদীঘি অর্থাৎ দান দীঘির চতুষ্পার্শে বাস করিতেন। নবাব সরকারের চাকুরী-কালীন এই লালারা পরে দেববংশীয় লোকেরা কার্য্যানুসারে নানাপ্রকার উপাধি বা খেতাব প্রাপ্ত হয়েন যথা বিশ্বাস, খাস্‌নবীশ (নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী), মুন্‌সী, চৌধুরী ইত্যাদি। এই সময়ে, ঠিক কিন্তু বলিতে পারা যায় না কোন্ সময়ে, ঢাকাতে মুসলমান লোকসংখ্যার আধিক্য হওয়ায়, হিন্দু বাসেন্দাদের উপর বিশেষ অত্যাচার হইতে আরম্ভ হয়, তখন সেই দেববংশীয় লোকেরা আর ঢাকাতে সম্মানের সহিত থাকিতে না পারিয়া দানদীঘির বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ঢাকার দক্ষিণ পার এই শুভাঢ্যা (শুভ আঢ্য অর্থাৎ ধনী), বাথইর ইত্যাদি স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন

বংশ-পরিচয়

এবং তথা হইতে যাতায়াত করিয়া নবাব সরকারে নানাপ্রকার কার্য্য করিতে থাকেন। তাঁহারা ঢাকা পরিত্যাগকালীন নিজেদের গুরু-পুরোহিত, পূজারি, ধোপা, নাপিত, সিকৃদারাদি সহ আসিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই গ্রামে অদ্যাবধিও কোন মুসলমানের বাস নাই। কায়স্থরা এই গ্রামের প্রধান আধিপত্যশালী লোক ছিলেন, ধন, মান ও সম্মানসহ তাঁহারা এই স্থানে বাস করিতেন। এটুকু জানা যায় যে, তাঁহারা কায়স্থ ও তাঁহাদের আদি-পুরুষ ধনবন্ত রায়। তাঁহাদের বংশাবলী দেখিলে জানা যায় যে, তাঁহারা নবাব সরকারে চাকুরীকালীন নানারূপ উপাধি পাইয়াছিলেন।"

পিতামহ

ডাক্তার দ্বারকানাথের পিতামহের নাম রামধন রায়। ইনি ১১৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩৭ সালে তাহার মৃত্যু হয়। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল এবং তিনি পূর্ণিয়া জিলায় জমীদারদের মধ্যে আমিনী কার্য্য করিয়া অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন।

পিতা ও পিতৃব্যগণ

রামধন রায়ের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামলোচন অতি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অন্য তিন পুত্রের নাম—শ্যামসুন্দর রামকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ রায় বাঙ্গালা ১২০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৭৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি শ্রীহট্ট জেলায় পুলিশ বিভাগে নায়েব-দারোগার কার্য্য করিতেন। তিনি পারস্য ভাষা জানিতেন।

প্রাণকৃষ্ণ রায় বাঙ্গালা ১২১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও পারস্য ভাষা জানিতেন। তিনি মুন্সেফি আদালতের উকীল ছিলেন। ১২৬৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্যামসুন্দর রায় বাঙ্গালা ১১৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ডাক্তার দ্বারকানাথ রায়ের পিতা। ইনি দীর্ঘাবয়ব, বলিষ্ঠ, সুকান্তি ও সুপুরুষ

ছিলেন। তখনকার কালে বাল্যবিবাহ সবিশেষ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রথম বিবাহ বেশী বয়সেই করিয়াছিলেন। একটি কন্যাসন্তান রাখিয়া তাঁহার প্রথমা পত্নী মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনেক কাল পর্য্যন্ত তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি চরিত্রবান্, সদাশয়, দয়ালু, ধর্ম্মপরায়ণ ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। তিনি কখনও সুরা বা অপর কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করেন নাই। তিনি কেবল তামাক খাইতেন। তাঁহার বয়স যখন ৫২ বৎসর তখন তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কিন্তু বয়স ৫২ বৎসর হইলে কি হয়, তখনও তাঁহার দেহে প্রভূত শক্তি এবং স্বাস্থ্য অটুট ছিল। কথিত আছে, দ্বিতীয়বার বিবাহের সময়ে শ্বশুরবাড়ীর কেহ কেহ তাঁহাকে বৃদ্ধ বলিয়া বিদ্রূপ করিলে তিনি একটী গোটা সুপারি দাঁত দিয়া দুই টুকরা করিয়া দিয়াছিলেন। অধিক বয়সে বিবাহ করিলেও তাঁহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। এমন কি, মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বেও তাঁহার একটী কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যা বাঁচিয়া থাকে এবং তাহার বিবাহের পর তাহার অনেকগুলি সন্তান-সন্ততিও হয়।

শ্যামসুন্দর ঢাকা আদালতে মুহুরির কাজ করিতেন। যদিও অল্প বেতন পাইতেন, তবুও তাঁহাকে বহু পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। অনেক আত্মীয়-স্বজন তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া ঢাকাতে কাজকর্ম্ম করিতেন ও প্রতিপালিত হইতেন। ছেলেবেলায় তাঁহাদের বাড়ীতে এত লোক-জন দেখা যাইত যে, পরে তাহাদিগকে আর চিনিতে পারা অসম্ভব হইত। দূরস্থ কুটুম্বগণের মধ্যে যাঁহাদেরই ঢাকায় আসিবার প্রয়োজন হইত, তাঁহারা সরাসরি আসিয়া একেবারে রায়েদের বাড়ীতে উঠিতেন। কারণ, তাঁহারা জানিতেন—রায়েদের বাড়ীই তাঁহাদের থাকিবার জায়গা। এরূপ লোক যে প্রতি সপ্তাহে কত আসিয়া বাড়ীতে উঠিতেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। এতদ্ব্যতীত বিপন্ন অতিথিরাও আসিয়া রায়েদের বাড়ীতে উঠিতেন।

তাঁহার আয় অল্প ছিল বটে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি অকাতরে এই সকল লোককে তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন। আর যাঁহারা বারমাসই বাড়ীতে থাকিতেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। সামান্য কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিলেই সেই ব্যক্তি রায়েদের পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িতেন। সেই সময়ে জিনিসপত্র খুবই সস্তা ছিল; কাজেই বহুলোককে ভরণপোষণ করিতে বড় বেশী কষ্ট পাইতে হইত না। যদি কখনও শ্যামসুন্দর অভাবে পড়িতেন, অমনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেন। তিনি বলিতেন,—আমি ত উপলক্ষ্যমাত্র; ঈশ্বরই ইহাদিগকে ভরণপোষণ করিবেন। তাঁহাদের বাড়ীতে সর্ব্বদা বহুলোকজন থাকিত। বহুদূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত শ্যামসুন্দরের নাম প্রচারিত ছিল।

শ্যামসুন্দরের পিতার সমাধিস্থলে, বসতবাটীর অনেকটা দক্ষিণাংশে খালের পারে একটা মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। লোকে ইহাকে 'শ্যামসুন্দরের মঠ' আখ্যা দিয়াছিল। এই খাল দিয়া নানাস্থানের লোক ঢাকায় যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা সকলেই 'শ্যামসুন্দরের মঠে'র কথা জানিতেন। সেই মঠ-বাড়ীতে এক হরি-স্থাপনা হয়, অদ্যাপি সেই বাড়ী 'হরি-বাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। এই 'হরিবাড়ী'তে বৈষ্ণবেরা থাকিতেন। বহু দূর-দূরান্তর হইতে এই মঠে লোক-সমাগম হইত। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে এই মঠে হরিসঙ্কীর্ত্তন ও হরিলুট হইত। এই মঠ এবং হরিবাড়ী এখনও বর্ত্তমান আছে। এক-বার ঐ মঠে বজ্রপাত হইয়াছিল, উহার ফলে মঠের কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শ্যামসুন্দরের মধ্যম ভ্রাতা ডক্টর পি-কে রায়ের ব্যয়ে শ্যামসুন্দরের মাতাঠাকুরাণী তাহা মেরামত করাইয়া দিয়াছিলেন।

ডাঃ দ্বারকানাথের পিতা শ্যামসুন্দর বড় চাকুরী করিতেন না বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তিনি সম্মানের সহিত জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও খাতির করিত। তিনি বড় চাকুরী করিতেন না বলিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে

তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়; নিজের সামান্য কিছু জমি ছিল, উহা বন্ধক রাখিয়া মাতৃশ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই সময়কার লোকেরা পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধে কিম্বা অন্যপ্রকার ক্রিয়াকর্ম্মে এরূপ ঋণ করিতে একটুও সঙ্কোচবোধ করিতেন না।

১২৭০ খৃষ্টাব্দে শ্যামসুন্দর রায় মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি ঢাকাতে যাতায়াত করিয়া কাছারীর কাজ করিয়াছিলেন। যে সময় দ্বারকানাথের পিতৃদেবের মৃত্যু হয়, সে সময়ে দ্বারকানাথ ৮ বৎসরের বালকমাত্র।

পিতার মৃত্যু

শ্যামসুন্দর রায় মহাশয়ের মৃত্যু-সময়ে দ্বারকানাথদের সংসারের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তখন সংসারে দীনবন্ধু, প্রসন্ন-কুমার ও দ্বারকানাথ—এই তিন ভ্রাতা, চারিটী অবিবাহিতা ভগিনী ও বড় দাদার স্ত্রী, মা এবং এক ঠাকরুণ দিদি ছিলেন। ইনি হইতেন দ্বারকানাথের মায়ের মামী। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া অবধি দ্বারকানাথদের বাড়ীতেই থাকিতেন এবং দ্বারকানাথের ভ্রাতা-ভগিনীদিগকে লালন-পালন করিতেন। বালক-বালিকারা তাঁহাকে মা অপেক্ষা অধিক মনে করিত ও সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তিনিও বালক-বালিকাগণকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন ও যত্ন করিতেন; ইহা ছাড়া চাকর-চাকরাণী এবং আত্মীয় লোকজনও অনেক থাকিত।

ভ্রাতা-ভগিনীগণ ও সংসারের অবস্থা

দ্বারকানাথের পিতার মৃত্যুর পর এই পরিবারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। বহু পরিবার—অথচ সেরূপ আয় নাই। কি করিয়া যে মাতাঠাকুরাণী এই বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতেন, তাহা তিনিই জানিতেন। ছেলেমেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার যে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা প্রথম প্রথম বুঝিতে পারা যায় নাই। দ্বারকানাথের

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঢাকার গণি মিঞার (তখনও তিনি নবাব ও স্যর উপাধি প্রাপ্ত হন নাই) ফ্রি স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া মাসিক ৩০৲ টাকা বেতন পাইতেন। ইহা ব্যতীত দ্বারকানাথদের পরিবারের অপর কোনও আয় ছিল না। তিনি সেই সময়ে আইন পড়িতেন, প্রসন্নকুমার ঢাকা পোগোজ স্কুলে পড়িতেন এবং দ্বারকানাথ গ্রামের স্কুলে পড়িত।

ছেলেবেলায় দ্বারকানাথের পড়াশুনার উপর বিশেষ মনোযোগ ছিল না। তিনি অপরাপর ছেলেদের মত স্কুলে যাইতেন বটে কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তেমন আগ্রহ বাল্যকালে তাঁহার ছিল না। লেখাপড়ার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল না, কিন্তু বলচর্চ্চা ও ব্যায়ামের দিকে তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল।

ছাত্রজীবন—বাল্যে

ব্যায়াম করিবেন, শরীরকে বলশালী ও দৃঢ় করিবেন—এইদিকে তাঁহার খুবই চেষ্টা ও যত্ন ছিল। তাঁহার বয়স যখন বার তের বৎসর, তখন হইতেই ব্যায়ামের প্রতি তাঁহার অনুরাগের সঞ্চার হয়। তিনি শরীরকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রত্যহ মুগুর ঘুরাইতেন এবং ডন্, বৈঠক ইত্যাদি করিতেন। তিনি দশ পনের সের ওজনের একটি একটি মুগুর—এইরূপ দুইটী দুই হাতে লইয়া অনায়াসে ভাঁজিতেন। তিনি মাতুলালয় মীরপুর হইতে লাল মাটী আনিতেন এবং সেই মাটী সর্ব্বাঙ্গে জোরের সহিত মর্দ্দন করিয়া মাংসপেশী দৃঢ় করিতেন। দ্বারকানাথের দুই অগ্রজও ব্যায়াম করিতেন ; দ্বারকানাথ তাঁহাদের নিকট হইতেই ব্যায়াম শিক্ষা করিয়াছিলেন। ডন, বৈঠক, কুস্তি প্রভৃতি করিলে বিশেষ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিতে হয় ; কিন্তু দ্বারকানাথের ঘি, দুধ, মাখন ইত্যাদি পুষ্টিকর সামগ্রী কিনিয়া খাইবার সংস্থান ছিল না। তিনি শরীরের পুষ্টির জন্য ছোলা কখনও ভিজাইয়া, কখনও শুকনা খাইতেন। যদি ছোলার সহিত একটু আখের গুড় হইত, তাহা হইলে ভাল হইত, নচেৎ তিনি শুধু ছোলাই খাইয়া ফেলিতেন। এরূপ ব্যায়াম করাতে তাঁহার শরীরে প্রভুত শক্তি হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বারকানাথ গ্রাম্য স্কুলে পড়িতে যাইতেন, কিন্তু পড়াশুনার উপর তাঁহার সেরূপ অনুরাগ ছিল না। স্কুলের দৈনিক পাঠ কোনও দিন তিনি তৈয়ারী করিতেন, কোনও দিন তৈয়ারী না করিয়াই স্কুলে যাইতেন। একে ত তাঁহাকে পড়া বলিয়া দিবার লোক ছিল না, তাহার উপর তাঁহার নিজের যত্ন-চেষ্টা ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই লেখাপড়ার উপর তাঁহার অবহেলা ছিল; কিন্তু খেলা-ধূলা ও শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যের উপর খুব টান ছিল। দ্বারকানাথের খুড়তুত ভগিনীর পুত্র শশী-কুমার নাগ দ্বারকানাথদের বাড়ীতে থাকিয়া ঢাকাতে পড়িতে যাইত; তাহার নিকট হইতে দ্বারকানাথ কখনও কখনও স্কুলের পড়া বুঝাইয়া লইতেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে খুব অল্পক্ষণ বই লইয়া বসিতেন এবং যাহা হয় সেইরূপ পড়াশুনা করিতেন। তার পর স্নান করিয়া যাহা পাইতেন তাহাই তাড়াতাড়ি খাইয়া একখানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া পড়িবার বই ও শ্লেট হাতে করিয়া স্কুলে যাইতেন। স্কুলে উপস্থিত হইয়া যদি দেখিতেন, স্কুল বসিতে কিছু দেরী আছে, তাহা হইলে সেই সময়টুকু খেলা করিতেন। স্কুলের ছুটী হইলে দ্রুত বাড়ীতে আসিতেন এবং কিছু খাইয়াই মাঠে চলিয়া যাইতেন এবং সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা রকম খেলা করিতেন। দ্বারকা-নাথ খেলাতে অত্যন্ত পটু ছিলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া হাত পা ধুইয়া পড়িতে বসিতেন। কোনও দিন ভাত খাইয়া পড়িতে বসা হইত; কোনও দিন ভাত খাইবার পূর্ব্বে পড়া আরম্ভ করিতেন। ভাত খাইয়া পড়িতে বসিলে শীঘ্রই ঘুম আসিত ও তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার পর একটি পলিতায় মৃৎপ্রদীপে তৈলের আলো জ্বলিত; উহাতে আলো এত কম হইত যে, কোনও প্রকারে পুস্তকের অক্ষর দেখা যাইত ও সহজেই ঘুম পাইত। কিছুক্ষণ পুস্তকাদি নাড়া-চাড়া করিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন।

পৌষ মাঘ মাসে ধানক্ষেতের ধান পূর্ব্বে কাটিয়া লইলে, এই ধানগাছ-

গুলা ক্ষেতে পড়িয়া শুকায়। এই গাছগুলা বেশ লম্বা হয়, ইহাকে দেশে 'নারা' বলে। ধানগাছের আগের ভাগ দিয়া খড় (বিচালী) হয়, নীচের দিকটা মোটা ও শক্ত, ইহা কেবল জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই 'নারা' অতি অল্প দাম দিলেই পাওয়া যাইত। দ্বারকানাথ চাকর লইয়া নিজে ধানক্ষেতে গিয়া নারা তুলিয়া এক বোঝা চাকরের মাথায় দিতেন; আর এক বোঝা নিজে মাথায় করিয়া আনিতেন। বাড়ীতে আনিয়া তাহা প্রথমতঃ রৌদ্রে মেলিয়া দিতেন ; তার পর বেশ শুকাইলে বড় 'বঠিদা' দিয়া ছোট করিয়া কাটিয়া দিতেন। রান্না করিবার সময় সেই কাটা নারার ব্যবহার হইত। ইহাতে কাঠ জ্বালাইয়া পাক করা অপেক্ষা অনেক কম খরচ হইত। দেশে অনেক বাড়ীতেই ইহার ব্যবহার হইত।

তিনি বর্ষার সময় চাকর লইয়া নৌকা করিয়া টেঙ্গরে যাইতেন। টেঙ্গর অর্থাৎ জঙ্গলা জায়গা ; ইহা ঢাকা সহরের অনেকটা উত্তরাংশে। অল্প কিছু পয়সা দিলেই এক নৌকা ভরিয়া নিজেরা যতটা কাঠ কাটিয়া লইতে পারা যায়, তাহা লইতে পারা যাইত। দ্বারকানাথ চাকরের সঙ্গে সেখানে গিয়া তাড়াতাড়ি ছোট-বড় অনেক কাঠ কাটিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া এক-দিনের ভিতরই বাড়ীতে লইয়া আসিতেন। সেইদিন চিড়া মুড়ী খাইয়াই দিন কাটাইয়া দিতেন।

দ্বারকানাথ কুড়াল দিয়া কাঠ চিরিতে বড় মজবুত ছিলেন। তিনি কেবল তাঁহাদের নিজেদের বাড়ীর কাঠ চিরিতেন তাহা নহে, এ-বাড়ী ও-বাড়ীর কাঠও চিরিয়া দিতেন। তিনি কাঠের আঁশ দেখিয়া দেখিয়া কুড়ালের এরূপ কোপ দিতে পারিতেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তর কাঠ চিরিয়া ফেলিতেন।

দ্বারকানাথ নৌকা চালাইতে বড় ওস্তাদ ছিলেন। যখনই সুবিধা পাইতেন নৌকা চালাইতেন। সঙ্গে চাকর থাকিলেও তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া নিজে নৌকা চালাইতেন। বর্ষার সময়ে ঝড়বৃষ্টি বড় একটা গ্রাহ্য

করিতেন না। ঢাকায় স্কুলে পড়িবার সময় যখন শ্রাবণ ভাদ্র মাসে খুব ঝড়ের মত বাতাস হইত আর বুড়ীগঙ্গা নদীতে বড় বড় ঢেউ উঠিত, চাকরটা তখন নদীতে পাড়ি দিতে ভয় পাইত, পাছে নৌকা ডুবিয়া যায়। তখন দ্বারকানাথ সাহস করিয়া সেই ঢেউয়ের মধ্যে পাল দিয়া, বইঠা নিজে ধরিয়া নদীতে পাড়ি দিতেন। নৌকার মাচাইল তিনি নিজেই বাঁশ চিরিয়া পরিষ্কার করিয়া আর নিজেই বেত দিয়া ঠিকমত বাঁধিতেন। তিনি সুন্দর করিয়া নৌকার ছই (ছাদ) বাঁধিতে জানিতেন। এসব কাজ করিতে তিনি বেশ পটু ছিলেন।

দ্বারকানাথ ১৪।১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ খেলাধূলা, হুড়াহুড়ি, মারামারি করিয়া কাটাইয়াছিলেন। লেখাপড়ার উপর কোনও রূপ অনুরাগ বা টান ছিল না। গ্রামের বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে অন্যান্য ছেলেরা যাইত, তিনিও যাইতেন ; পড়াশুনার উপর তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। যখন তিনি প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন ইঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ (বড় দাদা) স্থির করিলেন যে, কোনও রূপে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ঢাকা নর্ম্ম্যাল স্কুলে (Normal) তিন বৎসর পড়িয়া যদি দ্বারকানাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে কোনও প্রকারে ১৫।২০ টাকা মাহিনার পণ্ডিতী করিয়াও খাইতে পারিবে।

ছাত্রজীবন—কৈশোর

সেই সময়ে দ্বারকানাথের নিজের কোন মতামত ছিল না, ভ্রাতৃগণ যাহা স্থির করেন, তাহাই করিতে হইবে। বড় দাদা ত এই স্থির করিলেন। দ্বারকানাথও জানিতেন—তাঁহাকেও তাহাই করিতে হইবে অর্থাৎ নরম্যাল স্কুলে পড়িয়া পণ্ডিত হইতে হইবে ; কারণ তিনি বাড়ীর কর্ত্তা। কিন্তু দ্বারকানাথের মধ্যম ভ্রাতার পড়াশুনার উপর বিশেষ মনোযোগ ছিল আর তিনি অতি অল্প বয়সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া স্কলার্সিপ পাইয়া ঢাকাতে পড়াশুনা করিয়া এনট্রান্স পরীক্ষাতেও স্কলার্সিপ

পাইয়া ঢাকাতে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন বাড়ীতে আসিয়া শুনিতে পাইলেন যে, দ্বারকানাথ নরম্যাল স্কুলে পড়িয়া পণ্ডিত হইতে যাইবে। বড় দাদা স্থির করিয়াছিলেন যে, দ্বারকানাথকে ইংরাজী শিখাইবেন না; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে মত দিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করিয়া দ্বারকানাথ ঢাকায় কোনও ইংরেজী স্কুলে পড়েন। কিন্তু তাঁহার এমন অর্থ ছিল না যে, তিনি দ্বারকা-নাথকে সাহায্য করিতে পারেন। যে টাকা স্কলাসিপ পাইতেন, তাহাতে নিজের কোনও রূপে চলিয়া যাইত। তিনি স্থির করিলেন যে, দ্বারকানাথ ঢাকাতে Gregory Free School-এ ভর্ত্তি হইয়া ইংরাজী পড়িবে। এই স্কুলটী ঢাকা আরমানিটোলায় সাহেবের বাটীতে ছিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ গ্রামের বাঙ্গালা স্কুল ছাড়িয়া এই স্কুলের লাষ্ট ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন। সেই স্কুলে বাড়ী (শুভাঢ্যা) হইতে যাতায়াত করিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন। প্রথম ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মনে বড় স্ফুর্ত্তি হইল আর শীঘ্র শীঘ্র করিয়া এ, বি, সি, ডি ও স্পেলিং বই পড়িতে লাগিলেন। ধনদাদা ৺রামলাল রায় মহাশয় (দ্বারকানাথের মধ্যম খুড়ার পুত্র) তখন Gregory স্কুলের লাষ্ট ক্লাসের মাষ্টার ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ীতে আসিয়াও মন দিয়া পড়িতেন, এইরূপ কিছুকাল সেই স্কুলেই পড়িলেন। দ্বারকানাথের মধ্যম ভ্রাতা সে সময়ে এল্‌-এ পরীক্ষা পাশ করিয়া বিশ টাকা স্কলার্সিপ পাইতেন ও ঢাকা কলেজে পড়িতেন। থার্ড ইয়ার হইতে তিনি Gilchrist পরীক্ষা পাশ করিয়া স্কলার্সিপ পাইয়া বিলাত যাওয়া ঠিক করিলেন। ছেলে বিলাত যাইবে শুনিয়া বাড়ীতে মা মহা-কাঁদাকাটি করিতে লাগিলেন। তিনি মাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা দিয়া বিলাত যাওয়া স্থির করিলেন, কোনও প্রকার বাধা-বিঘ্ন মানিলেন না। তিনি তখন বিশ টাকা স্কলার্সিপ পাইয়া ফোর্থ ইয়ারে উঠিয়াছেন, সেই

টাকা তিনি নিজে না লইয়া দ্বারকানাথের পড়ার জন্য এখানে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া যাইলেন। আর দ্বারকানাথ তখন Gregory Free School ছাড়িয়া Pogose School-এ ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন, এবং বাড়ী হইতে যাতায়াত করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

দ্বারকানাথের মধ্যম অগ্রজ প্রসন্নকুমার (Dr. P. K. Ray) গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাতে চলিয়া যাইলেন। দ্বারকানাথ Pogose School-এই পড়িতে লাগিলেন। তিনি এই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হন। এই সময়ে পড়াশুনার উপর একটু মন লাগিয়াছিল; কিন্তু খেলাধূলা ও ব্যায়ামের দিকেই মনটা ছিল বেশী। ইংরাজী ভাষা ভাল করিয়া শিখিতে পারিতেন না, কারণ, পড়া বলিয়া দিবার, কি শিখাইয়া দিবার লোক কেহ ছিল না। এজন্য ইংরেজীটা কাঁচাই থাকিয়া গিয়াছিল। তিনি যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন, সেই সময়ে সেখানে জিমন্যাষ্টিক শিখিবার খুব ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। ব্যায়ামের প্রতি তাহার বরাবরই অনুরাগ। কাজেই তিনি আগ্রহসহকারে জিমন্যাষ্টিক ক্লাসে যোগ দিতেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই জিমন্যাষ্টিকে ওস্তাদ হইয়া পড়িলেন। তিনি জিমন্যাষ্টিক মাষ্টারের খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে, তখন ঢাকায় থাকিয়া পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার উচিত মনে হইয়াছিল, কিন্তু এত পয়সা ছিল না যে, ঢাকায় বাসা-খরচ দিয়া থাকিতে পারেন। শেষে ঠিক করিলেন যে, পরীক্ষার পূর্ব্বে কয়েক মাস ঢাকাতে থাকিবেন। অল্প খরচে থাকা যায়—এরূপ একটা বাসার খোঁজ করিতেছিলেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে একটা বাসায় মাসিক চারি টাকা দিলে থাকা যায়। সেখানেই থাকা ঠিক করিয়া সেই বাসায় আসিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের বাৎসরিক পরীক্ষা নভেম্বর মাসে হইত। তাঁহাদের বাসার ছেলেরা তাহাদের ক্লাসের পরীক্ষা হইয়া গেলে সব বাড়ী চলিয়া গেল, দ্বারকানাথকে

বাসা ছাড়িয়া তাঁহাদের গ্রামে চলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু পরীক্ষার কয়েক দিন তিনি তাঁহাদের গ্রামের স্কুলের পণ্ডিত ৺ সূর্য্যকুমার রায় মহাশয়ের ভ্রাতার শাঁখারীটোলার বাসায় থাকিয়া পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে স্কুলে Test পরীক্ষা হইত; উহাতে যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হইত তাহাদিগকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইত। দ্বারকানাথ Test পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় সাত

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

বৎসর পরে লণ্ডন ও এডিনবরা—দুই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর অফ সায়েন্স' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন ও কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। সে সময়টা খুব সম্ভব ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। মধ্যম ভ্রাতা সাত বৎসর পরে বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন; তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার খুবই আগ্রহ হইল। সে আগ্রহ তিনি দমন করিতে পারিলেন না। তিনি বিলাত হইতে আসিয়া আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ কলিকাতায় আসিয়া সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি দ্বারকানাথকে দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন, বাড়ীরও সকল খবর জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলের কুশল সমাচার লইলেন, কিন্তু দ্বারকানাথকে বলিলেন—পরীক্ষার সময়ে তোমার কলিকাতায় আসা ভাল হয় নাই। দ্বারকানাথ দুই তিন দিন কলিকাতায় থাকিয়া ঢাকাতে ফিরিয়া আসেন। তারপর যথাসময়ে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি ৮৩ নং মুক্তারাম বাবুর

ষ্ট্রীটস্থ একটি বাসায় অবস্থান করিতে থাকেন। এই বাসা হইতে তিনি কলেজে যাতায়াত করিতেন। তিনি এক বৎসর এই বাসাতে থাকিয়াই পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। তিনি এই বাসা হইতে হাঁটিয়া কলেজে যাইতেন। কলিকাতায় তখনও ট্রামগাড়ী হয় নাই!

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষে অথবা নভেম্বর মাসের গোড়াগুড়ি কলেজে পুনরায় ছুটী হইল। সেই ছুটীতে দ্বারকানাথ শুভাঢ্যায় না গিয়া বাঁকিপুরে তাহার মধ্যম অগ্রজ ডক্টর পি কে রায়ের নিকট গমন করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই লোক-পরম্পরায় তিনি শুনিয়াছিলেন যে, কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। তিনি সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী। মধ্যম অগ্রজ প্রসন্নকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ একরূপ পাকাপাকি হইয়াও গিয়াছে। বাঁকিপুরে পৌঁছিয়া দ্বারকানাথ দেখিলেন,—দুর্গামোহন দাশমহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জন দাদার বাড়ীতেই রহিয়াছেন ও সেখানে থাকিয়াই তাঁহার পড়াশুনা করিবার ইচ্ছা! সত্যরঞ্জনের বয়স তখন ১৩।১৪ বৎসর মাত্র। বাঁকিপুরে যাইবার পূর্ব্বে দ্বারকানাথ দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের ১নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ বাটীতে গিয়াছিলেন। তখন দাশমহাশয় বিপত্নীক; মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। ৩১।৩২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিনটী পুত্র—জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সত্যরঞ্জন দাশ, ইনি ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং ঠাকুর আইনের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। মধ্যম পুত্রের নাম—সতীশরঞ্জন দাশ (মিঃ এস্ আর দাশ নামে সুপরিচিত); ইনিও ব্যারিষ্টার ছিলেন; ইনি বাঙ্গালা দেশের এডভোকেট-জেনারেল, পরে ভারত গভর্মেণ্টের ব্যবস্থা-সচিব হইয়াছিলেন। ব্যবস্থা-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে তাহার মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম—যতীশরঞ্জন দাশ; ইনিও রেঙ্গুন

মধ্যম অগ্রজের বিবাহ

হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ছিলেন, পরে তথাকার জজ হন। বাঁকিপুরে গিয়া দ্বারকানাথ শুনিলেন—মধ্যম অগ্রজ প্রসন্নকুমার ঢাকা কলেজে বদলি হইয়াছেন। ছুটীর পর কলেজ খুলিলেই তাঁহাকে ঢাকা কলেজে যোগ দিতে হইবে। দাদা বাঁকিপুরে Rose Bower নামক একটী প্রকাণ্ড বাগান বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন এবং সেই বাড়ীতেই থাকিতেন। তিনি বিস্তর আসবাবপত্র কিনিয়াছিলেন। এইসকল জিনিসপত্র যদি ঢাকায় লইয়া যাওয়া সম্ভব হয় লইয়া যাইও, নতুবা বিক্রয় করিয়া ফেলিও—যাহা সুবিধাজনক হয় করিও—এই আদেশ দিয়া দাদা কলিকাতায় চলিয়া যাইলেন। দ্বারকানাথ জিনিসপত্র বিক্রয় করা ক্ষতিকর হইবে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন—বড় ভোজপুরী নৌকায় করিয়া এই সব আসবাবপত্র ঢাকায় লইয়া যাইবেন। দাদা ঢাকার ডালবাজারে একটা বড় বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। বাড়ী ঘাটের নিকটেই ছিল। দ্বারকানাথ এই বাড়ীতে জিনিসপত্র উঠাইয়া দিলেন। নৌকাযোগে বাঁকিপুর হইতে ঢাকায় আসিতে ১৭।১৮ দিন লাগিয়াছিল। কলেজ খুলিলে দ্বারকানাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে না গিয়া ঢাকা কলেজেই ভর্ত্তি হইলেন। দ্বারকানাথ দাদার বাসায় থাকিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে দুই বেলাই বাহির হইতে আহার করিয়া আসিতে হইত। কারণ, তখনও তিনি হিন্দুসমাজে ছিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জুন মসে প্রসন্নকুমার বিবাহ করিতে কলিকাতায় গমন করেন; দ্বারকানাথও সঙ্গে গিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের বিবাহে দ্বারকানাথও খাওয়া-দাওয়া করিয়াছিলেন। বিবাহ তুমুল ঘটা করিয়া হইয়াছিল। বহুসংখ্যক লোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ পূর্ব্বে বিবাহে কখনও এত লোক একত্র হইতে দেখেন নাই। বিস্তর আয়োজন ও বিস্তর পয়সা খরচা করিয়া ৺দুর্গামোহন দাশ মহাশয় নিজের মর্য্যাদানুযায়ী তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের মনে অল্পবয়স হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার

হয়। ঢাকায় পড়িবার সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার মধ্যম অগ্রজ প্রসন্ন-কুমারের বাসায় যাইতেন। তখন তাঁহারা অনেকে মিলিত হইয়া ব্রজসুন্দর বাবুর হাউলিতে আরমানিটোলায় থাকিতেন, রবিবারে রবিবারে সেখানে সমাজ হইত। দ্বারকানাথ দুই একদিন গিয়া তাঁহাদের সমাজে যোগ দিয়া দেখিলেন, তাঁহারা যেরূপ ধর্ম্মের কথা বলিতেন তাহা তাঁহার মনে খুব ভাল লাগিত, আর তিনি সেগুলি মন দিয়া শুনিতেন। এইরূপে তাঁহারও ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর একটা টান হইতে লাগিল, কিন্তু বাড়ীতে কেহ কিছু জানিতে পারিল না। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বই পড়িতে এবং ভাল করিয়া মন দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে দেশপূজ্য ধর্ম্ম-প্রচারক আচার্য্য ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় একবার ঢাকাতে গিয়াছিলেন, আর সেই ব্রজসুন্দর বাবুর হাউলিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া দ্বারকানাথ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কি পরিষ্কার বলিবার ক্ষমতা, যাহা বলিতেন মনের মধ্যে যেন বসিয়া যাইত। এই সকল ঘটনাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ হইল ও ভাল করিয়া বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টা হইল। দেব, দেবী যাহা আমরা পূজা করি ও ভক্তি করিয়া নমস্কার করি তাহা ত মাটীতে নির্ম্মিত, পূজা করিয়া আবার ফেলিয়া দিতে হয়, ইত্যাদি নানা কথা তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। তবে এ কথাও তিনি জানিতেন যে, এই দেব দেবী মাটীতে নির্ম্মিত হইলেও পূজার সময়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় আর সেই সময়ের জন্য দেবতা ইহার মধ্যে অধিষ্ঠান করেন। মূর্ত্তি দেখিয়া পূজা করা, কি নমস্কার করা তাঁহার অতি সহজ মনে হইত কিন্তু ঈশ্বর সমস্ত জগদ্ব্যাপী, নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান, অব্যক্ত, অনন্ত ইত্যাদি মনের মধ্যে অনুভব করা তাঁহার পক্ষে বড় দুঃসাধ্য মনে হইত। যাহা হউক, ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানের উপর একটা আস্থা জন্মিল। সেই সময়ে মধ্যম অগ্রজের অনুগ্রহে অনেক

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ

ব্রাহ্ম-পরিবারের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইল—বিশেষতঃ ৺কালী-নারায়ণ গুপ্ত (৺স্তর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের পিতা) মহাশয়ের পরিবার। ৺কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত অনেকদিন হইতেই দ্বারকানাথের মধ্যম অগ্রজ প্রসন্ন-কুমারের পরম বন্ধু ছিলেন। অনেকবার কলেজের ছুটার সময়ে প্রসন্নকুমার তাঁহাদের বাড়ী ভাটপাড়া যাইতেন আর তাঁহার মাকে মা বলিয়া ডাকিতেন। যখন তাঁহাদের সহিত দ্বারকানাথের প্রথম আলাপ হইল, তখন তিনি মেয়েদের স্বাধীনতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মেয়ে-ছেলেরা একত্র চলা-ফিরা খাওয়া দাওয়া করিত দেখিয়া প্রথম প্রথম তাঁহার বাধাবাধ লাগিত, পরে সে ভাব চলিয়া গেল আর ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তাঁহারা দ্বারকানাথকেও ভ্রাতার মত দেখিতেন; দ্বারকানাথও তাঁহাদিগকে ভগিনীর মত স্নেহ করিতেন। ইহা ছাড়া ৺বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পরিবারের সহিত ও প্রসন্নদাদার ব্রাহ্ম বন্ধুদের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। তিনি ঢাকাতে দাদার বাসায় থাকিয়া ঢাকা কলেজে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দাদা ব্রাহ্ম ও বিলাত-ফেরত বলিয়া তাঁহার বাসায় খাওয়া-দাওয়া দ্বারকানাথ করিতেন না, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দাদার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহায় বাসায় খাওয়া-দাওয়া করিলে গ্রামের লোকেরা গোলমাল করিবে আর অপ্রকাশ্যভাবে চুপে চুপে দাদার সহিত খাইয়া সমাজে থাকা—দাদা ইহা পছন্দ করিতেন না। সে সময়ে বর্ত্তমান সমাজের মত সমাজ ছিল না, যে যাহা ইচ্ছা করে ও খায়-দায় অথচ হিন্দু সমাজে আছে—সে সময়ে ছেলেরা কোথায় কি করে, কি খায় ইত্যাদি বিষয় সমাজের লোকেরা খোজ রাখিত ও ইহা লইয়া বড় গোলমাল করিত। অতএব দ্বারকানাথ যতদিন হিন্দু সমাজে ছিলেন, ততদিন তাঁহার দাদার বাসায় থাকিতেন কিন্তু খাইতেন না। দ্বারকানাথের খাইবার বন্দোবস্ত

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ

ছিল অন্যত্র। সোনা নাম্নী তাঁহার আর এক খুড়তাত ভগিনীর স্বামী ৺গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় সেই সময়ে ঢাকাতে মোক্তারি করিতেন এবং ঢাকাতেই থাকিতেন। তাঁহার বাড়ী ঢাকার খুব কাছেই—তেঘরিয়া গ্রামে ছিল। এই বাসা দ্বারকানাথদের ডালবাজারের বাসার নিকটেই ছিল। দ্বারকানাথ বৃষ্টি বাদল হইলেও সেইস্থানে খাইয়া আসিতেন। ইহাতে গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে লইয়া সামাজিক গোলমাল করিতে পারিত না।

প্রসন্নকুমারের বিবাহের পর হইতেই দ্বারকানাথকে হিন্দুসমাজ ছাড়িতে হইল। তখন হইতে তিনি ঢাকায় আসিয়া তাঁহার মধ্যম দাদার বাসাতেই খাওয়া-দাওয়া করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে যাইলেও দ্বারকানাথ রাত্রিতে বড় থাকিতেন না, সন্ধ্যার সময় চলিয়া আসিতেন। তিনি রবিবারে রবিবারে ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে আরম্ভ করিলেন, আর অন্যান্য ব্রাহ্মদের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। অবশেষে দ্বারকানাথ ব্রাহ্মদলভুক্ত হইলেন।

ঢাকায় দাদার বাসায় থাকিবার পূর্ব্ব হইতেই দ্বারকানাথের মন হইতে হিন্দুর আচার-ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। কারণ বাঁকিপুর হইতে তাঁহার দাদার জিনিসপত্র লইয়া নৌকা-যোগে ঢাকায় আসিবার সময়ে দ্বারকানাথ বাবুর্চ্চির রন্ধন করা অন্নাদি ভোজন করিয়াছিলেন। একদিকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপর যেমন তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছিল, অন্যদিকে তেমনই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি ও বিশ্বাসের হ্রাস হইতেছিল।

যে বৎসর দ্বারকানাথের মধ্যম অগ্রজের বিবাহ হয়, সেই বৎসর দ্বারকানাথের এফ-এ পরীক্ষা দিবার বৎসর ছিল। তিনি পরীক্ষাও দিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জা হয়। এই লজ্জার জন্য তিনি আর ঢাকা কলেজে পড়িয়া পরীক্ষা দিতে

চাহেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। তার পর ব্যবসায় করিবেন করিবেন করিয়াও কিছুদিন অতিবাহিত হইল।

অতঃপর Casual Student হইয়া দ্বারকানাথ ১৮৭৯ খৃ াব্দের জুন মাসে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। সে সময়ে দ্বারকানাথের বয়স পঁচিশ বৎসর। যে সময়ে দ্বারকানাথ মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন, সেই সময়ে ৪৫ নং বেনেটোলা লেনে ছেলেদের থাকিবার একটী বোর্ডিং ছিল। ইহার নাম ছিল আনন্দমোহন বসুর বোর্ডিং। আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় এই বোর্ডিংয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ইনি আনন্দমোহন বসুর শ্বশুর ছিলেন; এই বোর্ডিংয়ে থাকিবার সময়ে দ্বারকানাথের সহিত দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক ছাত্রের আলাপ-পরিচয় হয়। ইহাদের অনেকে দ্বারকানাথ ও অপরাপর পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছাত্রদিগকে "বাঙ্গাল" বলিয়া ঠাট্টা করিত। এজন্য পূর্ব্ববঙ্গীয় কোনও কোনও ছাত্র রাগিয়া যাইত ও ফলে ঝগড়া হইত। কিন্তু দ্বারকানাথকে "বাঙ্গাল" বলিলে রাগ করিতেন না। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ছিল। দ্বারকানাথ বলিতেন,—পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছাত্রদের কথাবার্ত্তা ও উচ্চারণ এত তফাৎ ছিল যে, কলিকাতাবাসী লোকমাত্রেরই কানে তাহা বাজিত। এই জন্য পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদের কথা বুঝিতে না পারার জন্যও সময়ে সময়ে ঝগড়া হইত। দ্বারকানাথ রাগ করিতেন না বলিয়া তাঁহাকে কেহ 'বাঙ্গাল' বলিয়া ক্ষেপাইত না। তিনি সকলের সহিতই ভাব রাখিয়া ও মিলিয়া মিশিয়া চলিতেন। বাসার ঝি-চাকরেরা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রদিগকে 'বাঙ্গাল' বলিয়া অবহেলা করিত। দ্বারকানাথ ইহাতে কিছু মনে করিতেন না এই জন্য যে, ঢাকার লোকেরাও শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের লোকদিগকে তাঁহাদের কথাবার্ত্তার জন্য এইরূপ উপহাস করিতেন।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার সময়ে দ্বারকানাথ প্রতি শনিবারে দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের বাসায় যাইতেন। সেই সময়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা ভুবনমোহন দাশ একত্র ৩১ নং পিপুলপটী রোড-স্থিত একটী বাড়ীতে থাকিতেন। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সকলেই দ্বারকানাথকে ভালবাসিত এবং শীঘ্রই উহাদের সঙ্গে তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছিল। এই সময়ে দুর্গামোহনবাবুর অল্পবয়স্ক দুইটী পুত্র—সতীশ ও যতীশ এক সঙ্গে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অনেক দিন ভুগে। তখন দ্বারকানাথ তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ইহারা সুস্থ হইয়া উঠিবার পর পূজার ছুটীতে হাইকোর্ট বন্ধ হয়। তখন দুর্গামোহনবাবু বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য উহাদিগকে হাজারিবাগে লইয়া যান। সেই সময়ে দ্বারকানাথও উহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন ও ঢাকায় তাঁহার দাদার বাসায় গমন করেন। দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হয় যে, দ্বারকানাথ বোম্বাই মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ডাক্তারী পড়িবেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে দ্বারকানাথ এই উদ্দেশ্যে বোম্বাই যাত্রা করেন। সেই সময়ে বোম্বাইতে রজনীনাথ রায় মহাশয় অবস্থান করিতেন। তিনি সেখানকার ফাইন্যান্স বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বারকানাথ বোম্বাইতে গিয়া প্রথমে এই রজনীবাবুর (Mr. R. N. Ray) বাড়ীতেই ছিলেন। এইখান হইতে কলেজে আনাগোনা করিয়া তিনি ভর্ত্তি হইলেন। পরে কলেজের নিকটে একটি বাসা ভাড়া করিয়া দ্বারকানাথ সেখান হইতে কলেজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কলেজের পড়াশুনা দ্বারকানাথের ভাল লাগিল না। বাসাতে নিরামিষ আহার এবং তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার রীতি তাঁহার মনঃপূত হইল না। কাজেই তিনি মাসাবধি সেখানে

বোম্বাই মেডিক্যাল কলেজে

থাকিয়া ফেব্রুয়ারী মাসেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার পথে তাঁহার বহুদিনের দেশ-ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা তিনি কতকটা মিটাইয়া আসিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি সোজা কলিকাতায় না গিয়া ব্রোচ, আজমীর ও আবু পর্ব্বত হইয়া, দিল্লী আগ্রা দেখিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দ্বারকানাথ প্রথমোক্ত স্থানগুলিতে দুই একদিন করিয়া থাকিয়া পরে আগ্রায় ৺গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হয়েন এবং সেখানে প্রায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া কলিকাতায় পৌছেন। রাস্তার কষ্টের কথা বলাই বাহুল্য। কারণ, কোনখানেই কাহারও সহিত পরিচয় ছিল না। অতএব অধিকাংশ সময়ই অন্যান্য লোকের সহিত মোসাফেরখানাতেই রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। তাহারা যাহা খাইতে দিত তাহাই খাইতেন। অধিকাংশ সময়েই বড় বড় শুক্‌না চাপাটি আর মাংস তাহারা খাইতে দিত। এরূপ থাবার ও থাকিবার কষ্ট হইলেও দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির জন্য মনে কষ্ট না হইয়া বরং আহ্লাদই হইত। কিন্তু আগ্রাতে গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে অতি যত্নে থাকা হইয়াছিল। তাঁহারা দ্বারকানাথকে আগ্রার সকল দর্শনীয় স্থানেই লইয়া যাইতেন। এইরূপে কয়েকদিন ঘুরিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন।

দ্বারকানাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এবার তিনি ৬নং কলেজ স্কোয়ারের একটি বোর্ডিংয়ে রহিলেন; এইখানে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রগণ থাকিতেন। এইবার তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত লেকচার শুনিতে ও অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তখন ডাক্তার রে সাহেব দ্বিতীয় সার্জ্জন ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে দুই জন ডিমনষ্ট্রেটর ছিলেন; একজনের নাম ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অপরের নাম ডাক্তার রাজ-

পুনঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে

মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শব-ব্যবচ্ছেদের (Dissection) ভার ইঁহাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। শব-ব্যবচ্ছেদ করিতে দ্বারকানাথের বড় ভাল লাগিত এবং তিনি গভীর মনোযোগের সহিত ইহা করিতেন। গোবিন্দবাবু দ্বারকানাথের যত্ন ও চেষ্টা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কোন্‌টা কি সেসব বলিয়া দিতেন। শব-ব্যবচ্ছেদ করিতে পচা দুর্গন্ধময় মৃতদেহ ঘাঁটিতে হয়, সকল ছাত্র ইহা ভালবাসিত না; কিন্তু মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে অনেক বিষয় জানিতে পারা যাইবে—ইহা মনে করিয়া দ্বারকানাথ দুর্গন্ধকে গ্রাহ্য না করিয়া কার্য্য করিতেন। মেডিক্যাল কলেজে এই সময়ে Dr. Cunningham ফিজিওলজির লেকচার ও মাইক্রসকোপ শিক্ষা দিতেন। তিনি হিষ্টলজিতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। দ্বারকানাথ তাহাও মনোযোগ দিয়া শিক্ষা করিতেন। পরে সার্জ্জারি পড়িবার সময়ে প্রথম Surgeon Macleod সাহেবের ওয়ার্ডে রোগী দেখিতেন। সেই সময়ে তিনি প্রথম লিষ্টার এণ্টিসেপটিক আরম্ভ করেন। তখনও কোনও রূপ অপারেশনের সময়ে, কি ড্রেস করিবার সময়ে স্প্রে করিবার যন্ত্র ছিল না, কেবল হাত-স্প্রে ছিল। ওয়ার্ডে ড্রেস করিবার সময়ে ছেলেদের তাহা ব্যবহার করিতে হইত, এই স্প্রে করিবার সময়ে হাত ধরিয়া যাইত। যতক্ষণ ড্রেস করিতে হইত ততক্ষণ স্প্রে করিতে হইত। দ্বারকানাথের হাতে শক্তি থাকাতে এই কার্য্যে তিনি খুব মজবুত ছিলেন। সাহেব এজন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন। প্রথম ফিজিসিয়ান ও প্রিন্সিপাল ছিলেন Coat সাহেব; তিনি মেডিসিন পড়াইতেন। দ্বিতীয় ফিজিসিয়ান Chandra সাহেব; তাঁহার ওয়ার্ডে দ্বারকানাথ রোগী দেখিতেন। তিনি ওয়ার্ডে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতেন, অধিক কিছু বলিতেন না। রাত্রিতে পালা-মত এক একদল করিয়া ছেলেদের হাঁসপাতালে থাকিতে হইত। রাত্রিতে থাকিতেও দ্বারকানাথের কোনওরূপ অনিচ্ছা ছিল না। অনেক ছাত্র সুযোগ পাইলেই পলাইতে

ছাড়িত না। সকালে আউট-ডোরেও তিনি রোগী দেখিতে যাইতেন। তিনি একমাস থানেক মিড্‌ইফারি ওয়ার্ডে গুড়িভ স্কলারের বদলে কাজ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে Casual Student-রূপে তিনি ৩।৪ বৎসর পড়িয়াছিলেন। সুতরাং চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহার মোটামুটী জ্ঞান হইয়াছিল। হয় ত আর ২।১ বৎসর এখানে পড়িয়া তিনি একখানি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতেন ও মফঃস্বলের কোনও স্থানে গিয়া ডাক্তারী তেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তাহা নহে।

বিলাত-যাত্রা

যিনি উত্তরকালে কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডাক্তার হইবেন তাঁহার তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া করিলেন।

১৮৮২ সালের জুলাই মাসে ছুটীর সময়ে দ্বারকানাথ ঢাকায় মধ্যম অগ্রজ প্রসন্নকুমারের বাসায় গিয়াছিলেন। বধূঠাকুরাণী একদিন কথায় কথায় বলিলেন, এখন আপনি বিলাতে গেলে ভাল হয়; এই কথাটা দ্বারকানাথের নিকট স্বপ্নের মত লাগিল। ইহা তিনি কখনও মনে করেন নাই বা ভাবেনও নাই। তাঁহার মনে মনে কেবল এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল যে, ঈশ্বর কি এমন দিন দিবেন যে, বিলাত যাওয়া হইবে। বিলাত যাওয়া সেই সময়ে এক বৃহৎ ব্যাপার ছিল; আজকালকার মত নয় যে, প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর ছেলেরা প্রথম হইতেই বিলাত যাইবার প্রস্তাব করে। যাহা হউক, বিলাত যাইয়া ডাক্তারী পড়ার কথায় মন বড় চঞ্চল হইল। কি যে হইবে ইহা ভাবিয়া তিনি কূল-কিনারা পাইতেন না। দ্বারকানাথ দেখিতেন, দাদা যাহা বেতন পান তাহা হইতে তাঁহার বিলাতে থাকিবার খরচপত্র দেওয়া কঠিন। কিন্তু বধূঠাকুরাণী ও দাদা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, যদিও তাঁহাদের টাকার অভাবে বিশেষ কষ্ট হইবে কিন্তু ভবিষ্যতে দ্বারকানাথের ত ভাল হইবে। অতএব তাঁহারা

তাঁহাকে বিলাতে পাঠানই স্থির করিলেন। দ্বারকানাথ বেশ বুঝিতে পারিলেন, বধূঠাকুরাণীর আগ্রহেই তাঁহার বিলাত-যাত্রার বিষয় ঠিক হইল।

তিনি বিলাত যাইবার সকল আয়োজন করিতে লাগিলেন। মেডিক্যাল কলেজ হইতে সকল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিলেন। কিছু কিছু কাপড় ও জিনিস-পত্রাদি কিনিতে লাগিলেন। বিলাত যাইবার ভাড়া পাঁচশত টাকা দিয়া Graham কোম্পানীর California নামক জাহাজের প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিলেন। সেই সময়ে বিলাত যাইবার ভাড়া সস্তা ছিল। অন্যান্য লাইনে, City লাইনে প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছয় শত টাকা চাহিল; অতএব যেখানে কম মূল্য হয় তাহাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি ঠিক করিলেন। ক্রমে তাঁহার যাত্রার দিন নিকটে আসিল। আগষ্ট মাসের ২৪শে আগষ্ট (১৮৮২ খৃঃ) জাহাজে উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গে সেই জাহাজে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় (Sir P. C. Ray) Gilchrist পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কলারসিপ পাইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহারা মাত্র দুইজন বাঙ্গালী সেই জাহাজে ছিলেন। মোটের উপর, অধিক Passenger সেই জাহাজে ছিল না, অল্প কয়েকজন মাত্র ছিল। তাঁহারা ৩০শে আগষ্ট অধিক রাত্রে কলম্বো আসিয়া পৌছেন। পর দিবস সেখানে ডাঙ্গায় উঠিয়া তাঁহারা একখানা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া সহর ভ্রমণ করিতে বাহির হন। সিনামন গার্ডেন (Cinnamon Gardens), মিউজিয়াম আর যাহা যাহা দেখিবার ছিল দেখিয়া তাঁহারা বাজারে যান। দেখেন, সে অসময়েও সেখানে আম পাওয়া যায়। কতগুলি আম ও একপ্রকার ছোট ছোট পেয়ারা ফলের মত ফল ও কিছু তৈয়ারী পানের খিলি খরিদ করিয়া তাঁহারা জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর জাহাজ ছাড়িয়া দিল। ১০ই সেপ্টেম্বর জাহাজ এডেনে আসিয়া পৌছিল। এখানে তাঁহারা চিঠিপত্রাদি ডাকে দিয়া সহর পরিভ্রমণ করিতে চলিলেন।

সহরটি বিশেষ বড় নহে। এখানে কয়েকটা মাড়োয়ারীর দোকান দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া গেল। এখানে একদিন থাকিয়া ১১ই আবার জাহাজ চলিতে লাগিল। Red Sea-র মধ্য দিয়া ৫।৬ দিন চলিয়া ১৬ই Suez-এ পৌঁছিল। সুয়েজের (Suez Canal) কাণা খাল দিয়া তিন দিন চলিয়া চলিয়া ১৯শে বেলা দুইটার সময়ে Port Said-এ জাহাজ পৌঁছিল। সেইদিনই রাত্রি ৮টার সময়ে আবার জাহাজ চলিতে লাগিল। আট নয় দিনের মধ্যে তাঁহারা ২৭শে রাত্রিতে Gibralter পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া মনে হইল, তাঁহারা ইউরোপে আসিলেন। লোকজন সব শ্বেতকায়। এখানে জাহাজ দেড়দিন অপেক্ষা করিল অর্থাৎ ২৮শে বেলা আড়াইটার সময়ে আবার জাহাজ ছাড়িল। ৪ঠা অক্টোবর অতি প্রত্যুষে পাঁচটার সময়ে জাহাজ Gravesend-এ আসিয়া পৌঁছিল। ট্রেণে উঠিয়া বেলা একটার সময়ে তাঁহারা লণ্ডনে ভিক্টোরিয়া (Victoria) ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। ষ্টেশনে সত্যরঞ্জন অর্থাৎ দুর্গামোহনবাবুর বড় ছেলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ট্রেণ হইতে নামিবামাত্র তাঁহাদের দুইজনকে একটা Cab-এ করিয়া তাহার Fitzroy Road-স্থ ভবনে লইয়া যাইল। সেখানে তাঁহাদের খাইবার জন্য Breakfast প্রস্তুত রাখিবার আদেশ দিয়া গিয়াছিল। বাসাতে আসিয়াই Breakfast খাওয়া হইল। নানা কথাবার্ত্তায় প্রায় দিন কাটিয়া গেল। বিকাল বেলা জগদীশ (Sir J. C. Bose) আসিলেন, তিনি Cambridge-এ Christ College-এ পড়িতেন আর ছুটীর সময়ে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। তিনি দ্বারকানাথের পুরাতন বন্ধু, তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদ হইল ও তাঁহার সহিত দেশের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সন্ধ্যার সময়ে সত্য বলিল, চল তোমাকে নিয়া Mr. O. C. Mallick-এর বাসায় যাই। তিনি কে দ্বারকানাথ তাহা পূর্ব্বে জানিতেন না। সত্যের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে যাওয়া হইল। তাঁহার বাড়ী এ বাড়ীর নিকটেই

লণ্ডনে উপস্থিতি

ছিল। সে বাড়ীতে মিষ্টার মল্লিক তাঁহার স্ত্রী পুত্র লইয়া থাকিতেন। তাঁহারা রাত্রে খাইবার জন্য দ্বারকানাথ প্রভৃতিকে আদর করিয়া রাখিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে দেশের মত ভাত মাংসের ঝোল ইত্যাদি খাইয়া রাত্রি করিয়া সত্যের বাসাতে ফিরিয়া আসা হইল। প্রফুল্লের রাত্রিতে থাকিবার জন্য সত্য একটী ঘর তাহার বাসার নিকট ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেখানে শুইতে গেলেন আর তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে এক বিছানায় শুইলেন। পরদিন দুইজনে বাহির হইয়া নিকটে ৯০নং Gloucester Road-এ ঘর ঠিক করিয়া আসিলেন। তিন তলার উপর দুইটী ঘর, একটী রাস্তার উপর একটুকু বড়, তাহার ভাড়া সপ্তাহে পাঁচ শিলিং। ছোটটীতে প্রফুল্লচন্দ্র থাকিবেন ও বড়টীতে দ্বারকানাথ থাকিবেন। দুই জনের একত্র খাইবার ও বসিবার স্থান দ্বারকানাথের ঘরেই হইল। সত্যরঞ্জন চলিয়া গেলে প্রফুল্লচন্দ্র ও দ্বারকানাথ দুইজনে সেই দুইটী ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। সপ্তাহকাল লণ্ডনে থাকিয়া দ্বারকানাথ Glassgow ও প্রফুল্লচন্দ্র Edinburgh যাইলেন।

১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারে দ্বারকানাথ গ্লাসগো সহরে পৌছেন। সেখানে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত মিঃ পি-এম্ রায় নামক এক ছাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে দ্বারকানাথের সতীর্থ ছিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহাকে পত্র লিখিয়া গ্লাসগো যাইবার বিষয় জানাইয়াছিলেন। তিনিও দ্বারকানাথকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার রায় সেই সময়ে গ্লাসগোতে মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্ট ছিলেন। গ্লাসগোর মেডিক্যাল কলেজের নিয়ম—সেখানে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে Medical Student বলিয়া নাম রেজিষ্টারী করাইতে হয়। রেজিষ্ট্রার এডিনবরাতে থাকেন। তাঁহার নিকট কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের Junior ও Senior লেকচারের সার্টিফিকেট লইয়া যাইতে হইল। জুনিয়র লেকচারে Anatomy দুই Session, Physiology, Chemistry, Botany এবং

Dissection, Materia Medica সব দুই Session করিয়া ছিল আর সিনিয়র লেকচারও অর্থাৎ Practice of Medicine, Surgery, Midwifery, Pathology এবং Hospital Attendance ইত্যাদি সব দুই Session করিয়া ছিল। রেজিষ্ট্রার এইসকল দেখিয়া দ্বারকানাথকে অবিলম্বে Medical Student বলিয়া রেজেষ্টারী করিলেন এবং একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন। সেই পত্র লইয়া দ্বারকানাথ সেই দিনই Glassgowতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তিনি লেকচার শুনিতে আরম্ভ করিলেন। Maternityতে delivery করাইবার জন্য নাম লিখাইলেন। Vaccination Outdoor Department-এ যোগ দিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ডাক্তারীর প্রাথমিক পরীক্ষা (Medical Primary Examination) দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। Maternity বিভাগের নিয়ম এই যে, প্রসূতির নাম ও ঠিকানা পাঠাইয়া দিলে যে অবস্থায়ই থাকা যাউক না কেন, তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইতে হইবে। এমন কি, দুই চারি দিন লেকচার হইতেছে, তাহারই ভিতর হইতে ছুটিতে হইয়াছে।

গ্লাসগোতে অধ্যয়ন আরম্ভ

কলিকাতায় থাকিতে অনেক ডিলিভারী কেসই দ্বারকানাথ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ধাত্রীবিদ্যা পড়া ছিল কিন্তু নিজ হাতে কখনও প্রসব করান নাই। প্রথম হইতেই প্রসব করাইতে তাঁহার কিছুমাত্র ভয় হইত না বরং সাহসের সহিত কাজ করিতেন। শীতের সময় রাত্রিয়ত তাঁহাকে রোগীর বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইত. তবে সে দেশের পুলিশ এ বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিত। দুই চারিটী Case অনেক দূরে রাত্রিতে তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। গরীব-দুঃখীদের কোন কোন বাড়ীতে অত শীতের সময়েও আগুন থাকিত না। প্রসব করানই শেষ নহে; তার পরেও কয়েকদিন পর্য্যন্ত রোজ যাইতে হইত আর একটি

ফর্ম্ম (Form) আছে তাহা পূর্ণ করিয়া মেটারনিটিতে দিতে হইত। তাহাতে নাম. ধাম, বয়স, কখন প্রসব হইল, কত মাসে, বিবাহিতা, অবিবাহিতা, বিধবা, পুত্র কি কন্যা ইত্যাদি সব লিখিতে হইত। তিন চারি মাসের মধ্যে অনেক প্রসবের Case করিয়া তিনি Certificate পাইলেন। ওদিকে একদিন পর পর Vaccination করিতে সকালে Outdoor-এ যাইতে হইত। সেখানে নিজ হাতে Vaccination করিতে হয়, আর ভাল টীকা উঠিলে তাহা হইতে Lymph খুব সরু tube-এর ভিতর মুখ দিয়া টানিয়া লইয়া spirit lamp-এ গরম করিয়া hermetically seal করিতে হয়। এইরূপ রোজ অনেক টীকার lymph প্রস্তুত করিতে হইত। Session শেষ হইলে এজন্যও একটী certificate পাওয়া গেল।

ক্রমে পরীক্ষার দিন নিকটে আসিল। দ্বারকানাথ Feeর টাকা জমা দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই পরীক্ষা আরম্ভ হইল। চারিদিন মাত্র পরীক্ষা হইয়াছিল। একদিন মৌখিক পরীক্ষা Chemistryর ছিল। পরীক্ষা দেওয়া মন্দ হইল না। পরীক্ষা হইয়া গেলে তাঁহার মনে নানারূপ ভাবনা-চিন্তা আসিতে লাগিল। কিন্তু একদিনের তরেও ঈশ্বরকে ভুলেন নাই। তিনি কি করিয়া কিরূপে তাঁহাকে এই দেশে লইয়া আসিলেন, প্রায়ই এই সব দ্বারকানাথ ভাবিতেন। তাঁহার মনে হইত, এ সকলই ভগবানের ইচ্ছা।

পরীক্ষায় সাফল্য

পরীক্ষার ফল বাহির হইবার জন্য তাঁহার মন বড় ব্যস্ত হইতে লাগিল। যাহা হউক, শীঘ্রই পরীক্ষার ফল তিনি জানিতে পারিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। ঈশ্বরের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাব নিজ হইতেই আসিতে লাগিল।

বিলাতে গিয়া সেখানকার রীতি-অনুযায়ী ভোজ-সভা প্রভৃতিতে মদ্যপান, চুরুট ও সিগারেট ইত্যাদি সেবন করিতে হয়। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অনেকে এই রীতি পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু দ্বারকানাথ ভোজে

নিমন্ত্রিত হইয়াও মদ্যপান করেন নাই ও চুরুট খান নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার স্বলিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গ্লাসগোতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার সময়ে বড়দিনে তাঁহারা এক প্রফেসরের বাগান-বাড়ীতে Xmas dinner-এ নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলেন। সেই ডিনারে সব রকম মদ ছিল কিন্তু জল ছিল না। দ্বারকানাথ কোনও প্রকার মদ খান নাই, তাই পরিবেশন-কারী ভৃত্যের নিকট চুপে চুপে জল চাহিতে হইল। সে তাঁহাকে স্পষ্ট বলিল, এখানে জল নাই। এ কথা প্রফেসরের কানে পৌঁছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে রান্নাঘর (Cellar) হইতে জল ও গেলাস আনিতে আদেশ করিলেন। খাবার টেবিলের সব লোক জানিতে পারিলেন যে, তিনি জল ছাড়া অন্য কিছু পান করেন না। এই গোলমালে তাঁহার একটু লজ্জা বোধ হইল বটে কিন্তু কখনও মদ খাইব না—এই সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল। আবার যখন আহারান্তে সকলে মিলিয়া সিগার-সিগারেটের ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাকেও সিগার-সিগারেট লইতে বলিলেন, তখন দ্বারকানাথ তামাক খাই না, মদ খাই না বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বিশেষ তামাক খাই না—ইহা জানিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

ছাত্রজীবনে মদ্য ও তামাক স্পর্শ না করা

দ্বারকানাথ ছাত্রজীবনে তামাক স্পর্শ করেন নাই বটে, কিন্তু উত্তর-জীবনে তিনি তামাক ব্যবহার করিতেন।

ভোজ-সভায় বিলাতে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যেভাবে মেলামেশা করেন, একসঙ্গে মদ খান, গান করেন, লাফালাফি করেন, সমবয়সীর মত ব্যবহার করেন, তাহা ভারতবাসীর চক্ষে বিসদৃশ ঠেকে। নূতন বৎসর উপলক্ষে কলেজে একটী New Year Subscription Dinner বা ভোজ হয়। দ্বারকানাথ তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ডিনারে অনেক প্রফেসরও

ভোজ-সভায় বিলাতের ছাত্র ও অধ্যাপক

ছিলেন। তাঁহারা ছেলেদের সহিত যেভাবে মদ্যপান ও মেশামেশি করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া দ্বারকানাথ অবাক্ হইয়াছিলেন। তাহার মনে হইয়াছিল, ছেলেরা প্রফেসরদিগকে কোনও রূপ সম্মান করে না। একত্র মদ খাওয়া, গান করা ও লাফালাফি করা, সমবয়সীর মত ব্যবহার এ দেশে নূতন আগত ভারতীয়ের চক্ষে কেমন কেমন লাগিতেছিল। তবে কি না তিনি সে দেশের আচার-ব্যবহার তখন পর্য্যন্ত কিছুই জানিতেন না। সে দেশের চাল-চলনই অন্যরূপ, বাপ-বেটা একত্র বসিয়া মদ্যপান করে, তামাকাদি খায়, ইহাতে কোনও-রূপ মান-অপমানের কথা নাই।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কলেজের ছুটী হইল। সেই ছুটীতে দ্বারকানাথ গ্লাসগো হইতে লণ্ডনে চলিয়া আসিলেন। তখন মার্চ্চ মাস। ছুটী পাইয়া প্রফুল্লচন্দ্রও (Sir P. C. Ray) এডিনবরা হইতে লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। উভয়েই একটি বাড়ীর দুইটী ঘর ভাড়া করিয়া লণ্ডনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সত্য ও জগদীশ কেমব্রিজ হইতে আসিয়া তাঁহাদের বাসায় ২।৪ দিন থাকিয়া যাইতেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ তাহাদের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে থিয়েটার দেখিতে যাইতেন। থিয়েটার দেখিতে তাহার বড় ইচ্ছা হইত না। লোকে অবশ্য বলিত, থিয়েটার ইত্যাদিতে যাওয়া ভাল, তাহাতে শিক্ষা হয়। কিন্তু ইহা শুনিয়াও তাহার থিয়েটার দেখিবার ইচ্ছা বিশেষ হইত না।

বিলাতে থিয়েটার দেখা

এই সময়ে দ্বারকানাথ ব্রিটিশ-মিউজিয়ামের পাঠাগারে পড়িবার জন্য জোগাড়-যন্ত্র করিয়া একটি টিকিট লয়েন। সেখানে তিনি প্রত্যহ সকালে যাইতেন ও সারাদিন থাকিয়া পড়াশুনা করিয়া বিকালে বাসায় ফিরিতেন। দ্বারকানাথের ভ্রাতা ও তদীয় পত্নী জানিতেন,—দ্বারকানাথ কোনও রূপে ডাক্তারীতে qualified হইতে পারিলেই ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সারভিস্ পরীক্ষা

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে

দিবে। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যচক্রের গতি তাঁহাকে অন্য পথে চালিত করিল।

London-এ আসিয়া ভাবিয়া ঠিক করিলেন যে, আর Glasgow ফিরিয়া না গিয়া এখানেই Double qualification L. R. C. P. আর L. R. C. S. পরীক্ষা দিবেন, সেজন্য পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করিলেন। Surgery তাঁহার বড় ভাল লাগিত, কলিকাতায় থাকিতেও Surgeryর উপর তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। যাহা হউক, সব বিষয়গুলি বেশ ভাল করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এক এক দিন London Hospital-এও Clinic শুনিতে যাইতেন। সেখানকার Clinic শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হইত। একটা রোগী লইয়া একটা ব্যারামের যাহা কিছু শিখিবার আছে অধ্যাপক সব বলিয়া যাইতেন। কি রকম শিক্ষার সুবিধা! Clinic Lecture তিনি বড় একটা এড়াইতেন না।

লণ্ডনে অনেক ভারতবাসীর সহিত দ্বারকানাথের পরিচয় হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন মেডিক্যাল সার্ভিসের অবস্থা বড় খারাপ ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ ৫।৬ টার অধিক পদ খালি হইত না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ২।৩ বার পরীক্ষা দিয়াও চাকুরী পান নাই। এ সকল কথা দ্বারকানাথের মধ্যম অগ্রজ ও অন্যান্য আত্মীয়েরা জানিতেন না। লণ্ডনের পরিচিতগণের মধ্যে কেহ কেহ দ্বারকানাথকে পরামর্শ দিলেন,—আপনি ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Dr. M. N. Banerji) মত L. S. A. পরীক্ষা পাশ করুন, তাহা হইলে ডাক্তারী প্রাক্‌টিস করিতে পারিবেন। এই পরীক্ষা পাশ করাও তত কঠিন নয়। এই পরামর্শ দ্বারকানাথের মনের মত হইল। তিনি তাঁহার সার্টিফিকেট ইত্যাদি লইয়া পরীক্ষা-বোর্ডের সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ

লণ্ডনে আসিয়া এল্-এস্-এ পরীক্ষা পাশ

করিলেন এবং L. S. A. পরীক্ষা দিবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিলেন। সেক্রেটারী সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিলেন এবং কি কি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে, সমস্তই বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। দ্বারকানাথ লণ্ডনে থাকিয়া এই পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পড়িয়া শুনিয়া তিনি ভালরূপই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

হোমিওপ্যাথির উপর অনুরাগের সূত্রপাত

দ্বারকানাথ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে এলোপ্যাথি পড়িয়াছিলেন, বিলাতে গিয়াও তিনি এলোপ্যাথিক পদ্ধতিতেই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার মনে হোমিওপ্যাথির উপর অনুরাগের সঞ্চার কিরূপে হইল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হইলেও ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। যে সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথি অধ্যয়নের জন্য সঙ্কল্প করেন, তখন হোমিওপ্যাথির প্রচার এখনকার মত ব্যাপকভাবে হয় নাই। সে সময়ে হোমিওপ্যাথির উপর নির্ভর করা আর আকাশে প্রাসাদ রচনা করা একই কথা ছিল। অথচ তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন মাত্র বিবেকের প্রেরণায় সেই সত্যের পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পথে সাফল্যলাভ অনিশ্চিত ছিল। দূরদেশে নিশ্চিতের আশা ত্যাগ করিয়া ভগবানের নামে, সত্যের নামে দ্বারকানাথ অনিশ্চিতের অন্ধকারময় বক্ষে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। দৃঢ়চেতা, সত্যসন্ধ, আত্মবিশ্বাসী, স্বাবলম্বী না হইলে তিনি সত্যের জন্য এই অনিশ্চিত পথে যাত্রা করিতে পারিতেন না। এই হোমিওপ্যাথির উপর কেমন করিয়া তাঁহার মনে অনুরাগের সঞ্চার হইল—তাহা প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা উচিত। যে বৈজ্ঞানিক সত্য তিনি মনে মনে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাকে জীবনে লাভ করিবার জন্য যে সংগ্রাম তিনি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ন্যায় প্রকৃত আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন বীরের পক্ষেই সম্ভবপর। L. S. A.

পরীক্ষা দিবার পর ছুটী হইয়াছিল ; তখনও পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই ; দ্বারকানাথ লণ্ডনে থাকিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া তথাকার রোগীদিগকে দেখিতে লাগিলেন ও তাহাদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেখানকার Resident-Physician-এর সহিত আলাপ-পরিচয়ও হইল। তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, যদি হোমিওপ্যাথি জানিতে ইচ্ছা কর, তবে America যাইতে হইবে। এখানে Lecture হয় বটে কিন্তু কোনরূপ diploma, কি ডিগ্রী পাওয়া যায় না। অতঃপর দ্বারকানাথ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি করিয়া এই বিন্দু বিন্দু গুলি, বা এক ফোঁটা জলের ঔষধে শরীরের উপর অত বড় কাজ করে ; কিন্তু তিনি তাহার উত্তর কিছু দিতে পারিলেন না। কিন্তু বলিলেন, রোগীরা এই অল্প মাত্রায় ঔষধ খাইয়া উপকার বোধ করে, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তুমি রোজ রোজ আসিয়া দেখিও। তাহা হইলেই তোমার নিজের বিশ্বাস হইবে, এ বিষয় তোমাকে তর্ক করিয়া কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু যাহারা Practice করে তাহারা জানে যে, এই অল্প মাত্রার ঔষধেও বিশেষ উপকার হয়। দ্বারকানাথ সেই অবধি প্রায়ই সেই হাঁসপাতালে যাইতেন ও তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। পরে সেখানকার ডাক্তারের দুই চারিটি রোগী বাহিরে গিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। দুইটী বিশেষ কঠিন রোগী, একটী Scarlet fever আর একটী diptheria যে অবস্থা হইতে বাঁচাইতে তিনি দেখিলেন, তাহা এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের হাতে কখনও ভাল হইত না। কারণ তখনও antitoxinএর আবিষ্কার হয় নাই। এই দুইটী রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া তাঁহার মন এই Homœopathyর প্রতি আকৃষ্ট হইল। কি করিলে এ বিষয় জানা যায় তাহাই

তিনি প্রতিনিয়ত ভাবিতে লাগিলেন। কলিকাতায় থাকিতে এক সময় দ্বারকানাথ এই ছোট ছোট বটিকাগুলিকে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন! এক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা অত্যন্ত মূর্খতা। না জানিয়া, না বুঝিয়া কোনও বিষয়ে বিদ্রূপ করা উচিত নহে।

দ্বারকানাথের পূর্ব্বসঙ্কল্প ছিল যে, তিনি L. S. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া L.R.C.P. ও L.R.C.S. পরীক্ষাও দিবেন। এজন্য কিছু কিছু পড়া-শুনাও তিনি করিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি হোমিওপ্যাথির ভিতর কি বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তিনি তাই আমেরিকায় যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে এখনই যাইতে হয়। কারণ, এখন সেপ্টেম্বরের শেষ এবং সেখানে session আরম্ভ অক্টোবর মাসে। কাজেই তিনি ১০ই অক্টোবর আমেরিকা যাত্রা করিলেন। লিভারপুল হইতে তিনি জাহাজে উঠিয়াছিলেন। পথে ঝড় হইয়াছিল। ১০।১১ দিনে নিউ ইয়র্কে পৌছিয়াছিলেন।

হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার জন্য আমেরিকা-যাত্রা

দ্বারকানাথ বিলাতে থাকিবার সময়ে মাসিক ৮ পাউণ্ড করিয়া সাহায্য পাইতেন। তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া এই টাকা হইতেও কিছু কিছু বাঁচাইতেন। এইরূপে যাহা বাঁচিয়াছিল তাহা হইতেই তিনি আমেরিকায় যাইবার টিকিট কিনিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ নিউ ইয়র্কে গিয়া যে বাসায় উঠিয়াছিলেন সেই বাসার বোর্ডারদের নিকট নিউ ইয়র্ক হোমিওপ্যাথিক কলেজের রাস্তা জানিয়া লইলেন এবং প্রাতরাশ করিয়া পরদিন বেলা ৯টা।১০টার সময়েই বাহির হইয়া পড়িলেন। কলেজে গিয়া কলেজের একটি Prospectus সংগ্রহ করিলেন। উহাতে অধ্যাপকগণের নাম-ঠিকানা দেওয়া ছিল।

Dr. T. F. Allen সেই সময় New York Homeopathic

College-এর Dean ছিলেন। দ্বারকানাথ পরদিন তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বিদেশী দেখিয়া যত্ন করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারকানাথও মন খুলিয়া আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তিনি দ্বারকানাথকে স্পষ্ট বলিলেন, হোমিপ্যাথিক ঔষধ কি করিয়া কাজ করে· তাহা তোমাকে তর্ক করিয়া বুঝাইতে পারিব না; তবে এক কাজ কর, আমি তোমাকে একখানা পত্র দিতেছি এই পত্রখানা লইয়া হোমিওপ্যাথিক কলেজের Dispensary-র House-Physician-এর সহিত আলাপ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে। এই পত্রে কেবলমাত্র এই লেখা ছিল যে, ইনি একজন পাশ করা ডাক্তার, হোমিওপ্যাথি শিখিতে ইচ্ছা করেন। ইঁহাকে রোগীদিগকে দেখিতে দিবে আর কি ওষুধ দাও তাহা বলিয়া দিবে, আবার যখন রোগীরা অপর দিন আসে তখন তাঁহাকে রোগীদের নিকট হইতে কেমন আছে না আছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে দিবে। দ্বারকানাথ দুই চারিদিন প্রত্যহ এরূপ করিতে লাগিলেন। তিনি রোগীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ঔষধে তাহাদের উপকার হয়। তখন তাঁহার মনে হইল যে, যখন রোগীরা নিজে উপকার স্বীকার করে, তখন অবশ্যই এ ঔষধের ভিতর এমন কিছু আছে যাহাতে উপকার হয়। কি করিয়া হয় তাহা সেই ডাক্তারও বলিতে পারিলেন না, তবে বলিলেন, ফলের দ্বারাই পরিচয়। দ্বারকানাথ তিন চারিদিন পরে কলেজের Post Graduate ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি সকল লেকচারই শুনিতে লাগিলেন। সেখানে প্রফেসরেরা পূর্ব্বদিন যাহা লেকচার দেন পরদিন লেকচার দিবার পূর্ব্বে 'কুইজ' করেন অর্থাৎ পূর্ব্বদিন যে লেকচার দিয়াছেন তাহা যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, জিজ্ঞাসার কোনও নির্দ্দিষ্ট লোক নাই, যাহাকে হয় জিজ্ঞাসা করেন, পরে সে উত্তর দিতে না পারিলে তাহার পরবর্ত্তীকে, সে না পারিলে আবার পরবর্ত্তীকে—এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন। দুই একদিন

দ্বারকানাথকেও প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল। ইহাতে ছেলেরা ও প্রফেসরগণ সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ডাক্তারী কিছু পড়া আছে। তিনি ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথিক Materia Medica ভিন্ন তাঁহার অন্য সব বিষয়ই পড়া ছিল। কলেজের লেক্‌চার শেষ হইয়া আসিল আর পরীক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। পরীক্ষা আরম্ভ হইলে দ্বারকানাথও পরীক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি কলেরা সম্বন্ধে এক thesis লিখিলেন। তাঁহার thesis পড়িয়া প্রফেসরেরা বড় সন্তুষ্ট হইলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে তিনি জানিতে পারিলেন—পরীক্ষায় খুব সম্মানের সহিতই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার নাম সসম্মানে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া না আসিয়া New York Homeopathic কলেজের Dispensaryতে Attending Physician-এর কার্য্য গ্রহণ করিয়া সেইখানেই Practical পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সেখানে প্রাকটিস্ করিতে হইলে একটা State medical পরীক্ষা দিতে হয়। দ্বারকানাথকেও তাহা দিতে হইয়াছিল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সেই State-এ প্রাকটিস্ করিবার জন্য একখানি Certificate দেওয়া হয়। তিনি তাহা দ্বারা প্রাকটিস্ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার একটু একটু প্রাকটিস্ হইতে লাগিল। তিনি কিছু টাকাও পাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার হাতে দুই পয়সা হইল। দেশে কবে ফিরিব তাহা তিনি ঠিক করিলেন, কিন্তু দেশে কিছু লিখিলেন না; কেবল লিখিলেন এখানে পরীক্ষা পাশ করিয়া কার্য্য করিতেছি। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তিনি বাহিরে রোগী দেখিতেন আর Dispensaryতে কাজ করিতেন। অতঃপর দ্বারকানাথ কলেরা সম্বন্ধে যে thesis লিখিয়াছিলেন তাহা ছাপাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। কারণ, তিনি মনে করিলেন, ইহাতে

হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

দেশের উপকার হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ডাক্তার এলেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—আমি আমার কলেরার thesis ছাপাইতে ইচ্ছা করি। ডাক্তার এলেন বলিলেন, ইহা কলেজের সম্পত্তি। তবে তুমি যদি ইচ্ছা কর, ছাপাইতে পার। দ্বারকানাথ তখন ডাক্তার এলেনকে একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। দ্বারকানাথ দেড়শত ডলার খরচ করিয়া ৫০০ খণ্ড এই পুস্তক ছাপাইলেন।

কলেরার thesis ছাপানো

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্কুল-কলেজের পারিতোষিক-বিতরণ এক সমারোহ ব্যাপার। নিউ ইয়র্ক হোমিওপ্যাথিক কলেজের পুরস্কার বিতরণ-উৎসব মহা আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। সত্য সত্যই ইহা এখানে একটী বৃহৎ ব্যাপার। একটা প্রকাণ্ড হলে প্রায় দুই তিন হাজার লোক উপরে ও নীচে সমাগত হয়। অন্যান্য ছেলেদের সহিত দ্বারকানাথও রাত্রি ৮টার সময় সেই বৃহৎ হলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না যে, তাঁহার পরীক্ষার ফল কি হইয়াছে। যখন সময় উপস্থিত হইল, তখন Dr. Allen (Dean) উঠিয়া প্রথম তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, ডাক্তার দ্বারকানাথ রায় কলিকাতাবাসী, তিনি আমাদের ছেলেদের মধ্যে প্রথম হইয়াছেন ও "Honourable mention" পাইয়াছেন। এই কথা বলিবামাত্র চারিদিক হইতে অতি উচ্চশব্দে হাততালি পড়িয়া হল যেন ফাটিয়া গেল। দ্বারকানাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার শরীর শিহরিত হইতে লাগিল, বাকরোধ হইল। এইরূপে যখন তিনি বসেন তখন আবার হাততালি পড়ে, আবার যখন উঠিয়া দাঁড়ান, তখনও হাততালি। এইরূপে চারি পাঁচ বার ওঠা বসা চলিল। আর সকলে এই বিদেশীয় লোকটাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। দ্বারকানাথ কলেজের Regular student ছিলেন না বলিয়া

কোনও পুরস্কারের অধিকারী হইলেন না। কিন্তু তাঁহাকে একটী Medicine chest আর একটী বৃহৎ ফুলের তোড়া (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ লেখা) তাঁহার হাতে দেওয়া হইল। পরে কলেজের ছেলেরা নিয়ম-মত প্রাইজ ইত্যাদি পাইল। এইরূপে পুরস্কার-বিতরণ-উৎসব শেষ হইল।

নিউ ইয়র্কে আরও কিছুদিন থাকিয়া দ্বারকানাথ হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস্ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরিবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রোগীদের মধ্যে দ্বারকানাথের নাম-ডাক হইতেছিল। যদি কোনও দিন তাঁহার ডিস্পেন্সারীতে আসিতে বিলম্ব হইত, তাহা হইলে রোগীরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত—সেই Spanish ডাক্তার কোথায়? তিনি যে একজন বাঙ্গালী—বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়াছেন, ইহা তাহারা জানিলেও তাঁহার বাড়ী যে পৃথিবীর কোন অংশে তাহা তাহারা জানিত না। সেইজন্য দ্বারকানাথকে তাহারা Spanish ডাক্তার বলিত। এই সময়ে দ্বারকানাথের কলেরার Thesis ছাপাও হইয়া গেল। উহার দাম স্থির হইল—প্রতি খণ্ড আমেরিকাতে ১ ডলার এবং কলিকাতাকে ২॥০ টাকা। দ্বারকানাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন। ফিরিবার পথে লণ্ডন হইয়া তিনি ভারত যাত্রা করেন।

তিনি নিউ ইয়র্ক ছাড়িয়া আসিবার অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রফেসরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার নিকটে এই দূরদেশে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অনেক আশা করেন—এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আর কেহ কেহ লণ্ডনের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার Dr. Hughes Barnett ইত্যাদির নিকট পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলেন। New York ছাড়িবার দিন অনেক বন্ধু তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য জাহাজ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় ২৪শে আগষ্ট

স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের পথে লণ্ডনে অবস্থান

(১৮৮৪) New York ছাড়িয়া দিন দশেকের মধ্যে লণ্ডনে পৌছেন। এখানে আসিয়া তিনি এবার Mornington Terrace-এ একটা ঘর লইয়া রহিলেন। কয়েক মাস এখানে থাকিয়া তিনি দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। লণ্ডনে থাকিবার সময়ে রোজই British Museum Library room-এ যাইতে আরম্ভ করিলেন। অনেক পুরাতন হোমিওপ্যাথিক পুস্তকাদি তিনি পড়িতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের এদিকে ওদিকেও কিছু কিছু বেড়াইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কয়েক মাস চলিয়া গেল। একদিন হঠাৎ একখণ্ড Homeopathic World কাগজে তিনি একটা বিজ্ঞাপন দেখিলেন যে, বোম্বাইতে একজন ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের দরকার। ইহা Mrs. Fleming নাম্নী পক মহিলা তাঁহার ঠিকানা দিয়া লিখিয়াছেন। দ্বারকানাথ ইহা জানিবার জন্য তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলেন। তিনি উত্তরে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি Chester-shire-এ বাস করিতেন। দ্বারকানাথ তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে একদিন উপস্থিত হইলেন। তিনি বোম্বাই-বাসিনী; তাঁহার স্বামী Mr. Fleming বোম্বাইতে ছিলেন; আর তিনি কয়েকটী অল্পবয়স্কা মেয়ে লইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। তিনি দ্বারকানাথকে যথেষ্ট যত্ন-সহকারে বাড়ীতে দুই দিন রাখিয়া সকল সংবাদ দিলেন এবং তাঁহার স্বামীর নিকট একখানা পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলেন। তিনি লণ্ডনের একজন লোকের নাম করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকখানা পত্র বোম্বাইয়ের বিশেষ বিশেষ লোকদের নিকট তাঁহার লইয়া যাওয়া দরকার। দ্বারকানাথ তাঁহার নিকটে সকল বিষয় শুনিয়া স্থির করিলেন যে, বোম্বাইতে Practice করিবেন। লণ্ডনে আসিয়া বোম্বাইয়ের পুরাতন প্রবাসী কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত তিনি আলাপ পরিচয় করিয়া কতকগুলি চিঠি জোগাড় করিলেন।

India Office-এ Sir George Birdwood-এর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন, তিনি অনেকদিন বোম্বাইতে ছিলেন, তিনি একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার। তিনি দ্বারকানাথের মুখে হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিসের সম্বন্ধ শুনিয়া বলিলেন, You are a heretic। ইহা বলিয়াও দ্বারকানাথকে তিনি কয়েকখানা চিঠি তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুদের নিকট লিখিয়া দিলেন। Sir Mangaldas Nathurai, Sir Dinsha Petit, Justice Birdwood (তাঁহার নিজের ভাই), Mr. Telang (Advocate), Mr. Wadali প্রভৃতির নিকট তিনি পত্র দিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া চলিয়া আসিলেন। লণ্ডনে থাকিবার সময়ে দুই একজন পার্শি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইয়াছিল। Mr. Mancharjee Bhavanagari (এক্ষণে Sir Mancharjee Bhavanagari) তাঁহাকে অনেকগুলি বড় বড় লোকের নামে চিঠি দিলেন যথা ;—Mr. Nowrojee (the Grand Old man), Mr. Malabari (Spectator কাগজের Editor), এরূপ আরও কয়েক জন। এরূপ চিঠিপত্র লইয়াও তিনি আরও কতকদিন লণ্ডনেই ছিলেন। ইতিমধ্যে যে সকল পত্রাদি তিনি New York হইতে লণ্ডনের ডাক্তারদের নামে আনিয়াছিলেন সেগুলি তাঁহাদিগের নিকট পাঠাইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। Dr. Hughes Brightonএ থাকিতেন, তিনি দ্বারকানাথকে তাঁহার Club-এ একদিন রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। ডাক্তার ডাড্জিয়ন দ্বারকানাথকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। দুই একদিন তাঁহার বাড়ীতে তিনি খাইয়াছিলেন। ডাক্তার বারনেট লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে বাস করিতেন ; লণ্ডনে তাঁহার আফিস ছিল। রোজ আসিয়া আবার বাড়ী চলিয়া যাইতেন। তিনি প্রথম দিন দ্বারকানাথকে তাঁহার আফিসে সাক্ষাৎ করিতে বলেন।

তিনি তাঁহার আফিসে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। দ্বারকানাথ এক শনিবারে তাঁহার গ্রাম্য বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেদিন দ্বারকানাথকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিলেন। তিনি ডাক্তার স্কিনারের সহিত তাঁহার লণ্ডনের আফিসেই সাক্ষাৎ করিলেন। ইনি দ্বারকানাথকে পাইয়া তাঁহার High potency machine লইয়া কি করিয়া কাজ করা হয় তাহা দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন; দ্বারকানাথ ধৈর্য্য-সহকারে ইহা দেখিলেন। বিদায় লইবার সময়ে তিনি Volume Organon নামক journal তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলেন।

ক্রমে দেশে আসিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইল; দ্বারকানাথ বাড়ীতে Passage-এর টাকার কথা লিখিলেন। ওদিকে যে সকল ঔষধ ২।১ ড্রাম করিয়া লইতে হইবে তিনি সেগুলির একটা তালিকা করিয়া ক্রয় করিতে লাগিলেন। বড় একটা টিনের বাক্স কিনিয়া পুস্তকাদি ভরিয়া প্যাক করিলেন। সস্তা দামে একটা নূতন পোষাক তৈয়ার করিলেন; সস্তা দামে ছয়টা করিয়া কাঁটা, ছোট বড় চামচ ও ছুরি ইত্যাদি যেগুলির নিতান্ত প্রয়োজন সেগুলি কিনিয়া লইলেন। তিনি এক গিনি কি ২৫ শিলিংএর মধ্যেই এইসকল খরিদ করিয়াছিলেন। সব ঠিকঠাক করিয়া পরে কোথায় সস্তা ভাড়ায় জাহাজ পাওয়া যায় তাহা তিনি খবরের কাগজে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদিন কাগজে হঠাৎ দেখিলেন, একটা জাহাজ মালপত্র লইয়া Tilbury Dock হইতে বোম্বাই যাইবে, দুই একজন যাত্রী লইতে পারে, এইরূপ খবর লিখিয়াছে। দ্বারকানাথ তাহাদিগকে লিখিয়া বিশ গিনিতে সেই জাহাজে বোম্বাই যাওয়া স্থির করিলেন। জাহাজের নাম New Camer, ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ছাড়িবে। দ্বারকানাথ টাকা-কড়ি দিয়া সেই জাহাজেরই টিকিট

কিনিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৪শে কি ২৫শে তারিখে দ্বারকানাথ লণ্ডন হইতে বোম্বাই যাত্রা করিলেন।

২৬।২৭ দিন পরেই দ্বারকানাথ বোম্বাই বন্দরে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে বন্দরের ভিতরে জাহাজ প্রবেশ

বোম্বাই বন্দরে উপস্থিতি

করিতে বন্দর-কর্ত্তৃপক্ষ দিলেন না। তিনি জিনিসপত্র জাহাজে রাখিয়া সামান্য একটি ছোট পোর্টম্যাণ্ট লইয়া নৌকা করিয়া তীরে আসিলেন। সেদিন রাত্রিটা তিনি একটা বোর্ডিংয়ে কাটাইলেন। পরদিন সকালে একটি ইউরোপীয়ান বালক মেডিক্যাল কলেজে পড়ে,—তাহার সহিত আলাপ হইল। দ্বারকানাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বোম্বাইতে কোনও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কি কোনও Dispensary আছে কি না। সে বলিল,—একটা হোমিও-প্যাথিক হাসপাতালের মত কালবাদেবী বলিয়া স্থানে আছে। দ্বারকানাথও Mr. Fleming-এর নিকট শুনিয়াছিলেন যে, Melville সাহেব একটা ছোটখাটো হাসপাতালের মত করিয়াছিলেন। তাহা যমুনাদাস বলিয়া একজন ডাক্তারের অধীনে চলিতেছিল। দ্বারকানাথ সেইদিন সকালের আহারের পর সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। পরিচয় দিবামাত্র তিনি তাঁহাকে যত্নসহকারে গ্রহণ করিলেন। দ্বারকানাথ বলিলেন—"আমার ইচ্ছা এখানে আসিয়া Practice করি, তবে এখন একবার কলিকাতায় যাইব ; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া Practice আরম্ভ করিব।" তাঁহার নিকটে দ্বারকানাথ এই বলিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন যে, আমার জিনিসপত্রাদি এক্ষণে জাহাজে আছে। যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে আমি সে সব জিনিস আপনার বাড়ীতে কি অন্য কোন স্থানে রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। তিনি বলিলেন—আপনি অবাধে রাখিয়া যাইতে পারেন।

অবশেষে জিনিসপত্রাদি ডাক্তার যমুনাদাস লালাবটীর বাড়ীতে রাখিয়া

পরদিন দ্বারকানাথ বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে ট্রেণযোগে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের বাড়ীতে উঠলেন। সেখানে ২।১ দিন থাকিয়াই ঢাকা রওনা হন। ঢাকায় পৌঁছিয়া তিনি দেখেন যে, তাঁহার মধ্যম অগ্রজ প্রসন্নকুমারের পত্নী অত্যন্ত পীড়িতা এবং শয্যাগতা। Civil Surgeon Lt. Colonel Cromby তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি রাত্রিতে ও সকাল বেলা এক রকম থাকেন, কিন্তু বিকাল বেলা ৪টার সময় হইতে আরম্ভ হইয়া ৭।৮টা পর্য্যন্ত যন্ত্রণায় চীৎকার করেন। তাঁহাকে পাইয়া দাদা ও বধূঠাকুরাণী খুব সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু বধূঠাকুরাণীর যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল।

কলিকাতা ও ঢাকায় অবস্থান

দুই চারিদিন এইরূপে যাইল। দ্বারকানাথ শুনিলেন, মাস দেড়েক যাবৎ এইরূপ হইয়াছে। একদিন দ্বারকানাথ বধূঠাকুরাণীকে বলিলেন, আপনি এতদিন যাবৎ ঔষধ খাইতেছেন, বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। আপনি এখন ঐ ঔষধ বন্ধ করিয়া আমার ঔষধ খান, আপনি দুই চারি দিনের মধ্যেই ভাল হইয়া যাইবেন।

ঢাকায় বধূঠাকুরাণীর চিকিৎসা ও রোগমুক্তি

দাদার Homœopathyর উপর বিশেষ বিশ্বাস ছিল না। বিশেষতঃ একজন এত বড় ডাক্তার দেখিতেছেন, তাঁহাকে কি করিয়া কি বলিবেন। শেষে দ্বারকানাথ বধূঠাকুরাণীর সহিত যুক্তি করিয়া ঠিক করিলেন, ডাক্তার ও দাদাকে কিছু বলিবার দরকার নাই। ডাক্তার যেরূপ আসিতেছেন আসুন, তবে তাঁহার ঔষধ না খাইয়া রাখিয়া দেওয়া যাউক। দুই এক দিনের মধ্যে যন্ত্রণা দূর হইবে বলিয়া মনে হয়। দ্বারকানাথ প্রথম দিন Lycopodium 30 বলিয়া একটা ঔষধ তিন মাত্রা সকাল হইতে চারি ঘণ্টা অন্তর অন্তর দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, সেদিন ৪টার সময়

কোনও রূপ ব্যথা ধরিল না। দাদা কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রোজ নীচে হইতেই জানিতে পারিতেন, বধূঠাকুরাণী যন্ত্রণায় কান্নাকাটি করিতেছেন। কিন্তু সেদিন কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া সোজা ঘরে আসিয়া বলিলেন,—"আজ ত দেখি তুমি বেশ ভাল আছ, তবে আজকার ঔষধটাতে বেশ উপকার করিয়াছে।" দ্বারকানাথ সেখানে বসিয়া ছিলেন। তিনি কিছু বলিলেন না ; মনে মনে হাসিতে লাগিলেন মাত্র। পরদিন ডাক্তার আসিলে তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল—কাল রোগী ভাল ছিলেন। তিনি সেই ঔষধই খাইতে বলিয়া চলিয়া যাইলেন। বৌদিদি ও দ্বারকানাথ কোন বিষয় ফাঁস করিলেন না ; মনে করিলেন, আরও দুই চারিদিন দেখা যাউক। পূর্ব্বের দিন ভাল ছিলেন বলিয়া দ্বারকানাথ কেবল একবার সেই ঔষধই দিয়াছিলেন, সেই দিনও তিনি বেশ ভাল রহিলেন। পরদিনও যেমন ডাক্তার আসেন আসিয়া দেখিয়া গেলেন। এত ভাল আছেন দেখিয়া দ্বারকানাথ তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে বলিলেন, তিনিও প্রায় দেড়মাস বিছানায় শুইয়া থাকিয়া সেদিন বসিয়া বড় আরাম পাইলেন। দ্বারকানাথ আর ঔষধ দিলেন না। এইরূপে দিন দিনই তিনি সুস্থ হইতে লাগিলেন। যখন তিনি পাঁচ দিনের দিন একটুকু চলিয়াও কষ্টবোধ করিলেন না, তখন বৌদিদি দাদাকে দ্বারকানাথের সাক্ষাতে হাসিতে হাসিতে সব কথা খুলিয়া বলিলেন, আর বলিলেন, দেখ Dr. Cromby্র ঔষধ ওখানে লুকানো আছে। দাদা ইহা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। বধূঠাকুরাণী এইরূপে আরাম হইয়া নীচে টেবিলে খাইতে আসিতে লাগিলেন ও অল্প অল্প চলা-ফিরা করিতে লাগিলেন। ইহাতে দ্বারকানাথের মনে বড়ই আনন্দ বোধ হইল। কারণ তাঁহার প্রথম রোগীই বধূঠাকুরাণী—যিনি এত কষ্ট করিয়া তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা এত শীঘ্র নিবারণ করিতে পারা হইল, ইহা অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে!

ইতিমধ্যে দ্বারকানাথ শুভাঢ্যায় গিয়া মাতৃচরণ দর্শন করিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার জননী যে আনন্দে অভিভূত হইযা কত কথা বলিতে লাগিলেন তাহার আর শেষ ছিল না। দ্বারকানাথ গ্রামের সকলের বাড়ীতে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। ঢাকাতেও বিস্তর আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, তাঁহাদের সকলের সহিত তিনি দেখা করিলেন। তিনি প্রায় একমাস কাল ঢাকায় ছিলেন।

স্বগ্রামে গমন ও মাতৃদর্শন

অতঃপর তিনি কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্থির হইল, বধূঠাকরাণীও তাঁহার সহিত কলিকাতায় যাইবেন ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসিত হইবেন। দ্বারকানাথের পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প ছিল -বোম্বাইয়ে গিয়া তিনি প্রাকটিস্ করিবেন। তবে যাইবার সময় কিছু টাকার দরকার; তাই পাথেয় ব্যতীত তিনি ১২০৲ টাকা সঙ্গে লইলেন। অনেক দিন কলিকাতায় থাকিয়া আগষ্ট মাসে তিনি বোম্বাই যাত্রা করেন।

আবার বোম্বাই যাত্রা

দ্বারকানাথ বোম্বাইতে যাইয়া ডাক্তার যমুনাদাসের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কোথায় বসা দরকার তাহা ঠিক করিয়া Byramjee House-এর Agent-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৯নং Hornby Road দোতলার উপর একটা ঘর মাসিক ৬০৲ টাকা ভাড়ায় ঠিক করিলেন; ঘরটি বেশ বড় ছিল তাহা দুই ভাগ করিয়া একটীতে শুইবার জায়গা, আর সম্মুখেরটিতে বসিয়া খাইবার ও রোগী দেখিবার স্থান করা হইল। একখানা খাট ও বিছানা আর ছয়খানা চেয়ার ও একটী টেবিল তিনি কিনিলেন। একটা Goanese চাকর ১৪৲ টাকা মাহিনাতে রাখিলেন; সেই রান্না করিবে ও টেবিলে খাওয়াইবে। তিনি নিজ বাসাতে আসিয়া সকল জিনিস-পত্রাদি ডাক্তার যমুনাদাসের বাড়ী হইতে লইয়া আসিলেন।

বোম্বাইতে প্রাকটিস আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা

কয়েকদিন চলিয়া গেল। তার পর তিনি সেই হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারীতে একবার করিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহার মধ্যে বৃদ্ধ ব্যবসায়ী মিষ্টার টুকারাম তাতীয়া জানিতে পারিলেন যে, একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার America হইতে পাশ করিয়া বোম্বাইতে প্রাক্‌টিস করিতে আসিয়াছে। তিনি নিজে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা করেন, এক পয়সা কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করেন না, এমন কি ঔষধাদিও বিনামূল্যে দান করেন। তিনি বোম্বাই সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে Batra বলিয়া একটা স্থানে বাস করেন, কিন্তু ফোর্টের ভিতরে একটা ঘর ভাড়া করিয়া রোগী দেখেন। সকালে ৯টার সময়ে বোম্বাইতে তাঁহার ব্যবসায়ের জন্য আসেন। প্রথমে রোগী দেখিয়া পরে নিজের কাজে যান। দ্বারকানাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি সকালে এই দাতব্য চিকিৎসার স্থানে আসিয়া বসিতে পারিলে তোমার প্রাক্‌টিসের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে। দ্বারকানাথও ভাবিয়া দেখিলেন,—ঠিকই কথা ; এখানে বসিলে অনেক রোগীও দেখিতে পারিবেন আর অনেক লোকের সহিত জানাশুনা হইবে। দ্বারকানাথ তাঁহার কথাতে সম্মত হইয়া সকালে সেই Charitable Dispensaryতে বসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, দ্বারকানাথ হোমিওপ্যাথিক পড়াশুনা করিয়া আসিয়াছেন। অল্প দিনের মধ্যেই সেখানে সকাল বেলা ৬০।৭০ জন রোগী আসিতে লাগিল। সেখানে একটা দাতব্য বাক্স ছিল রোগীরা দুই এক আনা করিয়া দিয়া যাইত। প্রথম মাসেই তাঁহার বাক্সে অনেক টাকা হইল, আর দুই একটি লোক দ্বারকানাথকে তাহাদের বাড়ীতে রোগী দেখিবার জন্য ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। দ্বারকানাথকে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাহারা এখানে আসে তাহাদের বাড়ীতে ডাকিলে তিন টাকা ফি লইবে। আর যাহারা অবস্থাপন্ন লোক তাহাদের নিকট হইতে পাঁচ টাকা লইবে।

* * * * এক মাস পরে তিনি বলিলেন—এখানে বাক্সে এত টাকা হয় যে, আমি তোমাকে মাসিক পঁচিশ টাকা করিয়া দিব। ইহাতে দ্বারকানাথের মনে বড় আনন্দ হইল। মাসিক পঁচিশ টাকার জোগাড় হইল ; ইহা ভিন্ন রোগীদের বাড়ীতে গিয়াও কিছু কিছু টাকা তিনি পাইতে লাগিলেন। প্রথম মাসে তিনি ২৮৲ টাকা পাইয়াছিলেন ! দ্বিতীয় মাসে তিনি ১২০৲ টাকা পাইলেন। এই মাস হইতেই তাঁহার খরচ তিনি চালাইতে সমর্থ হইলেন।

এইরূপে ডাক্তার দ্বারকানাথের পশার ক্রমে বাড়িতে লাগিল। তিনি মিষ্টার দাদাভাই নাওরোজী, মিষ্টার মালাবারী প্রভৃতি বড় বড় লোকদের বাড়ী চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। মিষ্টার ফ্রেমজী নামক একজন পার্শী ভদ্রলোক কমিশরিয়েটে মাল সরবরাহ করিতেন। বার্ষিক ৩০০৲ টাকায় তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন। একজন মুমূর্ষু কারবাঙ্কল রোগীকে সারাইয়া দিয়া ১০০০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর বোম্বাই সহরে তাঁহার নাম-ডাক ও প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে তিনি পুরাতন বাসা ছাড়িয়া ৫নং Ravelin Street এ নূতন বাসায় আসেন এবং গাড়ী ঘোড়া ক্রয় করেন। ক্রমে তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। ইহার পর তিনি ১৭ নং টেমারিণ্ড লেনে গির্জ্জার পাশে একটা বাড়ীর দোতলা ভাড়া করিলেন ; বাড়ীটি খুবই খোলা ছিল।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাশের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী শৈলবালা দাশের সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হয়। বিবাহ সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে হইয়াছিল। কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিয়া দ্বারকানাথ সস্ত্রীক

বিবাহ

১৩ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাইতে আসিয়া এই নূতন বাড়ীতে তাঁহারা অবস্থান করেন। বোম্বাইতে দ্বারকানাথের পত্নীর মন বসিল না ; সেইজন্য তিনি স্বামীকে বলিলেন,—কলিকাতায় প্রাকৃটিস

করিবে চল, এখানে মন টিকিতেছে না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর দ্বারকানাথ প্রাকটিসের জন্য সস্ত্রীক কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। বোম্বাইতে তিনি ৩ বৎসর প্রাকটিস করিয়াছিলেন। যখন তিনি বোম্বাই হইতে চলিয়া আসেন, তখন তাঁহার যথেষ্ট উপার্জ্জন হইতেছিল।

কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন ঘুরাঘুরি করিয়া ডাক্তার দ্বারকানাথ মাসিক ৫৫৲ টাকায় ৬৫ নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীর উপর তলাটা ভাড়া লইলেন। এই বাড়ী তাঁহার স্ত্রীরও মনোমত হইল। ৩রা নভেম্বর সেই বাড়ীতে প্রবেশ করা হইল। তার পর ৬৫০৲ টাকা দিয়া একটা ব্রুহাম গাড়ী ও ঘোড়া কিনিয়া দ্বারকানাথ প্রাকটিস আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তিনি চারিটাকা ফি লইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার একটু একটু করিয়া ডাক হইতে থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি কলিকাতার একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি ৩৮ বৎসর কাল একাধিক্রমে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে কলিকাতা সহরে চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি কলিকাতাবাসীর মনে বহুকাল জাগরূক থাকিবে। কলিকাতায়, শুধু কলিকাতায় কেন, বঙ্গদেশে যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন ডাক্তার দ্বারকানাথ রায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ইতিহাসে তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতার একমাত্র হোমিও-প্যাথিক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। এই হাঁসপাতালটী আপার সারকুলার রোডে অবস্থিত।

কলিকাতায় প্রাকটিস ও খ্যাতিলাভ

সহজ, সরল, অমায়িক ও সদানন্দ ভাব দ্বারা তিনি শীঘ্রই সকলকে আপন করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার নিজের উপর ও তাঁহার ঔষধের উপর তাঁহার এমন একটা গভীর বিশ্বাস ছিল যে, সহজেই তাহা

রোগীর মনের মধ্যে সংক্রামিত হইত। তাঁহার চিকিৎসার প্রতিপত্তির ইহা এক প্রধান কারণ। তাঁহার এমন শত শত রোগী কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন যাঁহারা তাঁহার পদশব্দে ও কণ্ঠের আওয়াজ পাইয়া আশ্বস্তি বোধ করিয়াছেন এবং তাঁহার সৌম্য, শান্ত ও সদা হাস্যময় মূর্ত্তি দেখিয়া রোগ-যন্ত্রণার উপশম বোধ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব এমনই মধুর ও চিত্তাকর্ষক ছিল যে, অনেক পরিবারে যেখানে তিনি চিকিৎসা করিয়াছেন, বংশানুক্রমে তিনি সে গৃহের চিকিৎসক ছিলেন। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা তাঁহার ঔষধ ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করিতেন না। আমাদের দেশে অনেকে রোগীর প্রায় শেষ অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। তিনি এইরূপ কত রোগীকে যে আরোগ্য করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহার নিকট আত্মীয় ও পরিজনের মধ্যেই এরূপ কত ঘটনা ঘটিয়াছে। তাঁহার কোন রোগী বলিতেন যে, অনেক সময় ঔষধ খাইয়া উপকার পাই নাই কিন্তু তিনি আসিয়া সেই ঔষধটা নিজ হস্তে দিয়াছেন ও তাহা খাইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে; চিকিৎসা করিতে তিনি যেন একটা বিশেষ আনন্দ, উৎসাহ ও ঔৎসুক্য অনুভব করিতেন, আর রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা ও ঔষধের উপর গভীর বিশ্বাস ছিল বলিয়া ঔষধ দিতেও আনন্দ বোধ করিতেন। নিকট আত্মীয় বা বন্ধু-গৃহে কাহারও অসুখের খবর পাইলে বারে বারে যাইয়া দেখিতেন ও ঔষধ দিতেন।

চিকিৎসা-জীবন

নূতন পাশ করা বা বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তারগণ যখনই কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন তিনি সকলকেই সর্ব্বদা যত্নের সাহত ডাকিয়া আলাপ করিয়াছেন এবং সুপরামর্শ ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

তিনি সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরকাল চিকিৎসা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং নিজের অধ্যবসায় ও চরিত্রগুণে চিকিৎসক-শ্রেণীর মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার চিকিৎসা-জীবনের কথা আর কি বলিব? অনেকেই তাঁহার চিকিৎসা-গুণের ফলভোগী, কিন্তু কলিকাতায়, বঙ্গদেশে ও বঙ্গের বাহিরে তিনি যে শতসহস্র রোগীর রোগ আরোগ্য বা রোগ-যন্ত্রণার উপশম করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে তিনি চির-জাগরূক থাকিবেন ও তাঁহাদের মঙ্গল-ইচ্ছা তাঁহার অনন্ত-যাত্রার পথের সহায় হইবে, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাস

দ্বারকানাথ ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও সাফল্য তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন যে, জীবনে তিনি যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন ও বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহা তাঁহার জীবনারম্ভে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, কিন্তু কেবল মঙ্গলময় জগদীশ্বরের দয়াতেই এরূপ সম্ভব হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও অটল বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় এত উদার ছিল যে, হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের—যাহার মধ্যে তিনি বাল্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন—তাহার প্রতি তাঁহার কোন প্রকার অবজ্ঞার ভাব ছিল না; বরং উহার প্রতি চিরজীবন একটা মমত্ববোধ ছিল। তাঁহার ধর্ম্মজীবনে বাহ্য আচার অনুষ্ঠান—যেমন উপসনাদি বা সমাজে উপাসনায় নিয়মিত যোগদান ইত্যাদি বেশী দেখা যাইত না বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনযাত্রা ও জীবনের সকল কার্য্য ধর্ম্মানুপ্রেরিত ছিল ও তাহাই তাঁহার ধর্ম্মের অভিব্যক্তিরূপে আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনে কোন প্রভেদ ছিল না।

তাঁহার জননী দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত তাঁহার বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে হিন্দু-আচারাদি পালন করিয়া বাস করিতেন ও সেই গৃহেই ৯৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি

খুব মাতৃভক্ত ছিলেন ও জননীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য সর্ব্বদা

মাতৃভক্তি

চেষ্টিত থাকিতেন এবং নিজেই তাঁহার আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রতিদিন ক্রয় করিয়া আনিতেন।

তিনি সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। কোনও প্রকার মলিনতা ও দুর্ব্বলতা তাঁহার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি আজীবন চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরনিন্দা বা কুৎসা সহ্য করিতে পারিতেন না ও কাহারও কোনও দিন

স্বভাব-চরিত্র

নিন্দা করিতেন না। তাঁহার সাক্ষাতে কাহারও নিন্দা করিলে তিনি তাহার ভাল দিকটাই দেখিতে বলিতেন। পাপ ও অন্যায়কে ঘৃণা করিলেও মানুষকে তিনি কখনও ঘৃণা করিতেন না। "বসুধৈব কুটুম্বকম্"—এই বাক্য তাঁহার জীবনে সত্য হইয়াছিল। তিনি অতি শান্তিপ্রিয় ছিলেন ও কলহ-বিবাদ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। জীবনে কাহারও সহিত কোনও দিন কলহ করেন নাই। রূঢ় কথা বলিয়াও কাহাকেও কোনও দিন দুঃখ দেন নাই। তাঁহার জীবন শান্তিময় ও আনন্দপূর্ণ ছিল এবং তাহা তাঁহার সদানন্দ ভাবে প্রকাশ পাইত। তাঁহার মনে কোন দুঃখ ছিল না। তিনি ক্রোধকে একরূপ জয় করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে ক্রোধ করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গৃহের ভৃত্য যাহাদের উপর আমরা সহজেই ও কারণে অকারণে এবং অল্পেতেই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকি, কখনও দোষ করিলেও তিনি তাহাদের উপর ক্রোধ করিতেন না বা তিরস্কার করিতেন না। তাঁহার স্ত্রী কখনও তাহাদিগকে কোনও অন্যায়ের জন্য জরিমানা করিলে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া পূর্ণ বেতন দিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন এবং তাহা না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না।

তিনি যথেষ্ট কর্ম্মকুশল ছিলেন। নিজের জামা শেলাই, মোজা শেলাই,

বোতাম লাগান ইত্যাদি কাজ নিজেই করিতেন ও তাহাতে বেশ আমোদ পাইতেন। শুনিয়াছি, ছেলেদের বাল্য-

কর্ম্মকুশলতা

কালে ছেলেদের জামা ইত্যাদি নিজে অনেক সময় কাটিয়া দিয়াছেন। Upper Circular Roadএ Sir Jagadish Bose মহাশয়ের নিজবাটী ও তৎসংলগ্ন মৃত Dr. M. M. Bose মহাশয়ের বাড়ী শুনিয়াছি তিনিই মিস্ত্রী নিযুক্ত করিয়া ও তত্ত্বাবধান করিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চিকিৎসাকার্য্যে ঘুরিয়া প্রত্যহ একবার এই কাজ দেখিয়া তবে বাড়ী ফিরিতেন। গৃহের দৈনন্দিন আহার্য্য দ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রভৃতি তিনিই সর্ব্বদা ক্রয় করিতেন ও কলিকাতার কোথায় কোন ভাল জিনিস পাওয়া যায় তাহা জানিতেন ও কিনিয়া আনিতেন। বাজার করিতে বা কাহারও কোন জিনিস কিনিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন।

তাঁহার পরিশ্রমশীলতায় সকলে বিস্মিত হইতেন। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যেরূপ পরিশ্রম করিতেন ও করিতে পারিতেন তাহা অনন্যসাধারণ। তিনি আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। আর ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, এই পরিশ্রমশীলতার জন্যই তিনি চিকিৎসাক্ষেত্রে এত প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তিনি অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন ও দুঃখ-কষ্টের কাহিনী বলিয়া যে কেহ সহজেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত। কোনও দিন রিক্তহস্তে ফিরে নাই! কত লোক তাঁহাকে

দয়া ও পরোপকার

প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থ লইয়া গিয়াছে,কিন্তু তাঁহাকে বলিলে বলিতেন যে, অভাবে পড়িয়াই এরূপ করিয়াছে। তাঁহার সুদীর্ঘ চিকিৎসা-কার্য্যে তিনি যে কত দুঃস্থ সহায়হীন রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও আরোগ্য করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই

তিনি অতি স্বজন-বৎসল ছিলেন। অনেক দরিদ্র সহায়হীন আত্মীয়কে নিয়মিতভাবে মাসিক অর্থসাহায্য করিয়া আসিয়াছেন; অনেকের বিদ্যাশিক্ষায় ও সাহায্যকল্পে মুক্ত-হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। দূর বা

স্বজন-বাৎসল্য

নিকট সকল আত্মীয়ের সহিত সর্ব্বদাই অতি হৃদ্যতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার স্বজন বা দূর-আত্মীয় সকলেই একটি বৃহৎ আশ্রয়চ্যুত হইয়াছেন বলিয়া অনুভব করিতেছেন। বস্তুতঃ তিনি যেন একটী বিশাল মহীরুহের মত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ছিলেন ও তাঁহার আশ্রয়ে কত জন শান্তি, বিশ্রাম, সাহায্য ও জীবন লাভ করিয়াছে। আজ তাঁহারা যেন আশ্রয়হীন হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, তাঁহার দাদা ও বধূ-ঠাকুরাণীর জন্যই তিনি এতটা সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন ও এজন্য চিরকাল তাঁহাদের জন্য কিছু করিয়াও যথেষ্ট হইল বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহাদের জন্য তাঁহার হৃদয় গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তিতে পূর্ণ ছিল। তিনি যে কিরূপ সন্তান-বৎসল ছিলেন তাহা তাঁহার সন্তানগণ কখনও ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহাদের যখন যে কোন ইচ্ছা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিয়াছেন তাহাই পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি যখন বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক বোম্বাই যান তখন সেখানে তাঁহার বেশ পসার ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর বোম্বাই একেবারেই ভাল লাগিল না ও সেখানে থাকিতে চাহিলেন না। তাই তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য তিনি তাঁহার সেই বিস্তৃত পসার ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় অনিশ্চয়তার মধ্যে আসিয়া জীবনারম্ভ করিলেন। গ্রাম হইতে তাঁহার কখনও কোন দরিদ্র বাল্যবন্ধু বা তাঁহাদের কোন আত্মীয় তাঁহার নিকট আসিলে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইতেন ও আদর-আপ্যায়নে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতেন। এমন কি, তাঁহার হৃদ্যতায় অনেক সঙ্কোচ বোধ করিত ও বিস্মিত হইত।

তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান অতি প্রখর ছিল। কাহাকেও কাজ করাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পারিশ্রমিক দিয়া দিতেন, একটুও বিলম্ব করিতেন না। কাহারও পাওনা একদিনও হাতে রাখিতে পারিতেন না। তিনি চিঠি-পত্রের তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে বড় তৎপর ছিলেন।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধি

তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই অনেক চিঠিপত্র আসিত এবং অবিলম্বে তিনি সেগুলির উত্তর লিখিতেন। তাঁহার নাতি-নাতনী-সম্পর্কিত ও অন্যান্য আত্মীয় সকলেই তাঁহাকে সর্ব্বদা বহুসংখ্যক পত্রাদি লিখিত ও তিনি নিয়মিত সেগুলির উত্তর দিতেন। তাঁহার স্বভাব এমন নিয়মানুবর্ত্তী ছিল যে, সকল কাজই তিনি শৃঙ্খলার সহিত করিতেন। তাঁহার সুদীর্ঘ চিকিৎসক-জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন তাঁহার Diaryতে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে চিঠি-পত্র লিখিতেন তাহারও একটা record রাখিতেন। এমন কি, মৃত্যুর দিন বৈকাল পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহারও record আছে।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে হইতেই তিনি যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি জীবনে যেমন কাহাকেও দুঃখ দেন নাই, মৃত্যুতে সেইরূপ নিজেও কোন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া, কাহাকেও দুঃখ না দিয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে

স্বর্গারোহণ

৮ই অক্টোবর শুক্রবার রাত্রি ১১॥ ঘটিকার সময় ৭২ বৎসর বয়সে সুস্থ শরীরে নিদ্রা যাইবার মত হৃদ্‌রোগে তিনি অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য স্মরণ করিলে মনে হয় পরলোকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারকানাথ রায় মহাশয়ের দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মিঃ আর রায়, এম-এ, এ সি-এ, এফ-আর-ই এস এবং কনিষ্ঠের নাম মিঃ এ-এন রায়, এ-সি এ;

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ

(উত্তরপাড়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব্ব অনারারি ফেলো)

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত গরলগাছা গ্রামে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৭৬০ শকাব্দে (ইং ৪ঠা জুন ১৮৩৮ সালে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃকুলের বংশাবলী—১। হরিরাম ২। রামকান্ত ৩। সুধারাম (ভঙ্গ) ৪। কেবলরাম ৫। তারাচাঁদ ৬। কালিদাস ৭। শ্যামাচরণ।

পূর্ব্বপুরুষের বাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বেগেতে ছিল। কেবলরাম গরলগাছায় বিবাহ করেন এবং তাঁহার পুত্র তারাচাঁদ গরলগাছায় বাস করেন। গরলগাছা ক্ষুদ্রগ্রাম হইলেও তথায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস বেশী এবং ইংরাজী লেখাপড়ার চর্চ্চা বহুপূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কালিদাস ইংরাজি জানিতেন, মুরশিদাবাদে গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট Col McLeod (কর্ণেল ম্যাকলাউড) এর অফিসে ৪০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন এবং পরে ২৫৲ টাকা বেতনে খিদিরপুর ডকে কর্ম্ম করেন এবং পেনসন ভোগ করিয়া ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

শ্যামাচরণ প্রথম নিজ গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বাঙ্গালা ও সামান্য ইংরাজী শিখেন, পরে অল্পদিনের জন্য কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে এবং ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে পড়েন। ১৮৫১ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে তিনি ভর্ত্তি

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

হন এবং সেই সময় হইতেই রীতিমতরূপে পড়া-শুনা চলিতে থাকে। বাসাতে তিনি, তাঁহার ছোট ভাই বামাচরণ, বিধবা মাসী ও শঙ্করী নামে পুরাণ বাড়ীর ঝী থাকিতেন। জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল, তবু খাই-খরচ ৮৲ টাকার মধ্যে কোনও প্রকারে সারিতে হইত। ঝীকে বেতন দিতে হইত না। তিনি উপায়ক্ষম হইয়া শঙ্করীকে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু মাসী পূর্ব্বেই মারা যাওয়াতে তাঁহার ঋণ আংশিকভাবে শোধ করিতে পারেন নাই বলিয়া আজীবন দুঃখ ছিল। ৮ বৎসর বয়সে শ্যামাচরণের মাতৃবিয়োগ হয়।

উত্তরপাড়া স্কুলে প্রথমে Hand (হ্যাণ্ড) সাহেব ও পরে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় হেডমাষ্টার ছিলেন। শ্যামাচরণ বরাবর বলিতেন, রামতনু বাবুর সংস্রবে থাকিয়া তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

শ্যামাচরণ উত্তরপাড়া স্কুল হইতে মাসিক ৮৲ টাকা জুনিয়ার স্কলাসিপ পাইয়া কলিকাতায় হিন্দু কলেজে ভর্ত্তী হইবার জন্য যান, কলেজের অধ্যক্ষ সাটক্লিফ (Sutcliffe) সাহেব তাঁহার বয়স কম দেখিয়া ও মফঃস্বল স্কুলে পড়াশুনা তেমন ভাল হয় না বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে স্কুল-ডিপার্টমেণ্টে ভর্ত্তি করেন। পর বৎসর (১৮৫৪-৫৫) জুনিয়ার স্কলাসিপ পরীক্ষায় শ্যামাচরণ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ১০৲ বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজের নূতন-নাম-দেওয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের কলেজ-ডিপার্টমেণ্টে ভর্ত্তি হন।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় শ্যামাচরণ প্রথম হন, সিনিয়র দ্বিতীয় বার্ষিক স্কলারসিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন। তৃতীয় বার্ষিক ক্লাসে পড়িবার সময় নূতন-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ইউনিভার্সিটির এনট্র্যান্‌স পরীক্ষা পীড়িত থাকায় দিতে পারেন নাই, ঐ পরীক্ষা না দিলে বি-এ পরীক্ষা দিবার অধিকার জন্মিত না, এই কারণে ১৮৫৯ সালে বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না। চতুর্থ বার্ষিক

শ্রেণী হইতে তিনি, ৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিবর ও হাইকোর্টের বড় উকিল) এবং ৺ নীলমণি কুমার ছাড়িয়া আসিয়া মিলিটারি একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের অফিসে চাকরী লয়েন। কেবল নীলমণি বাবুই ঐ অফিসে রহিয়া যান, অপর দুই জনেই ছাড়িয়া আসেন। ১৮৬০ সালে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে শ্যামাচরণ পাশ করেন ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকদিগের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় ছিলেন কাউয়েল (Cowell) সাহেব এবং শ্যামাচরণ তাঁহার একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৬ সালে ১৪ই অক্টোবর কাউয়েল সাহেব তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :—"Your letter, telling me of your retirement, called up many thoughts and memories. I remember none of my old friends at the Presidency College more vividly than I do you. * * * I have often quoted here a remark of yours that the gentle poet Cowper strongly felt the democratic influence of the French Revolution, as was shown by his lines—

'War is a game which, were their subjects wise kings would not play at'.

It was a very original thought."

বালক-কাল হইতেই শ্যামাচরণ লাজুক ও মুখ-চোরা ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতি হইতেই তাঁহার পরম বন্ধু কবি হেমচন্দ্র "লজ্জাবতী লতা"র idea পান। তখনকার দিনে গভর্ণমেণ্টের যে সব কর্ম্ম লইলে ভবিষ্যতে বেশী বেতন হইবার কথা সে সব কর্ম্মে তিনি আকৃষ্ট না হইয়া অল্পবেতনে শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করেন। ক্রমান্বয়ে মালদহ জিলা স্কুলের, আরা জিলা স্কুলের ও ছাপরা জিলা স্কুলের হেডমাষ্টারের কর্ম্ম তিনি

করেন। বিহারে কর্ম্ম করিবার সময় তিনি হিন্দী এবং উর্দ্দু উত্তমরূপে শিখিয়া ফেলেন। বি-এ পরীক্ষায় তখন সংস্কৃতের স্থান ছিল না বলিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিবার চেষ্টা করেন; একদিকে সংস্কৃত ভাষা শক্ত বলিয়া মনে করেন, অপরদিকে প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) মত জানিয়া সে চেষ্টা ত্যাগ করেন।

তিনি শিক্ষাবিভাগে প্রথম হইতেই সুখ্যাতি লাভ করেন। ১৮৬৩-৬৪ সনের Bengal Education Reportএর ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠায় N. W. Divisionএর Inspector of Schools, Dr. S. W. Fallon, M. A, Ph. D. তাঁহার কর্ম্ম-সম্বন্ধে লিখেন :—"Among the headmasters, Babu Shyama Charan Gangooly, B. A., lately promoted to Chapra is as able a man as it might be possible to find for the place. His mind, capacities, tastes, habits, enthusiasm and an excellent disposition combine to fit him for the difficult and important office of teacher and headmaster."

অধিকতর উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে পড়াইবার আনন্দ উপভোগ করিবার ইচ্ছায় ৫০৲ টাকা কম বেতনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের Philosophy, Logic ও Englishএর অধ্যাপকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ঐখানে ৯ বৎসরের অধিক কর্ম্ম করেন। সংস্কৃত কলেজে বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায় অধিক বেতনের উত্তরপাড়া গভর্মেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টারের পদ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। প্রায় ৬ বৎসর পরে উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার ৺ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ঐ স্কুল দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইলে তিনি অধ্যক্ষ হন এবং ৯ বৎসর অধ্যক্ষতা করিয়া ১৮৯৬ সালে জুলাই মাসে পেনসন গ্রহণ করেন।

তিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে মোট ৩৪½ বৎসর কর্ম্ম করেন। ভূতপূর্ব্ব Director of Public Instruction, Sir Alfred Croftএর ভাষায় তিনি "rendered long and valuable services to the State" এবং তাঁ[illegible] [illegible]od services coupled with ability of a high or[illegible]"এর জন্য রায় বাহাদুর খেতাবের জন্য সরকারকে লেখেন। খেতাব না পাওয়াতে শ্যামাচরণ কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই।

বাল্যকালের লাজুক মুখ-চোরা স্বভাব তাঁহার বরাবর ছিল। কর্ম্মের প্রারম্ভে সাহেবদের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাহা একান্ত দরকার—নামের কার্ড ১০০ খানি ছাপান, পেনসন লইবার সময়ও তাহা শেষ হয় নাই। সাহেবদের সঙ্গে বড় দেখা-শুনা করিতেন না, তবে তাঁহার নানা বিষয়ে ইংরাজী মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে ও তাহার বাহিরে অনেক সাহেবদের সঙ্গে চিঠি-পত্র লেখা-লেখি হইত।

১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের National Magazine-এ Police Commission বিষয়ে এক প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে স্বনামখ্যাত ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কি উচ্চমত ছিল জানা যায়। প্রবন্ধে আছে—"The late Bhoodeb Mukerjee used often to say, when expressing surprise that he himself got on so very well with the Goverment, while Babu Shama Charan Ganguli of the Uttarpara College, his superior intellect and culture, scarcely thrived, that his chief merit lay in his tall figure and fair complexion". প্রথম অংশটা যাহাই হউক, ভূদেববাবুর নিজের merit সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা নিশ্চয়ই ঠিক নহে। আর প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, শ্যামাচরণেরও গৌর বর্ণ ছিল।

শ্যামাচরণের শিখাইবার পদ্ধতি সাধারণ হইতে বিভিন্ন ছিল। কি ইংরাজী সাহিত্য, কি দর্শন (Philosophy), কি ন্যায়শাস্ত্র (Logic)

পড়াইবার সময় কেবল পাঠ্যপুস্তকের লিখিত বিষয় বুঝাইয়া দিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, পাঠ্যপুস্তকে যে সব উক্তি (statements) বা মতবাদ (ideas, views and theories) থাকিত তাহা ছাত্রদের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া, যাচাই করিয়া, গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিবার অভ্যাস যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা সর্ব্বদাই করিতেন।

তাঁহার স্বাস্থ্য যৌবন হইতেই ভাল ছিল না ; আজীবন সব বিষয়ে খুব মিতাচারী ছিলেন, সেই জন্য তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি বালকবালিকাদিগের ইংরাজী শিখিবার জন্য নূতন পদ্ধতিতে বাঙ্গালা-ইংরাজী Wordbook, হিন্দী-উর্দ্দু-ইংরাজী Wordbook, English Primer ও ইংরাজী-প্রবেশ-পুস্তক রচনা করেন।

১৮৭৭ হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি নানা বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ ইংরাজী ত্রৈমাসিক বা মাসিক পত্রিকায় লিখেন। তাঁহার প্রবন্ধ কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইউরোপ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও সমাদৃত হয়। ১৯২৭ সালে কয়েকটী নির্ব্বাচিত প্রবন্ধ Essays and Criticisms নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাহা পাঠ করিয়া জগদ্বিখ্যাত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :—"আপনার রচনাগুলিতে সংস্কারযুক্ত বিচারবুদ্ধি ও ভাবপ্রকাশের প্রাঞ্জলতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বহুকাল পূর্ব্বে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সে সময়কার পাঠকেরা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু এখন তাহা স্বীকার করিবার বাধা ক্রমশই দূর হইতেছে। সে সময়ে এমন লোকবিরুদ্ধ মত যে আপনি এমন সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছিলেন ও নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছিলেন, ইহাও আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয়। শব্দের ধ্বনি অনুসরণ করিয়া নূতন অক্ষর প্রচারের জন্য আপনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তখনকার কালে ইহাও নূতন ; এখনকার কালেও ইহার অভাব দূর হয় নাই।"

উত্তরপাড়া স্কুলে পড়িবার সময়ই শ্যামাচরণের মূর্ত্তি-উপাসনায় বিশ্বাস যায়। পরজীবনে ফরাসী দার্শনিক কোম্‌ত (Comte) ও ইংরাজ দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) এই দুইজনের লেখার প্রভাব অনুভব করেন, তবে তিনি তাঁহাদের সকল মত গ্রহণ করেন নাই; তিনি কোম্‌তের "নরপূজা" (Religion of Humanity) বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়াছিলেন।

১৯২৪ সালে তিনি Phases of religious faith of a Bengali of Brahman birth নামক প্রবন্ধে নিজের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"I have no objection to call myself a pantheist * * In Sanskrit, I would call myself a 'Visvavadi' and my religion 'Visvavad'."

আরও লিখেন—"Hindu birth and conformity to certain Hindu usages constitute the essence of Hinduism at present. To its credit, it leaves the individual free to believe according to his lights, so that a man of Hindu birth, whether he is a monotheist believing in a personal God, or an Agnostic or a Pantheist, is recognised to be a Hindu, if he conforms to certain Hindu usages."

নৈতিক অবনতি ও ভদ্র আচরণের হ্রাস প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের হ্রাসের জন্য ঘটিতেছে বলিয়া সাধারণে মনে করেন কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে কি না, বিশেষ সন্দেহের কথা। অন্ততঃ বহু সহস্র ছাত্রের উপর, এমন কি, যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের উপরও শ্যামাচরণ অসাধারণ নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি কি ছোট, কি বড় সব কার্য্যেই কঠোর নীতিবান্ ছিলেন—ইংরাজীতে যাহাকে বলে a man of very strict moral principles.

সারাজীবন প্রাচীন হিন্দু আদর্শ--সাধাসিধা ভাবে থাকা এবং উচ্চ চিন্তায় মনোনিবেশ—plain living and high thinkingএর মতে চলিয়াছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সাময়িক সাহায্য করা ছাড়া প্রতি মাসে কয়েক জনকে নির্দ্দিষ্ট সাহায্য করিতেন। ৩৪ বৎসরের অধিক কর্ম্ম করিয়া সবেমাত্র মাসিক ১৮৪৲ পেনসন পাইতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পারিতোষিক দিবার জন্য ৩০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন ও নিজ গ্রামের লোকেদের সাহায্যের জন্য ২০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের একটী ক্ষুদ্র ট্রাষ্ট ফণ্ড করিয়া যান।

তাঁহার উপনয়নের পরই ১১ বৎসর বয়সে নিজগ্রামের একটী ৯ বৎসরের বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শ্বশুরমহাশয় ৺কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরমহাশয়ের বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিতের কর্ম্ম করিতেন। শ্যামাচরণের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীর ১৮৯৯ সালে ২৬শে মে তারিখে মৃত্যু হয়।

১৯২৮ সালে ২৩শে জুন তারিখে ৯০ বৎসর ২০ দিন বয়সে শ্যামাচরণের মৃত্যু হয়।

তিনি দুইটী পুত্র, চারিটী পৌত্র, তিনটী পৌত্রী, চৌদ্দটী প্রপৌত্র-প্র-পৌত্রী এবং একটী বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রাখিয়া যান।

৺শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই পুত্র; শ্রীঅজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীবিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

অজয়কুমারের জন্ম ১২৭৬ সালে ১২ই কার্ত্তিক ইং ১৮৬৯ সালে ২৮শে অক্টোবর তারিখে হয়। প্রথমে কলিকাতায়, তার পর উত্তরপাড়া স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়া রেভেনিউ বোর্ডে (Revenue Board) কর্ম্ম করেন। সেখান হইতে ছাড়িয়া Gillanders Arbuthnot & Co.র সওদাগর অফিসে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৯২০ সালে

পেনসন গ্রহণ করেন। অবসর লইয়া তিনি Homeopathy ও Biochemy মতে দাতব্য চিকিৎসা করিয়া সাধারণের, বিশেষ গরীব-দুঃখী লোকের পরম উপকার করিতেছেন।

বিজয়কুমারের জন্ম ১২৭৯ সনে ১৩ই বৈশাখ ইং ১৮৭২ সালে ২৬শে এপ্রিল তারিখে হয়। উত্তরপাড়া স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে B. A. পাশ করেন। ১৮৯৪ সালে পরীক্ষা দিয়া সব ডেপুটী কলেক্টরের কর্ম্ম পান। ১৯০৪ সালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টরের পদে উন্নীত হন।

১৯২৩ সালে কলিকাতার রেণ্ট-কনট্রোলার (Rent-Controller) নিযুক্ত হন। তখনকার মন্ত্রী স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে মনোনীত করেন। তিনি ৪ বৎসর এই কর্ম্ম করিয়া পেনসন গ্রহণ করেন। তার পর রেণ্ট অ্যাক্টের (Rent Act) মেয়াদ ফুরাইয়া যায় এবং রেণ্ট-কনট্রোলারের (Rent Controller) পদও উঠিয়া যায়।

তাঁহার সমদর্শিতায় ও ন্যায় বিচারে সাধারণ লোকে খুবই সন্তুষ্ট হয়। যদিও কর্ম্মজীবনে বরাবর ফৌজদারি ও রাজস্ববিষয়ক আইন (Criminal and Revenue law) পরিচালনা করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ কর্ম্মে দেওয়ানি আইন (Civil law) পরিচালনা করিতে হয়। তাঁহার শ্লাঘার বিষয় এই যে, তাঁহার রায় বেশীর ভাগই মহামান্য হাইকোর্ট বাহাল রাখেন এবং বিলাত-আপীলেও তাঁহার রায় বাহাল থাকে।

শ্রীঅজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের তিনটী পুত্র। মধ্যম পুত্র শ্রীঅমল গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করিয়া ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে প্রবেশ করেন। এখন তিনি ব্যাঙ্কার্স ইনষ্টিটিউটের সব পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বেই ষ্টাফ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহার জন্ম ১৯০০ সাল ১লা জানুয়ারি।

বংশ-লতা
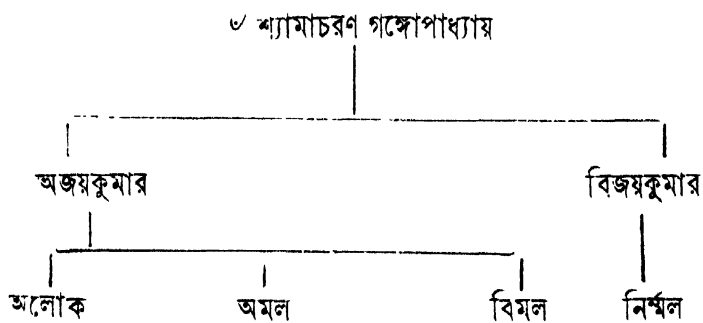
স্বর্গীয় সারদাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সারদাচরণ চট্টোপাধ্যায় "কৃষ্ণের সন্তান", দেবগুরু "পার্টুলির চাটুয্যে"দের বংশধর। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ নদীয়া জিলার বিল্বগ্রামে বাস করিতেন। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সারদাচরণের অতিবৃদ্ধ পিতামহ রামদুলাল চট্টোপাধ্যায় হাওড়া জিলার গজাগ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত গাঙ্গুলী বংশে বিবাহসূত্রে উদয়নারায়ণপুর-গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। সন ১২৫৮ সালে ২৯শে আষাঢ় শনিবার উদয়নারায়ণপুর-গ্রামে সারদাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঈশানবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কারবারী লোক ছিলেন। ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্ নামে লোহা ও চূণের যে দুইটি ফারম্ অদ্যাবধি কলিকাতায় সকলের কাছে সুপরিচিত, ঈশানচন্দ্র উহাদের প্রতিষ্ঠাতা। সারদাচরণ ঈশানবাবুর একমাত্র পুত্র। তাঁহার যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যানুরাগ সত্ত্বেও তিনি বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিবার তাদৃশ সুযোগ পান নাই। পিতাকে সাহায্য করিবার জন্য অল্প বয়স হইতেই তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া কারবারের কার্য্যে মনোনিয়োগ করিতে হইয়াছিল। তরুণ বালক সারদাচরণ অসাধারণ শ্রমশীলতা ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দিয়া অচিরে তাৎকালিক প্রবীণ ব্যবসাদারগণের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন।

সন ১২৭৫ সালে সারদাচরণ উদয়নারায়ণপুরের সন্নিকট শিবপুর-নিবাসী মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক পুত্র ও

স্বর্গীয় সারদাচরণ চট্টোপাধ্যায়

এক কন্যা ব্যতীত কেহই দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে নাই। ১৮৯৫ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে সারদাচরণের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তখন তাঁহার একটিমাত্র পুত্র বর্ত্তমান। সেও তাঁহার অগ্রজদিগের ন্যায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে পারে—এই আশঙ্কায় সারদাচরণের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহাকে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। সারদাচরণ প্রথমে সে অনুরোধে সম্মত হন নাই। তাঁহার আত্মীয়গণ জানিতেন, তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত। তাঁহার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তখন তাঁহারা তাঁহার মাতৃদেবীর নিকট অনুযোগ করিলেন। অবশেষে মাতৃদেবীর আদেশে সারদাচরণ পুনরায় ১৮৯৫ সালে অগ্রহায়ণ মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর-নিবাসী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

সন ১৩০২ সালে কার্ত্তিক মাসে সারদাচরণের পিতা ৺কাশীলাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজে স্বাধীনভাবে কলিকাতার কারবারের কার্য্যগুলি চালাইতে আরম্ভ করেন এবং দুই চারি বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি কারবারগুলির প্রভূত উন্নতিসাধনপূর্ব্বক প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন।

কেবল যে ব্যবসায়-কার্য্যে সারদাচরণের অদ্ভুত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ছিল তাহা নহে, তিনি সকল গুণেই গুণবান্ ছিলেন বস্তুতঃ তাঁহার সদ্‌গুণগ্রাম আলোচনা করিলে তাঁহাকে একজন আদর্শ পুরুষ না বলিয়া থাকা যায় না। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সংসারে এবং সমাজে, ছোট বড় সকল ব্যাপারে তাঁহার আচার-ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ দৃষ্টান্তস্থানীয়।

সারদাচরণের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এখন আর বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও কারবার উপলক্ষ্যে নানা স্থানে নানা কার্য্যে তাঁহাকে

নানা জাতীয় লোকের সংসর্গে থাকিতে হইত, তথাপি কোনও দিন কোনও কারণে তিনি তাঁহার হিঁদুয়ানির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। তিনি কখনও ব্রাহ্মণোচিত নিত্যক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠানে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করেন নাই। সর্ব্বদাই দেবদ্বিজে তিনি সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিলে তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। ভট্টপল্লীর পণ্ডিতগণ কার্য্য-উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আগমন করিলে ফিরিবার পথে প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে কিছুকাল বিশ্রাম করিতেন। তৎকালে তিনি তাঁহাদিগের জলযোগাদির ব্যবস্থা করিয়া, যথারীতি সংবর্দ্ধনা না করিয়া তাঁহদিগকে ছাড়িয়া দিতেন না। বাড়ীতে ক্রিয়া উপলক্ষ্য করিয়া প্রায়ই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে ভূরিভোজন করাইয়া যথাযোগ্য দক্ষিণা দিয়া পরিতৃপ্ত করিতেন।

সারদাচরণ একজন "ক্রিয়াবান্" পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই থাকিত। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা ও রথযাত্রা প্রভৃতি সকল মহাপূজাই তিনি যথেষ্ট ধূমধামের সহিত অনুষ্ঠান করিতেন। কালীপূজা নিজে করিতেন না বটে, কিন্তু তিন চারি স্থানে আত্মীয়-গৃহে অর্থসাহায্য করিয়া উহা করাইতেন। প্রকৃত তন্ত্রবিহিত দেবদেবী-সেবোদ্দিষ্ট ক্রিয়াবলীর প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ছিল এবং যে নিষ্ঠার সহিত তিনি তাহা সম্পন্ন করিতেন তাহা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই শ্লাঘার বিষয়।

সারদাচরণ ধন-সম্পত্তি অনেক করিয়াছিলেন কিন্তু ধনাভিমান তাঁহার আদৌ ছিল না। তাঁহার বেশভূষায় বিলাসের লেশমাত্র ছিল না। কথায় বার্ত্তায় তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন। ছোট বড় সকলেই তাঁহার নিকট অবাধে উপস্থিত হইতে পারিত এবং সকলের সহিতই তিনি সুবিনীত ও সরলভাবে আলাপ-পরিচয় করিতেন।

ঈশানচন্দ্র ত্রৈলক্যতারিণী দাতব্যচিকিৎসালয়

একদিকে তিনি যেমন বিনয়ী ছিলেন, অন্য দিকে আবার সেইরূপ শান্ত, ধীর এবং সহিষ্ণু ছিলেন। সংসারে তিনি বিশেষ কোনও সুখ লাভ করেন নাই। আত্মীয়-বিরোধ, পুত্র-কন্যা-কলত্র-বিয়োগ প্রভৃতি দুর্ব্বিসহ শোকতাপে প্রায় সারাজীবনই তাঁহাকে জর্জ্জরিত থাকিতে হইয়াছে; কর্ম্মক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা-সঙ্কুল উদ্বেগ-আশঙ্কায় তাঁহাকে নিয়তই নিপীড়িত হইতে হইয়াছে। তিনি স্থিরভাবে সব সহ্য করিয়াছেন, এত জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যেও এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হন নাই।

সারদাচরণ দানে একেবারে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার প্রায় সমস্তই দানে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল যেমন কোমল, তেমনই উদার। পরিচিত হউক বা অপরিচিতই হউক, যে কেহ তাঁহার কাছে অভাব জানাইত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার দুঃখ-মোচনের জন্য যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার দ্বার হইতে যাচক কোনও দিন হতাশ হইয়া ফিরে নাই। ভদ্রেতর-নির্ব্বিশেষে অনেকগুলি গৃহস্থ-পরিবারের ভরণ-পোষণের সমস্ত ব্যয় তিনি নিজে নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে ও জননীর "তুলা"য় যেরূপ প্রচুরভাবে তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং দরিদ্র ও ভিক্ষুক-দিগকে অর্থদান করিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন তাহা আজিও তাঁহার স্বগ্রামে "গল্প কথা" হইয়া আছে। সন ১৩২০ সালে দামোদরের প্রবল বন্যায় যখন হাওড়া জেলার অধিকাংশ স্থান জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল তখন বন্যাপীড়িতের সাহায্যার্থ তিনি তাঁহার অর্থকোষ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বন্যাগ্রস্ত গ্রামগুলির মধ্যে ন্যূনাধিক পাঁচহাজার মণ চাউল বিতরণ করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত সাধারণ দান ব্যতীত সারদাচরণ দেশহিতর কতকগুলি স্থায়ী অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। স্বগ্রামে তথা দেশের মঙ্গলের জন্য পথ ও ঘাট প্রভৃতির উন্নতিকল্পে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

তিনি জানিতেন, সহর হইতে বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে গ্রামে যাতায়াত না করিলে গ্রামের দুর্দ্দশা ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। সেই জন্য সম্ভ্রান্ত লোকের সংস্পর্শে আনিয়া গ্রামগুলিকে ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্ন করিবার মানসে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। অতিথিদিগের বসবাস ও আহারাদির কোনও কষ্ট না হয়—এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বগ্রামে সুশোভন একখানি "বাংলা বাটী" নির্ম্মাণ করাইয়া অতিথি-পরিচর্য্যার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। গভর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ কিম্বা অন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরিদর্শন-কার্য্যে উক্ত অঞ্চলে গমন করিলে উক্ত "বাংলা"য় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন। দেশপ্রাণ সারদাচরণের সুব্যবস্থায় তাঁহাদের কোন কষ্টই হইবে না।

তখন দেশে ডাক্তারি চিকিৎসার কোনও উপায় ছিল না। ডাক্তার ও চিকিৎসা-অভাবে পল্লীবাসী লোকের কষ্টের সীমা ছিল না। যাহাতে জনসাধারণ অনায়াসে বিনাব্যয়ে সুচিকিৎসা ও সুযোগ্য ডাক্তারের সাহায্য লাভ করিয়া ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য সারদাচরণ প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এল্-এম্-এস্-পরীক্ষোত্তীর্ণ উপযুক্ত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আধুনিক সকল সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করিয়া ১৯১১ সালে উদয়নারায়ণপুরে "ঈশানচন্দ্র ত্রৈলোক্যতারিণী" নামে এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়া অবধি দরিদ্র আর্ত্ত পীড়িতের অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

সারদাচরণের প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ ছিল। তিনি নিজে অবস্থাচক্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা অর্জ্জন করিবার সুবিধা পান নাই; কিন্তু দেশের লোক সুশিক্ষিত হইতে না পারিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। বিদ্যার্থীমাত্রই তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলেই তিনি সানন্দে তাহার

সারদাচরণ ইন্‌ষ্টিটিউসন্

ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেন। পল্লীবাসীদিগের শিক্ষার সুযোগের তখন যে অভাব ছিল তাহা দূরীকরণ-কল্পে ১৯১১ সালে বহু অর্থব্যয়ে সুবৃহৎ এক সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি উদয়নারায়ণপুরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত স্কুল এস. সি. ইনষ্টিটিউসন নামে খ্যাত। বিদ্যালয়টি সুশিক্ষিত শিক্ষক-মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অদ্যাবধি দুঃস্থ গ্রাম্য ছাত্রদিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করিতেছে এবং পরহিতৈকব্রতী মহাত্মা সারদাচরণের অক্ষয়কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছে।

তিনি মুগকল্যাণ বিদ্যালয়ে ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

তিনি বহু অর্থব্যয়ে স্বগ্রামে বাজার স্থাপিত করিয়া স্থানীয় লোকের অভাব মোচন করিয়াছেন।

তিনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

সারদাচরণের অনেকগুলি সুন্দর সংস্কার ছিল। তিনি বাল্য-বিবাহ পছন্দ করিতেন। তিনি তাঁহার নিজ কন্যা ও দৌহিত্রীগণের নয় হইতে একাদশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং যৌবন-আরম্ভেই পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি অবরোধ-প্রথাকে হিন্দু সমাজের গৌরব বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজের ঘরের ঝি-বৌকে দেবদেবী দর্শন ছাড়া অন্য কারণে ঘরের বাহিরে যাইতে দিতেন না। লোকে কথায় বলে জ্ঞাতি-শত্রু। সারদাচরণ কিন্তু জ্ঞাতিকেই পরম মিত্র মনে করিতেন। জ্ঞাতি-প্রতিপালন করাই প্রথম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া জ্ঞাতিবৃন্দকেই আপনার এষ্টেটের কর্ম্মচারি-পদে প্রথম নিযুক্ত করিতেন। তিনি তাঁহার স্বগ্রামস্থ সমাজের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সময়ে সমাজে "ঠেকো" করার খুব ধুম ছিল। তিনি সমাজের এ শাসন, অত্যাচার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, মানুষকে সমাজে রাখিয়া সংশোধন করাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর; তাহাকে বর্জ্জন করিলে সমাজ

ক্ষতিগ্রস্ত হয়—তিনি এই ধারণার বশে সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে সমাজে তুলিয়া লইতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন।

সারদাচরণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে সারাজীবন তাঁহার পরিশ্রমেই কাটিয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া কনট্রাকটরির কার্য্য-পরিদর্শনে বাহির হইতেন। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর লোহার দোকানের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। বৈকালে চূণের কারবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সন্ধ্যার পর বাড়ীতে প্রত্যাগত হইয়া আহ্নিককৃত্যাদি সমাধাপূর্ব্বক জমিদারি প্রভৃতি কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। কার্য্যের চাপে রাত্রি একটার পূর্ব্বে কোনও দিন শয়ন করিতে পাইতেন না।

আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের হাতে অনেক কাজ তাঁহারা মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিয়া গিয়া কিছুকাল অবসর গ্রহণ করেন। সারদাচরণও মধ্যে মধ্যে তাঁহার কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেন; তবে কর্ম্ম ফেলিয়া নহে, আরও অধিক কর্ম্মের আহ্বানে—জমিদারি-পর্য্যবেক্ষণে—স্বাস্থ্যকর স্থানে নহে, জঙ্গলাকীর্ণ ম্যালেরিয়া-পীড়িত মফঃস্বলের পল্লীগ্রামে। সে স্থানে তাঁহার পরিশ্রমের অন্ত থাকিত না। যে কয়দিন থাকিতেন সে কয়দিন তিনি আহার-নিদ্রার সময় পাইতেন না। দেহের কষ্টকে তিনি কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। ভোগের প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। আমোদ-আহ্লাদে বা অলস বিশ্রামে তিনি বৃথা কালাতিপাত পছন্দ করিতেন না। আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিগণ রংতামাসায়, ক্রীড়াকৌতুকে সমধিক অনুরক্ত। কিন্তু সারদাচরণ ধনী হইয়াও কোনও দিন তাহাতে আকৃষ্ট হন নাই। তাঁহার সাত্ত্বিক জীবন সৎকর্ম্মেই অতিবাহিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে বাড়ীতে পূজাদি উৎসব উপলক্ষ্যে পৌরাণিক
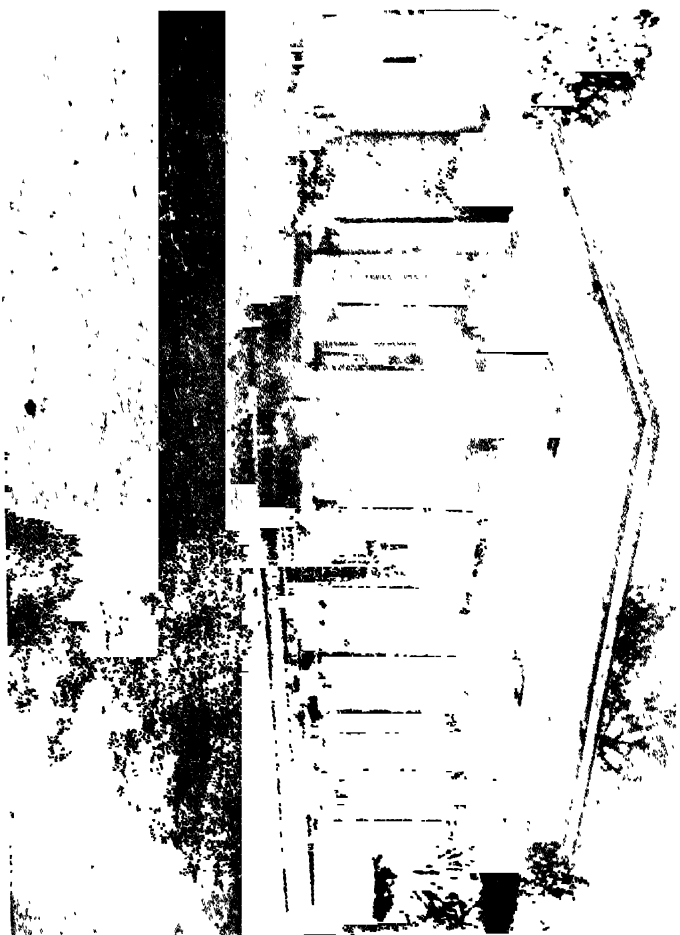
অতিথি শালা

স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নাটকের যাত্রাভিনয় দিতেন এবং তাহাই অবসরমত অল্পবিস্তর উপভোগ করিতেন। তাঁহার শরীর সবল ও সুগঠিত ছিল কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং আহারাদির অনিয়মের দরুণ তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তিনি অজীর্ণরোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। তখনও কর্ম্মোৎসাহে তাঁহার চিত্ত পূর্ণ। শরীরের অসুস্থতার প্রতি তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলেন না—পূর্ব্বে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন সেইরূপই করিয়া চলিলেন। কিন্তু নশ্বর দেহ কতদিন অনিয়ম সহ্য করিবে?—ক্রমশঃ আরও অক্ষম হইয়া পড়িল। অবশেষে ১৩২০ সালে ২০শে আশ্বিন ৺ শরদীয়া সপ্তমী তিথিতে সারদাচরণ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

সারদাবাবুর দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ নিবারণ ও কনিষ্ঠ বীরেশ্বর।

নিবারণবাবু লোক্যাল বোর্ডের সদস্য ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। নিবারণ-বাবু মিষ্টভাষী, দয়ালু ও বিনয়ী ছিলেন। নিবারণবাবুর দুই বিবাহ; প্রথম পক্ষে বিবাহ করেন বাজেশিবপুর-নিবাসী মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে ও দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন গৌদলপাড়া-নিবাস শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে।

সারদ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করেন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (এস. এন ব্যাণ্ডো) কন্যাকে। বীরেশ্বর এক্ষণে আই এ পড়িতেছেন। তিনি পিতার ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক পৈতৃক কীর্ত্তিকলাপের রক্ষা ও প্রস র সাধন করিতেছেন।

সারদাবাবুর ছয় কন্যা; প্রথমা কন্যার বিবাহ কে নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এর সহিত, দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ কলিকাতা-নবাসী মুনসেফ বাবু অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, তৃতীয়া কন্যার বিবাহ

বীরভূম জিলার গঙ্গাপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নবগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত, চতুর্থা কন্যার বিবাহ কলিকাতা জোড়াসাঁকো-নিবাসী শ্রীযুক্ত অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের সহিত, পঞ্চম কন্যার বিবাহ উত্তরপাড়া-নিবাসী সি.এম.এস. কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এর সহিত এবং ষষ্ঠ কন্যার বিবাহ বহরমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-কিশোর মুখোপাধ্যায়, এম. এর সহিত হইয়াছে।

সারদাবাবুর পঞ্চম জামাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং একজন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগী। তিনিই উদ্যোগী হইয়া সারদাচরণের জীবনচরিতের উপকরণ আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বংশ-লতা
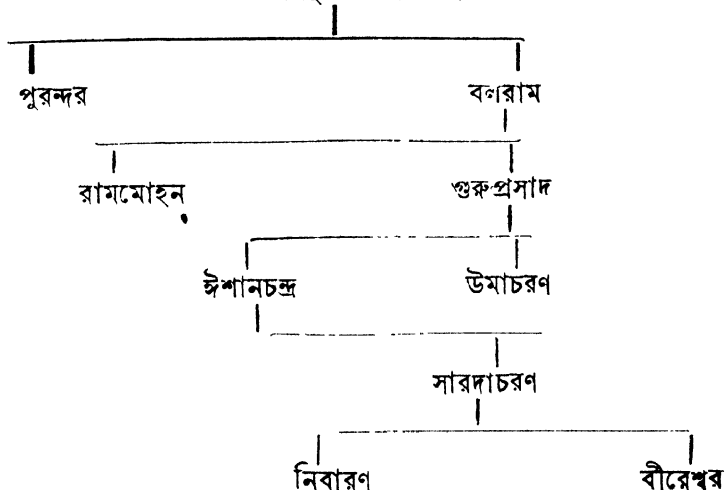
শ্রীমান বিরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

হিলি জমিদার-বংশ

বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার অধীন কলশা গ্রাম। ই-বি রেলওয়ের সান্তাহার জংশনের পূর্ব্বদিকে সংলগ্ন যে বাজার তাহা সান্তাহার বাজার বলিয়া অভিহিত হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে উহা এই কলশা মৌজার অন্তর্গত। মৌজার পূর্ব্ব প্রান্তে ইঁহাদের আদি বাসভবন। ইহার উত্তরে প্রকাণ্ড দীঘি, পূর্ব্বদিকে একটী পুষ্করিণী এবং দক্ষিণ দিকে যে বৃহৎ পুষ্করিণীটী আছে, সেগুলি এই বংশের আদিপুরুষের কীর্ত্তি। এই বংশের স্বনামধন্য পুরুষ রমানাথবাবুই বাটীর দক্ষিণদিকস্থিত বৃহৎ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়াছিলেন

এই বংশের রাজবল্লভবাবুর এক পুত্রের নাম জয়নারায়ণ। জয়নারায়ণের চারি পুত্র ও এক কন্যা। চারি পুত্রের নাম—প্রথম রামমোহন; দ্বিতীয় সূর্য্যনারায়ণ; তৃতীয় শিবরাম এবং চতুর্থ দধিরাম।

রামমোহন

রামমোহনবাবুর পিতা ৺ জয়নারায়ণ মজুমদার মহাশয় বিষয়-সম্পত্তি-হীন হইয়া পরলোক গমন করিবার পর রামমোহনবাবু দেশী কাপড়ের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং "সাধু" পদবী গ্রহণ করেন; উক্ত "সাধু" পদবীর অপভ্রংশ সাহা এই সাহা পদবী অদ্যাপি কলেক্টরীতে জারি আছে। এক্ষণে দাস উপাধি হইয়াছে। রামমোহন সাহা মহাশয়ের সম্পত্তি কি কারণে নষ্ট হয় তাহা জানিবার উপায় নাই। ইনি ৯৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। ইঁহার বিবাহ রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার নিকটবর্ত্তী টেপাগাড়ী গ্রামে হইয়াছিল; ইঁহার পত্নীর নাম কাঞ্চনমণি। ইনি মৃত্যুকালে চারি পুত্র ও

পাঁচ কন্যা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন ; পুত্রগণের নাম (প্রথম পক্ষে) জ্যেষ্ঠ—গোবর্দ্ধন, দ্বিতীয়—নিধিরাম এবং (দ্বিতীয়পক্ষে) তৃতীয়—রমানাথ ও চতুর্থ—বনমালী।

রমানাথ দাস

স্বর্গীয় রামমোহনের তৃতীয় পুত্র রমানাথ দাস সন ১২৪০ সালে বগুড়া জেলার অন্তর্গত ই. বি. রেলওয়ের বর্ত্তমান সান্তাহার জংসন ষ্টেসনের সন্নিকট পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান কলশাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৺রাজবল্লভবাবুর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। সান্তাহার বাজার এই কলশা মৌজার এক অংশেই অবস্থিত এবং ষ্টেশনটী সান্তাহার মৌজার অন্তর্গত। রমানাথবাবু তাঁহার পরিবারবর্গকে "দাস" পদবীতে অভিহিত করেন। ইনি এই সাঁতাহার মৌজার অন্যতম জমিদার। রমানাথবাবুর ছয় পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম তারকনাথ, দ্বিতীয় রায় সাহেব কুমুদনাথ, তৃতীয় দ্বারকানাথ, চতুর্থ নৃসিংহচন্দ্র, পঞ্চম কাশীনাথ ও ষষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র এবং কন্যা শ্রীমতী নীরোদবরণী। রমানাথবাবুর ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র তারকনাথ সপ্তম বর্ষ বয়সে,চতুর্থ পুত্র নৃসিংহচন্দ্র অষ্টম বর্ষ মাত্র বয়সে এবং ষষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্র দশম বর্ষ বয়সে পরলোক গমন করেন। রমানাথবাবুর জীবন-বৈচিত্র্যময়। ২২ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গোবর্দ্ধন দাসের চক্রান্তে এক মাস মাত্র বয়সের শিশু ভ্রাতা ও মাতাসহ বড়ই আর্থিক কষ্টে ও দৈন্যে দিনযাপন করেন। ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্যমাত্র লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তখন এতদঞ্চলে উচ্চশিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না ; নতুবা ইঁহার মত প্রতিভাশালী, কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমশীল ব্যক্তি জগতে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিতেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন এবং স্বীয় কর্ম্মকুশলতা, প্রতিভা ও ন্যায়নিষ্ঠার ফলে অবিলম্বেই অবস্থার

স্বর্গীয় রমানাথ দাস

বিশেষ উন্নতি করিতে সমর্থ হন। ইনি সুদক্ষ ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কৈশোরেই তিনি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পরিণামে তাঁহার অবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। ইহাই তাঁহার পারদর্শিতার একমাত্র উদাহরণ-স্থল। তিনি ১২৬৪ সালে হিলিতে যাইয়া উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল পরগণা হইতে সাঁওতাল আনাইয়া উহাদের সাহায্যে ঢেঁকি দ্বারা চাউল ছাঁটাইয়া উহার ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন এবং ঐ ব্যবসায়ের পথ-প্রদর্শক হন। বর্ত্তমানে ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে এবং হিলিতে ১৩টী চাউলের কল হওয়ায় কলে-ছাঁটা চাউলের ব্যবসায় চলিতেছে। ইনি বহু বাধা অতিক্রম করিয়া হিলি-বাসীর শিক্ষার জন্য একটী ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপন করেন ও স্বয়ং ইহার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। যে সময়ে উত্তরবঙ্গে রেল-লাইন স্থাপিত হয় নাই, হিলীর বহুক্রোশব্যাপী স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় দূরের কথা—সামান্য পাঠশালা পর্য্যন্ত ছিল না, সেই সময়ে তিনি এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে।

স্বীয় কলশাগ্রামের বাসভবনের সংলগ্ন পূর্ব্বপুরুষের খনিত একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন করিয়া তাহার দুইটী ঘাট তিনি বাঁধাইয়া দেন ও প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে একটী ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ৺ রাধামাধব জীউ ও ৺ বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক মন্দির ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠানে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাকালে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৺ শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, নবদ্বীপধামের মহামহোপাধ্যায় ৺ অজিতকুমার ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় ৺ নৃসিংহচন্দ্র স্মৃতিভূষণ, রাজসাহী ধর্ম্মসভার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বামনদাস বিদ্যারত্ন ও ৺ রামতনু তর্করত্ন, পাবনার ৺

ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, নাটোর-রাজবাটীর ৺ রমণীমোহন বিদ্যারত্ন, বাদ্ধাই খাড়ার ৺ কৃষ্ণকুমার স্মৃতিতীর্থ, ও রায়কালী-নিবাসী ৺ বিপিনবিহারী কাব্যরত্ন, বৈন্দাকোণা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সাংখ্যকাব্য-তীর্থ বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি বহুগণ্যমান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত থাকিয়া এই কার্য্য সুসম্পন্ন করেন সন ১৩১৯ সালের আষাঢ় মাসে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপস্থিতিতে একটী পিতলের রথ নির্ম্মাণ ও তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। তদুপলক্ষে একটী মেলা জমিয়া প্রায় অর্দ্ধলক্ষ লোকের সমাগম হয় এবং সপ্তাহকাল যাবং যাত্রা, কীর্ত্তন ইত্যাদি হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত উক্ত রাধামাধব বিগ্রহের দোল, রাসযাত্রা এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব হইয়া থাকে। উত্তর বঙ্গের হিলি বন্দরই ইঁহার কর্ম্মস্থান। রমনাথ বাবুই হিলিতে বারোয়ারী স্থাপন করেন। এইস্থানে রাধামাধব বিগ্রহ, শিবলিঙ্গ ও কালীমন্দিরের নিত্য-নিয়মিত সেবা ও ভোগের বন্দোবস্ত ইনিই করিয়া যান। ইঁহাদের স্বগ্রাম কলশাস্থিত উল্লিখিত রাধামাধব বিগ্রহের সেবাকার্য্যাদির পরিচালনা করিবার জন্য ইনি প্রায় ১৫০০৲ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দেবতার নামে প্রদান করিয়া স্থায়ীভাবে দেবসেবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হয়। তিনি ধর্ম্মশীল ও নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। অন্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল। জনৈক মুসলমান ফকির তাঁহার সাহায্যে দেবস্থানের নিকটে একটী দরগা স্থাপন করেন, অদ্যাপি ঐ দরগা বর্ত্তমান আছে এবং তথায় প্রতি বৎসর মুসলমানদের উৎসব হইয়া থাকে।

ইনি সন ১৩২৩ সালের ৬ই বৈশাখ বুধবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় ৮৩ বৎসর বয়সে হিলি মোকামে পরলোক গমন করেন।

বনমালী দাস

বনমালী দাস মহাশয় রমানাথবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি এক মাস বয়সে পিতৃহীন হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা রমানাথ দাসমহাশয়ের যত্নে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মহিষবাথানের সরকার-বংশের জনৈক বংশধর বহুপূর্ব্বে বগুড়া জেলার অন্তর্গত নারায়ণপাড়া গ্রামে বাস করেন। এই বংশের দীনবন্ধু সরকার মহাশয়ের কন্যা মধুমতীর সহিত ইঁহার পরিণয় হইয়াছিল। রমানাথ দাসের বংশধরগণসহ এক্ষণে ইঁহার পুত্রগণ একান্নভুক্তই আছেন। বনমালী দাস মহাশয় লর্ড কার্জ্জনের দিল্লীর দরবারে অনারস সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। ইনি সান্তাহারের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা রাজসাহী বিভাগের সর্ব্বপ্রধান মধ্য-ইংরাজী স্কুল। এই বিদ্যালয়টী এখন সুপরিচালিত। দিল্লীর দরবারে ইনি যে অনার্স সার্টিফেকেট পাইয়াছেন তাহার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল :—

By Command of His Excellency the Viceroy and Governor-General-in-Councl this certificate is presented in the name of His Most Gracious Majesty King George V, Emperor of India on the occasion of His Imperial Majesty's Coronation Durbar at Delhi to Babu Banamali Shaha, son of Babu Ram Mohon Shaha of Santahar, Bogra in recognition of his good work in connection with the Santahar M. E School.

12th Docember, (sd) Illegible
1911 Liet. Governor of Bengal & Assam.

বনমালীবাবু গত ১৩৩৩ সনে পৌষ মাসে ৭২ বৎসর বয়সে

পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই কন্যা ও এক পুত্র। পুত্রের নাম শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

রায় সাহেব কুমুদনাথ দাস

কুমুদনাথ দাসই বর্ত্তমান হিলি জমিদার পরিবারের অন্যতম ও প্রধান জমিদার। ইঁহার বয়স এক্ষণে ৫৬ বৎসর। ইনি রাজবল্লভ মজুমদার মহাশয়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হলদী গ্রামের গুরুগোবিন্দ মজুমদার মহাশয়ের ভগিনীর বিবাহ দিনাজপুর জেলার সুজাপুর গ্রামে চন্দ্রশেখর রায়ের সহিত হয়। চন্দ্রশেখরের উইলক্রমে বিষয়-সম্পত্তি তাঁহার পুত্র মোহিনীমোহন মজুমদারের হস্তগত হইয়া ভোগদখল হইতেছে। এই গুরুগোবিন্দ মজুমদারের কন্যা ভুবনেশ্বরীর সহিত ইঁহার প্রথম বিবাহ হয়। দ্বিতীয় বিবাহ পাবনা জেলার সাঁথিয়া গ্রাম-নিবাসী সীতানাথ বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর সহিত হইয়াছে। কুমুদবাবুর সাত পুত্র ও তিন কন্যা। প্রথমা পত্নীর গর্ভে শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, ভুপেন্দ্রনাথ, কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা, শ্রীমতী বরুণা, শ্রীমান মণীন্দ্রনাথ, শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমান্ ফণীন্দ্রনাথ পর্য্যায়ক্রমে এই ছয় পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে মাত্র দুই কন্যা ও এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে; পুত্রের নাম শ্রীমান্ অনিলেন্দ্রনাথ। কুমুদবাবু হিলী বন্দরে একটী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং ইঁহারই যত্নে ও অর্থব্যয়ে এই বিদ্যালয় বর্ত্তমানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের নামে "রমানাথ হাই স্কুল" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বহুদূর দূরান্তর হইতে ছাত্রগণ আসিয়া এই স্কুলে বিদ্যালাভের সুবিধা পাইতেছে। ইনি বহু দুঃস্থ এবং দরিদ্র ছাত্রগণের পাঠের সুবিধার জন্য অন্ন দান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। রায় সাহেব কুমুদনাথ নীরব কর্ম্মী।
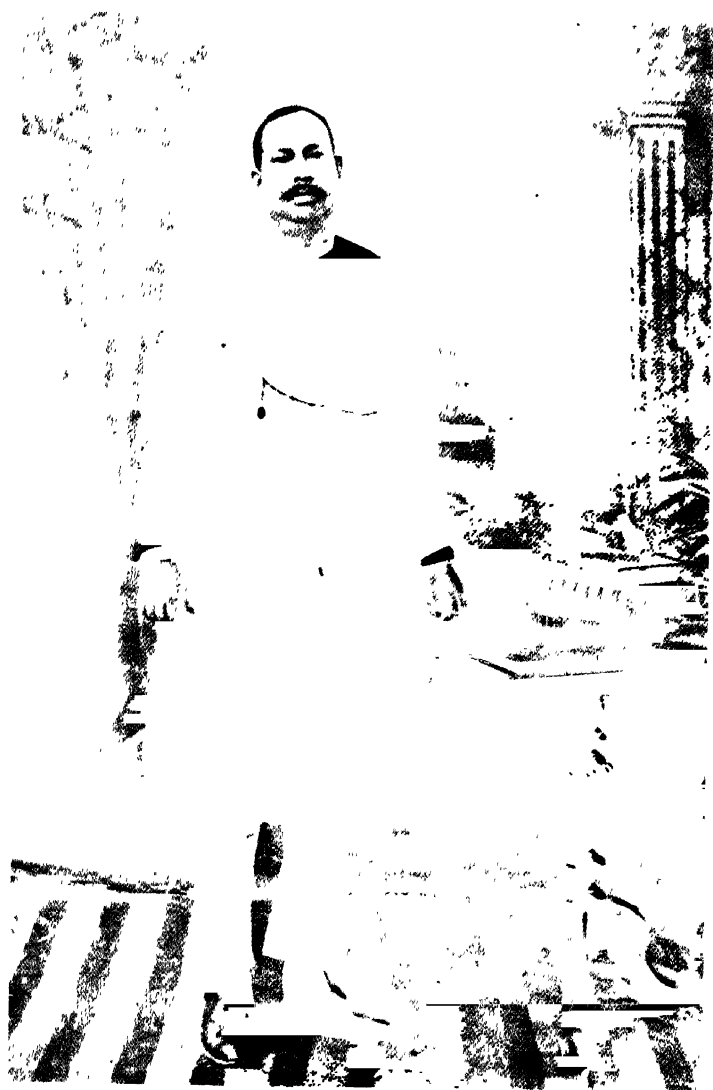
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস

তাঁহার কোনও রূপ অহঙ্কার কিংবা দ্বেষ ও হিংসা নাই। তিনি দেশের উন্নতি-সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। হিলি বাজারে নূতন নূতন রাস্তা প্রস্তুত ও পুরাতন রাস্তাগুলি ইঁহারই যত্নে, অর্থব্যয়ে ও চেষ্টায় পাকা হওয়ায় বাজারটী নূতন আকার ধারণ করিয়া একটী ক্ষুদ্র সহরে পরিণত হইয়াছে; এই নব কলেবরে সজ্জিত হিলি বাজারের ইনি মালিক। হিলি বন্দর ধান চাউলের কারবারের জন্য উত্তরবঙ্গে বিখ্যাত, ভারতবর্ষের বহুস্থান হইতে ক্রেতা এখানে ধান চাউল খরিদ করিতে আসেন। পাট ও অন্যান্য জিনিসের খরিদ-বিক্রী এখানে মন্দ হয় না।

বাজারের এক দিকে রেল ষ্টেশন; অপর দিকে যমুনা নদী প্রবাহিতা। স্থানটী অতীব স্বাস্থ্যকর। ইঁহার চেষ্টায় বগুড়া জেলা-বোর্ড একটী দাতব্য চিকিৎসালয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ইনি হিলি বন্দরে তাঁহার স্বর্গগতা প্রাতঃস্মরণীয়া মাতৃদেবী রুক্মিণীসুন্দরীর স্মৃতি-উপলক্ষে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাকা বাটীটি স্বীয় অর্থব্যয়ে করিয়া দিয়াছেন। ইনি বগুড়া জেলা-বোর্ডের একজন সদস্য। ইনি লোক্যাল বোর্ডেরও সদস্য এবং স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির সন ১৩৩০ সালের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে ইহাঁর কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছে। তিনি ভারতীয় হিন্দু মিশনের উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি ইঁহারই চেষ্টা ও যত্নের ফলে প্রায় ছয় সহস্র সাঁওতাল হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়া মহানন্দে কালাতিপাত করিতেছে। পরবর্ত্তী বৎসরে হিন্দু মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজীর সহযোগিতায় এই স্থানে একটী গৌরাঙ্গ-ভক্ত-সম্মিলন হয়।

এই উৎসবে কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্যচৌধুরী, বলিহারের কুমার বিমলেন্দু রায় ও বহু গণ্যমান্য জমিদার এবং অধ্যাপক ডক্টর সুনীতি

চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ যোগদান করিয়া ইঁহারই বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিলি হইতে রঙ্গপুর জিলায় গোযান প্রভৃতি যাতায়াতের জন্য কোনও রাস্তা ছিল না। ইনিই দিনাজপুর জিলাবোর্ডের সহযোগিতায় নিজে প্রায় ৯০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়া দৈর্ঘ্যে ৬ মাইল একটী প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ই. বি. রেলের জামালগঞ্জ ষ্টেশনের সংলগ্ন পশ্চিমদিকস্থিত যে রামকানাই দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথের জামাতা ৺ রামকানাই দাসের স্মৃতিরক্ষার্থ ইঁহারই দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। ই. বি. রেলের সান্তাহার জংসনের সংলগ্ন সান্তাহার বাজারে যে বনমালী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহা তাঁহারই পিতৃব্য ৺ বনমালী দাসের স্মৃতিরক্ষার্থ ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্নে স্থাপিত হইয়াছে।

বগুড়া সহরে হিন্দুসভার গৃহনির্ম্মাণে ইনি ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বগুড়া এডওয়ার্ড পার্কের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধার জন্য ইনি তদানীন্তন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুরকে চাঁদা-আদায়ে সাহায্য করিয়াছেন ও নিজে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। বগুড়া উডবরণ পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে তদানীন্তন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার শালেকের মারফতে ইনি অর্থ দান করেন।

তিনি বালুরঘাট মহাকুমায় হাই স্কুলে প্রতিষ্ঠার জন্য তৎকালীন মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অতুলচন্দ্র দত্তের মারফতে অর্থসাহায্য করেন। পরে অতুলবাবু রায় বাহাদুর হন এবং বগুড়া-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে। উন্নীত হন।

পূর্ব্বে হিলিতে বালিকাদের অধ্যয়নের জন্য বিদ্যালয় ছিল না

ইনি এই অভাব দূর করিবার জন্য এইস্থানে ইউনিয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় প্রায় ৪০০০৲ টাকা ব্যয়ে বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এক্ষণে ইহা "Hili Union Board's Girls' School" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই স্কুলে প্রায় একশত ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে।

এই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে মহামান্য গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী "রায় সাহেব" উপাধিতে ভূষিত করেন।

রায় সাহেব উপাধি-প্রাপ্তি-উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে ইঁহাকে অভিনন্দিত করা হয় ;—

(১) হিলী রমানাথ হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ।

(২) বগুড়া জিলার অন্তর্গত জয়পুরহাটের উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সমিতি।

(৩) জয়পুরহাটের অধিবাসিবৃন্দ (রায় সাহেব পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার বিপিনচন্দ্র তোকদার, খাশমহলের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ সরকার, সার্কেল অফিসার শোভাবাজার-রাজবংশধর শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন)।

(৪) হিলির মুসলমান সমাজ, মাড়োয়ারী সম্প্রদায়, রাইস মিলস্ এসোসিয়েশন প্রভৃতি সকলে একসঙ্গে হিলির নবনির্ম্মিত বারোয়ারী-ভবনে জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় অনাথবন্ধু দে বাহাদুরের সভাপতিত্বে ইঁহাকে অভিনন্দিত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবা তাঁহার অভিভাষণ-কালে বলেন যে, হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারী সকলের দ্বারা একই ভাবে একই স্থানে অভিনন্দিন হওয়া ইঁহার জীবনে একটী প্রধান গৌরবের কথা। কারণ, এরূপ ঘটনা অতি বিরল ; জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয়ে সমভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ার চেয়ে এই পার্থিব জগতে মানুষের

প্রকৃত বাঞ্ছনীয় বিষয় বড় কিছু আছে কি না সন্দেহ। এই কারণেই হিলিতে ইউনিয়ন বোর্ডের সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ১৫।১৬ বৎসর ইনি বরাবরই প্রেসিডেণ্ট হইয়া আসিতেছেন।

বগুড়া জিলা-সদরে "Isolation Ward" একটি টিনের ঘরে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে ওলাউঠায় ও বসন্তে আক্রান্ত রোগীদিগকে স্বতন্ত্র-ভাবে চিকিৎসার্থ রাখা হইত। বগুড়ার তদানীন্তন জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় অনাথবন্ধু দে বাহাদুর উক্ত গৃহটীকে পাকা করিবার অভিপ্রায়ে কুমুদবাবুর নিকট হইতে ২০০০৲ টাকা অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। কুমুদবাবু সেই টাকা প্রদান করেন; এক্ষণে কুমুদবাবুর ইচ্ছানুসারে উহার নাম হইয়াছে "রামমোহন বনমালী Isolation Ward"।

হিলি বন্দরে একটী দাতব্য পশু-চিকিৎসালয় রায় সাহেব কুমুদ-নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাসের নামে প্রতিষ্ঠার জন্য ইনি গৃহাদির ও ভূমির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

রায় সাহেব কুমুদনাথ বগুড়া মাদ্রাসায় ৩৫০৲ টাকা মূল্যের আলমারি ও পুস্তক দান করিয়াছেন।

সান্তাহার বালিকা-বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসের যত্নে ও অর্থে স্থাপিত হইয়াছে এবং সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে।

তুলসীগঙ্গানদীর উপর একটী সেতু-নির্ম্মাণের জন্য তিনি ১০০০৲ এক হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এক্ষণে এই সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা রঙ্গপুর-হিলি যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই সেতুটী জনসাধারণের বহুদিনের অভাব মোচন করিয়া দিয়াছে।

রায় সাহেব কুমুদনাথ নিম্নলিখিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও কার্য্যের সহিত সংশিষ্ট ছিলেন ও অদ্যাবধি আছেন; যথা—

(১) Banking Enquiry Committeeর Bogra District Branchএর সদস্য ছিলেন (১৯২৯)।

(২) Bogra District Agricultural Commiteeর সদস্য।

(৩) সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের বগুড়া করোনেশন কমিটির সদস্য।

(৪) বগুড়া জমিদার সমিতির সদস্য।

(৫) বগুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য এবং ঐ বোর্ডের ফাইন্যান্স ও পাবলিক ওয়ার্কস কমিটিরও সদস্য।

(৬) ৺ রমানাথ দাস মহাশয় প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে হিলিতে তদঞ্চলবাসীর শিক্ষার জন্য বহু বাধা অতিক্রম করিয়া বহু যত্নে ও কষ্টে এক ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি বহুদিন উহার সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। তৎপর উহা ছাত্রাভাবে উঠিয়া যাইলে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া রায় সাহেব কুমুদনাথ দাস মহাশয় ঐ স্থানে এক এম-ই স্কুল স্থাপন করেন ও স্বয়ং উহার সেক্রেটারী হন। তৎপর তিনি এই মধ্য-ইংরাজী স্কুলটীকে তাঁহার পিতা ৺ রমানাথ দাস মহাশয়ের নামে ইংরেজী ১৯২৩ সালে "R. N H. E. School"-এ পরিণত করেন। তিনি এখনও পর্য্যন্ত এই স্কুলের সেক্রেটারী-পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

(৭) ইনি বগুড়া জিলার অন্তর্গত খঞ্জনপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সদস্য ছিলেন।

(৮) ইনি "বারোয়ারী সমিতি"র সভাপতি। ইঁহারই যত্নে ১৯২৭ সালে হিলিতে একটী নূতন বারোয়ারী-ঘর প্রস্তুত হয়। উত্তরবঙ্গে এত বড় সুদৃশ্য বারোয়ারী-ঘর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। টাউন হলের অভাবে বর্ত্তমানে এই স্থানে সভাসমিতির কার্য্য হইতেছে।

দ্বারকানাথ দাস

দ্বারকানাথ বাবু রমানাথ দাস মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। বগুড়া জেলার অন্তর্গত বামনকুণ্ডা গ্রাম-নিবাসী কৃষ্ণকুমার তোকদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইঁহার এক কন্যা; দুঃখের বিষয়, কন্যাটী বিধবা। জামালগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট রামনারায়ণ দাসের পুত্র রামকানাই দাসের সহিত কন্যাটীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি সুযোগ্য ও পারদর্শী ব্যবসায়ী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাস মহাশয় জনসাধারণের কল্যাণকর বহু কার্য্যের সহিত সম্পৃক্ত। তাঁহার কতকগুলি কার্য্যের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

(১) ১৯৩১ সালের মে মাসে রাজসাহী জিলার অন্তর্গত আত্রাই নামক স্থানে রাজসাহী জিলার রায়ত-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন।

(২) ঐ সময়ে আত্রাই নামক স্থানে উত্তরবঙ্গ কংগ্রেস কর্ম্মিবৃন্দের যে সম্মিলনী হয় তাহাতেও তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। মহিলা-কর্ম্মিগণ ইঁহাদের আত্রাই বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

(৩) ইঁহারই যত্নে আত্রাইতে এক মধ্য-ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ স্কুলে ইনি ৫০০৲ শত টাকা এককালীন দান করেন।

(৪) আত্রাইতে Co-operative Societyর যে পাট-বিভাগ ছিল, তিনি উহার সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি ঐ কার্য্য করিতে অক্ষম হন।

(৫) ১৩২৫ ও ১৩২৯ সালে Flood Relief করিতে যাঁহারা আত্রাইতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ইঁহাদের বাসভবনে ইঁহার

উপবিষ্ট — শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাস

দণ্ডায়মান — শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস

আতিথ্যগ্রহণ করেন। “হিতসাধন মণ্ডলী”র সভাপতি ডাক্তার ডি-এন মৈত্র ইঁহার বাসভবনেই ছিলেন। ইনি রিলিফ কার্য্যে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ঐ কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করায় ইনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

(৬) ইনি ইঁহার ৺ পিতৃদেবের আদেশে আত্রাইয়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথমে একটী জুট-প্রেস খোলেন। এখন আত্রাই উত্তরবঙ্গের মধ্যে পাট-ব্যবসায়ের একটা প্রধান কেন্দ্র।

(৭) ইনি আত্রাই মার্চ্চ্যাণ্ট এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট এবং স্থানীয় বারোয়ারী-উৎসব ইঁহারই নায়কত্বে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

কাশীনাথ দাস

ইনি রমানাথ দাস মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র। ইঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৪৮ বৎসর। বগুড়া জেলার অন্তর্গত পার্ব্বতীপুর-নিবাসী ৺ ললিত-মোহন চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর সহিত ইঁহার শুভ পরিণয় হইয়াছে। কাশীনাথ বাবুর চারি পুত্র ও তিন কন্যা। প্রথম পুত্র সুধেন্দ্র ; দ্বিতীয় ধীরেন্দ্র ; তৃতীয় দেবেন্দ্র ও চতুর্থ বীরেন্দ্র।

কাশীনাথবাবু ৺ পিতৃদেবের আদেশে বগুড়া জিলার অন্তর্গত সান্তাহারে সর্ব্বপ্রথম পাটের কল লইয়া পাটের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এখন সান্তাহারকে উত্তরবঙ্গে পাটের একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যবসায়-স্থান বলা যাইতে পারে। ইনি ১৩২৫ ও ১৩২৯ সালে উত্তরবঙ্গে যে ভীষণ বন্যা হয় তাহাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং বিপন্নদের ঘরে ঘরে যাইয়া অন্ন ও বস্ত্র প্রদান করিয়া সকলের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হন। ইনি সান্তাহার মার্চ্চ্যাণ্ট এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইনি সান্তাহারে দুইটী যৌথ ঋণ-দান কোম্পানীর মধ্যে

একটীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও অপরটীর সুপারভাইজিং ডিরেক্টর। পিতৃব্যদেব ৺ বনমালী দাস মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁহার প্রত্যেক জনহিতকর কার্য্যে ইনি দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। সান্তাহার বাজারের প্রায় সমুদয় রাস্তা ইঁহার উদ্যোগে পাকা হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ দাস

(১) ইনি সান্তাহার Union Boardএর President.

(২) ইনি সান্তাহার Banomali Parameswar H. E. School-এর Secretary। ইহা প্রথমে মধ্য-ইংরেজী স্কুল ছিল। পরে রায় সাহেব কুমুদনাথের সহযোগিতায় সুরেন্দ্রবাবু ইহাকে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত করেন এবং তদীয় পুণ্যস্মৃতি পিতৃদেবের নাম ইঁহার সহিত বিজড়িত করিয়া দেন।

(৩) ইনি সান্তাহার বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী।

(৪) ইনি সান্তাহারে ইঁহার ৺ পিতৃদেবের নামে স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রেসিডেণ্ট।

মোট কথা, ইঁহার পিতা ৺ বনমালী দাস মহাশয় যে যে স্থানে যে-সব লোকহিতকর কার্য্য করিতেন ইনি বর্ত্তমানে সেই সব জনহিতকর-কার্য্যে সেই সেই স্থান অলঙ্কৃত করিতেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায় সাহেব কুমুদনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৩০ বৎসর। নওগাঁ স্কুল হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ১৫৲ টাকা বৃত্তি সহ ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রবেশ করেন। ইনি এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এডভোকেট। দক্ষিণ বঙ্গের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাওয়ালীর প্রসিদ্ধ মণ্ডল-বংশের স্বর্গীয় বাবু গোপাললাল মণ্ডল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত-

হরিনাথ মণ্ডল মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অমিয়প্রভার সহিত গত ১৩৩০ সালের আষাঢ় মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শুভ পরিণয় হয়। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের এই শুভ সম্মিলনে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ইঁহার একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহার নাম জগদিন্দ্রনাথ। জগদিন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ৩ বৎসর।

গিরীন্দ্রনাথ দাস

গিরীন্দ্রনাথের বয়স ২১ বৎসর। ইনি কুমুদবাবুর দ্বিতীয় পুত্র। ইনি দিনাজপুর জেলা স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এল অধ্যয়ন করিতেছেন। গিরীন্দ্রনাথের বিবাহ নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভেড়ামারা গ্রামের নিকটবর্ত্তী ক্ষেমিরদিয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত সুরপতি নাথ ভৌমিকের কন্যা শ্রীমতী ইরাবতীর সহিত হইয়াছে।

কুমুদবাবুর তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্র আই-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া এক্ষণে ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন।

হিলি জমিদার-বংশ

বংশ-তালিকা

১। রাজবল্লভ মজুমদার

২। জয়নারায়ণ মজুমদার

৩। রামমোহন সাহা　৩। সূর্য্যনারায়ণ সাহা (৩ পুত্র)　৩। শিবরাম সাহা (৫ পুত্র)　৩। দধিরাম সাহা (৪ পুত্র)

৪। গোবর্দ্ধন দাস　৪। নিধিরাম দাস　৪। রমানাথ দাস　৪। বনমালী দাস

৫। সৌদামিনী দাসী　৫। শরৎশশী দাসী　৫। সুরেন্দ্রনাথ দাস

৬। (কন্যা)　৬। (কন্যা)　৬। (কন্যা)　৬। (কন্যা)　৬। (কন্যা)　৬। (পুত্র মৃত)

৪। রমানাথ দাস

৫। ৺ তারকনাথ দাস — ৫। রায় সাহেব কুমুদনাথ দাস — ৫। দ্বারকানাথ দাস — ৫। ৺ নৃসিংহচন্দ্র দাস — ৫। ৺ কাশীনাথ দাস — ৫। ৺ পূর্ণচন্দ্র দাস — ৫। নীরদবরণী রায়

দ্বারকানাথ দাস:
৬। সরলাবালা দাস্তা

কাশীনাথ দাস:
৬। সুধেন্দ্রনাথ — ৬। ধীরেন্দ্রনাথ — ৬। দেবেন্দ্রনাথ — ৬। বীরেন্দ্রনাথ — ৬। অন্নপূর্ণা — ৬। রাধারাণী — ৬। সাবিত্রী

রায় সাহেব কুমুদনাথ দাস:
প্রথমা পত্নীর গর্ভে — ৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ — ৬ গিরীন্দ্রনাথ — ৬ ভূপেন্দ্রনাথ — ৬ লাবণ্যপ্রভা — ৬ বরুণাবালা — ৬ মণীন্দ্রনাথ — ৬ রবীন্দ্রনাথ — ৬ ফণীন্দ্রনাথ
দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে — ৬ নিরুপমা — ৬ অনিলেন্দ্র

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ:
৭। জগদিন্দ্র

স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র,

এম্-এ, এল-এল-ডি, এম্-আর-এ-এস্

সন ১২৫১ সালের ২১শে বৈশাখ (ইংরাজী ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে) ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বাবু জয়গোপাল মিত্র সওদাগরী অফিসের কেরাণী ছিলেন। তাঁহার সংসার খুব বড় ছিল এবং তাঁহাকে অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিতে হইত। ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীরামপুরে বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। তার পর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে উত্তরপাড়া স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি বাল্যকাল হইতেই শ্রমশীল, অধ্যবসায়ী ও স্বাবলম্বী ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ সকল ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম্-এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। প্রকাশ, প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল মিঃ সাটক্লিফ ত্রৈলোক্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, এম্-এ পরীক্ষায় তিনি কোন্ বিষয় লইবেন? তদুত্তরে ত্রৈলোক্যবাবু বলেন যে, তিনি তাহা জানেন না; তবে যে কোন বিষয়ে এম্-এ দিতে

প্রস্তুত আছেন। মিঃ সাট্‌ক্লিফ তাঁহাকে গণিতশাস্ত্রে এম্-এ দিবার জন্য বলেন এবং ত্রৈলোক্যনাথ গণিতশাস্ত্রেই এম্-এ পাশ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বিভাগে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইনে "অনার্স" পান এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-এল্ (Doctor of Law) উপাধি প্রদান করেন।

এরূপ প্রতিভাবান্ লোক কখনও অজ্ঞাতনামা হইয়া দিন কাটাইতে পারেন না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এম্-এ পাশ করিবার পরই—তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে কার্য্য করেন, অতঃপর তিনি হুগলী কলেজে আইন ও দর্শনশাস্ত্রের অস্থায়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। দর্শনের অধ্যাপক-পদে মিঃ ক্রফট্ (পরে স্যার এলফ্রেড) কাজ করিতেন, তিনি ছুটীতে গিয়াছিলেন, কাজেই যুবক ত্রৈলোক্যনাথকে যোগ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ঐ পদে বরণ করা হয়। ইহা তাঁহার পক্ষে বড় অল্প সম্মানের পরিচায়ক নহে। প্রায় এক বৎসর কাল তিনি এই পদে কাজ করেন, তার পর দর্শনের অধ্যাপকতা ত্যাগ করিয়া কেবল আইনের অধ্যাপকতা করিতে থাকেন এবং ওকালতী আরম্ভ করেন। প্রকাশ, শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর মিঃ এট্‌কিন্‌সন বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগে বড় চাকুরী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ উহাতে রাজি না হইয়া আইনের অধ্যাপকতাই করিতে থাকেন ; কালে এই আইন-ব্যবসায়ের জন্যই ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার উপর সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ হুগলীতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন এবং এক বৎসরের মধ্যে হুগলী আদালতের প্রথম শ্রেণীর উকিলে

পরিণত হন ; পরবর্ত্তীকালে তিনি হুগলী বারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল হইয়াছিলেন। ৮ বৎসর কাল তিনি অসামান্য কৃতিত্বের সহিত হুগলীতে ওকালতী করেন। অতঃপর বিচারপতি মিঃ মার্কবি তাঁহাকে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে পরামর্শ দেন। বিচারপতি মার্কবী তখন পর্য্যবেক্ষণোদ্দেশ্যে হুগলীতে গিয়াছিলেন এবং ত্রৈলোক্যনাথের প্রখর বুদ্ধি ও বাগ্মিতা দর্শনে তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতী করিতে অনুরোধ করেন। হাইকোর্টে আসিয়া ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের অধ্যাপক হন এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। হাইকোর্টে তিনি যে পসার-প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন, তাহার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না, সকলেই সে বিষয় জানেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন ; এই সময়ে তাঁহার বন্ধু ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ রাসবিহারী ঘোষও "ফেলো" নির্ব্বাচিত হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঠাকুর ল-লেকচারার নিযুক্ত হন এবং হিন্দুবিধবার সম্পর্কিত আইন বিষয়ে যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেগুলি অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। দশ বৎসর যাবৎ তিনি শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং মিউনিসিপ্যালিটীতে ডাঃ লিডারডেলের সহিত শ্রীরামপুরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার যে সমস্ত আলোচনা ও কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা অতি সারগর্ভ প্রয়োজনীয়। এ সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা জনসাধারণ, এমন কি, "টাইম্‌স্" পত্র পর্য্যন্ত তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ পদত্যাগ করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অফ ল তাঁহাকে তাঁহাদের সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তিনি সিণ্ডিকেটের

সদস্য হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য হন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার জন্য তিনি পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ভবানীপুরে জররোগে মারা যান, মৃত্যু-কালে তাঁহার মাতা, স্ত্রী, একটী পুত্র ও চারিটি কন্যা জীবিত ছিলেন।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। এই সম্বন্ধে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল "ইংলিসম্যান" পত্রে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হয়—

"গত কল্য হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ বেভারলি আসন গ্রহণ করিলে অস্থায়ী এডভোকেট-জেনারেল স্যার গ্রিফিথ ইভান্স তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের মৃত্যুতে উকিল ও এটর্নীগণ যে শোক পাইয়াছেন, আমি তাহা প্রকাশ করিতেছি। গত কল্য সন্ধ্যাকালে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এই আদালতের অন্যতম প্রাচীন ব্যবহারাজীব ছিলেন এবং তাঁহার পারদর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণতায় জন্য তিনি সকলের সম্মানার্হ ছিলেন।"

সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট উকিল বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ঃ—

"ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের মৃত্যুতে এই আদালতের উকিলগণ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। তিনি জীবনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি দেশহিতকর কার্য্যে সতত অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সুকঠিন। তাঁহার শূন্য স্থান শীঘ্র পূর্ণ হইবে না।"

প্রধান বিচারপতি বলেন—"আজ প্রাতে আদালতে আসিয়া আমরা ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথের অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদ শুনিতে পাইলাম। আমি

আমার ও অন্যান্য বিচারপতিগণের পক্ষ হইতে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছি। তিনি চরিত্রবান এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। সত্যই তাঁহার শূন্য স্থান শীঘ্র পরিপূরণ হইবে না।"

বিচারপতি মিঃ ম্যাকৃফার্সন বলেন, "ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তিনি এই আদালতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। তিনি যেমন তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, তেমনি বিচারপতিগণও তাঁহাকে বিশ্বাস ও সম্মান করিতেন। তাঁহার শূন্য স্থান সহজে পরিপূর্ণ হইবে না।"

বিচারপতি মিঃ ব্যানার্জ্জী বলেন,—"অন্যান্য বিচারপতিগণের অপেক্ষা ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। ডাঃ মিত্র একজন প্রতিভাবান ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী গ্রাজুয়েট এবং এই আদালতের একজন নেতৃস্থানীয় উকীল ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, চরিত্রের দৃঢ়তা ও অসাধারণ যোগ্যতা, তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা এবং শিষ্টাচার তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, অনেক দিন যাবৎ সেই ক্ষতি অনুভূত হইবে।"

উকিলদিগের পক্ষে উত্তর দিবার প্রসঙ্গে বাবু সারদাচরণ মিত্র বলেন—"আমি উকিলদিগের পক্ষ হইতে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আমি একজন সুপণ্ডিত সতীর্থকে হারাইয়াছি। তিনি একজন যোগ্য এড্‌ভোকেট এবং অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, তিনি সততার মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা যে কেবল একজন শ্রেষ্ঠ উকিলকে হারাইয়াছি তাহা নহে, পরন্তু একজন স্বদেশহিতব্রত দেশসেবককেও হারাইয়াছি।"

স্যার হেন্‌রী প্রিন্সেপ, বিচারপতি মিঃ নরীস, বিচারপতি মিঃ পিগটও ঐরূপভাবে শোক প্রকাশ করেন।"

১৮৯৫ সালে ২৬শে এপ্রিল তারিখে "ফ্যাকালটি অব লয়ের" মন্তব্যের সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল—

"ফ্যাকালটী অতি দুঃখের সহিত ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছেন। ডাঃ মিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি পাইয়াছিলেন এবং যখনই যে কাজ করিয়াছেন তাহাতেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ফ্যাকালটির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদস্য ছিলেন। সিণ্ডিকেটে—তিনি একাধিক বার ফ্যাকালটির প্রতিনিধিত্ব যোগ্যতার সহিত করিয়া ছিলেন। আগামী বৎসরের জন্য তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই পদ গ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ওকালতিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং বিবেকের সহিত আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিতেন। ঠাকুর আইনের অধ্যাপকরূপে তিনি হিন্দুবিধবা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত মূলাবান। ফ্যাকালটি তাঁহার মৃত্যুতে যে অপরিসীম শোক পাইয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত।"

হাইকোর্টের উকিল সমিতি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন—

"ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের মৃত্যুতে এই সমিতি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি একজন প্রতিভাবান পণ্ডিত, সুশিক্ষিত ব্যবহারজীব ও কৃতকর্ম্মা এড্ভোকেট ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ হইতে উকিলগণ সমভাবে তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার পূত স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। তিনি একজন খাঁটি ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার শূন্য স্থান পরিপূর্ণ করা সহজসাধ্য হইবে না।"

হুগলী উকিল সভা, শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটী এবং অন্যান্য সমিতিসমূহ ঐরূপ প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে সেগুলির সবিস্তার উল্লেখ সম্ভবপর নহে।

ডাঃ মিত্র মদ্যপান করিতেন না এবং তামাক পর্য্যন্ত খাইতেন না। তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার সততার বিরুদ্ধে তাঁহার পরম শত্রুরাও কখনও কিছু বলিতে পারিত না। তাঁহার মৃত্যুতে জননী বঙ্গভূমি একজন সুযোগ্য সন্তানকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন কৃতী ও মনীষী রত্নকে এবং ব্যবহারাজীবগণ একজন পারদর্শী সুহৃদ্ ও সতীর্থকে হারাইয়াছেন।

ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথের একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি তাঁহার পিতৃদেবের বহু সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ইনি নীরব কর্ম্মী, বিদ্যোৎসাহী এবং সকল প্রকার সৎকার্য্যের উৎসাহ-দাতা।

মিত্র-বংশ-লতা

(১) কালিদাস
(২) শ্রীধর
অশ্বপাত (বঙ্গজকায়স্থ)
(৩) শুক্তি
তারাপতি
(৪) সৌরভি
(৫) হরি
(৬) সোম
(৭) কেশব
(৮) মৃত্যুঞ্জয়
(৯) ধুই-(বড়িসা)
গুই-(টেকা)
নিশাপতি
(১০) মকরন্দ
চক্রপাণি
বনমালী
অচ্যুত
(১১) বিকর্ত্তন
মহানন্দ
বিভাকর
(১২) হেরম্ব
বাসুদেব
যুধিষ্ঠির
জগদানন্দ
যোগেশ্বর
(১৩) পরাশর
গোবিন্দ
গৌরী
নকড়ি

(১৩) পরাশর
(১৪) ত্রিপুরারি
(১৫) কৃষ্ণানন্দ
(১৬) গোপীনাথ
(১৭)নারায়ণ
(১৮)চণ্ডীদাস
(১৯) শ্রীরাম (কোন্নগরের প্রথম বসতি)
জনার্দ্দন
(২০) রামানন্দ
(২১) কাশীনাথ (২য় সুত)
(২২) বিনোদরাম (৩য় সুত)
(২৩) গোকুলচন্দ্র (১ম সুত)
(২৪) জয়গোপাল
(২৫) ত্রৈলোক্য
(২৬) শৈলেন্দ্র
(২৭) নলিনী
রবীন্দ্র
যতীন্দ্র

স্বর্গীয় তারিণীকুমার ঘোষ

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর অফ রেজিষ্ট্রেশন অর্থাৎ রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা খ্যাতনামা স্বর্গীয় তারিণীকুমার ঘোষ মহাশয় পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশোদ্ভূত। ইঁহারা কুলীন কায়স্থ সম্প্রদায়-ভুক্ত। এই ঘোষ-বংশের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলায়। পলাশী যুদ্ধের এক বৎসর পরে—১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী কাশিমবাজার কুঠীর এজেণ্ট নিযুক্ত হন এবং ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবসায় আরম্ভ করিলে মাল ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একজন দালালের প্রয়োজন হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংস রামলোচন ঘোষ মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত করেন। তিনি পাথুরিয়া-ঘাটার ঘোষ-বংশজাত। রামলোচন ঘোষ মহাশয় কাশিমবাজারের কুঠীতে কান্তবাবুর সহিত মিলিত হইয়া একযোগে কর্ম্ম করিতেন। অতঃপর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব কলিকাতায় আগমন করিলে রামলোচন ঘোষ মহাশয়ও কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কলিকাতাতেও তিনি হেষ্টিংস সাহেবের দালাল ছিলেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণর নিযুক্ত হন। তখন রামলোচন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দালালের পদ গ্রহণ করেন। দালালী করিয়া রামলোচন ঘোষ মহাশয় বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন এবং তাহার পর হইতেই পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ-বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রামলোচন ঘোষ মহাশয় পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাবি-রক্ষক এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের দেওয়ান হইয়াছিলেন

এই সময়ে যে দশশালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহাতে তিনি যথেষ্ট কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়া সম্মান ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

রামলোচনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ ঘোষের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ এবং কনিষ্ঠ জয়নারায়ণ।

জয়নারায়ণের পাঁচ পুত্র—জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমার, দ্বিতীয় শম্ভুচন্দ্র, তৃতীয় হরিশচন্দ্র, চতুর্থ কৃষ্ণচন্দ্র এবং পঞ্চম কেশবচন্দ্র।

শম্ভুচন্দ্র ঘোষ

শম্ভুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৯নং রেগুলেশন অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রথম যে তিনজন ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত করেন, শম্ভুচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। কিছুদিন ডেপুটী কলেক্টরী করিয়া শম্ভুচন্দ্র উহাতে ইস্তফা দেন এবং বর্দ্ধমান রাজ-সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার চারি পুত্র—প্রসন্নকুমার, নিমাইচরণ, তারিণীকুমার এবং নিবারণচন্দ্র তারিণীকুমার যখন নিতান্ত বালক সেই সময়ে তাঁহার পিতা শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

তারণীকুমার ঘোষ

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমার বর্দ্ধমান রাজ-সরকারে তাঁহার পিতা যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিই তারিণীকুমারকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তারিণীকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তারিণীকুমার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বর্দ্ধমান ফ্রি ইনষ্টিটিউসন হইতে তিনি সবিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে বিশিষ্ট গৌরবের সহিত বি-এ উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উজ্জ্বলরত্ন সুপণ্ডিত ব্যবহারাজীব এবং দানবীর স্বর্গীয় রাসবিহারী

ঘোষ মহাশয় কলেজে তারিণীকুমারের সহাধ্যায়ী ছিলেন; কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা উভয়েই বর্দ্ধমান জেলার লোক ছিলেন। ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যে তারিণীকুমারের অসাধারণ অধিকার ছিল। তাঁহার ইংরেজী উচ্চারণ ছিল যেমন শুদ্ধ, বলিতে কহিতে এবং লিখিতে পারিতেনও তেমনই শুদ্ধভাবে। ছাত্রজীবনেই তাঁহার বিপুল পাণ্ডিত্যের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা দেখিয়া তারিণী-কুমারকে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসরও হয় নাই। তিনি কিছুদিন শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল আরও উচ্চ। বঙ্গদেশে যখন প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করিবার প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, সেই সময় তারিণীকুমার প্রতিযোগী পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শ্বশুর তখন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ বসু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিপাহী সেনাদলের ডাক্তার ছিলেন; সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঐ সিপাহী সেনাদল বিদ্রোহী হয় নাই; উহারা গবর্মেণ্টের পক্ষভুক্ত ছিল এবং লক্ষ্ণৌ অবরোধের সময়ে অসহনীয় ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল। যখন তারিণীকুমারের শ্বশুর বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যু হয় সেই সময়ে তাঁহার পত্নী বসন্তকুমারী অত্যন্ত শিশু; তাঁহার মাতামহ স্বনামখ্যাত বাগ্মী ও দেশভক্ত স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে লালন-পালন করিয়াছিলেন।

যখন তারিণীকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। তখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের কাম্য বস্তু ছিল। সে সময়ে শিক্ষিত-সমাজের মুকুটমণিগণের মধ্যে অনেকেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবিবর নবীনচন্দ্র, ঔপন্যাসিক সঞ্জীবচন্দ্র, কবি রাজকৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায়, বৈদিক পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল, সুপণ্ডিত সূর্য্যকুমার অগস্তি, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তারিণীকুমার সুপণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী এবং সহানুভূতিপ্রবণ ছিলেন; এইজন্য যেখানে যাইতেন সেইখানকার অধিবাসীরাই তাঁহাকে সম্মান করিত ও তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িত। তিনি উদারহৃদয় ছিলেন এবং বিপন্নের বিপদে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেন। অধীন কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে তাঁহাদিগের উপকারী বন্ধু ও মুরুব্বি মনে করিতেন; বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহার নিকট সুপরামর্শ পাইতেন এবং গবর্মেণ্টেরও তিনি বিশ্বাসভাজন ও দক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি প্রায় আট বৎসর কাল কলিকাতা আলিপুরের ল্যাণ্ড একুইজিশন ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। এই সময়ে তিনি গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের জন্য ভূমি ক্রয় করিয়া দিতেন। এই কার্য্যে তিনি গবর্মেণ্টের প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং গবর্মেণ্ট তাঁহার যোগ্যতায় পরম প্রীত হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দেশবাসীও তাঁহার কর্ম্ম-দক্ষতায় তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট স্যর জন উডবরণ তারিণীকুমারের গুণমুগ্ধ ছিলেন। এই সময়ে বঙ্গদেশের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা, ইনস্পেক্টর-জেনারেল অফ রেজিষ্ট্রেশন খাঁ বাহাদুর দিলওয়ার হোসেন অবসর গ্রহণ করিলেন। ছোট লাট স্যর জন উডবরণ তারিণীকুমারকে বেল-ভেডিয়ার প্রাসাদে ডাকিয়া লইয়া যান এবং এই মর্ম্মে বলেন,—ইনস্পেক্টর-জেনারেল অফ রেজিষ্ট্রেশনের পদে আমি আপনাকেই নিযুক্ত করিলাম; কারণ আমি সমস্ত সিভিল লিষ্ট খুঁজিয়া দেখিলাম—আপনার অপেক্ষা যোগ্য লোক আর নাই। এইভাবে যোগ্যতার সমাদর করিয়া সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারী তারিণীকুমারকে তিনি তাঁহার

বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্ম্মপ্রতিভার উপযোগী কার্য্যই দিয়াছিলেন। কারণ স্যর জন উডবর্ণ বিশেষভাবেই জানিতেন যে, তারিণীকুমারের যোগ্যতা যেরূপ অসাধারণ, তাঁহার মেধা ও মনীষা যেরূপ অপরিমেয়, তাহাতে এইরূপ একটি বিরাট বিভাগের কর্ত্তৃত্ব-ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত না করিলে তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতা পরিস্ফুট হইবার সুযোগই পাইবে না। সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশ বলিতে—বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা বুঝা যাইত। তখন বিহার ও উড়িষ্যাও বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি এই পদে সাত বৎসর কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সাত বৎসরে তিনি রেজিষ্ট্রেশন-বিভাগের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন; তাঁহার সময়ে এই বিভাগের এমন অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে, সেইগুলি কখনও আশা করাও যায় নাই। স্যর জন উডবরণের শাসন-সময়ে একবার এবং অস্থায়ী ছোট লাট বোর্ডিলন সাহেবের সময়ে একবার—এই দুইবার তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। রেজিষ্ট্রেশন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে পূর্ব্বে বেতন দেওয়া হইত না, কমিশনে পারিশ্রমিক দেওয়া হইত। তারিণীকুমার এই পদ্ধতি উঠাইয়া বেতনের ব্যবস্থা করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি এই বিভাগকে একেবারে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে বিপুল পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি সুন্দর ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। তাঁহার যুক্তিসমূহ ছিল অকাট্য, ইহার উপর তাঁহার ইংরেজী রচনাশক্তিও ছিল অসাধারণ। তাঁহার যুক্তিতর্কপূর্ণ অভিমত পাঠ করিয়া বড় বড় সিবিলিয়ান তাঁহার মতানুগামী হইয়া পড়িতেন। এইজন্যই তিনি রেজিষ্ট্রেশন-বিভাগের এরূপ আমূল সংস্কার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিভাগে তিনি আরও যে সকল সংস্কার-সাধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সকলগুলি গবর্মেণ্ট গ্রহণ

করেন নাই; করিলে এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণের বেতন ও মর্য্যাদা এবং অন্যান্য সুবিধা-সুযোগ আরও অধিক হইত। তিনি সব-রেজিষ্ট্রারদের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর বেতন মাসিক ১০০৲ টাকা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যদি সে অনুরোধ পালিত হইত, তাহা হইলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সংস্কারের সময়ে সব-রেজিষ্টারদের সর্ব্বনিম্ন বেতন ১৫০৲ টাকা হইতে পারিত। তারিণীকুমারের সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বে রেজিষ্টারিং অফিসারদিগকে "রুর‍্যাল সব-রেজিষ্ট্রার" আখ্যা দেওয়া হইত। ইহা অত্যন্ত পার্থক্য ও অমর্য্যাদা-জ্ঞাপক বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। তিনি গবর্মেণ্টকে বলিলেন—এই অপমানজনক পার্থক্য উঠাইয়া দেওয়া উচিত। গবর্মেণ্ট তাঁহার এই কথা রাখিয়াছিলেন এবং "রুর‍্যাল" এই শব্দটি এখন আর সব-রেজিষ্ট্রারগণের নামের সহিত যুক্ত থাকে না।

অন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল তিনি যোগ্যতার সহিত গবর্মেণ্টের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে গবর্মেণ্ট এইজন্য তাঁহাকে বিশিষ্ট বৃত্তি (special pension) প্রদান করেন। দুঃখের বিষয়, অবসর-গ্রহণের পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; এইজন্য তিনি মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার-পদ ও শিয়ালদহ আদালতের অবৈতনিক বিচারকের পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যেমন বড় বড় মনীষী বাঙ্গালী বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তারিণীকুমারও সেইরূপ বহুমূত্ররোগাক্রান্ত হইয়াই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তারিখে জ্বরবিকারে তারিণীকুমার ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৬২ বৎসর হইয়াছিল।

তাঁহার চারি পুত্র; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের জনৈক অফিসার এবং সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি।

ডাক্তার প্রাণধন বসু

কলিকাতা সহরের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ ডাক্তার প্রাণধন বসু মহাশয় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত আগড়পাড়া গ্রামে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব গুরুচরণ বসু মহাশয় বাগবাজারের বসু-বংশের সন্তান ছিলেন। তিনি পুণ্যস্মৃতি ডেভিড হেয়ার সাহেব কর্ত্তৃক স্থাপিত স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি গবর্মেণ্ট-সাহায্য-কৃত আগরপাড়া সি-এম-এস স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। এই পদে তিনি ৬০ বৎসরের উপর কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় শত বৎসর বয়সে গুরুচরণ বসু মহাশয় পরলোক গমন করেন।

শ্রীযুক্ত প্রাণধন বসু আগরপাড়া স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। আরও তিনি এই পরীক্ষায় গবর্মেণ্টের বৃত্তি পাইয়া দুই বৎসর কাল কলিকাতা ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে বিনাবেতনে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে পরীক্ষা দিয়া ২০৲ বৃত্তি পান। এই কলেজ তখন সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রাণধন বসু মহাশয়কে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

অতঃপর তিনি এই কলেজে হইতে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দেন ও পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবার বৃত্তি-সহ কলিকাতা

মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। মেডিক্যাল কলেজ হইতে তিনি এম-বি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন।

তাঁহার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, প্রাণধনবাবু কলিকাতা সহরেই স্বাধীনভাবে ডাক্তারী করেন; চাকুরী-গ্রহণের তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারীতে ব্রতী হইবার প্রারম্ভেই কলিকাতায় ব্যবসায় আরম্ভ করা তিনি সবিশেষ দুষ্কর বলিয়া মনে করেন। কারণ, কলিকাতা সহরে তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ বহু ডাক্তার বিদ্যমান ছিলেন; তাঁহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। এইগুলি ভিন্ন আরও একটী বিশিষ্ট অন্তরায়ও ছিল; তাহা হইতেছে শ্রীযুক্ত প্রাণধন বসু খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী। যদিও তাঁহার পিতৃদেব যাহাতে তিনি হাস্যকররূপে সাহেব সাজেন এরূপ শিক্ষা প্রদান করেন নাই এবং তাহার ফলে যদিও তিনি দেশীয় আচার-ব্যবহারেরই অনুসরণকারী ছিলেন, তথাপি তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, হিন্দুরা তাঁহাকে আহ্বান করিবেন না। সে সময়ে প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে কঠোর রক্ষণশীলতা অবলম্বিত হইত এবং খৃষ্টানগণকে তাঁহারা অস্পৃশ্য-পর্য্যায়-ভুক্ত মনে করিতেন। যাহা হউক, ডাক্তার প্রাণধন বসু মহাশয় আপনার অকপট ও মধুর ব্যবহারে এবং সুচিকিৎসার গুণে ক্রমে ক্রমে কলিকাতা সহরে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন এবং ধীরে ধীরে সকল বাধাই অপসারিত হইয়া যায়। রোগী রোগমুক্ত হইলে তিনি বিমল আনন্দ লাভ করিতেন এবং মনে করিতেন—ইহাই তাঁহার উচ্চ পুরস্কার হইল। রোগীর রোগমুক্তির নিকট আর্থিক লাভকে তিনি তুচ্ছ মনে করিতেন। লোকে তাঁহার অকপট ব্যবহার ও বিনয়-নম্র আচরণ এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্য দেখিয়া ক্রমেই তাঁহার পক্ষপাতী ও অনুরাগী হইতে লাগিল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ডাক্তারীতে তাঁহার

প্রসার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাঁহার পসার এমন বাড়িয়া উঠিল যে, তাহা সহরে অন্যান্য প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের সমতুল্য হইয়া পড়িল।

ডাক্তার প্রাণধন বসু বাল্যকালে তোত্‌লা ছিলেন, এমন কি, স্কুলেও তাঁহার এই তোত্‌লামি ছিল। এইজন্য মূক ও বধিরগণের প্রতি তিনি স্বভাবতই সহানুভূতি-পরায়ণ ছিলেন সম্ভবতঃ এইজন্যই তিনি কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের (Calcutta Deaf and Dumb School) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কেবল সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিলে চলিবে না, তিনি উহার অন্যতম পরিচালক ও হিতৈষী ছিলেন। প্রায় ২০ বৎসরের উপর কাল তিনি এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক ও অবৈতনিক চিকিৎসক ছিলেন। এক্ষণে মূক-বধির বিদ্যালয়ের যে সমুন্নত অবস্থা হইয়াছে তাহার মূলে ডাক্তার প্রাণধন বসুর বিপুল কর্ম্মশক্তি বিদ্যমান। তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সুযোগ্য শিক্ষক স্বর্গীয় যামিনী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একযোগে বিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন এবং উহাকে বর্ত্তমান সমুন্নত অবস্থায় আনয়ন করেন।

কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লবের (The Calcutta Medical Club) যে দশজন প্রতিষ্ঠাতৃ-সদস্য (Foundation-members) আছেন, ডাক্তার প্রাণধন বসু তাঁহাদের অন্যতম। বার্দ্ধক্যজনিত অক্ষমতায় অবসর-গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই ক্লাবের অবৈতনিক সেক্রেটারী ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রতি সম্মান-জ্ঞাপনের জন্য তাঁহাকে এই ক্লাবের অনারারী মেম্বার বা সম্মানভাজন সদস্যশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

ডাক্তার প্রাণধন বসু গবর্মেণ্টের অধীনে কখনও কর্ম্ম করেন নাই। তথাপি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কংগ্রেসের

যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য গবর্মেণ্ট তাঁহাকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে একাধিক বিশিষ্ট কমিটী-ভুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি "কলিকাতা সহরে শিশুদিগের স্কার্ভি (Infantile Scurvy) বা রোগ" সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা এই কংগ্রেসে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল; অতঃপর এই প্রবন্ধটী "Brathwaite's Half Yearly Retrospect of Medicine" নামক পুস্তকখণ্ডে সাদরে প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে স্বাস্থ্যনীতির (Hygiene) পরীক্ষক হইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন। একাধিক্রমে সাত বৎসর কাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যনীতির পরীক্ষক ছিলেন।

ডাক্তার প্রাণধন বসু প্রসিদ্ধ রামবাগান দত্ত-পরিবারের স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রখ্যাতনামা বাবু রসময় দত্ত এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ডাক্তার প্রাণধন বসুর দুই পুত্র; একজনের নাম শ্রীযুক্ত প্রফুল্লধন বসু; ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট এবং অপরের নাম শ্রীযুক্ত বিমলধন; ইনি শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী।

স্বর্গীয় জয়নারায়ণ মিত্র

স্বর্গীয় জয়নারায়ণ মিত্র কলিকাতার কায়স্থ সমাজে 'জয় মিত্র' নামে সুপরিচিত। তিনি স্বর্গগত রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। এই রামচন্দ্র কলিকাতা সহরে বহুকাল জাহাজের কাপ্তেনের বেনিয়ন ছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে তাঁহার প্রভূত দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছিল। যে সকল ইউরোপীয় জাহাজের কাপ্তেন জাহাজের সহিত কলিকাতায় বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করিতেন, তাঁহাদের সহিত রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। তিনি মৃত্যুকালে কলিকাতা সহরে বিপুল ভূসম্পত্তি ও প্রচুর অর্থ রাখিয়া যান। তাঁহার একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ মিত্র এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

কলিকাতার অভিজাত-সম্প্রদায়ে তিনি উদারহৃদয়, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁহার তেমন সুশিক্ষা ছিল না। তাই বলিয়া তিনি যে বৈষয়িক কাজ-কর্ম্ম বুঝিতেন না, এরূপ কেহ মনে করিবেন না। বৈষয়িক কাজ-কর্ম্ম তিনি বেশ ভাল রকমেই বুঝিতেন এবং সম্পত্তি-পরিচালন কার্য্যে তাঁহার দক্ষতাও ছিল।

জয় মিত্র মহাশয় ধর্ম্মপরায়ণ আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। তাঁহার সুবৃহৎ বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। বরাহনগর কুঠীঘাটে ভাগীরথীকুলে তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শিবমন্দিরসহ কালীমন্দির আজিও বিদ্যমান। জনসাধারণের নিকট ইহা "জয় মিত্রের কালীবাড়ী" নামে পরিচিত।

স্বর্গীয় জয়নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের তিন পুত্র। তাঁহাদের নাম—ভুবনমোহন মিত্র, পঞ্চানন মিত্র, ও ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র।

পঞ্চাননবাবুর পুত্রগণের নাম—৺দেবেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ।

ক্ষীরোদবাবুর পুত্রগণের—কেদারনাথ, গোপীনাথ, শম্ভুনাথ ও লক্ষ্মী-নারায়ণ।

কেদারবাবুর পুত্রগণের নাম—গুরুনারায়ণ, কালীনারায়ণ, হরনারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ।

গোপীনাথ বাবুর পুত্রের নাম—কৃষ্ণনারায়ণ।

লক্ষ্মীনারায়ণবাবুর পুত্রের নাম—ইন্দ্রনারায়ণ।

স্বর্গীয় রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়

স্বর্গীয় রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়

জোড়াসাঁকো রাজবাটীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় সুপ্রসিদ্ধ পোস্তা-রাজবংশের বংশধর এবং এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় লক্ষ্মীকান্ত রায় মহাশয়ের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর এই বংশের কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন; মহারাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রাজনারায়ণ রায়; তাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয় রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়; রাজা দীনেন্দ্র-নারায়ণ রায় ইঁহারই একমাত্র পুত্র। সুতরাং রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ মহারাজা সুখময়ের জ্যেষ্ঠপুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমিক বংশধর। ইঁহাদের নামের একটি বৈশিষ্ট্য এই—নামের সহিত ইঁহারা নারায়ণ শব্দটি সংযুক্ত করিয়া রাখেন। পোস্তা-রাজবংশের জ্যেষ্ঠানুক্রমিক শাখার এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পোস্তা-রাজবংশ অত্যন্ত প্রাচীন। ইংরাজ বণিকেরা যখন তাঁহাদের হুগলীর কুঠী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, সেই সময়ে তাঁহারা ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী কালীকাটা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর এই তিনটী ক্ষুদ্র গ্রাম যেখানে অবস্থিত সেইখানে কুঠী স্থাপন করেন। তখন এই তিনটী গ্রাম একরূপ জলাভূমি ছিল বলিলেই হয়। সে সময়ে ইহাদের নামও অনেকে জানিত না। ইংরেজ বণিকেরা আসিয়া এইখানেই বস-বাস ও বন্দর স্থাপন করেন। যে সময়ে ইংরেজ বণিকেরা হুগলীতে থাকিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন সেই সময়ে বাণিজ্যসূত্রে তাঁহাদের সহিত কতকগুলি সুবর্ণবণিক মহাজনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরেজ বণিকদিগের মধ্যে শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, সাহস, ব্যবসায়-

বাণিজ্যে প্রতিশ্রুতি-রক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সন্দর্শন করিয়া তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজ কুঠীওয়ালা বণিকগণের সহিত উহাদের নূতন আবাসস্থান কলিকাতায় যাইলে ভবিষ্যতে তাঁহাদেরও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা ও বিপুল অর্থাগম হইবে। সুবর্ণবণিকগণ স্বভাবতই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী; তাহারা স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ইংরাজের চেষ্টায় শীঘ্রই এই তিনটী নগণ্য গ্রাম বিরাট বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইবে।

লক্ষ্মীকান্ত ধর

হুগলীর ইংরেজ কুঠীয়ালগণের সহিত যে সকল সুবর্ণবণিক মহাজন কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে **লক্ষ্মীকান্ত ধর** অন্যতম। সুবর্ণবণিক মহাজনগণের মধ্যে তখন ইনিই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। জনসাধারণের নিকট ইনি **নকু ধর** নামে পরিচিত ছিলেন। এই ধর-বংশের আদিনিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। পরে ইঁহাদের উপাধি 'রায়' হইয়া যায় এবং রায়-উপাধিকরূপেই ইঁহারা পরিচিত হন। এই লক্ষ্মীকান্তই কলিকাতাস্থ পোস্তা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বা আদিপুরুষ।

লক্ষ্মীকান্তের যেরূপ প্রভূত ধন-রত্ন ছিল, তেমনই তাঁহার দানও অপরিসীম ছিল। জগৎ শেঠ যেমন মুর্শিদাবাদের নবাবদিগকে টাকা জোগাইতেন ইনিও সেইরূপ শিশু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অগ্রিম টাকা দিয়া সাহায্য করিতেন। পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে যখন ইংরেজ বণিকদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, যখন ক্লাইভ অন্ধকূপ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, যখন ইংলণ্ড যাইতে হইলে প্রায় এক বৎসর সময় লাগিত এবং যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আর্থিক প্রতিপত্তি কিছুমাত্র ছিল না বলিলেই

হয়, সেই সময়ে স্বুবর্ণ বণিক মহাজন লক্ষ্মীকান্ত ধর মহাশয় স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া বুক ঠুকিয়া লর্ড ক্লাইবকে অর্থ সরবরাহ করিয়াছিলেন। প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময়েও তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নয় লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ধন্যবাদ-সহকারে সেই দান গ্রহণও করিয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। লক্ষ্মীকান্ত প্রত্যুপকার-লাভের আশায় যে ইংরেজ বণিকদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন ইহা নহে; তিনি উঁহাদের প্রতি অকপট অনুরাগ ও সৌহার্দ্দবশেই উঁহাদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ সরবরাহ করিতেন। এইজন্য যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তাঁহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করিতে উদ্যত হন, সেই সময়ে তিনি বলেন—আমি উহা গ্রহণ করিব না। কিন্তু যখন এই উপাধি তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা হইল, তখন তিনি বলিলেন,—এই উপাধি আমার দৌহিত্র শ্রীমান্ স্বুখময় রায়কে দেওয়া হউক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তদনুসারে তাঁহার দৌহিত্রকে মহারাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীকান্তের নিকট যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেবল অর্থ গ্রহণ করিতেন তাহা নহে, বিশ্বাসভাজন কর্ম্মী লোকের প্রয়োজন হইলেও তাঁহারা উঁহার নিকট যাইতেন। তিনিই নবকৃষ্ণকে লর্ড ক্লাইভের মুন্সী করিয়া দিয়াছিলেন। মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রথমে লক্ষ্মীকান্তেরই মুন্সী ছিলেন। এই নবকৃষ্ণ পরে বিপুল অর্থের অধীশ্বর হন ও রাজা উপাধি লাভ করেন। ইনিই শোভাবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যু হইলে সকল শ্রেণীর লোক দুঃখে অভিভূত হইয়াছিল এবং কোম্পানী একজন অকপট ও বিশ্বাসভাজন বন্ধু হারাইয়াছিলেন।

মহারাজা স্বুখময় রায় বাহাদুর

লক্ষ্মীকান্তের পুত্রসন্তান ছিল না; তাঁহার পার্ব্বতী নাম্নী একটী কন্যা

ছিল। ইনি যেমন গুণবতী তেমনই করুণহৃদয়া ছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত তাঁহাকে সুশিক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। পার্ব্বতীর স্বামীর নাম রঘুনাথ পাল। ইঁহাদের কয়েকটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু বিধাতার কৃপায় কেবল সুখময় রায়ই বাঁচিয়াছিলেন। ইনিই মাতামহ লক্ষ্মীকান্তের বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সুখময় রায় মাতামহের ইচ্ছায় 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। সুখময় মহারাজা হইলে তাঁহার মাতা লোকসমাজে 'মহারাজ-মাতা পার্ব্বতী দাসী' নামে পরিচিতা হন।

মহারাজ-মাতা পার্ব্বতী দাসী তাঁহার উইলে ৪০ হাজার ও ৩০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন। ৪০ হাজার টাকায় কাশীপুর গান ফাউণ্ড্রী ঘাট এবং তথা হইতে দমদমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল; ৩০ হাজার টাকা দেশীয় হাঁসপাতাল-সমূহে দেওয়া হইয়াছিল।

মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর দয়ার্দ্রহৃদয়, পরোপকারী, দীন-দুঃখীর দুঃখমোচনে মুক্তহস্ত ব্যক্তি ছিলেন। কাহারও দুঃখ-ক্লেশের সংবাদ শুনিলে তিনি অধীর হইয়া উঠিতেন। সকল প্রকার জনহিতকর সদনুষ্ঠানেই তিনি মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতেন। পুরীধাম হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ। সেকালে যখন রেল-ষ্টীমার ছিল না তখন বাঙ্গালা দেশ হইতে পুরীধামে যাইবার কোনও প্রশস্ত একটানা রাস্তা ছিল না। অথচ প্রতি বৎসরই বহু যাত্রী পুরীধামে তীর্থ করিতে যাইতেন। বাঙ্গালার ধর্ম্মপিপাসু নরনারীগণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তিনি বিপুল অর্থব্যয়ে 'জগন্নাথ রোড' নামক ২৮০ মাইল রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দেন। এই রাস্তা উলুবেড়িয়া হইতে পুরীর শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত দীর্ঘ। কেবল রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; পথের নানা স্থানে তিনি ইষ্টক-নির্ম্মিত ১৪টি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক ধর্ম্মশালাতে প্রায় ৫০০ যাত্রী বিশ্রাম করিতে

পারিত। প্রতি ধর্ম্মশালাতে পুষ্করিণী, প্রাঙ্গণ এবং ছায়া-শীতল বৃক্ষসকল ছিল। রাস্তা তৈয়ারী করিবার সময় অসংখ্য সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। কোনও কোনও সেতু নির্ম্মাণ করিতে বিপুল অর্থব্যয় হইয়াছিল। প্রত্যেক ধর্ম্মশালা ১০ হইতে ১৫ বিঘা জমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধর্ম্মশালা ব্যতীত বহুসংখ্যক ইন্দারা বা গভীর কূপও তিনি পথের ধারে প্রতি এক বা দুই ক্রোশ অন্তর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে এই রাস্তাটীর নাম হইয়াছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। একমাত্র বালেশ্বর জেলাতেই অন্ততঃ ৪০টী ইন্দারা ছিল। বালেশ্বরের ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর ঐগুলির সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি উইলে বহু অর্থ নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে দান করিয়া ছিলেন। তদ্ব্যতীত বৃন্দাবনধামে কুঞ্জে সমাগত অতিথিবৃন্দের সেবা ও জলযোগের জন্য ১৫ হাজার টাকা এবং সত্যবাদীতে শ্রীশ্রীগোপাল জীউর পূজার জন্যও ১৫ হাজার টাকা দান করিয়া যান।

যখন বেঙ্গল ব্যাঙ্ক (Bank of Bengal) স্থাপিত হয় তখন মহারাজা সুখময়ই উহার একমাত্র দেশীয় ডিরেক্টর ছিলেন।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারী মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর পরলোক গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র; প্রথম—রাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর; দ্বিতীয়—বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় তৃতীয়—বাবু বৈদ্যনাথ রায়; চতুর্থ—বাবু শিবনাথ রায়; এবং পঞ্চম—বাবু নরসিংচন্দ্র রায়।

রাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর

রাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাজা সুখময়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি হিজরী ১১৮৯ অব্দে অর্থাৎ ১৮১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে মহারাজা বাহাদুর উপাধি এবং ৪ হাজার পদাতিক ও ৪ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদ লাভ করেন। ইহা ব্যতীত বাদসাহ

তাঁহাকে ঝালর-দেওয়া পাল্‌কী ব্যবহার করিবারও অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহার পিতৃদেবের ন্যায় তিনি পরদুঃখকাতর, সকল প্রকার সৎকার্য্যে অর্থসাহায্যকারী এবং জনহিতব্রত ছিলেন। তিনি যখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গয়া এবং অন্যান্য স্থানে তীর্থযাত্রা করেন সেই সময়ে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহাকে একটি ছাড়পত্র (Passport) দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৪ জন সশস্ত্র অনুচর রাখিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে তারিখে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

রাজা রাজনারায়ণ রায়

মহারাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুরের পুত্র রাজনারায়ণ রায় রাজা উপাধি লাভ করেন নাই বটে, তথাপি শিষ্টাচার-হিসাবে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে রাজা সম্বোধন করিতেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৩শে এপ্রিল অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; এইজন্য রাজা উপাধি লাভ করিবার তাঁহার সময় ও সুযোগ ঘটে নাই।

তাঁহার পুত্র ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়েরও অকালমৃত্যু হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। জনসাধারণ ইঁহাকে রাজা সম্বোধন করিতেন।

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়

রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্রের নাম রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়। পিতামহ ও পিতার অকালমৃত্যুর জন্য তাঁহার বিষয়-সম্পত্তিতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। এই সকল বিশৃঙ্খলা হইতে সম্পত্তি যে উদ্ধার পাইবে এমন আশা নিতান্ত সামান্যই ছিল। রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ সুখৈশ্চর্য্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইলেও তিনি শ্রমশীল, অধ্যবসায়ী ও আত্মোন্নতিতে উৎসাহসম্পন্ন এবং উদ্যমপরায়ণ

ছিলেন। তিনি বিপুল পরিশ্রমে বিষয়-সম্পত্তিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে উন্মুক্ত করেন এবং সবিশেষ যত্ন ও কৃতিত্ব-সহকারে উহার প্রভূত উন্নতি-সাধনও করেন। তিনি বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন অমায়িকস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। ধনী বা দরিদ্র যিনিই তাঁহার নিকটে আসিতেন, তাঁহার বিনয়পূর্ণ ব্যবহার ও শিষ্টাচারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারিতেন না। একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিলে তাঁহার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষপাতী হইতেই হইত। তিনি শিষ্টাচার-সৌজন্য ও ভদ্রতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। বৈষ্ণবোচিত নম্রতা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। তাঁহার নিকট ধনী ও দরিদ্র উভয়ে তুল্য মর্য্যাদা ও ব্যবহার পাইতেন। তাঁহার শিষ্টাচার আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মত তিনিও বাহাড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না; পোষাক-পরিচ্ছদের জাঁক-জমক তিনি পছন্দ করিতেন না ; অথবা রাজা-রাজড়ার চাল-চলনও তাঁহার ছিল না। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তিনি রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না। গভীর ধর্ম্মভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। পূর্ব্বপুরুষের জনহিতকর সাধনা তাঁহাতেও বিকশিত হইয়াছিল। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাস্তা তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের হস্তে তিন খণ্ড জমি দান করেন ; দুই খণ্ড জমি গড়পাড় অঞ্চলে এবং এক খণ্ড জমি জোড়াসাঁকো-শিকদারপাড়ায়। প্রথম দুই খণ্ড জমি দান করিবার জন্য কর্পোরেশন দুইটি রাজপথ গড়পার অঞ্চলে তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন; একটীর নাম হইয়াছে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট ; অপরটির নাম হইয়াছে রাজা দীনেন্দ্র-নারায়ণের পিতামহের নামে—রাজা রাজনারায়ণ রায় ষ্ট্রীট। যে রাস্তাটী শিকদারপাড়া অঞ্চলে হইয়াছে উহার নাম হইয়াছে তদীয় পিতৃদেব—রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নামে। প্রথমোক্ত তিন খণ্ড জমির পরিমাণ দুই বিঘা সাত কাঠা; দান করিবার সময়ে ইহার মূল্য

২৭ হাজার টাকা স্থির হইয়াছিল। শিকদারপাড়ার ভূমিখণ্ডের মূল্য তখন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল প্রায় ৫ হাজার টাকা।

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। অবসর পাইলেই তিনি পুস্তক পাঠ করিতেন। তিনি স্বয়ং বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন এবং অপরকে বিদ্যাচর্চ্চায় উৎসাহও দিতেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, সাহিত্যানুশীলনও করিতেন; এইজন্য কতিপয় সাহিত্যিক তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং প্রায়ই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে "কুমার" উপাধি প্রদান করেন। নিম্নে আমরা ইহার সনদের অনুলিপি প্রদান করিলাম :—

SANAD

To

BABU DINENDRA NARAIN ROY

Honourary Magistrate and Municipal

Commissioner of Calcutta.

I hereby confer upon you the title of Kumar as a personal distinction.

(Sd.) LANSDOWNE

Viceroy and Governor-General of India.

Fort William,

The 3rd February, 1893.

রাজভক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার জনহিতকর সদনুষ্ঠানের জন্য গবর্মেণ্ট ১৯১৪ সালে তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। ইহার সনদের অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল :—

SANAD

To

KUMAR DINENDRA NARAIN ROY

Municipal Commissioner and Honourary

Presidency Magistrate, Calcutta.

I hereby confer upon you the title of Raja as a personal distinction.

(Sd.) HARDINGE OF PENHURST

Viceroy and Governor-General of India.

Delhi, the 1st January 1914.

Seal of the Governor-General of India in Council.

'সুবর্ণবণিক সমাজ' তাঁহার "রাজা"-উপাধি-প্রাপ্তি-উপলক্ষ্যে তাঁহাকে মানপত্র-দানে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

"রাজা" উপাধি প্রদান করিবার পূর্ব্বে কুমার দীনেন্দ্র-নারায়ণকে দিল্লী মহানগরীতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর অভিষেক-উপলক্ষে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক 'সার্টিফিকেট অফ অনার' বা মানপত্র প্রদান করা হয়। ইহার অনুলিপি নিম্নে প্রদান করা হইল :—

CERTIFICATE OF HONOUR.

•By command of His Excellency the Viceroy and Governor-General-in-Council, this certificate is presented in the name of His Most Gracious Majesty King George V., Emperor of India, on the occasion of His Majesty's Coronation Durbar at Delhi, to Kumar Denendra Narain Roy, son of Raja Brojendra Narain Roy in recognition of his public services as Honourary Presidency Magistrate, a Municipal Commissioner and President and Ex-officio Vice-Precident of the District Charitable Society.

(Sd) F. W. DUKE
Lieutenant-Governor of Bengal.

Dated, the 12th December 1911.

গবর্মেণ্টের নিকট রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণের প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল এবং নানারূপে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি রাজোপাধি লাভ করেন নাই, কেবল "কুমার" মাত্র, সেই সময়েও গবর্মেণ্ট তাঁহাকে অস্ত্র-আইন হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিলেন। তখন তিনজন সশস্ত্র প্রহরী রাখিবার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল; পরে "রাজা" হইলে তাঁহাকে ৮ জন সশস্ত্র প্রহরী রাখিবার অধিকার দেওয়া হয়।

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত কমিশনার এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উহার মনোনীত কমিশনার ছিলেন।

তিনি কয়েক বৎসর কর্পোরেশনের জেনারেল কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯০২ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতার পোর্ট কমিশনার ছিলেন। ১৮৮৬ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ বৎসর কাল তিনি অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য এবং উহার অন্যতম ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির উৎসাহশীল ও কর্ম্মপ্রবণ সদস্য এবং সুবর্ণবণিক চ্যারিটেবল এসোসিয়েসনের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর দেশীয় শাখার সদস্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহার অনারারী জয়েণ্ট সেক্রেটারী ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ইহার অনারারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহার প্রেসিডেণ্ট এবং ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর এক্স-অফিসিও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে গবর্মেণ্ট প্রাসাদে যে দরবার অনুষ্ঠিত হয় তদুপলক্ষে রাজা উপাধির সনন্দ দান করিবার সময়ে বাঙ্গালার তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল রাজা দীনেন্দ্র-নারায়ণ রায়কে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন নিম্নে আমরা তাহার মর্ম্ম প্রদান করিলাম :—

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়! আপনি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ও সম্মানের দ্যোতক-হিসাবে যে "রাজা" উপাধি লাভ করিয়াছেন সেইজন্য আমি আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি এক অতি প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি এবং মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের প্রত্যক্ষ বংশধর। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজানুগত্য ও জনসেবার জন্য আপনাকে 'কুমার' উপাধিধানে বিশিষ্টভাবে সম্মানিত করা হইয়াছিল।

আপনি বহু বৎসর ধরিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত সদস্যরূপে চেয়ারম্যানগণের, আপনার কর্পোরেশন-স্থিত সতীর্থগণের এবং কলিকাতার করদাতৃগণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। কর্পোরেশন আপনাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া আপনার উপর তাঁহাদের যে বিশ্বাস আছে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া জনহিতকর কর্ম্মে ব্রতী থাকুন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয় এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর—১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে মান্যবর মিষ্টার পি সি লায়নের সভাপতিত্বে এক শোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় গৃহীত প্রস্তাব-অনুসারে স্বর্গগত রাজার স্মৃতি-চিহ্ন-স্থাপনের এবং তাঁহার নামে সহরের দীন-দরিদ্রগণের দুঃখ-মোচনের জন্য একটী অর্থ ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। সেই অর্থে কলিকাতা টাউন হলে রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণের অর্দ্ধ মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট স্যর ইভান্স কটন এই মর্ম্মর-মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন। মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়াছিল তাহা ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর ভারতীয় শাখার কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে দরিদ্রগণের দুঃখ-মোচনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণের মর্ম্মর-মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিবার সময়ে স্যর ইভান্স কটন যে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষের মর্ম্ম আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদান করিলাম :—

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়; সে সময়ে তিনি দেশ-সেবার কার্য্যে পূর্ণভাবে প্রবৃত্ত। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত সদস্য ছিলেন; ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমি কর্পোরেশনে তাঁহার সতীর্থ ছিলাম। তাঁহাকে আমার বেশ মনে আছে। তিনি শিষ্টাচার ও অমায়িক ব্যবহারের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। এজন্য তাঁহার শত্রু কেহ ছিল না। তিনি যেভাবে জনসাধারণের সেবা করিতেন তাহাতে কোনও ত্রুটি থাকিত না, কারণ মন-প্রাণ ঢালিয়া তিনি সেই কার্য্য করিতেন। ১৬ বৎসরের পর আমি এদেশে আবার আসিয়াছি; আমার অনেক পুরাতন বন্ধুকে আমি আবার দেখিতে পাইয়াছি—এজন্য আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি, কিন্তু আমি অকপটভাবেই স্বীকার করিতেছি যে, রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণের সুমিষ্ট সম্ভাষণ ও আলাপ হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি বিশেষভাবে দুঃখ-বোধ করিতেছি। আমার পূজনীয় পিতৃদেব রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণকে প্রভূত শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান আমারও যথেষ্ট রহিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার মর্ম্মর-মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হওয়ায় আমি ইহাতে গৌরব বোধ করিতেছি।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়

রাজা দীনেন্দ্রনারারণ রায়ের একমাত্র পুত্র কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছেন। পিতার ন্যায় ইনিও শিষ্টাচার ও বিনয়ের অবতার। ইনি মিষ্টভাষী, অমায়িকস্বভাব এবং সকলের সহিতই ইনি মধুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইঁহার ভদ্র ও বিনম্র আচরণ সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন

করিয়াছে। সুতরাং পিতার 'রাজা উপাধি-লাভের পরেই গবর্মেণ্ট যে ইঁহাকে 'কুমার' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন তাহাতে বলিতে হয়, যোগ্য ব্যক্তিকেই গবর্মেণ্ট সম্মানিত করিয়াছেন। কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ শ্রমশীল এবং নানারূপ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর ভারতীয় শাখার সদস্য ; ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত তিনি ইহার অনারারী জয়েণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন, ১৯২৩ হইতে অদ্যাবধি তিনি ইহার অনারারী সেক্রেটারী বা কর্ম্ম-সচিব-পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর সদস্যপদে নিযুক্ত আছেন। এই দরিদ্রহিতকর প্রতিষ্ঠানটীর সহিত তিনি বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট এবং দরিদ্রগণের দুঃখমোচনকল্পে তিনি যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করেন। এই প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতি-সাধনের অর্থ - প্রকৃষ্টভাবে দরিদ্রজনগণের সেবা করা। কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ এই মহৎ কার্য্যকেই বিপুলভাবে তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ মনে করিয়া থাকেন। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর ভারতীয় শাখার হস্তে ১০,৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য,—এই টাকায় তাঁহার নামে একটী স্থায়ী অর্থ-ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হইবে এবং তাহা হইতে দীন-দরিদ্রগণের দুঃখ-মোচনে সহায়তা করা হইবে।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ অনাথ আশ্রমের (Orphanage) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য, অন্ধবিদ্যালয় এবং মূক ও বধির বিদ্যালয়ের সদস্য। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য রহিয়াছেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি এই এসোসিয়েসনের অনারারী ট্রেজারার বা কোষাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ইণ্ডিয়া ক্লাবের আজীবন সদস্য এবং হিন্দু স্কুলের কার্য্য-পরিচালক-সমিতির সদস্য। তিনি ১৯১০
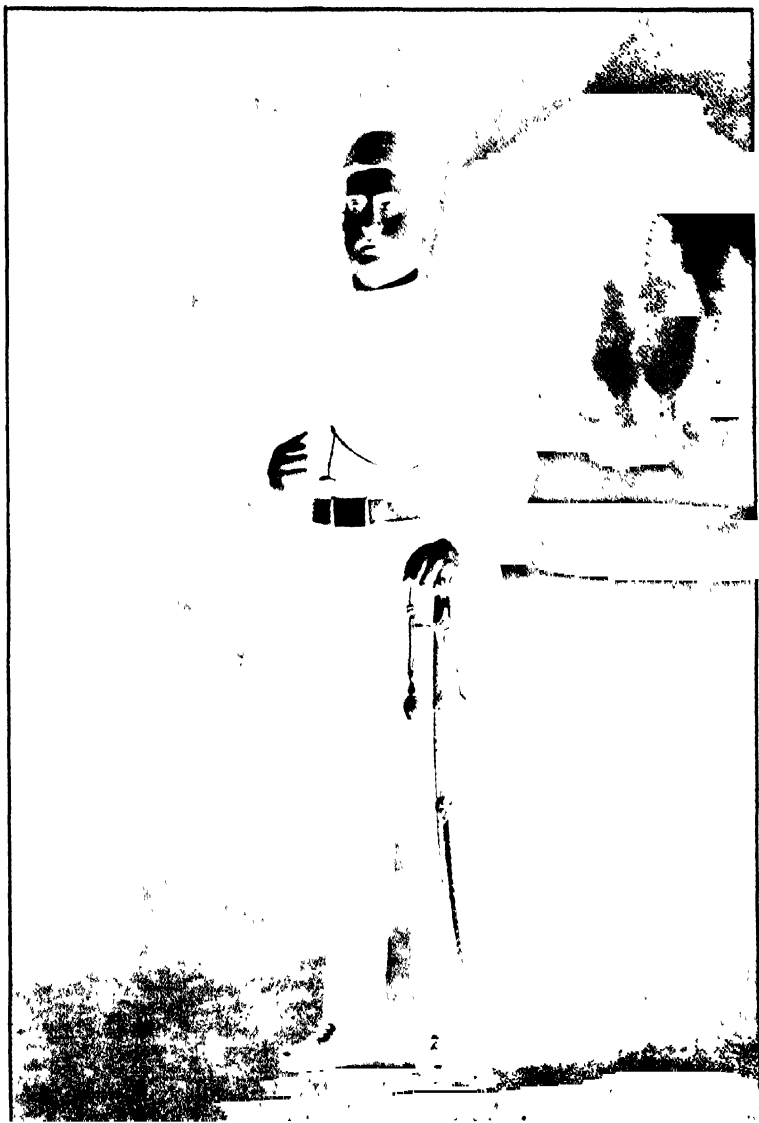
কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়

খৃষ্টাব্দ হইতে শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তাঁহার বহু জনহিতকর কর্ম্মের মধ্যে এই কয়েকটী মাত্রের উল্লেখ করা হইল।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতার আরপুলি লেনের স্বর্গীয় মণিমোহন দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। কুমার রাজেন্দ্র-নারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ বড়বাজার-আমড়াতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ধরের সহিত হইয়াছে।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের ছয় পুত্র; প্রথম—শৈলেন্দ্রনারায়ণ; দ্বিতীয়—বীরেন্দ্রনারায়ণ; তৃতীয়—ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ; চতুর্থ—সুরেন্দ্রনারায়ণ; পঞ্চম—জিতেন্দ্রনারায়ণ এবং ষষ্ঠ—আদিত্যনারায়ণ। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই পিতৃ-আদর্শে গঠিত এবং সকলেই শিষ্টাচার-সম্পন্ন ও অমায়িকস্বভাব। উঁহারা সকলেই বাহ্যাড়ম্বরের বিরোধী এবং বিদ্যাচর্চায় উৎসাহশীল ও মনোযোগী। সাধারণতঃ বড়লোকদের বাড়ীর ছেলেরা যেরূপ পড়াশুনায় বিমুখ ও অলস হয়, কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্রগণ সেরূপ নহেন; তাঁহারা সকলেই উৎসাহ ও শ্রমসহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।

শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায় কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট; এক্ষণে এম-এ ও আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। দানবীর স্বর্গীয় মতিলাল শীল-বংশীয় রামকৃষ্ণপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত চুনীলাল শীলের কন্যার সহিত শৈলেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন।

বংশ-লতা
লক্ষ্মীকান্ত ধর
মহারাজ-মাতা পার্ব্বতী দাসী (কন্যা) [স্বামী রঘুনাথ পাল]
মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর
মহারাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
(নিঃসন্তান)
রাজা বৈদ্যনাথ
রাজা শিবচন্দ্র
(নিঃসন্তান)
রাজা নরসিংচন্দ্র
রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়
রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়
কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়
শৈলেন্দ্রনারায়ণ
বীরেন্দ্রনারায়ণ
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ
সুরেন্দ্রনারায়ণ
জিতেন্দ্রনারায়ণ
আদিত্যনারায়ণ
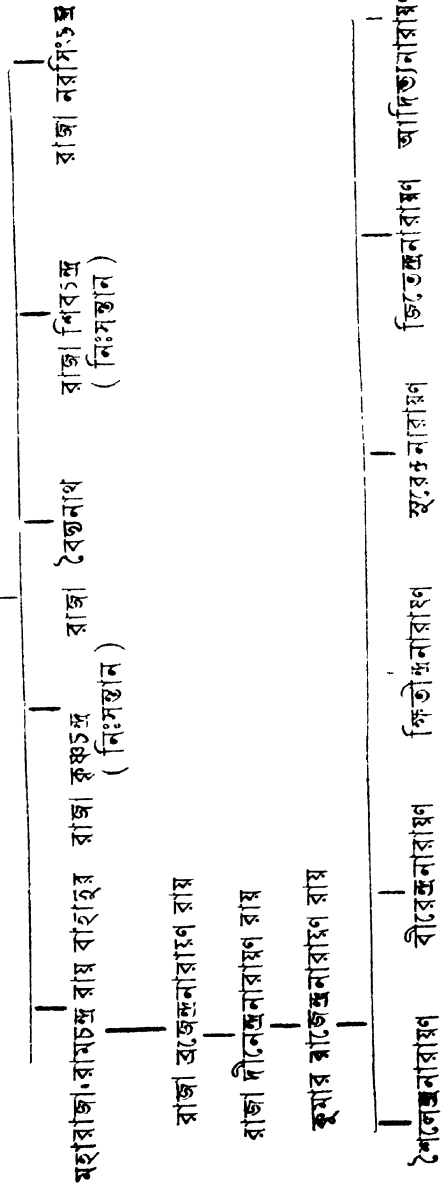
রায় স্বর্গীয় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর

যশোহর জেলার কেশবপুর থানার অন্তর্গত বিদ্যানন্দকাঠি গ্রাম দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ ঘোষ বংশের বাসভূমি। বাঙ্গালা দেশে ইঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে, ধন-মানে এবং শিষ্টাচার-সৌজন্যে চিরপ্রসিদ্ধ। রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এই প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন চারি পুরুষ এই গ্রামেই বাস করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের নামের তালিকা পর পর দেওয়া হইল :—

রামনারায়ণ ঘোষ
|
রামকানাই ঘোষ
|
ভগবানচন্দ্র ঘোষ
|
উমেশচন্দ্র ঘোষ
|
দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
(জন্ম ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, সেপ্টেম্বর মাস)
|

চারুচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারী)	ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ডিসেম্বর)
রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, হীরেন্দ্র	

এই গ্রামেই দেবেন্দ্রচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের ভূসম্পত্তি ছিল এবং এখনও আছে। কায়স্থ-সমাজে ইঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সম্মানও যথেষ্ট। দেবেন্দ্রচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এক সময়ে ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে ইনকাম ট্যাক্স আইন অনুসারে তিনি পরে খুলনার ইনকাম ট্যাক্স-এসেসরের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় খুলনা যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক ইনি নলডাঙ্গা রাজ-সম্পত্তির ম্যানেজার বা অধ্যক্ষ এবং পরে যশোহরের আর একটী রাজ-সম্পত্তির ম্যানেজার বা কর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই সকল গুরু-দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য অশেষ সুখ্যাতি ও যোগ্যতার সহিত ইনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান এবং সমাজহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লোকান্তর গমন করেন।

ইংরাজী ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ২৮শে তারিখে দেবেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয়। ষোল বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি যশোহর জেলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ইনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি এবং এখান হইতে বি-এ, বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইনি ভবানীপুরে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং হাইকোর্টের উকিল-শ্রেণীভুক্ত হন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত ইনি হাইকোর্টেই ছিলেন। পরে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইনি চব্বিশ পরগণার সদর আলিপুর জেলা-আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এখানে অল্পদিনের মধ্যেই দেওয়ানী মামলা-পরিচালনে ইঁহার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। জনসাধারণ এবং আদালতের বিচারকগণ তাঁহার ক্ষমতা ও যোগ্যতা বুঝিতে পারেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর আদালতের

তদানীন্তন সরকারী উকিল খিদিরপুর-নিবাসী বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় এবং সেই বৎসর বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আলিপুরের উকিল-সরকার নিযুক্ত করেন। এই সময় ওকালতিতে তাঁহার প্রভূত আয় ছিল। একবার জেলা-জজের আদালতে এক মামলার বিচারের সময় প্রতিপক্ষের একজন বড়দরের কৌঁসুলী প্রকাশ্যভাবে বলেন যে, বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের আয় হাইকোর্টের একজন জজের বেতনের সমতুল্য।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রচন্দ্র বুঝিলেন,—তাঁহার অর্থ-উপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়াছে। এ সময়ও তাঁহার যথেষ্ট আয় ছিল, টাকা তাঁহার নিকট চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিত, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার সঙ্কল্পের বিচ্যুতি ঘটিত না। তিনি উপার্জ্জনের দিকে আর মোটেই লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহার লক্ষ্য হইল এখন দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণ-সাধনের দিকে। এইরূপে স্থিরসঙ্কল্প দেবেন্দ্র-চন্দ্র আলিপুর আদালত হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং সেই দিনই উকিল-সরকারী কার্য্যেও ইস্তফা দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেদিন তিনি উপার্জ্জনের মায়া ত্যাগ করিলেন সেইদিনই তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হইলেন। পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলের কর-দাতৃগণ তাঁহাকে তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ মিউনিসিপ্যালিটীতে পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি চেতলার করদাতৃগণ কর্ত্তৃক কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার নির্ব্বাচিত হন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ নববর্ষের উপাধি-তালিকায় গবর্ণমেণ্ট দেবেন্দ্রচন্দ্রকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্রকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেন। তদবধি তিনি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার

অতিরিক্ত সদস্যরূপে কর্ত্তব্য পালন করিতেন। ব্যবস্থাপক সভায় তাহার স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন বিপ্লববাদ দমনের জন্য গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত নূতন বিধি-ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছিলেন, তেমনই অপরদিকে এই শ্রেণীর আইনের প্রয়োগে যাহাতে নিরপরাধ লোকের উপর অবিচার না হয় বা তাহাদের কোন ক্ষতি না হয় এবং এই আইনের আমলে আসিয়া যাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার নষ্ট হইয়াছে তাহাদের উপর নিগ্রহ বা দুর্ব্ব্যবহার না হয় তাহাও গভর্ণমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই।

তিনি স্বায়ত্তশাসন, সমাজ-সংস্কার এবং দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধায়ক সকল প্রস্তাবেরই সমর্থন করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রচন্দ্রেরা তিন সহোদর; অন্য দুই ভ্রাতার নাম—বীরেন্দ্রচন্দ্র ও উমেশচন্দ্র। ইঁহার ভগিনীর সহিত স্বর্গীয় রামদুলাল সরকারের পৌত্র স্বর্গীয় অনাথনাথ দেবের বিবাহ হয়।

দেবেন্দ্রচন্দ্রের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ এবং কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। চারুচন্দ্র ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তিনি অস্থায়ীভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবিধ সদ্গুণের জন্য মহামান্য গভর্ণমেণ্ট চারুচন্দ্রকে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে "নাইট" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন।

স্যর চারুচন্দ্র স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র বসুর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

স্যর চারুচন্দ্রের চারি পুত্র। প্রথম পুত্রের নাম রবীন্দ্র, ইনি ব্যারিষ্টার; দ্বিতীয় পুত্রের নাম দ্বিজেন্দ্র, ইনিও ব্যারিষ্টার; তৃতীয়ের নাম সত্যেন্দ্র, ইনি বিলাত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার; চতুর্থের নাম

হীরেন্দ্র, ইনি বি এস সি পাশ করিয়া ব্যাঙ্কে শিক্ষানবীশ আছেন।

রবীন্দ্রচন্দ্র ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন; দ্বিজেন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে স্বর্গীয় স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্রের কন্যার সহিত এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল মিষ্টার এ কে রায়ের একমাত্র কন্যাকে সত্যেন্দ্রচন্দ্র বিবাহ করিয়াছেন।

স্যর চারুচন্দ্রের প্রথমা কন্যার বিবাহ হইয়াছে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব সেরিফ স্বর্গীয় ডাক্তার চুণীলাল বসু সি. আই. ই. মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসু ব্যারিষ্টারের সহিত এবং কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্রের সহিত; ইনি বিলাত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার।

কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ; কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার বা কৌসুলী। এক্ষণে ইনি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাইবুন্যালের প্রধান বিচারপতি। ইঁহার ৫ পুত্র ও ২ কন্যা।

সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা দেবেন্দ্রচন্দ্রের অস্থি মজ্জার সহিত জড়িত ছিল। বাল্যবিবাহ-প্রথা যাহাতে সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, অল্পবয়স্কা বিধবাদের যাহাতে পুনর্ব্বিবাহ হয় সে পক্ষে দেবেন্দ্রচন্দ্রের আন্তরিক চেষ্টা ছিল এবং কেবল মুখে আদর্শের কথা তুলিয়া নহে, সে আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিয়া তাঁহার মনোবলের ও সৎসাহসের পরিচয়ও তিনি দিয়াছিলেন। কথায় ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন, এমন লোক আমাদের সমাজে কেন, সকল সমাজেই বিরল। রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র কথায় ও কার্য্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছিলেন। তিনি মনে প্রাণে যাহা সমাজের কল্যাণকর বিবেচনা করিতেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

সমাজে এইরূপ সত্যসন্ধ, আত্মবিশ্বাসী, নির্ভীক ও তেজস্বী

লোকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, সমাজের কল্যাণের পথ ততই অধিক পরিমাণে উন্মুক্ত হইবে।

তিনি ধনে মানে যশে এবং বিদ্যা-বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতিকে পূজা করিতে হয় তাঁহার সত্যনিষ্ঠার জন্য. তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার জন্য, তাঁহার সৎসাহসের জন্য, তাঁহার আন্তরিকতার জন্য এবং শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বিবেক-প্রণোদিত হইয়া পাপ ও অমঙ্গলের বিরুদ্ধে তাঁহার দণ্ডায়মান হইবার শক্তির জন্য।

রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর শিমলা শৈলে ৭৫ বর্ষ বয়সে পরলোক গমন করেন।

স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ সেন

স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ সেন

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল স্বদেশপ্রাণ হেমেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার এলাকা-ভুক্ত আলমপুর গ্রামে ইংরেজী ১৮৬৩ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। আলমপুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ; কিন্তু তাহা হইলেও ইহার বৈশিষ্ট্য আছে। আলমপুরের পার্শ্বে একটী বিল ; এই বিলের অপর পারে শ্রীচৈতন্যের পুণ্য-স্মৃতিপূত শ্রীখণ্ড। বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীখণ্ড অঞ্চলের বৈদ্যগণ অমর হইয়া আছেন। হেমেন্দ্রনাথ আলমপুরের বরাট-উপাধিক বৈদ্য-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারাই এখন এই গ্রামের গৌরব।

হেমেন্দ্রনাথের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের নাম করিতে হয়। বৈকুণ্ঠনাথ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন সংসারে আর অভাব-অনটন ছিল না। অগ্রজ বৈকুণ্ঠনাথ তখন কৃতী ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠিতেছেন। হেমেন্দ্রনাথ প্রথমে বহরমপুরে অগ্রজের নিকট থাকিয়া পাঠাভ্যাস করেন, তৎপরে অধ্যয়নার্থ কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় পটলডাঙ্গা অঞ্চলের একটি বাসায় থাকিয়া তিনি কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বহরমপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং তথায় তদীয় অগ্রজ বৈকুণ্ঠনাথের নিকট থাকিয়া ওকালতীতে শিক্ষানবীশী করেন। অল্পদিন পরেই ওকালতীতে হেমেন্দ্রনাথ পারদর্শিতার পরিচয় দেন এবং অর্থার্জ্জন করিতে থাকেন। বহরমপুরে বার বৎসর ওকালতী

করিয়া হেমেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি যখন হাইকোর্টে ওকালতী করিতে ব্রতী হন, সেই সময়ে তাঁহার কয়েক জন সতীর্থ কলিকাতা হাইকোর্টে উকীলরূপে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার সেই সকল সতীর্থের মধ্যে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং জে-সি দত্ত এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য।

হাইকোর্টে আসিয়া হেমেন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং তাঁহার কৃতিত্ব ও সুযশঃ ফুটিয়া উঠে। ইহার উপর হেমেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ছিল সাত্ত্বিক; অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য তাঁহার একেবারেই ছিল না। তিনি বিনয়ী, শিষ্টাচার-সম্পন্ন এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। চরিত্রের দৃঢ়তা ও স্বভাবের কোমলতা এই দুইটীর মধুর সামঞ্জস্য তাঁহাতে প্রকট হইয়াছিল। এইসকল গুণে তিনি এত শীঘ্র তাঁহার সতীর্থগণের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে উকিল লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী-পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

এখনকার অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি জীবনে সাফল্য লাভ করিয়া—প্রাচুর্য্যের অধিকারী হইয়া সহর বা নগরে বসবাস স্থাপন করিয়া উহাকে ষোল আনা সজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হন এবং আপনাদের জন্মস্থান—পল্লীভূমিকে একেবারে বিস্মৃত হন। বৈকুণ্ঠনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ দুই ভ্রাতা ইহার বিপরীত ছিলেন। উপার্জ্জনের অনুরোধে তাঁহারা কর্ম্মস্থলে অবস্থান করিতেন বটে কিন্তু তাঁহাদের পল্লীভূমিকে শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহারা আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আলমপুরের অধিবাসীদিগের জন্য তাঁহারা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেবালয় স্থাপন করিয়াছেন, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠনাথ যেমন বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তেমনই সেই অর্থের সদ্ব্যয়ও তিনি করিয়া গিয়াছেন। পল্লীভূমির শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন।

আলমপুর সূতিকাগার

বৈকুণ্ঠনাথের গৌরব—অর্থের সদ্ব্যয়ে। হেমেন্দ্রনাথ সর্ব্বতোভাবে অগ্রজ বৈকুণ্ঠনাথের এই মহৎ আদর্শের অনুসরণ করিতেন। গ্রামের প্রতি হেমেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ অনুরাগ ছিল। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীশারদীয় পূজার সময়ে তিনি সপরিবারে আলমপুরে যাইতেন এবং গ্রামবাসীদিগের সহিত পূজার উৎসব ও আনন্দ উপভোগ করিতেন। সেই সময়ে গ্রামের বহু দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে তিনি বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন। গ্রামের যাত্রা, কবি, কথকতা প্রভৃতির তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইসকল বিষয়ে তিনি তাঁহার অগ্রজ বৈকুণ্ঠনাথের সবিশেষ সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন।

হেমেন্দ্রনাথ বলিতেন - বৈদ্য বঙ্গদেশের অন্যতম প্রধান জাতি। বৈদ্যজাতিকে "বৈদ্য ব্রাহ্মণে" পরিণত কবিবার জন্য সম্প্রতি যে একটি মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন, - বৈদ্যজাতির সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে যাহা আছে তাহাই উহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। যতদিন বৈদ্যজাতি শিক্ষায় পশ্চাৎপদ না হইবে, যতদিন বৈদ্যজাতি স্বদেশের কল্যাণ-সাধনে সচেষ্ট থাকিবে ততদিন তাহার গৌরব ম্লান হইবে না।

অগ্রজ বৈকুণ্ঠনাথ রাজনীতি-চর্চ্চা করিতেন এবং কংগ্রেসের সেবক ছিলেন। তাঁহাকে সেবক বলিলে ঠিক বলা হয় না— তিনি কংগ্রেসের অন্যতম ধারক ও বাহক ছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ অগ্রজের নিকট হইতেই স্বদেশ-সেবার এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও রাজনীতি-চর্চ্চা করিতেন এবং কংগ্রেসের সেবক ছিলেন। ভারতের যেখানেই কংগ্রেসের অধিবেশন হইত তিনি তাঁহার অগ্রজের সহিত সেই অধিবেশনে যোগদান করিতেন। বৈকুণ্ঠনাথ কংগ্রেসের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারই আমন্ত্রণে তিনবার বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক

সম্মিলন যখন পুনর্জ্জীবিত হয় এবং প্রতি বৎসর কোন না কোনও জেলা-সদরে উহার অধিবেশনের প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বহরমপুরেই উহার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। কংগ্রেসের-সম্পর্কিত এইসকল কার্য্যে হেমেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন বলিলেও বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। ডক্টর বেশান্টের নেত্রীত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হেমেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের প্রায় সকল অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইলে অতিথি-অভ্যাগতগণের সম্বর্দ্ধনার ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইত। কারণ বিরাট কার্য্যে শৃঙ্খলা-রক্ষার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাঁহার ছিল এবং শ্রমশীলতা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও মিষ্টভাষিতার জন্য তিনি ইহাতে সাফল্য ও প্রশংসা লাভ করিতেন। হেমেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা ভারত-সভার সদস্য ছিলেন এবং উহার কার্য্যে আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন।

শিল্প-প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বদেশে অর্থাগমের ব্যবস্থায় হেমেন্দ্রনাথ একরূপ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে যখন বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশজাত পণ্য-ব্যবহারের সঙ্কল্প প্রবল হয় সেই সময় হইতেই হেমেন্দ্রনাথ দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। শিল্প প্রতিষ্ঠাই তাঁহার বিরাট ও অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা —বাঙ্গালা দেশে "চীনা মাটী"র দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখানা-স্থাপন। এই ব্যাপারে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর তাঁহার সহিত যোগ দেন। তাঁহাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই বাঙ্গালায় প্রথম 'চীনামাটী"র জিনিস তৈয়ারী করিবার কারখানা স্থাপিত হয়। তাঁহাদের সেই কারখানাই এক্ষণে "বেঙ্গল পটারি"তে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠানটীর জন্য হেমেন্দ্রনাথকে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু
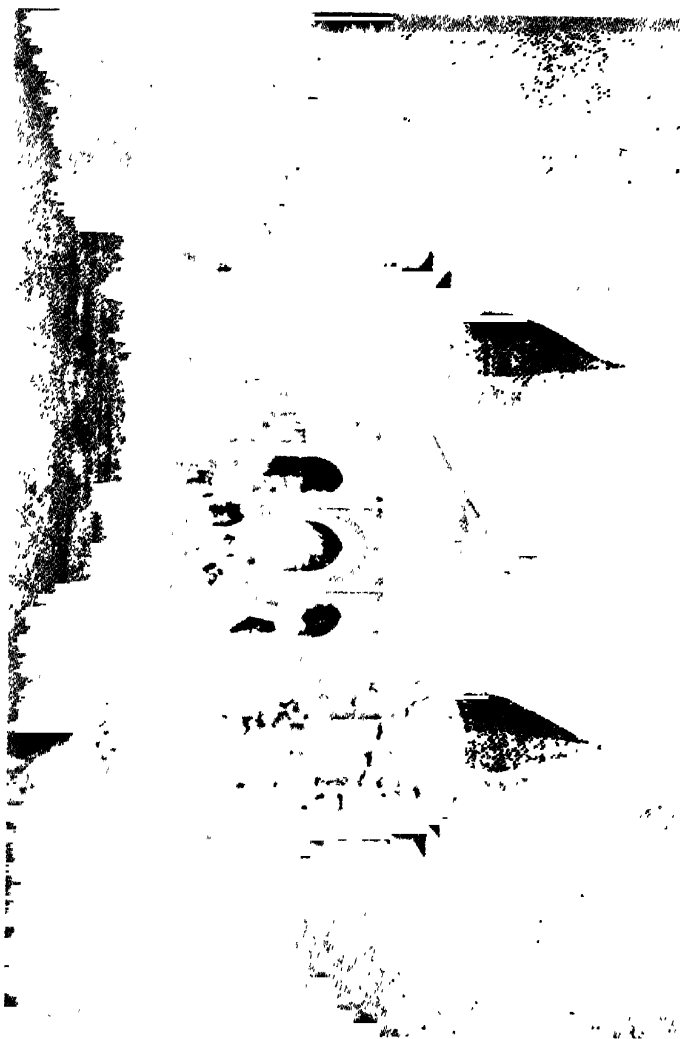
বিরজা সুন্দরী শিবমন্দির

তাহাতেও তিনি বিচলিত হন নাই; মৃত্যুকালেও তিনি ইহার উন্নতির জন্য নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

"বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস" নামক কাচের দ্রব্য তৈয়ারীর কারখানাটীও তাঁহারই চেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তিনি কেবল এই কারখানার তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অনাদিনাথকে ইউরোপের শিল্পকেন্দ্রে পাঠাইয়া কাচ-শিল্পে সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথও এই কারখানাটীর উন্নতি-সাধনের জন্য হাইকোর্টের ওকালতী ত্যাগ করিয়াছেন।

ইহা হইতেই বুঝা যায়, স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি-সাধনের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন এবং গতানুগতিক লোভের পথ ত্যাগ করিয়া অনিশ্চয়তার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা কিরূপ গভীর স্বদেশপ্রীতির পরিচায়ক তাহা অনুমানেই উপলব্ধি করা যায়।

হেমেন্দ্রনাথ অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন। তিনি যে কেবল দরিদ্র ছাত্রগণের পরম বন্ধু ছিলেন তাহা নহে, অভাবে পড়িয়া যাঁহারা তাঁহার নিকট আসিতেন তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তিনি নীরবকর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি এরূপ মধুর ছিল যে, তিনি একরূপ অজাতশত্রু ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হেমেন্দ্রনাথের আট পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজ-কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ দেশপ্রসিদ্ধ ডি গুপ্তের প্রপৌত্র ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিতীয়

পুত্র প্রিয়নাথ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার; ইনি যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেল স্বর্গীয় হরিদাস গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র অনাদিনাথ বিলাত হইতে কাচ-শিল্পে বিশেষজ্ঞ হইয়া পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত কাচের কারখানার অধ্যক্ষ হইয়াছেন; পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। চতুর্থ পুত্র জিতেন্দ্রনাথ বিলাত-ফেরত ডাক্তার; তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারানাথ গুপ্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। পঞ্চম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এটর্ণী; প্রিয়নাথ গুপ্তরায় মহাশয়ের পৌত্রীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। ষষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট; ইঁহার বিবাহ হইয়াছে সোমরার দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত। সপ্তম পুত্রের নাম যতীন্দ্রনাথ; ডি গুপ্তের প্রপৌত্র স্বর্গীয় কমলকৃষ্ণ গুপ্তের প্রথমা কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছেন। ফণীন্দ্রনাথও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট অষ্টম পুত্র রবীন্দ্রনাথও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট; ইঁহার বিবাহ এখনও হয় নাই। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পুত্র এখনও বিদ্যার্থী।

হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে কাশীধামের স্বর্গীয় নীলমাধব রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায়ের সহিত; ইনি উকীল। কনিষ্ঠা কন্যার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ গুপ্ত, ইনি মুন্সেফ।

হেমেন্দ্রনাথ বড় স্নেহশীল ও পুত্রবৎসল ছিলেন। পুত্রগণ কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাগত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন এবং তাঁহারা গৃহ-প্রত্যাবৃত্ত হইলে তবে তিনি স্থির হইতে পারিতেন। হেমেন্দ্রনাথের মত এরূপ সৌভাগ্যবান্ পিতা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী-পরিবারে বিরল। তিনি আট আট জন কৃতী পুত্রের পিতা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—হেমেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ছিল সাত্ত্বিক; তিনি ধর্ম্মপ্রাণ—পুণ্যবান্ ছিলেন, অধর্ম্মের লেশমাত্র যেখানে দেখিতেন তাহার সংস্পর্শ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতেন। তিনি জীবনে কাহাকেও মনোবেদনা দেন নাই, তাই জীবনে কোনও শোকভোগ করেন নাই বা পরিবারিক কোনও রূপ ক্লেশ তাঁহাকে ব্যথা দেয় নাই। ইহা তাঁহার পুণ্যেরই পরিচায়ক।

হেমেন্দ্রনাথ সামাজিক শিষ্টাচারের আদর্শ ছিলেন। নিমন্ত্রণ-সভায় যাইলে তিনি বহুজনের কেন্দ্র হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার স্নিগ্ধ ও সরস আলাপ সকলকেই আকৃষ্ট করিত। গত ত্রিশ বৎসর কলিকাতায় যে স্থানেই সভা-সমিতি ও সম্মিলন হইয়াছে—প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রফুল্ল হাস্যোজ্জ্বল স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। বাঙ্গালার সেকালের শিষ্টাচার ও সদালাপের ধারা হেমেন্দ্রনাথ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; এখন তাহা দুর্ল্লভ।

তাঁহার চিত্ত ছিল শিশুদের মতই স্বচ্ছ ও সরল। এইজন্য তিনি বালকদিগের আমোদ-প্রমোদেও যোগ দিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। ছেলেরাও তাঁহাকে পর মনে করিত না। তাঁহার অকপট ও অনাবিল স্নেহের ধারায় প্রবীণ ও তরুণের ব্যবধান ধৌত হইয়া যাইত।

তিনি সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যোৎসাহী ছিলেন। বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র যে লোক শিক্ষার সহায়ক—ইহা তিনি উপলব্ধি করিতেন। এইজন্য বহরমপুরে ওকালতী করিবার সময়ে তিনি "মুর্শিদাবাদ হিতৈষী" পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হেমেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভালই ছিল। গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে (সন ১৩৩৫ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ) তারিখে রাত্রি ১২টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তিনি যথারীতি কাজ করিয়াছিলেন এবং নানা-স্থানে গমন করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে শরীর অসুস্থ বোধ হওয়ায় আর

বাহির হন নাই। পরদিন প্রভাতে তিনি স্বয়ং তাঁহার রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং এই ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েন। তিনি পারলৌকিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকেন। সেই সময়ে তাঁহার এক পুত্র বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু সংসারের সকল চিন্তা তিনি মন হইতে পরিহার করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি রোগযন্ত্রণায় নিজেও ভুগেন নাই বা সংসারের কাহাকেও কোনও রূপ কষ্ট দেন নাই। তিনি পুণ্যাত্মা পুরুষ ছিলেন। তাই হাসিমুখে এই জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন। হেমেন্দ্রনাথ এই জড়বাদ-জর্জ্জরিত যুগে যেভাবে মৃত্যুকে অনিবার্য্য-জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ইহকালসর্ব্বস্ব লোকের পক্ষে বিস্ময়কর।

কলিকাতা হাইকোর্টের মান্যবর বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ (এক্ষণে স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ) ও মান্যবর বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী ঘোষের এজলাসে প্রসিদ্ধ উকীল হেমেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু-সমাচার জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া বার এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর শরৎচন্দ্র বসাক বলেন,—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে হেমেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন; তাহার পূর্ব্বে তিনি প্রায় দশ বৎসর-কাল বহরমপুর আদালতে ওকালতী করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্রজ বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় বহরমপুর উকীল-সমাজের নেতা ছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন; এই বৈশিষ্ট্য তিনি যে কেবল ওকালতীতে তাঁহার যোগ্যতা ও বিনম্র ব্যবহার দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নহে, হাইকোর্টে দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবহারাজীবের কর্ম্মসূত্রে লব্ধ সম্মান হইতেও তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য অর্জ্জিত হইয়াছিল।

এডভোকেট-জেনারেলের অনুপস্থিতিতে ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সুলী মিষ্টার প্যাঙ্করিজ ব্যারিষ্টার-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বলেন যে, ডক্টর বসাক যাহা বলিলেন তিনিও তাঁহার পুনরুক্তি করিতেছেন।

হরিমোহন মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়
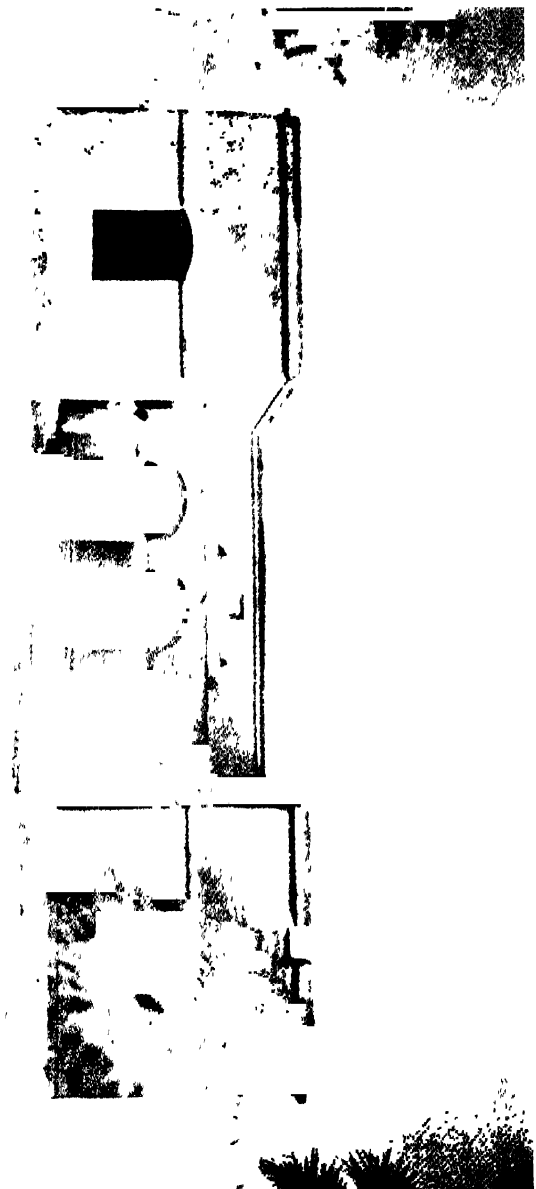
এটর্ণী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলেন—হেমেন্দ্রনাথ আমার বন্ধু ছিলেন; যাঁহাদের সহিতই তাঁহার পরিচয় ছিল তিনি তাঁহাদেরই বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ ও পারদর্শী উকীল ছিলেন; কিন্তু তদ্ব্যতীত তিনি শিল্প-প্রতিষ্ঠায় অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন এবং ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, কংগ্রেসের গোড়াকার আমলে তিনি তাঁহার স্বদেশকে রাজনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।

মান্যবর বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন আমি বলিতে পারি না—আজ প্রত্যূষ পাঁচটার সময়ে আমি কিরূপ গভীর দুঃখের সহিত এই বিচারমন্দিরের সুপ্রসিদ্ধ ও অতীব সম্মানভাজন ব্যবহারাজীব হেমেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু-সমাচার শ্রবণ করিয়াছি। গত রবিবারে তিনি আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, পর সপ্তাহের প্রারম্ভেই আমাকে এই শোচনীয় সংবাদ শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁহার মৃত্যু আকস্মিক বলিয়াই অধিকতর শোকাবহ হইয়াছে। আমি তাঁহাকে ভালরূপই জানিতাম; কারণ তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ৩৫ বৎসরের। এই সুদীর্ঘ কাল আমি তাঁহার বন্ধুত্ব উপভোগ করিয়াছি। ব্যবহারাজীব সমাজের তিনি যে একজন অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহার সতীর্থগণের প্রীতিভাজন ছিলেন, ইহা বলা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। হাইকোর্টে আসিবার পূর্ব্বে বহরমপুরে তাঁহার পশার ভালই ছিল এবং সেখানেও তিনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেন। হাইকোর্টে কিছুকাল পরেই—আমার বিশ্বাস সম্ভবতঃ ১৯০৩ সালে—তিনি যে খুব পশার করিয়াছেন ইহা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলগণের সুযশঃ তিনি উজ্জ্বল রাখিয়া গিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তিনি তাঁহার অগ্রজ স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের আদর্শই গ্রহণ

করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্রজ মনীষা ও অসামান্য খ্যাতি-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন ব্যবহারাজীব ছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের বিচারপতিগণের এবং মক্কেলদিগের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার ওকালতীর খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথা কহিয়াই আমি নিবৃত্ত হইব না। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—ব্যবহারাজীবেরা দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করেন না। এই কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি দেশে দুইটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন। কি দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই দুইটী প্রতিষ্ঠান এখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু যিনি উহাদের পত্তন করিলেন মৃত্যু সহসা তাঁহাকে টানিয়া লইল! আমি এবং আমার প্রত্যেক সতীর্থই তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখিত। তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিলাম, আশা করি, আপনারা ইহা তাঁহাদিগকে জানাইবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনও গত ২২শে মে (১৯২৯ সাল) তারিখে হেমেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে এই বলিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালার সমাজ, রাষ্ট্র ও শিল্প ---এই তিন বিভাগেরই প্রভূত ক্ষতি হইল এই শোক-প্রকাশক মন্তব্য কলিকাতা কর্পোরেশন হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে "ক্যালকাটা উইকলি নোট্স" "ষ্টেটসম ন্" "লিবার্টি" "ক্যাপিট্যাল" "অমৃতবাজার পত্রিকা" "বেঙ্গলী" "দৈনিক বসুমতী" "হিতবাদী" "ভোটরঙ্গ" "মুর্শিদাবাদ হিতৈষী"-প্রমুখ সংবাদপত্রে শোক-প্রকাশক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল এবং হেমেন্দ্রনাথের শোকার্ত্ত পরিজনবর্গের প্রতি সমবেদনাও জ্ঞাপন করা হইয়াছিল।

"হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট" নামক রাস্তাটি এক্ষণে হেমেন্দ্রনাথের কর্ম্মবহুল জীবনের পুণ্য-স্মৃতি বহন করিতেছে।

মাননীয় আলহাজ স্যর আব্দেল কেরিম গাজনবী, কে, টি

মাননীয় আলহাজ স্যর আব্দেল কেরিম গাজ্‌নবী, কে-টি

বঙ্গদেশে যে সকল দেশপ্রাণ মনীষী বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমা-নিবাসী স্বর্গীয় আব্দুল হাকিম খান গজ্‌নবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুরের শাসন-পরিষদের (Executive Council) অন্যতম সদস্য মাননীয় আলহাজ স্যর আব্দেল কেরিম গাজ্‌নবী সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ন্যূনকল্পে ত্রিশ বৎসর-কাল তিনি রাজনৈতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিলদুয়ারের জমীদার সুপ্রসিদ্ধ গাজ্‌নবী-বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই গাজ্‌নবী-বংশীয়গণ আফগানজাতীয়।

বংশেতিহাস

কথিত আছে,—আফগানগণ ইস্রাইলের (Israel) দশটী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কোনও একটি সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত। "আফঘানা" হইতেই আফগানজাতির নামকরণ হয়। সৈদানা ইব্রাহিম খলিল-উল্লার (এব্রাহাম) ঔরসে তদীয় পত্নী হাজরার (হাগার) গর্ভে ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ ইস্‌মাইল (Ishmael) জন্মগ্রহণ করেন। আফঘানা এই ইস্‌মাইলের পুত্র-পৌত্রাদিক্রমিক বংশধর।

ইহুদীগণের রাজা মালিক থালুতের (Saul) দুই পুত্র ছিলেন; তাঁহাদের নাম—আফঘানা ও জালুৎ। এই আফঘানাই আফগান জাতির আদিপুরুষ।

হেরাতের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবতুল্লা খান বলেন:—যুবরাজ আফঘানার তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ—জারাবেন্দ, মধ্যম—আরগাউচ এবং কনিষ্ঠ-কার্লেন। এই তিনজনের প্রত্যেকেরই আটটী করিয়া পুত্র হইয়াছিল। ইঁহাদের ২৪ জনের নাম অনুসারে ২৪টী সম্প্রদায় অভিহিত হইয়া থাকে। যেভাবে উঁহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

জারাবেন্দের পুত্রগণ	সম্প্রদায়ের নাম
আবদাল	আবদালি
যুসুফ	যুসুফজাই
বাবার	বাবারি
ওয়াজির	ওয়াজিরি
লোহুয়ান	লোহানি
বেরিচ	বেরিচি
খুগুইয়ান	খুগুইয়ানি
চিরাণ	চিরাণি

আরগাউচের পুত্রগণ	সম্প্রদায়ের নাম
ঘিল্‌জ	ঘিল্‌জাই
কৌকার	কৌকারি
জুমৌরিয়ান	জুমৌরিয়ানি
স্তোরিয়ান	স্তোরিয়ানি
পেন	পানি
কাস	কাসি
তাকান	তাকানি
নাসার	নাসারি

কার্লেনের পুত্রগণ	সম্প্রদায়ের নাম
খাটক	খাটকি
স্থর	স্থরি
আফ্রিদ	আফ্রিদি
তুর	তুরি
জাজ্	জাজি
বাব	বাবি
বেঙ্গুয়েচ	বেঙ্গুয়েচি
লেন্দেপুর	লেন্দেপুরি

এইসকল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ উত্তর-ভারতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, বরং হ্রাসই পাইয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেকেই স্থলেমান পর্ব্বতে ও উহার সান্নিধ্যে বসবাস স্থাপন করিয়াছে। এই স্থলেমান পর্ব্বতকে মানবজাতির আদিবাসভূমি বলিয়া কেহ কেহ অভিহিত করিয়া থাকেন। উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ স্থলেমান পর্ব্বতের নাম দিয়াছেন "কু-খাসে"।

কেবল য়ুসুফ সম্প্রদায় স্থলেমান পর্ব্বতে বসতি স্থাপন করেন নাই, তাঁহারা কাশ্মীরে বস-বাস স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহাদেরও সংখ্যা-পুষ্টি হয় নাই; তাঁহাদের কেবল সংখ্যা-হ্রাসই ঘটিয়াছে।

আবদালি সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণকে আফগানিস্থানের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহারা থাকেন হিরাত ও কান্দাহারে। ঘিলজাই সম্প্রদায়ের বস-বাস কান্দাহার ও কাবুলে। কৌকারি সম্প্রদায় বোলান গিরি-সঙ্কটের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। বাবারি, নাসারি, লোহানি এবং বাবি সম্প্রদায়ের অধিবাস কান্দাহার ও সিন্ধুপ্রদেশে। বেরিচিগণের বাসস্থান পিশীনের

নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে, চিরাণিগণের বসতি কাবুলের উত্তর-পশ্চিমে এবং বেঙ্গুয়েচিগণের অবস্থিতি কাবুল ও হাজারাদিগের বাসভূমির মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে।

আবদালিগণ এক্ষণে দুরাণী নামে অভিহিত; তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত এবং এই দুই শাখা হইতে আটটী উপশাখার সৃষ্টি হইয়াছে। এই উপশাখা বা সম্প্রদায়গুলি পপুলজাই, বারুকজাই, ইশাখজাই প্রভৃতি নামে পরিচিত।

ঘিলজাই এবং অন্যান্য সম্প্রদায়েরও এইরূপ শাখা-সৃষ্টি হইয়াছে। এইসকল শাখা হইতে বহু উপশাখার আবির্ভাব হইয়াছে; ইহাদিগকে "টিরা" বলা হয়। "টিরা"র অর্থ পরিবার। নানা কারণে যদি কোনও সম্প্রদায়ের লোক মূল সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায়, সেই সময়ে প্রায়ই এই সকল "টিরা"র সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহারা তখন বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়।

ঠিক এই কারণেই পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় প্রবাসী আফগান-পরিবারে বংশ-বৃদ্ধি ঘটিলে তাঁহারা মূল পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন ও আপনাদিগকে নূতন নামে পরিচিত করেন।

বঙ্গে আফগান—ওসমান খান লোহানি

১২০৩ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার-উদ্দীন মহম্মদ বিন বাখ্তিয়ার ঘিলজাই বাঙ্গালা ও বিহার অধিকার করেন। তখন হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আফগান-রাজগণই প্রধানতঃ বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। এই ১৫২৬ খৃষ্টাব্দেই তাইমুর-বংশীয়গণ কর্ত্তৃক আফগান-রাজগণ পরাজিত হন; এই সময়েও আফগান-রাজগণ বাঙ্গালা ও বিহারের অধিপতি ছিলেন। সুলতান দায়ুদ খানই বাঙ্গালার শেষ আফগান নরপতি। আফগান-রাজগণ পুরুষানুক্রমে ২৩৬ বৎসরকাল বঙ্গদেশের শাসনদ

পরিচালন করিয়াছিলেন। প্রায় চারি শতাব্দী ধরিয়া আফগান-রাজগণের প্রভুত্ব বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিল।

বাখতিয়ার খিলজাই হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ আফগান নৃপতি পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই এক একটি জিলা বা পরগণা মনোনীত করিয়া লইতেন; সেই জিলায় বা পরগণায় তাঁহারা থাকিতেন এবং উহাই হইত তাঁহাদের প্রত্যেকের খাস রাজ্য। অন্যান্য ক্ষুদ্র পরগণা তাঁহারা তাঁহাদের অধীন কর্ম্মচারীদিগকে জায়গীর-স্বরূপ দান করিতেন; যথা —উজীর বেতন পাইতেন না, তাহার বদলে একটি পরগণা জায়গীর-স্বরূপ পাইতেন; সেনাপতিরও বেতন ছিল না—উহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে জায়গীর দেওয়া হইত। উজীর, সেনাপতি প্রভৃতি আবার তাঁহাদের অধীন কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদের অধীন পরগণা হইতে দুই একখানা গ্রাম জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিতেন। এইরূপে জায়গীর-প্রথায় দেশের শাসনকার্য্য চলিত। বাঙ্গালার আফগান রাজগণের এই শাসন-পদ্ধতি অনেকটা ইউরোপের ফিউড্যাল-(Feudal) পদ্ধতির মত।

যখন আকবর বাদসাহের সেনাপতি বঙ্গদেশ অধিকার করিতে আসেন, সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র বহু আফগান জায়গীরদার বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই আকবরের সেনাপতির সহিত এরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে সহজে পরাজিত করিতে পারা যায় নাই। পরে দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর তাঁহারা আকবরের সেনাপতির হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। এইসকল আফগান নৃপতির মধ্যে মাসুম খান কাবুলি, কতলু খান এবং ওসমান খান লোহানির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে পাটনার মোগল-বাহিনীর

অধিনায়ক সৈয়দ খানকে বাঙ্গালার সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হয়। এই সৈয়দ খান আফগান-জাতীয়। তিনি লোকের নিকট পানি-সম্প্রদায়ভুক্ত সৈয়দ খান চাঘতাই নামে পরিচিত ছিলেন। সেই সময় রাজা মানসিংহ ও সৈয়দ খান উভয়ে একযোগে কতলু খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। পরে ওসমান খান লোহানির সহিতও তাঁহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই ওসমান খান লোহানিই কত্‌লু খানের মৃত্যুর পর বাঙ্গালার স্বাধীন আফগান-গণের অধিনায়ক হইয়াছিল।

ওসমান খান লোহানি ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাখজেন-ই-আফগানি অনুসারে তিনি ইশা খান লোহানির দ্বিতীয় পুত্র। এই সময়ে আফগান সর্দ্দারগণ বর্ত্তমান ভাওয়াল এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত আটিয়া পাহাড়ে (আইন-ই-আকবরীতে ইহা 'কোহিস্তান-ই-ঢাকা' নামে কথিত) অবস্থান করিতেছিলেন। এইসকল পাহাড় ও জঙ্গলে আফগান সর্দ্দারগণ কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এই আশ্রয় ও অবস্থান-স্থলগুলি সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খান বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন; তিনি রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকায় উঠাইয়া লইয়া যান। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খান তদানীন্তন আফগান সর্দ্দার ওসমান খান লোহানির নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। দূতকে এই কথা জানাইতে বলা হয় যে, আফগানদের পক্ষে এক্ষণে রাজমুকুট ধারণ করিবার চেষ্টা করা অজ্ঞতার কার্য্য হইবে; কারণ, এ সময়ে মোগলদের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার আশা নাই বলিলেই চলে। মোগলদিগের প্রভুত্বের চাপ দিল্লীশ্বরের অন্যান্য প্রজাদিগের উপর যতই বেশী হউক, আফগানদের উপর তাহা যে খুবই অল্প সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আফগানগণের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, মোগলেরা যে ইসলাম ধর্ম্মের উপাসক, আফগানেরাও সেই ইসলাম ধর্ম্মেরই উপাসক। যেহেতু

আফগানগণ এক্ষণে মোগলদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল, সেইহেতু আফগান-গণের উচিত—জেতৃ মোগলদিগের সহিত সম্মিলিত হওয়া এবং তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, বিধাতার ইচ্ছায়ই জাতিসকলের উত্থান ও পতন হইয়া থাকে। ছয়শত বৎসর কাল আফগানগণ হিন্দুস্থানে একাধি-পত্য করিয়াছে; কিন্তু এক্ষণে ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রাজদণ্ড এখন আফগানদের হাত হইতে মোগলদের হাতে পড়িয়াছে। সুতরাং বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া মোগলদের অধীনতা স্বীকার করা আফগানগণের উচিত। যদি অন্য কোনও জাতিকে ইসলাম খান এ কথা বলিতেন, তাহা হইলে তাহার ফল হইত। কিন্তু যেহেতু বর্ত্তমান সময়ে আফগানগণ তরবারি ফেলিয়া কখনও কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহে, এবং যেহেতু উপরোক্ত বহু দলের বংশধরগণ - যাহারা পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বসবাস স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজনও ভূমিকর্ষণে সম্মত নহে, সেইহেতু দূতের কথা ব্যর্থ হইল। উদ্ধত ওসমান খান ২০ হাজার আফগানের নেতা ছিলেন। তিনি এই শক্তি লইয়া নিজেকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার মনে করিতেন এবং যুদ্ধ ও স্বাধীনতা ব্যতীত তিনি আর কিছুই কামনা করিতেন না।

দূত-প্রেরণ নিষ্ফল হওয়ার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সেনাপতি সুজতালি খানকে সসৈন্যে আফগান সর্দ্দারের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ ঢাকা হইতে ১০০ ক্রোশ দূরে সবকার বাজুহার অন্তঃপাতী নেকুঝাইল নামক স্থানে সুজাতালির সৈন্যগণের সহিত ওসমান খানের অধীন আফগান সেনাদলের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সরকার-ই-বাজুহাই বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা। যুদ্ধে ওসমান খানই জয়লাভ করিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ একটি গুলি তাঁহার কপালে মারাত্মকরূপে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আফগানগণ যখন দেখিল যে, তাহাদের সর্দ্দারের হাতী সর্দ্দারকে লইয়া পলায়ন করিতেছে তখন

তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল এবং তাহাতেই আফগানেরা যুদ্ধে পরাজিত হইল।

ওসমান খান ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের উড়িষ্যা, সপ্তগ্রাম (হুগলী) ও সরকার বাজুহায় (ময়মনসিংহ জেলা) বহু জমি ছিল, উহা হইতে বার্ষিক ৫ হইতে ৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত।

নেকুঝাইলের যুদ্ধই ওসমান খানের শেষ চেষ্টা। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মোমরেজ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ—ফতেহ দাদ, ওয়ালি প্রভৃতি মোগল সম্রাটের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, তাহার ফলে তাঁহাদিগকে লাখেরাজ ও আইমা জমি জায়গীর দেওয়া হয়।

ওসমান খান লোহানির চারি ভ্রাতা ছিলেন ; তাঁহাদের নাম— সুলেমান, ওয়ালী, ইব্রাহিম খান এবং ফতেহ দাদ খান। এই ফতেহ দাদ খান লোহানি অনুমান ১৬১২ হইতে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে চারণে প্রথম বসতি স্থাপন করেন।

১। গাজনবী খান

গাজনবী অথবা গাজনিন খান লোহানি-সম্প্রদায়ভুক্ত খাঁটি আফগান। তিনি জালোর-রাজ মালিক খাঞ্জির পুত্র। জালোর আজমীরের একটি সুবা। তিনি সম্রাট্ আকবরের শাসনকালের শেষাশেষি এবং সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের শাসনকালের গোড়াগুড়ি বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ৪০০ সৈনিকের অধিনায়ক ছিলেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর তাঁহাকে দেওয়ান উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহাকে লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। গাজনবী খানের বংশধর পীর খান ওরফে পীরবক্স খানকে তাঁহার পিতৃব্য ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জালোর ও পাহলানপুর হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন ; তখন পীর খাম বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। বঙ্গদেশে বসবাসের জন্য তাঁহাকে সরকার হইতে জায়গীর দেওয়া হয়। এখনে কি,

অদ্যাবধি ঢাকা জেলার ইস-কা বাদ পরগণা ইসা খানের জায়গীরের এবং তালুক পীর খান বা পীরবক্স খান (ঢাকার ১৩৬৫ নং কালেক্টরী তৌজী) পীর খানের অধিকৃত জায়গীরের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। গাজ্নবী খানের পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমিক অধস্তন নবম পুরুষ আবদুল হাকিম খানের তৌলীয়াৎনামা-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই জায়গীরগুলি এখনও তাঁহাদেরই বংশধরগণের হস্তেই রহিয়াছে।

২। ইসা খান

ইনি ওসমান খান লোহানি ও ফতেহ্দাদ খান লোহানির পিতা। অনুমান ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জালোরের অধিপতি মালিক গজ্নবী খানের পুত্র। গজ্নবী খানের অনেকগুলি পুত্র ছিল। তাঁহার অপর এক পুত্র—নিজাম খানের ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। সম্রাট্ সাজাহানের সময়ে তিনি ৯০০ পদাতিক ও ৫০০ অশ্বারোহীর অধিনায়ক ছিলেন। তিনি পিতৃরাজ্য জালোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন বলিয়া তাঁহার ভ্রাতা ইসা খান পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশে চলিয়া আসেন। সেই সময়ে বঙ্গদেশ পলাতকগণের আশ্রয়স্থল ছিল এবং স্বাধীনতা-প্রিয় আফগান জাতি বঙ্গদেশে ভাগ্যান্বেষণ করিতে আসিত। বাঙ্গালায় আসিয়া ইসা খান শীঘ্রই বিখ্যাত হইয়া পড়েন এবং কত্লু খান তাঁহাকে উজীর নিযুক্ত করেন।

৩। ফতেহ্দাদ খান

ইনি ইসা খান লোহানির পুত্র এবং ওসমান খান লোহানির ভ্রাতা। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে নেকুঝাইলের যুদ্ধে ওসমান খান পরাজিত হন; তৎপরে ফতেহ্দাদ খান লোহানি দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং অনুমান ১৬১২ হইতে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারণের নিকটে তাঁহাকে বাদশাহ

জায়গীরস্বরূপ যেসকল ভূমিদান করেন তিনি তথায় বসবাস স্থাপন করেন।

৪। জোয়াহার খান

ইনি ফতেহ্‌দাদ খান লোহানির একমাত্র পুত্র। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। জোয়াহার খানের অপভ্রংশে লোকে ইঁহাকে চৌহার খান নামে অভিহিত করিত। উক্ত বর্ষেই সাহার গোবিন্দপুর নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সোরাবাড়ীর নিকটবর্ত্তী টঙ্করাকৈর নামক স্থানে তাঁহার সমাধি হয়। তিনি চারণে বাস করিতেন।

৫। তাজুদ্দীন খান

জোয়াহার খানের পুত্র তাজুদ্দীন খান পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৬। নামদার খান

তাজুদ্দীন খানের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার নাম নামদার খান তাজুদ্দীনের ঔরসে তাঁহার অন্য পত্নীর গর্ভে দরিয়ার খান লাল মহম্মদ খান জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি আপনাকে য়ুসুফজাই-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন।

৭। কামাল খান

ইনি নামদার খানের পরে শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কামাল খানের কন্যা রৌশন খাতুনের সহিত জাহানাই ইয়ার খান পানির বিবাহ হইয়াছিল। কামাল খানের অপর পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম বাসারত আলি খান। ইনিও য়ুসুফজাই সম্প্রদায়ভুক্ত হন।

৮। মজুমুদ্দীন খান আলি খান

ইনি কামাল খানের উত্তরাধিকারী।

৯। আবদুল হাকিম খান

ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা আবদুল আজিজ খান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। আবদুল হাকিম খান ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলহাজ স্যর আব্দেল কেরিম গাজ্‌নবী

ইনি আবদুল হাকিম খান গাজ্‌নবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট তারিখে ইনি দিলদুয়ারে জন্মগ্রহণ করেন।

বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নরপতি ইতিহাস-বিশ্রুত ওসমান খান লোহানি ১৬১২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আটীয়ার নিকটবর্ত্তী নেকুঝাইলের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা ফতেহ্‌দাদ খান মোগল-বাদসাহের প্রিয়পাত্র হন এবং সরকার-ই-বাজুহা (বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা) অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জায়গীর লাভ করেন। স্যর আব্দেল কেরিম এক্ষণে যে পরিবারের কর্ত্তা সেই পরিবার এখনও উক্ত জায়গীরের অংশ ভোগ দখল করিতেছেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়র অর্থাৎ পুরাতত্ত্ব-বিভাগের পরিদর্শক ডক্টর টি ব্লক আটিয়া পরগণায় পুরাতত্ত্ব-সম্পর্কীয় অনুসন্ধানকার্য্য করিবার সময়ে গাজ্‌নবী-পরিবারের প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ ও ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই :—"দিলদুয়ারের জমীদারগণের উপাধি গাজ্‌নবী। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ আকবর বাদশাহের অন্যতম ওমরাহ গাজ নবী বা গাজ্‌নিন্ খান হইতে এই উপাধি চলিয়া আসিতেছে।

আইন ই-আকবরীতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। পরিশেষে আমি গাজ্‌নবী-পরিবারের বর্ত্তমান কর্ত্তা মিঃ আব্দেল কেরিম আবু আহমদ্ খান গাজ্‌নবীর নাম আনন্দসহকারে উল্লেখ করিতেছি।" (Vide Dr. T. Bloch's Note No. 37 dated 1902 referred to in the Annual Report of the Archaeological Survey, Government of Bengal for the year 1902, page 28.)

শিক্ষা

স্যর গাজ্‌নবী প্রথমে কলিকাতার পুরাতন ডভেটন কলেজিয়েট স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। পরে ১২ বৎসর বয়সে তাঁহাকে বিদ্যালাভের জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া ডেভনসায়ারের অন্তর্গত এক্সমাউথের সেণ্টপিটার্স স্কুলে ভর্ত্তি হন ও তথায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বহুদিন ডেভনসায়ারে ছিলেন। যতদিন তিনি সেখানে ছিলেন, ততদিন এক্সমাউথ মারপুল হলের স্যর জন বাডফিয়ার তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। স্যর জন এক সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন; পরে সিংহলের প্রধান বিচারপতি পদে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন।

সেণ্ট পিটার্স স্কুলে অধ্যয়ন করিবার সময়ে তিনি ল্যাটিন ভাষায় ও অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। খেলাধূলায় (sports) তাঁহার খুব অনুরাগ ছিল এবং তিনি ভাল খেলোয়াড়ও ছিলেন। তিনি তাঁহার সহপাঠিগণের এরূপ প্রীতিভাজন ছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা তাহাদের অধিনায়ক (Prefect) নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্যে সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম অল্প বয়সে এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

এক্সমাউথের সেণ্ট পিটার্স স্কুল ত্যাগ করিয়া তিনি লণ্ডনে গমন

করেন এবং সেইখানে যাইয়া মেসার্স রেণ ও গার্ণির বিখ্যাত স্কুলে ভর্ত্তি হন। যে সকল ছাত্র ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতেন এই স্কুলে তাঁহারা উক্ত পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষালাভ করিতেন। বহু বৎসর ধরিয়া এই স্কুলে সিভিল সার্ভিস-পরীক্ষার্থীদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হইত। এই স্কুলে শিক্ষালাভ করিবার সময়ে স্যর গাজ্‌নবীর সতীর্থ ছিলেন—ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-দ্বয় স্যর জন কার ও স্যর হেনরী হুইলার, পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যর এফ রো এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান মিঃ কার্গিল, মিঃ সাম্মান ও মিঃ র‍্যানকিন। স্যর আলি ইমাম, মিঃ হাসান ইমাম, পরলোকগত মিঃ এস-আর দাশ, পরলোকগত মিঃ সি-আর দাশ, ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব মান্যবর স্যর জোসেফ আগষ্টাস মং গাই (কিছুদিন ব্রহ্মদেশের গবর্ণর হইয়াছিলেন), কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পরলোকগত মিঃ মনোমোহন ঘোষের পুত্র সিবিলিয়ান মিঃ মহীমোহন ঘোষ, বিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ এবং অন্যান্য বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি স্যর গাজ্‌নবীর সমসাময়িক।

রেণ ও গার্ণির স্কুলে পড়িবার সময়ে স্যর গাজ্‌নবী ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইহার সেক্রেটারী ও প্রিন্স রণজিৎ সিংজী (এক্ষণে নওয়ানগরের অধীশ্বর হিজ হাইনেস দি জাম সাহেব) ইহার ক্যাপ্‌টেন হন। ইনি পরে ক্রিকেট খেলায় এরূপ পৃথিবী-ব্যাপী যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাহাতে পরে নওয়ানগর রাজ্যের সিংহাসন-প্রাপ্তির পথ তাঁহার পক্ষে সুগম হইয়াছিল।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

সার গাজ্‌নবী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। সেই বৎসর কেবল ৩০ জন সিভিলিয়ানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরীক্ষায় তিনি ৩০ জনের সামান্য কয়েক জনের

পরে হইয়াছিলেন বলিয়া সিভিলিয়ান হইতে পারেন নাই। পর বৎসর ৫১ জন সিভিলিয়ানের প্রয়োজন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ন্যূনতম বয়সের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ২১ বৎসর ধার্য্য করায়, তাঁহার অভিভাবকগণ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা না দিয়া তাঁহাকে অক্সফোর্ডে ভর্ত্তি হইতে বলেন। অক্সফোর্ড হইতে স্যর গাজ্‌নবী জর্ম্মণীর অন্তর্গত জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও তথা হইতে পরে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন।

অতঃপর তিনি কয়েক বৎসর ফ্রান্স ও ইটালীতে অবস্থান করিয়া ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র ও আফ্রিকা পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তবর্ত্তী স্বীয় জমীদারী-পরিচালন কার্য্যে ব্রতী হন।

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে টাঙ্গাইলের প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন এই পদে অধিষ্ঠিত রহিবেন। যে সময়ে টাঙ্গাইল মহকুমায় মাত্র একজন মহকুমা-হাকিম ও একজন সব-ডেপুটী ছিলেন এবং যে সময়ে মহকুমা-হাকিমকে প্রধানতঃ সফরে বাহির হইতে হইত ও সব-ডেপুটীকে ট্রেজারির কার্য্য করিতে হইত, সেই সময়ে স্যর গাজ্‌নবী মহকুমার বহু ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন। এইভাবে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য তিনি বহু বৎসর করিয়াছিলেন। অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে তিনি বিচার-কার্য্যে সরকারের যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দেশবাসীকে সুবিচার বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রীত হইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রৌপ্য-পদক পুরস্কার দিয়াছিলেন।

জেলা-বোর্ডের সদস্য

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্যর আব্দেল গাজ্‌নবী ময়মনসিংহ জেলা-বোর্ডের সদস্য নিয়োজিত হন। এই বৎসর হইতেই তাঁহার দেশসেবার কার্য্য প্রকৃত-পক্ষে আরম্ভ হয়। তিনি যে কেবল জেলা-বোর্ডের কার্য্যেই ঘনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার নিজ মহকুমা টাঙ্গাইল লোকাল বোর্ডের কার্য্য এবং মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য তিনি সবিশেষ অভিনিবেশ-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

টাঙ্গাইল ক্লব

স্থানীয় ভূম্যধিকারিবর্গের সহিত রাজপুরুষগণের যাহাতে পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান হয়, উভয় পক্ষের মেলামেশার সুবিধা ও সুযোগ হয় এবং উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই উদ্দেশ্যে স্যর গাজ্‌নবী টাঙ্গাইল ক্লব-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। তাঁহারই উদ্যোগে টাঙ্গাইল ক্লব স্থাপিত হয়। ক্লবের জন্য একটী পাকা-বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। টাঙ্গাইল ক্লব-প্রতিষ্ঠায় যে ব্যয় হইয়াছিল উহার অধিকাংশ স্যর গাজ্‌নবী বহন করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য ভূস্বামিগণ চাঁদা করিয়া দিয়াছিলেন। গত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাই-কেল যখন টাঙ্গাইল-পরিদর্শনে গমন করেন সেই সময়ে টাঙ্গাইল ক্লবেই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। স্যর গাজ্‌নবী ইহার উদ্যোগী ছিলেন। এই সম্বর্দ্ধনা-ব্যাপারের ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্রসমূহ অদ্যাপি ক্লব-ভবনে বিরাজিত রহিয়াছে।

লোক-গণনার রিপোর্টে মিঃ গাজ্‌নবীর রচনা

১৯০০ খৃষ্টাব্দে সিভিলিয়ান মিঃ ই-এন গেট বাঙ্গালাদেশের লোক-

গণনার কর্ত্তা (Census Commissioner) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই গেট সাহেবই পরে স্যর এডওয়ার্ড গেট-রূপে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গবর্ণর হইয়াছিলেন। ঢাকা বিভাগের কমিশনার পরলোকগত সিভিলিয়ান মিঃ বনহাম কার্টার তখন ময়মনসিংহের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদিতত্ত্ব-সংক্রান্ত বিবরণ লিখিবার জন্য স্যর গাজ্‌নবীকে মনোনীত করা হয়। তিনি যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন তাহা প্রভূত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল এবং সিবিলিয়ান মিঃ ই-এন গেট কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ১৯০০ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনার রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-পদের জন্য প্রতিযোগিতা

১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্যর গাজ্‌নবী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফরিদপুরের স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার। এই নির্ব্বাচন-যুদ্ধে মাত্র দুইটী ভোটের জন্য তিনি পরাজিত হন। ইহারই কয়েক বৎসর পরে ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের আমলে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-সম্পর্কে দেশে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়।

ময়মনসিংহে প্রথম ঠক্‌ঠকি তাঁতের প্রবর্ত্তন

শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যাভেল ফ্লাই সাট্‌ল বা ঠক্‌ঠকি তাঁতের উদ্ভাবন করেন। যে তাঁত বরাবর এদেশে চলিয়া আসিতেছিল এই ঠক্‌ঠকি তাঁত তাহার উৎকর্ষ। এই উন্নত প্রণালীর তাঁত উদ্ভাবিত হওয়ায় গ্রাম্য তন্তুবায়কুলে বিশেষরূপে সাড়া পড়িয়া গেল। প্রাচীন-পদ্ধতির তাঁতে একখানি কাপড় বুনিতে যত সময় লাগে ঠক্‌ঠকি তাঁতে তাহার অর্দ্ধেকের কম সময় লাগিতেছে দেখিয়া তন্তুবায়গণ

এই তাঁত লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িল। নিজ জেলার গ্রাম্য বয়নশিল্পকে উন্নত ও পুষ্ট করিবার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে একদল লোককে অধ্যাপক হ্যাভেলের নিকটে শ্রীরামপুরের বয়ন-বিদ্যালয়ে ঠক্‌ঠকি তাঁত চালাইবার কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইহারা ঠক্‌ঠকি তাঁত চালাইতে, এমন কি, ঠক্‌ঠকি তাঁত পর্য্যন্ত তৈয়ারী করিতেও শিখিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিল। এই সময়ে টাঙ্গাইলে প্রথম কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়। এই প্রদর্শনীতে স্যর গাজ্‌নবীর শিক্ষিত শিল্পিগণ নিজেরা ঠক্‌ঠকি তাঁত তৈয়ারী করিয়া দর্শকগণকে দেখাইয়াছিল। ইহার ফলে ঠক্‌ঠকি তাঁত কেবল টাঙ্গাইল মহকুমায় কেন—সমগ্র ময়মনসিংহে এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত হইয়াছিল।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে তাঁহার কর্ম্মকুশলতা

গত ১৯০৫—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম নামে নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার এই প্রদেশের প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। সেই সময়ে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিতেছিল। স্যর গাজনবী তখন শান্তি ও শৃঙ্খলার সহায়তা-কল্পে বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ পি সি লায়ন, মিঃ ন্যাথান, মিঃ লা মাস্থরিয়ার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের সহিত সহযোগিতা করেন। ঢাকার ভূতপূর্ব্ব নবাব স্যর সলিমুল্লা বাহাদুরের নেতৃত্বাধীনে সমগ্র মুসলমান সমাজ বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অনুকূলে ছিলেন। গাজ্‌নবীও তাঁহাদের সহিত বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদে আনুকূল্য করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন জামালপুর ও কুমিল্লার হাঙ্গামার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরে অশান্তি ও বিদ্বেষের সঞ্চার হইয়াছিল। এই সৎকার্য্যের জন্য স্যর গাজ্‌নবী গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন।

নিখিল-ভারত মোসলেম লীগ

মুসলমান সম্প্রদায়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং দাবী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য ঢাকার নবাব পরলোকগত স্যর স'লিমুল্লা স্যর গাজ্‌নবীর সহিত পরামর্শ করিয়া নিখিল-ভারত মোসলেম লীগ (All India Moslem League) নামক একটি মুসলমান-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। স্যর গাজ্‌নবী ও অন্যান্য কয়েক জন নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের প্রতিষ্ঠা সময় হইতেই সদস্যশ্রেণীভুক্ত (Foundation Members) হন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা সহরে নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মর্লি-মিণ্টোর সংশোধিত শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। তদনুসারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ তদানীন্তন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার লাভ করে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম তখন নূতন প্রদেশ। ঢাকার পরলোকগত নবাব স্যর সলিমুল্লা বাহাদুর সেই নূতন প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে স্যর গাজ্‌নবীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন যে, তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ব্যবস্থাপক সভা হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হউন। এই অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য স্যর গাজ্‌নবী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হইলেন এবং ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন। সুতরাং তিনিই যে সেই সময়ে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসিগণের প্রথম ও একমাত্র প্রতিনিধিস্বরূপ তদানীন্তন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

লর্ড হার্ডিঞ্জ বড়লাট হইয়া আসিবার কিছুদিন পরেই লর্ড মর্লির

"অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থা" (Settled Fact)—বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীর দরবারে পরিবর্ত্তিত হইল। বঙ্গব্যবচ্ছেদ রদ হওয়াতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি যে অবিচার হইল তাহাতে সমগ্র মুসলমান সমাজে অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের সন্তোষ বিধানের জন্য ঢাকার নবাবকে জি-সি-আই ই উপাধি প্রদান করা হইল। ঢাকায় একটি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার এবং বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণরের প্রথম শাসন-পরিষদে প্রথম ভারতীয় সদস্যকে মুসলমান সম্প্রদায় হইতে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইল।

দ্বিতীয় বার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ নাকচ হইবার পর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্যর গাজ্‌নবী সমগ্র বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ পুনরায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন আপনি এখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিবর্ত্তনে সুখী হইয়াছেন ত? ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে—এই দিল্লী সহরই ত মুসলমান বাদসাহগণের সময়ে রাজধানী ছিল, দিল্লী মুসলমানের অতীত গৌরবের স্মৃতিপূর্ণ।" ইহার উত্তরে স্যর গাজ্‌নবী অসঙ্কোচে বলিয়াছিলেন "আমি এখনও ইহাকে প্রহসন বলিয়া মনে করি।"

জুম্মা নমাজের জন্য ছুটীর ব্যবস্থা

স্যর গাজ্‌নবী যখন বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন সেই সময়ে তিনি কয়েকটী উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিয়া জুম্মা নমাজের জন্য সরকারী মুসলমান কর্ম্মচারীদিগকে ছুটী দিবার ব্যবস্থা করেন। এজন্য গবর্ণমেণ্টের মুসলমান কর্ম্মচারিগণ, মামলাকারিগণ, আইনজীবিগণ তাঁহার

নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবেন। স্যার গাজ্‌নবীর চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রথম দুইটী ঈদ মহরম পর্ব্বদিন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নেগোসিয়েবল ইনস্‌ট্রুমেণ্টস্‌ এক্ট অনুসারে সাধারণ ছুটীর দিন বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ স্যার গাজ্‌নবীর চেষ্টায় ওয়াকফ্‌ ভ্যালিডেটিং বিল আইনে পরিণত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে রেলপথ বিস্তার, ভারতীয় ও অ-ভারতীয় টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারিগণের ভাতার বৈষম্য-দূরীকরণ, বিচার ও শাসন-বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট এতদুভয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক-ঘটিত সমস্যা-বিষয়ে স্যার গাজ্‌নবী বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়-কমিটির সদস্য

স্যার গাজ্‌নবী প্রথম ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়-কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। এই কমিটির কার্য্য ছিল—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-পদ্ধতি প্রণয়ন ও তৎসম্পর্কিত প্রাথমিক কার্য্যাদি-করণ।

খাইবার গিরিবর্ত্ম-পরিদর্শন

পেশোয়ার হইতে জামরুদ পর্য্যন্ত রেলপথ যখন খোলা হয়, সেই সময়ে খাইবার অঞ্চলের আফ্রিদি অধিবাসীদের মধ্যে বিভ্রাটের সূত্রপাত হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জের অনুরোধক্রমে স্যার গাজ্‌নবী ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে খাইবার গিরিবর্ত্ম পরিদর্শন করেন। তিনি জামরুদ কেল্লায়, আলি মসজিদে ও লাণ্ডি কোটালে অবস্থান করেন। এখানে সাহেবজাদা (এক্ষণে নবাব স্যার) আবদুল কায়ুম, এম-এল-এ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সে সময়ে সাহেবজাদা তথাকার অস্থায়ী এসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল এজেণ্ট ছিলেন। মিঃ পীয়ার্স—তদানীন্তন পলিটিক্যাল এজেণ্টও স্যার গাজ্‌নবীর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্যার গাজ্‌নবী এই সময়ে সীমান্তের পার্ব্বত্য জাতিসমূহের সহিত গবর্মেণ্টের সদ্ভাব-স্থাপনে প্রভূত চেষ্টা

করিয়াছিলেন। সীমান্তের পার্ব্বত্যজাতিগণও স্যর গাজ্‌নবীকে তাঁহাদের স্বজাতীয় বলিয়া বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল। পেশোয়ারে অবস্থান-কালে তিনি এক বিরাট সভায় বক্তৃতা করেন এবং সেই সময়ে পেশোয়ার সহরের উপকণ্ঠে ইসলামিয়া কলেজের জন্য যে বাটী নির্ম্মিত হইতেছিল এই সভায় তাহার জন্য চাঁদা তুলিয়া দেন।

বঙ্গীয় মোসলেম-শিক্ষা-পরামর্শ-সংসদের সদস্য

বাঙ্গালা দেশে ও অন্যান্য স্থানে বিপ্লবমূলক আন্দোলনের প্রকৃত কারণ-সম্পর্কে ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত স্যর গাজ্‌নবীর আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে স্যর গাজ্‌নবী তাঁহাকে বলেন,—"বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার অভাবই বিপ্লবমূলক আন্দোলনের মূল কারণ। মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক ভারতের শাসনভার গৃহীত হইবার পূর্ব্বে মক্তব ও মাদ্রাসা, পাঠশালা ও টোলের মারফতেই লোকে বিদ্যা শিক্ষা করিত এবং ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষাও উহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রদত্ত হইত। তাহার ফলে হিন্দু ও মুসলমান বালকগণের হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্ম ও নীতির বীজ উপ্ত হইত এবং ধর্ম্ম ও নীতির অনুশাসন মানিয়া তাহারা চলিত। অতঃপর গবর্মেণ্ট যখন ঘোষণা করিলেন যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা নিরপেক্ষ তখন হইতে বাধ্যতামূলক ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয় হইতে উঠিয়া গেল। পুরাতন মক্তব ও টোলের স্থান এইসকল বিদ্যালয় অধিকার করিল বটে, কিন্তু তথায় ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই রহিল না। ধর্ম্ম ও নীতির সংস্পর্শশূন্য শিক্ষা লাভ করিয়া যে তরুণদল গঠিত হইল তাহাদের ভিতর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সংযমের অভাব ঘটিল। পাপ পুণ্যকে উহারা উড়াইয়া দিল। পরজন্মের ভয় অন্তর্হিত হইল, সৎকর্ম্ম করিলে পরজন্মে পুরস্কার আছে, অসৎকর্ম্ম করিলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে,—ধর্ম্মশাস্ত্রের এইসকল মূল উপদেশে তাহাদের অনাস্থা হইল।

নৈতিক সংযমের এই অভাবই যে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি-সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

লর্ড হার্ডিঞ্জ স্যার গাজ্‌নবীর এই মন্তব্যসমূহের সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব স্যার হারকোর্ট বাটলারকে বলিলেন,—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সকল প্রদেশের প্রতিনিধিস্বরূপ যে সকল মুসলমান সদস্য আছেন তাঁহাদিগকে লইয়া একটি সভা আহ্বান করুন। এই সভায় গবর্ণমেণ্টের খাস বা সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়-সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা-প্রদানের উপায় নির্দ্ধারণ করা হউক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু প্রতিনিধিগণকে লইয়াও উক্তরূপ সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। ভারত গবর্ণমেণ্ট স্যার গাজ্‌নবীকে মুসলমান ছাত্রগণের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা-প্রদানের উপায় সম্বন্ধে এবং শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (পরে স্যার) হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা-প্রদানের উপায় সম্বন্ধে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার অনুরোধ করেন। স্যার গাজ্‌নবীর মন্তব্য-অনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতের সকল প্রদেশে একটি ইস্তাহার প্রচার করেন। উহার ফলে বঙ্গদেশে মুসলমান-শিক্ষা-পরামর্শ-সংসদ্ (Moslem Educational Advisory Committee) নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা তদানীন্তন মিঃ হর্ণেল ইহার সভাপতি হন এবং স্যর গাজ্‌নবী, নবাব বাহাদুর নবাব আলি চৌধুরী প্রভৃতি ইহার সদস্য হন। এক বৎসর ধরিয়া এই কমিটির অধিবেশন হয় এবং কমিটি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন। ইহারই অল্পদিন পরে জর্ম্মন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা তখনকার মত চাপা পড়িয়া যায়।

আনন্দমোহন কলেজের উন্নতি-সাধন

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ময়মন-

সিংহ পরিদর্শন করেন। সেই সময়ে ময়মনসিংহের বিশিষ্ট কতিপয় অধিবাসীকে সঙ্গে লইয়া স্যার গাজ্‌নবী আনন্দমোহন কলেজকে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিবার জন্য গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আনন্দমোহন কলেজের জন্য সরকারকে মোটা রকমের অর্থসাহায্য করিতে বলেন। লর্ড কারমাইকেল তদুত্তরে বলেন,—যদি ময়মনসিংহের অধিবাসিগণ মোটা রকমের চাঁদা তুলিতে পারেন, গবর্ণমেণ্টও তাহা হইলে তাহার অনুরূপ মোটা টাকা আনন্দমোহন কলেজের উন্নতি-সাধনার্থ প্রদান করিবেন। অতঃপর স্যার গাজ্‌নবীর চেষ্টায় আনন্দমোহন কলেজের জন্য চাঁদা সংগৃহীত হয়। স্যার গাজ্‌নবীও স্বয়ং চাঁদা দেন এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের প্রতিশ্রুত অর্থ দান করেন।

স্থায়ী কাজি কমিটীর সদস্য

১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে মুসলমানগণের বিবাহের রেজিষ্ট্রার নিয়োগের জন্য স্থায়ী কাজি কমিটি গঠিত হইলে স্যর গাজ্‌নবীকে উহার সদস্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়।

হেজাজ, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া যাত্রা

স্যর গাজ্‌নবী যখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন, সেই সময়ে—১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কোনও বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে মক্কার শরীফের (পরে রাজা হুসেন) দরবারে গমন করেন। তুরস্কের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র-সচিব তালাৎ বে মক্কার শরীফকে এই মর্ম্মে তার করেন যে, স্যর গাজ্‌নবীকে রাজ-অতিথিরূপে সম্মানিত করিবেন। তদনুসারে মক্কার শরীফ মহাশয় স্যর গাজ্‌নবীকে রাজ-অতিথিরূপে সম্বর্দ্ধনা করেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি আরাফাতের সমতল ক্ষেত্রের তীর্থসমূহ পরিদর্শন করেন। সুতরাং তিনি 'হাজি' বা "অল্‌হজ্‌"। হেজাজ, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ায় যে সকল যাত্রী তীর্থদর্শনের জন্য গমন করে, তাহাদের

যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্যই স্যর গাজ্‌নবী এইসকল স্থান পরিদর্শন করেন। বড়লাটের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যর জেমস ডুবলে স্যর গাজ্‌নবীর হস্তে হেজাজ, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার কন্সালগণের নামে পরিচয় পত্র লিখিয়া দেন। স্যর গাজ্‌নবী কামেরন, জেড্‌ডা, পোর্ট সৈয়দ, বৈরুত, দামাস্কাস ও জেরুজালেম-স্থিত ব্রিটীশ দূতাবাস পরিদর্শন করেন। তিনি কেবল যে হেজাজের প্রায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন তাহা নহে,—ব্যালবেক, হাইফা, কাইফা, নাবুলাস, বেথেলহেম, গ্যালিলি, সাগরকূলবর্ত্তী তাইবিবিয়া-প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি প্রসিদ্ধ হেজাজ রেলপথে দামাস্কাস হইতে মদিনা গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি তাবুক, ম্যান্‌ এবং তুর্ক দুর্গ ও ব্লক-হাউস-সমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। স্যর গাজ্‌নবীই সর্ব্বপ্রথম মক্কার শরীফ ও শাসনকর্ত্তা এবং ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাটের মধ্যে পরিচয় ও সদ্ভাবের প্রতিষ্ঠা করেন।

হেজাজ হইতে পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্যর গাজ্‌নবী ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটে একটী রিপোর্ট পেশ করেন। ইহার ফলে হজ-যাত্রী ভারতীয়গণের মক্কা-মদিনাদি তীর্থ-গমনের অসুবিধা বিদূরিত হয়। স্যর গাজ্‌নবীর এই রিপোর্ট পরে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। দামাস্কাসের ব্রিটিশ কন্সাল মিঃ ডেভিসের অনুরোধে তিনি দামাস্কাস হইতে মদিনা-ভ্রমণ-বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করেন। এই বিবরণে ম্যানের দক্ষিণ অঞ্চল, মাদাইন সালির পার্ব্বত্য গুহাসমূহ-ভ্রমণ-পথের দুর্গ ও ব্লকহাউসগুলির বিষয় বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। দামাস্কাসের ব্রিটিস কন্সাল স্যর গাজ্‌নবীর এই ভ্রমণ-বিবরণ লণ্ডনের ফরেন অফিসে অর্থাৎ বৈদেশিক বিভাগের দপ্তরখানায় পাঠাইয়া দেন। কোনও ইউরোপীয় বা খ্রীষ্টানকে

এই পথে কখনও মদিনায় যাইতে দেওয়া হয় নাই সেইজন্য স্যর গাজ্‌নবীর এই ভ্রমণ-বিবরণই তখন একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল।

জর্ম্মণ-পক্ষ-গ্রহণে তুরস্ককে নিষেধ

হেজাজ, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ায় তিনি ছয় মাস ধরিয়া ভ্রমণ করেন। ইহার ফলে তুরস্ক গবর্মেণ্টের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। জর্ম্মণীর সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধিলে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যর জেমস ডুবলের অনুরোধে তিনি নিধাম পাশা, তালাৎ বে, দামাস্কাসের শাসনকর্ত্তা, মদিনার শাসনকর্ত্তা ও তুর্ক গবর্মেণ্টের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর মারফতে যাহাতে তুরস্ক জর্ম্মণ-পক্ষে যোগ না দেয় সে পক্ষে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তুরস্কের তদানীন্তন যুদ্ধসচিব আনোয়ার পাশা তখন তথাকার হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ছিলেন, তিনিই তুরস্ককে জর্ম্মণপক্ষে যোগ দেওয়াইয়া ছিলেন;

খিলাফৎ আন্দোলন ও সমর-ঋণ

যখন খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং মুসলমানগণের মনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ সঞ্চারের চেষ্টা চলিতে থাকে সেই সময়ে স্যর গাজ্‌নবী গবর্মেণ্টের পক্ষে দণ্ডায়মান হন। তখন নানাপ্রকার মিথ্যা জনরব প্রচার করিয়া গবর্মেণ্টের প্রতি মুসলমান জনসাধারণের মনে বিরাগের উদ্রেক করা হইতেছিল। স্যর গাজ্‌নবী এই সকল অমূলক জনরবে তাঁহার স্বদেশবাসীকে আস্থা স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়া, এই সন্ধিক্ষণে গবর্ণমেণ্টের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন। অতঃপর সমর-ঋণ-সংগ্রহের সময়ে স্যর গাজ্‌নবী স্বয়ং যে কেবল সমর-ঋণ কাগজ খরিদ করিয়া সরকারকে যুদ্ধ-পরিচালনে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা নহে; বহু লোককে তিনি সমর-ঋণের কাগজ খরিদ করাইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপকার করিয়াছিলেন। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে হাস-

পাতালে ও আম্বুলান্স কোরে কার্য্য করিবার জন্য তিনি একটি দল মেসোপাটেমিয়ায় পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার সহায়তা করিয়াছিলেন।

দ্বৈতশাসন ও স্যর গাজ্‌নবী

১৯২০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত ভারত-সচিব মি· মণ্টেগু স্যর উইলিয়ম ডিউক (বাঙ্গালার ছোট লাট ছিলেন পরে ভারত-সচিবের মন্ত্রণা-পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন) এবং অন্যান্য কয়েক জন রাজপুরুষ ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময়ে স্যর গাজ্‌নবী-প্রস্তাবিত দ্বৈতশাসননীতি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পেশ করেন। তাঁহার মন্তব্যে তিনি দ্বৈতশাসন-পদ্ধতির ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইজন্য ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি স্যর উইলিয়ম ডিউক কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হন নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড রোণাল্ডসে স্যর গাজ্‌নবীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য নিযুক্ত করেন। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি পর পর তিনবার এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দ্বৈতশাসনের আমলের প্রথম ব্যবস্থাপক সভা

১৯২১ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগুর দ্বৈতশাসনের আমলের প্রথম ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। স্যর গাজ্‌নবী এই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ না করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন এবং ইহার সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইবার কোনই চেষ্টা করেন নাই। তবে তিনি অসহযোগ আন্দোলন ও উহার কুফলের বিরুদ্ধে যথাশক্তি কার্য্য করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থাপক সভার প্রথম

বৈঠকে (১৯২১—১৯২৩ খৃষ্টাব্দে) ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিবার তেমন কোনও চেষ্টা হয় নাই। তবে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের (ভারত-সচিবের মন্ত্রণা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য) নেতৃত্বে কতিপয় সদস্য ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উক্ত ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় বৈঠক

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা সহরে স্যর গাজ্‌নবীর সহিত বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড লিটনের সাক্ষাৎ হয়। তাহার ফলে স্যর গাজনবী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার জন্য নির্ব্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হন। পরে তিনি নির্ব্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণও হইয়াছিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা প্রায় ৪০০০ ভোট অধিক পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পরলোকগত সি-আর দাশ মহাশয় স্বরাজ্যদল গঠন করেন এবং কংগ্রেস হইতে এই মর্ম্মে অনুজ্ঞা গ্রহণ করেন যে, স্বরাজ্যদল আমলাতন্ত্রের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যরূপে প্রবেশ করিতে পারিবে। কংগ্রেসের যে অধিবেশনে এই অনুজ্ঞা প্রদত্ত হয় সেই অধিবেশনের সভাপতিও ছিলেন সি-আর দাশ মহাশয়। তিনি স্বরাজ্যদলের প্রচার-কার্য্য এরূপ সাফল্যের সহিত পরিচালিত করেন যে, নির্ব্বাচন-যুদ্ধে স্বরাজ্যদলের প্রায় সকল সদস্যপদপ্রার্থীই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমানে সম্মিলিতভাবে যাহাতে কার্য্য করিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে দাশ মহাশয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণের সহিত একটি আপোষ-সর্ত্ত করেন। তাহা "বেঙ্গল প্যাক্‌ট" নামে বিখ্যাত। এই আপোষ-সর্ত্তের ফলে বহু মুসলমান স্বরাজ্যদলভুক্ত হন। ইঁহাদিগকে লইয়া পরে ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজী সদস্যসংখ্যা ৫০এর উপর দাঁড়াইয়াছিল। এইরূপ শক্তিশালী দল যে মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া দিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার মন্ত্রিপদে প্রথম নিয়োগ

সম্পূর্ণ বিধিসঙ্গতভাবে লর্ড লিটন স্যর গাজ্‌নবীকে ডাকিয়া আনাইয়া বলিলেন—আপনি মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পারেন? স্যর গাজ্‌নবী বলিলেন,—আমি বিবেচনা করিয়া পরে আপনাকে জানাইব, কিছু সময় আমাকে দিন। অতঃপর লর্ড লিটন মিঃ বি চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বলিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহার পর কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও মিঃ ফজলল হককে লর্ড লিটন মন্ত্রী নিয়োগ করিলেন। কিন্তু ইঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, যদি স্যর গাজনবীকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া ইঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি না করা হয়, তাহা হইলে স্বরাজ্য দলের আক্রমণ ইঁহারা সহ্য করিতে পারিবেন না। ইঁহারা স্যর গাজ্‌নবীকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার জন্য লর্ড লিটনকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সুতরাং ইঁহাদের নিয়োগের কয়েক দিন পরেই লর্ড লিটন স্যর গাজ্‌নবীকে মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্যর গাজ্‌নবী উহা গ্রহণে সম্মত হইলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা করা হয় যে, স্যার গাজ্‌নবী মন্ত্রী হইয়াছেন এবং তাঁহার উপর কৃষি, শিল্প, সমবায়, আবকারী ও পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট—এই কয়টি বিভাগের পরিচালনভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের মাথার উপর নির্ব্বাচনের খড়্গ ঝুলিতেছিল। দুই এক মাস পরেই তিনি যেমন সদস্যপদপ্রার্থী হইয়া নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন, অমনই পরাজিত হইলেন। কাজেই তাঁহার মন্ত্রি-পদও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। তিনি মন্ত্রিপদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইলেন।

ফলে তাঁহার অধীন স্বায়ত্ত-শাসন ও স্বাস্থ্য-বিভাগের ভার তখন স্যর গাজ্‌নবীর উপর ন্যস্ত হইল। প্রকৃত কথা বলিতে কি, তখন দুইজন মন্ত্রীর কার্য্যভার তাঁহারই উপর পড়িল।

মন্ত্রিগণের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব নিস্ফল

ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের প্রারম্ভ হইতেই স্বরাজ্যদল মিঃ সি-আর দাশের নেতৃত্বে মন্ত্রিমণ্ডলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং মন্ত্রিগণের উপর অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। কিন্তু সে প্রস্তাব ভোটে টিকে নাই; তাহাতে স্বরাজ্যদল পরাজিত হন। ইহার পর স্বরাজ্যদল অন্যান্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া মাত্র দুইটি ভোটের আধিক্যে মন্ত্রিমণ্ডল ধ্বংস করেন। তখন মন্ত্রীরা মাত্র ৮ মাস কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ৬ মাস তাঁহারা বিনা বেতনে কর্ম্ম করেন। একটি ব্যাপারে স্বরাজ্যদলের মন্ত্রিগণের উপর শত্রুতা-সাধনের সুবিধা হইয়াছিল। মিঃ ফজলুল হকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা বাধ্যতাঘটিত পদত্যাগে সম্মতিদানের জন্য স্যর গাজনবী পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত ক্ষতি সহ্য করিয়াও আপনার সতীর্থের সঙ্গে রহিলেন। অতঃপর মিঃ ফজলুল হকের আর্থিক অস্বচ্ছলতা শীঘ্রই সাধারণের সমক্ষে প্রকটিত হইয়া পড়িল। প্রধানতঃ ইহাতেই মন্ত্রিমণ্ডলের ধ্বংস সাধিত হইল।

লর্ড লিটনের প্রশংসা

ইহার পর স্যর গাজ্‌নবী যখন মন্ত্রিপদ-পরিত্যাগের পত্র দাখিল করেন তখন স্যর গাজ্‌নবীর এই উদারতা ও সতীর্থের জন্য আত্মত্যাগ-দর্শনে লর্ড লিটন প্রীত হইয়া তাঁহার কার্য্যকলাপের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

মন্ত্রিগণের সম্মানার্থ ভোজ-সভা

কলিকাতার মুসলমান সাহিত্য-সমিতি ১৯২৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণের সম্মানার্থ এক ভোজ-সভার অনুষ্ঠান করেন। উহাতে স্যর গাজ্‌নবী এক উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেন এবং উহার একস্থলে উল্লেখ করেন যে, মন্ত্রিগণের বেতন বরাদ্দ না করিবার কারণ যে মন্ত্রিগণের উপর অনাস্থাজ্ঞাপক তাহা নহে, স্বরাজীদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্বেশবশে এবং কেহ কেহ বা সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশে পরিচালিত হইয়া এই কর্ম্ম করিয়াছেন।

মুডিম্যান কমিটিতে সাক্ষ্যদান

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সিমলা-শৈলে মুডিম্যান কমিটির বৈঠক বসিয়াছিল। স্যর গাজ্‌নবী তথায় যাইয়া লিখিত সাক্ষ্য দাখিল করেন। এই সম্বন্ধে তিনি যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন তাহার নাম দেন :—"Memorandum on the working of the India Act of 1919 and the Rules thereunder in Bengal," অর্থাৎ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের কর্ম্ম দ্ধতি ও বাঙ্গালায় তৎসংক্রান্ত বিধি বিধান সম্বন্ধে মন্তব্য। তাঁহার এই মন্তব্য সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহার কিয়দংশ তারযোগে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। এই মন্তব্যের এক স্থলে স্যর গাজ্‌নবী বলিয়াছেন —"আমি এমন কথা বলি না যে, ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন সম্পূর্ণ দোষত্রুটীশূন্য; তবে আমি বলি যে, ইহার সংস্কার বা উন্নতি করা যাইতে পারে। আমি অনুরোধ করিতেছি যে, প্রয়োজনমত সংশোধন করিয়া লইয়া এই আইন-অনুযায়ী পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত কার্য্য করা হউক। কারণ, এই উপকরণসমূহ লইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতির ভিত্তি রচিত হইবে। পূর্ণদায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত

করিবার পূর্ব্বে প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা কিরূপে শাসন-কার্য্য চালাইতে হয় তাহা আমাদের শিক্ষা করা উচিত এবং ইহাই যে প্রকৃত রাজনীতিসম্মত কার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও রূপ পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা নাই। আমাদের মত দেশে অল্পে অল্পে অর্থাৎ দফায় দফায় দায়িত্বমূলক শাসনাধিকার প্রদান করা উচিত। এক দফা যাহা দেওয়া হইল তদনুসারে দেশের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দেশের লোক শিক্ষা করিল। এক দফার শিক্ষা শেষ হইল, তখন তদুপরি আবার এক দফা শাসনাধিকার দেওয়া হইল। ইহাও দেশবাসী শিখিয়া লইল। পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি এইরূপ ক্রম অনুসারে অর্থাৎ এক এক ক্রম করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, এই দেশের শাসন-ব্যাপারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু বিভিন্নরূপ স্বার্থ সন্নিহিত আছে।"

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রিগণের বেতন বরাদ্দ হইবার পর আবার এক মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের চেষ্টা হয়। এবারকার মন্ত্রি-মণ্ডল নবাব বাহাদুর নবাব আলি চৌধুরী ও সন্তোষের রাজাকে লইয়া গঠিত হয়। নয় দিন পরে মিঃ সি-আর দাশ মহাশয়ের নেতৃত্বে স্বরাজ্য-দল এই মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এবারে মিঃ ফজলুল হক মন্ত্রিমণ্ডল ধ্বংস করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার পর ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে দ্বৈত-শাসন-পদ্ধতি বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল।

লাট-প্রাসাদে কনফারেন্স

বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের সদস্যপদ হইতে অবসর গ্রহণ এবং ত্রিশ বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল সরকারের অধীনে কর্ম্ম করিবার পর স্তর আবদার রহিম আলিগড়ে এক বক্তৃতা করেন এবং সেই বক্তৃতার ফলে

তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া উঠেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ কলিকাতা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও হাঙ্গামার লীলাভূমি হইয়া পড়ে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে লর্ড লিটন লাট-প্রাসাদে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে এক পরামর্শ-সভায় আহ্বান করেন। মুসলমান-গণের পক্ষে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন—স্যর আবদার রহিম ও স্যর গাজ্‌নবী এবং হিন্দুগণের পক্ষে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন মিঃ বি চক্রবর্ত্তী, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, এটর্ণী মিঃ জে-এন বসু ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ। শিখদিগের শোভাযাত্রা শীঘ্রই বাহির হইবে, তৎসম্বন্ধে উভয়পক্ষে একটা মীমাংসা করা এবং মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইবার সম্বন্ধে আপোষ করা—এই উভয় উদ্দেশ্যেই পরামর্শ-সভা আহূত হইয়াছিল। কিন্তু মীমাংসার চেষ্টা সফল হয় নাই। মুসলমানগণের প্রতিনিধিগণ যদিও শিখ-শোভাযাত্রা-সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ-সম্বন্ধে আপনাদিগকে তফাতে রাখিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের স্বজাতীয়গণের উদ্দেশে এক ইস্তাহার বা নিবেদনপত্র প্রচার করিয়াছিলেন. উহাতে তাঁহারা শিখ-শোভাযাত্রা-উপলক্ষে মুসলমানগণকে সম্পূর্ণরূপে শান্ত-সংযত হইয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

লর্ড লিটন আর একটী কনফারেন্স বা পরামর্শ-সভার আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাতে যোগ দিবার জন্য স্যর গাজ্‌নবী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতেও কোনও রূপ মীমাংসা হয় নাই।

অতঃপর স্যর গাজ্‌নবী প্রভূত ত্যাগস্বীকার করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং স্বয়ং ঐগুলি লইয়া গিয়া দার্জ্জিলিঙ্গে লর্ড লিটনের হস্তে প্রদান করেন।

টাউন হলের সভায় সভাপতি

সেই সময়ে বাঙ্গালা সরকার মসজিদের সম্মুখে বাজনার সম্বন্ধে যে

নির্দ্ধারণ করেন তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের একেবারেই মনঃপূত হইল না বলিয়া মুসলমানগণ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন তারিখে কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় এক লক্ষ লোক সমবেত হয় এবং এইজন্য সভামণ্ডপের বাহিরের প্রান্তরে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত সভারও অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। এই বিরাট সভায় একটি মাত্র প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবটী এই :—সভাপতি স্যর গাজ্‌নবী যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাই মসজিদের সম্মুখে বাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে সমগ্র মুসলমান সমাজের অনুমোদিত মীমাংসা এবং অদ্যকার টাউন হলে মুসলমানগণের এই মহাসভা একবাক্যে সভাপতি স্যর গাজ্‌নবীর এই মীমাংসারই সমর্থন করিতেছে।

সেণ্ট্রাল ন্যাশন্যাল মেহ্‌মেডান এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট

কয়েক মাস পরে সাম্প্রদায়িক বিভ্রাট প্রশমিত হইল। পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময় আসিয়া পড়ায় সকলেরই মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হইল। এদিকে স্যর গাজ্‌নবী স্যর আবদার রহিমের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। কেন করিলেন, তাহার কারণ উল্লেখ করা এস্থলে প্রয়োজনীয় নহে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে স্যর গাজ্‌নবী মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিলে সেণ্ট্রাল ন্যাশন্যাল মেহামেডান এসোসিয়েসন তাঁহাকে তাঁহাদের সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। এবারে তিনি এই এসোসিয়েসনের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইলেন। এই এসোসিয়েসন বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; রাইট অনারেবল মিঃ সৈয়দ আমীর আলি কর্ত্তৃক ইহা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। স্যর আবদর রহিম ব্যবস্থাপক সভায় একটী মুসলমান দল গঠিত করেন। কিন্তু এই এসোসিয়েসন স্যর আবদারের দল-গঠনের বহু পূর্ব্বে ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ মুসলমান

সদস্থকে লইয়া একটী দল করেন। স্যর গাজ্‌নবী বিভিন্ন মুসলমান-নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন মুসলমান সদস্যপ্রার্থীকে নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছিলেন। নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গেলে দেখা গেল, কেবল যে স্যর গাজ্‌নবী প্রতিপক্ষ অপেক্ষা বহুসংখ্যক ভোট অধিক পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার গঠিত মুসলমান দলের প্রায় সকল সদস্যপদপ্রার্থীই ভোটের আধিক্যে নির্ব্বাচন-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন।

বড়লাটের সহিত প্রতিনিধি-সঙ্ঘ লইয়া সাক্ষাৎ

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড় লাট লর্ড আরউইন প্রথমবার কলিকাতা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে সেণ্ট্রাল ন্যাশন্যাল মেহমেডান এসোসিয়েসন বড়লাট বাহাদুরকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। এসোসিয়েসনের প্রতিনিধিগণ এসোসিয়েসনের সভাপতি স্যর গাজ্‌নবীর নেতৃত্বে বড়লাটের সকাশে গমন করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎকারিগণের মধ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বহু মুসলমান সদস্য ছিলেন—যাঁহারা স্যর গাজ্‌নবীর দলভুক্ত। যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট-পদে স্যর গাজ্‌নবীর ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সদস্যদলের জেনারেল সেক্রেটারী খাঁ বাহাদুর এমাদুদ্দীনকে নিযুক্ত করা হয়, তখন স্যর গাজ্‌নবীর দলের শক্তি ও প্রভাবের প্রভূত পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই বিষয় বাঙ্গালা সরকার অবগত ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা ভুল করিয়া ফেলিলেন এবং স্যর আবদার রহিমকে ডাকিয়া পাঠাইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি কয়েকদিন মাত্র মন্ত্রীর আসনে বসিয়া তাঁহার এক হিন্দু সতীর্থের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও হিন্দুই তাঁহার সহিত কার্য্য করিতে চাহিলেন না। তখন গবর্ণর, স্যর আবদার

রহিমকে মন্ত্রিপদে ইস্তফা দিতে বলিলেন এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্যর গাজ্‌নবী ও মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালার মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার মন্ত্রী

দ্বিতীয় বারের মন্ত্রিত্বের সময়েও স্যর গাজ্‌নবীর উপর হস্তান্তরিত বিভাগগুলির অধিকাংশেরই পরিচালনভার ন্যস্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার সতীর্থ মিঃ বি চক্রবর্ত্তীর হস্তে শিক্ষা, আবকারী ও পাবলিক ওয়ার্কসের ভার অর্পিত হইয়াছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে স্বরাজ্যদল স্যর আবদার রহিমের সহিত একযোগে মন্ত্রিগণের বেতন না-মঞ্জুর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৪টি ভোটে তাঁহারা পরাজিত হন।

স্যর গাজ্‌নবীর উপর কৃষি, শিল্প, সমবায়, পশুচিকিৎসা, স্বায়ত্ত শাসন, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, রেজিষ্ট্রেশন, সরকারী উদ্যানসমূহ—এই কয়টি বিভাগের ভার অর্পিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সরকার সর্ব্বশুদ্ধ ২০টা বিভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ৬টি বিভাগ স্যর গাজ্‌নবীর পরিচালনাধীন ছিল। স্যর গাজ্‌নবী সাধারণতঃ কঠোর পরিশ্রমী। তাঁহার অধীন বিভাগসমূহের কার্য্য-পরিচালনার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। আট মাসের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি কার্য্যের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এইগুলি কার্য্যে পরিণত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে দেশবাসীর প্রভূত কল্যাণ হইত। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ওলাউঠার টীকা বাঙ্গালাদেশে উদ্ভাবিত হয়। স্যর গাজ্‌নবী ওলাউঠার টীকা চালাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার চেষ্টা ও প্রচার-কার্য্যের ফলে তাঁহার মন্ত্রিত্বের সময়ে প্রায় দশলক্ষ লোক কলেরার টীকা লইয়াছিল। পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনের পরিকল্পনা—যাহা ডাঃ

বেণ্টলী বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছিলেন, তাহা স্যর গাজ্‌নবীর মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই পরিকল্পনা-অনুসারে তিনি প্রত্যেক থানায় একটি করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনের উপায়জ্ঞাপক আশ্রম (Health Bureau) স্থাপন করিবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামগুলি যে কচুরীপানার জন্য নষ্ট হইতে বসিয়াছে সেই কচুরীপানা ধ্বংস করিবার জন্য তিনি সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের গৃহপালিত পশ্বাদির দৈহিক অবস্থা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতির জন্য তিনি কতকগুলি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। পশুচিকিৎসার জন্য দেশের সর্ব্বত্র পশুচিকিৎসালয়-স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের ছেলেরা যাহাতে কৃষিকে জীবিকার্জ্জনের উপায়রূপে গ্রহণ করে সেজন্য তিনি কৃষিকে জনপ্রিয় করিবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিলেন। কুটীর-শিল্পের উন্নতি-সাধনে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। বরিশাল, বহরমপুর, চুঁচুড়া ও অন্যত্র মেডিক্যাল স্কুল-সমূহ স্থাপন করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার বিস্তার-সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মফঃস্বলের হাসপাতালগুলিকে আধুনিক ধরণে উন্নীত করিবার কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতে তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এইসকল ব্যতীত অধুনা-অপ্রচলিত বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসন ও বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন সংশোধন, পল্লীগ্রামের জনসাধারণকে সমবায়-প্রথার উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া, পাট ও অন্যান্য দ্রব্য-বিক্রয়ের সমিতি-স্থাপনের ব্যবস্থা সমবায়-প্রথার মত লোকপ্রিয় করিয়া তুলা, মুসলমানগণের বিবাহের রেজিষ্ট্রার-সংগ্রহের জন্য সম্পূর্ণ নূতন এক এজেন্সির সৃষ্টি, সব-রেজিষ্ট্রার, পশুচিকিৎসক এবং সরকারের অপরাপর অল্পবেতনভোগী কর্ম্মচারিগণের বেতন ও অবস্থার উন্নতি-সাধন প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি তিনি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়াছিলেন এবং ঐগুলিতে হস্তক্ষেপ

করিবারও উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিলেন। স্যর গাজ্‌নবী যখন প্রথম বার মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই সময়ে তিনি কৃষিবিভাগে হাতে কলমে যাহাতে চাষবাস দেখাইয়া দেওয়া হয় সেই বিষয়ে এক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা কৃষিবিভাগের গবেষণা-কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। গবর্ণমেণ্টের কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রসমূহে তিনি হাতে কলমে কৃষিকার্য্য করিয়া দেখাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন যে, কৃষিকার্য্য লাভজনক ব্যবসায়। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলেরা যদি কৃষিকার্য্য অবলম্বন করে তাহা হইলে বেকার-সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে—ইহাও তিনি দেখাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

স্যর গাজ্‌নবী দুইবার অন্যান্য বিভাগের সহিত সমবায়-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। এই জন্য তিনি জাতিগঠনমূলক সমুদায় বিভাগগুলি যাহাতে একযোগে দেশবাসীর কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইতে পারে সেইভাবে সকল বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে গঠিত করিয়াছিলেন। একই মহৎ উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার একটি পদ্ধতি তিনি স্থির করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যের উন্নতিকর বিষয়সমূহের পরিজ্ঞাপক স্বাস্থ্য-বিভাগের ট্রেণ (Public Health Demonstration Train) যাহা দেশের সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। স্যর গাজ্‌নবীর বিশেষ চেষ্টাই যে এই সাফল্যের কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিভাগ-সমূহের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। স্যর গাজ্‌নবীকে অর্থের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিবের সহিত প্রায়ই বিবাদ করিতে হইত। বর্ত্তমান দ্বৈতশাসননীতির এই ত্রুটির জন্য মন্ত্রীদের কার্য্যে বাধা ঘটে।

স্যর গাজ্‌নবী দেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল অঞ্চলের লোকের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন ও তাহাদের অভাব-অভিযোগের বিষয় স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তিনি সমগ্র জুলাই ও

আগষ্ট মাসের কিয়দংশ ধরিয়া বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল অঞ্চল দ্রুত পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন বিভিন্ন বিভাগ-সমূহের সহিত সম্পর্কিত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই তিনি পরিদর্শন করেন। এই সফরের সময়ে তিনি বহু অভিনন্দনপত্র পাইয়াছিলেন এবং তাহার উত্তরে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পশ্চিম বঙ্গের সফর চুঁচুড়া হইতে এবং পূর্ব্ববঙ্গের সফর ফরিদপুর হইতে আরম্ভ হয়। ফরিদপুর হইতে তিনি ফরিদপুরের জেলা জেলের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন। ব্যবস্থাপক সভার পরবর্ত্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবার তিন চারি দিন পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ব্যবস্থাপক সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনের দিন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

এই সময়ে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায় অর্থাৎ দেউলিয়া হইয়া বন্ধ হয়। স্বরাজ্যদল এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং স্যর আবদার রহিমের সহায়তায় মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপনের প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতন, মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থনকারী কোনও কোনও সদস্যের বিদেশে অবস্থান এবং বাঙ্গালা সরকারের অর্থসচিব ও সরকারী সদস্যের নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির অভাব—এই তিন কারণেই যে মন্ত্রিমণ্ডলের পতন হইয়াছিল তাহা নহে; স্বরাজ্য দল এবং তাঁহাদের সহযোগী স্যর আবদার রহিম ও তদীয় শিষ্য নবাব মসারফ হোসেন কর্ত্তৃক অবলম্বিত উপায় দ্বারাই মন্ত্রিমণ্ডল ধ্বংস হইয়াছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মন্ত্রিপদ পরিত্যাগ করিবার পরে স্যর গাজ্‌নবী এক বক্তৃতা করেন; উহাতে বাঙ্গালা দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ ছিল।

রয়েল ষ্ট্যাটুটরী কমিশন

ইহার তিন মাস পরে রয়েল ষ্ট্যাটুটরী কমিশনের কথা সর্ব্বত্র আলোচিত

হইতে আরম্ভ হয় এবং পরে এই কমিশনের সমস্যাই সকল রাজনীতিক সমস্যার মধ্যে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর স্যর আবদার রহিমের সভাপতিত্বে আহূত টাউন হলের এক সভায় কমিশন বয়কটের ফতোয়া বাঙ্গালা দেশে প্রথম জারি হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর স্যর গাজ্‌নবী কমিশন-সম্পর্কে বাঙ্গালা দেশে এক ইস্তাহার জারি করেন। তাহার পরে কমিশনের বিরুদ্ধে একটি কথাও শুনা যায় নাই। বিলাতের পার্লামেণ্ট ও লর্ডস্ মহাসভায় রয়াল ষ্ট্যাটুটরী কমিশন-সম্পর্কে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল উহার রিপোর্ট ভারতে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই স্যর গাজ্‌নবী তাহার এই ইস্তাহার জারি করেন। অতঃপর স্যর গাজ্‌নবী তাহার ইস্তাহারের অনুরোধ-অনুসারে রয়াল কমিশনের অনুকূলে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার ফলে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাহার পক্ষভুক্ত হন। তখন স্যর গাজ্‌নবী তাহাদের সহিত একযোগে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে দ্বিতীয় ইস্তাহার জারি করেন। স্যর মহম্মদ সফির সভাপতিত্বে লাহোরে নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু মিঃ জিন্না ও ডাঃ কিচলু কমিশন বয়কটের দলের দুইজন প্রধান ব্যক্তি বলিলেন,—লাহোরে নয়, নিখিল ভারত মোসলেম লীগের বৈঠক কলিকাতায় করা হউক। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, কলিকাতায় লীগের অধিবেশন হইলে কমিশন-বয়কটের প্রস্তাব পরিগৃহীত করাইবার পক্ষে সুবিধা হইবে। তাঁহারা নিখিল-ভারত মোসলেম লীগকে ভাঙ্গিয়া দুইভাগে বিভক্ত করিতে ও উহারই একটি ভাগকে লইয়া কলিকাতায় লীগের অধিবেশন করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু কলিকাতার অধিবেশনে বাঙ্গালার কোনও নেতৃস্থানীয় মুসলমানই, এমন কি, স্যর আবদার রহিম পর্য্যন্ত যোগদান করেন নাই। স্যর গাজ্‌নবী একদল বঙ্গীয় মুসলমানকে লইয়া লাহোরের নিখিল-ভারত মোসলেম-লীগের অধিবেশনে উপস্থিত

হন। তিনি সেখানে কমিশনের সহযোগিতা করিবার প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় প্রত্যাগমনের পথে তিনি পঞ্জাবে, যুক্ত প্রদেশে ও বিহারে কমিশনের সহযোগিতা করিবার অনুকূলে বক্তৃতা করেন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে ভারত-শাসন-পদ্ধতির একটি খসড়া তৈয়ারী করিবার জন্য আহ্বান করেন তিনি বলেন, শাসন-পদ্ধতির খসড়াটি এরূপভাবে রচিত হওয়া উচিত যাহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষিত হইবার ব্যবস্থা থাকিবে।

রাজ-সম্মান-লাভ

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জন্মদিন উপলক্ষে অলহাজ আব্দেল কেরিম গাজ্‌নবী সাহেবকে দেশ-হিতৈষণার পুরস্কারস্বরূপ স্যর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সমগ্র বঙ্গদেশে এই বৎসর একমাত্র তিনিই এই বিপুল গৌরবজনক উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুলাই তারিখে Simon Commissionএর সহিত সহযোগিতার নিমিত্ত প্রাদেশিক কমিটী নিযুক্ত হয়। ঐ কমিটীতে বঙ্গদেশীয় আইন-সভা হইতে স্যর আব্দেল কেরিম গাজ্‌নবী সাহেব সহ সাতজন সভ্য মনোনীত হন। পরে তিনি ঐ প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। Statutory Commission ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষভাগে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক কমিটী-সমূহের সভ্যগণ দিল্লীতে মিলিত হন এবং তথায় নানা জটিল সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্যর আব্দেল কেরিম গাজনবী সাহেব এই সম্মিলিত প্রাদেশিক সভ্যগণের নেতৃপদে বরিত হন।

পরে Statutory Commissionএর মেম্বরগণের ও এই সম্মিলিত প্রাদেশিক কমিটীর সভ্যগণের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং উহা সমাপ্ত হইলে Statutory Commissionএর সভাপতি স্যর জন সাইমন সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সময়ে তিনি বিশেষভাবে স্যর আব্দেল কেরিম গাজ্‌নবী সাহেবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলে স্যর আব্দেল কেরিম গাজ্‌নবী গভর্ণর বাহাদুরের শাসন-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন এবং তিনি ২২শে এপ্রিল তারিখে উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

স্যর গাজ্‌নবীর চিত্ত ধর্ম্মপ্রবণ। ইংলণ্ডে [illegible] ঈশ্বরতত্ত্ব (Divinity) তিনি তাঁহার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন। লণ্ডনে সিবিল সার্ভিস পড়িবার সময়ে তিনি আরবীভাষাকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন এবং কোরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মুসলমান তাহা নহেন, ধর্ম্মবিশ্বাসমতেও তিনি মুসলমান। মুসলমানের ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহার অস্থিমজ্জায় – তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, তাঁহার প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে অনুস্যূত। ইংলণ্ডের আঞ্জমান-ই-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই স্যর গাজ্‌নবী উহার সদস্য। ইহারই অনুকরণে উওকিংএ বর্ত্তমান মোসলেম মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার নেতা এক্ষণে আইরিস অভিজাত-শ্রেণীভুক্ত লর্ড হেডলি।

সদনুষ্ঠানে দান

স্যর গাজ্‌নবীর জীবন আদর্শ জীবন। তিনি আশৈশব যেভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন তাহা অপরের আদর্শস্বরূপ। ইনি

আদর্শ জমিদার। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন, এক্ষণে তিনি তাঁহার জমীদারী অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অস্ত্র আইনের আমলের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। তাঁহার গুপ্তদান অত্যন্ত অধিক। তিনি আজ ২৭ বৎসর কাল ধরিয়া স্বব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইয়া আসিতেছেন। ইহা ব্যতীত তিনি নিজ জেলার সকল সদনুষ্ঠানেই মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন, এমন কি, তাঁহার জেলার বাহিরেও তাঁহার অর্থসাহায্যের বিরাম নাই। তিনি আমাদের কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউটে পর্য্যন্ত অর্থসাহায্য করিয়াছেন

প্রায় চৌত্রিশ বৎসর হইল, স্যর গজ্নবী জনসেবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই দীর্ঘকাল তিনি নানা ভাবে দেশের কল্যাণজনক কার্য্য করিতেছেন। তিনি আজীবন প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ময়মনসিংহ জেলার বে-সরকারী কারাগার-পরিদর্শক (Non-official visitor of the Mymensingh Jail)। ২৬ বৎসর ধরিয়া তিনি ময়মনসিংহ জেলা-বোর্ডের সদস্য ছিলেন। বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে দুইবার তিনি পুরাতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি দুইবার বাঙ্গালার মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েন। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

তাঁহার একমাত্র পুত্র Mr. J. S. K. Ghuznavi B. Sc. ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার্থী মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পিতার জমিদারী ও রাজনৈতিক কার্য্যে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিলাত যাত্রা স্থগিত রাখিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য-প্রবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় দীননাথ দাস

স্বর্গীয় দীননাথ দাস

এই পৃথিবীতে কত পুরুষ-রত্ন জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের ও দেশের বহুবিধ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। কেহ শিক্ষায় কেহ দানে, কেহ সমাজ-সংস্কারের দ্বারা এবং কেহ কেহ ধর্ম্মমত-প্রচারাদি দ্বারা জগতের সবিশেষ হিতসাধন করিয়াছেন।

আমরা যে [illegible] মহাপুরুষের জীবনী-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি কোনও প্রসিদ্ধ রাজবংশে বা কোনও প্রসিদ্ধ উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি স্বীয় মহৎ কীর্ত্তিবলে বহু প্রসিদ্ধ উচ্চকুলাভিজাত [illegible] অনেক উপরে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। এইরূপ [illegible] চরিত্র মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ও [illegible] অস্বীকার করা যায় না।

পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পিতামাতার আনন্দ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভবিষ্যতে সে বড় হইবে তাহার সূচনা শৈশবেই—এমন কি জন্মের সময় হইতেই হইয়া থাকে। জানি না এই মহাপুরুষের জন্মকালে প্রকৃতি কোনও অনির্ব্বচনীয় শোভায় অলঙ্কৃতা হইয়াছিলেন কি না?

এই জীবন-আখ্যায়িকার নায়ক স্বর্গীয় দীননাথ দাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত [illegible]পাড়ার নিকটবর্ত্তী ছাতিন গ্রামে দরিদ্র রুইদাস-কুলে জন্ম-গ্রহণ করেন। অস্পৃশ্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও দীননাথ কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় সকলেরই অনুরাগ আকর্ষণ করেন। ইঁহার হৃদয় প্রকৃত বৈষ্ণবের হৃদয় ছিল। সেই গুণে সকলেই ইঁহাকে নিজের মনে করিতেন; ইনিও জগৎকে আপনার ভাবিতেন। ঠিক যেন 'হিতোপদেশে'র সেই শ্লোক —

"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥"

বাল্যকাল হইতেই দীননাথ ধীর ও স্থির ছিলেন, সাধারণ বালকগণের মত চঞ্চল বা চপল ছিলেন না। বাল্যকালে তাঁহার এই ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য দেখিয়া লোকে বলিত, এই বালক ভগবদিচ্ছায় বাঁচিয়া থাকিলে পরে একজন প্রসিদ্ধ পুরুষ হইবে। আত্মীয়স্বজনেরাও দীননাথের সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করিতেন এবং বলিতেন—ভবিষ্যতে দীননাথ অসাধারণ ব্যক্তি হইবে।

দীননাথের বয়স যখন পঞ্চম বৎসর সেই সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলিতেন—এই বালক যেন মূর্ত্তিমান বিবেক। ইহার কথাবার্ত্তা বালকের মত নহে, স্থিরধীর প্রৌঢ়ের মত। দীননাথ যেমন শিষ্ট তেমনই শান্ত।

বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিবার জন্য দীননাথকে ধূর্জ্জটিপাড়ার (ধর্ম্মরাজতলায়) গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। পাঠশালার গুরুমহাশয় দীননাথের প্রখর বুদ্ধি, গাম্ভীর্য্য এবং পাঠে মনোযোগ দেখিয়া তাঁহার খুবই প্রশংসা করিতেন। যাহা হউক, পাঠশালায় অল্পদিন পাঠ করিয়াই তিনি পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া ফেলেন।

শিশুকাল হইতেই দীননাথের দেব-দ্বিজে অচলা ভক্তি ছিল। যখন পাঁচ বৎসরের বালক, তখন হইতে গ্রামের দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিতেন। যজ্ঞোপবীত ধারীকে দেখিলেই প্রণাম করিয়া বলিতেন, "ঠাকুর! আমি ছোট ছেলে, আমার প্রণাম কি গ্রহণ করিবেন না?" বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

দীননাথের পৈতৃক বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বামুন-ঝাড়ার নিকটবর্ত্তী রতনপুর গ্রামে। ইঁহার পিতামহ কৃষ্ণমোহন বাণিজ্যের

কেন্দ্রস্থান ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সে সময়ে যান-বাহনাদি দুষ্প্রাপ্য ছিল। এইজন্য রতনপুর হইতে তিনি পদব্রজে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি সিমলা-কাঁসারিপাড়ায় চামড়ার জাঁতা তৈয়ারীর ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই ব্যবসা দ্বারা তাঁহার সংসার স্বচ্ছলে চলিয়া যাইত। সেই সময়ে কাঁসারিদিগের পিতল-কাঁসার তৈজসপত্রের খুবই কাটতি ছিল, এইজন্য চামড়ার জাঁতার প্রয়োজন যথেষ্ট হইত। কৃষ্ণমোহন এই ব্যবসা উপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতেন, আর তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী চারি পুত্র—নবকুমার, মাধবচন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর ও হংসেশ্বরকে লইয়া রতনপুর গ্রামে বাস করিতেন এবং সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের সংসারযাত্রা সম্পন্ন হইত।

হঠাৎ কলিকাতায় কৃষ্ণমোহনের অকাল-মৃত্যু ঘটিল। তখন তাঁহার স্ত্রী অভিভাবকহীন হওয়ায় চারি পুত্রকে লইয়া তাঁহার পিত্রালয় বীরভূম জেলার অন্তর্গত খুজুটীপাড়ার 'নকটবর্ত্তী ছাতিন গ্রামে চলিয়া যাইলেন সেখানে মাতুলগণের সাহায্যে পিতৃহীন পুত্রগণ যৎসামান্য কাজকর্ম্ম করিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের তৃপ্তি হইল না। তাঁহারা কাজকর্ম্মের বৃদ্ধিসাধন করিবেন বলিয়া প্রশস্ততর কর্ম্মক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শেষে চারিজনে যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহারা কলিকাতাতেই যাইবেন। ইঁহাদিগকেও যান-বাহনের অভাবে পদব্রজে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। ১২৬৩ সালে তাঁহারা কলিকাতায় উপস্থিত হন।

কিছুদিন পরে মাধবচন্দ্রের স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথের মৃত্যু হয়। তখন মাধবচন্দ্র তদীয় পুত্রগণ দীননাথ, বনিকলাল ও নারায়ণদাসকে সঙ্গে লইয়া কাঁসারিপাড়ার সন্নিকট গোয়াবাগানে স্বজাতিগণমধ্যে বাস করিতে থাকেন। নারায়ণদাস তখন শিশু; দীননাথ তাঁহার এই শিশু ভ্রাতাটিকে কোলে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।

পিতা মাধবচন্দ্রের সহিত দীননাথ গোয়াবাগানে ভস্ত্রা ও জুতার ব্যবসা আরম্ভ করেন। ক্রমে কারবারের বিস্তৃতির সহিত তাঁহারা গোয়াবাগান হইতে কৃষ্ণবাগানে উঠিয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে সন ১২৭২ সালে আশ্বিনমাসে পূজার সময় যে সর্ব্বব্যাপী ভীষণ ঝড় হয় তাহাতে একটি চামড়া-বোঝাই জাহাজ কলিকাতার সন্নিকট গঙ্গায় জলমগ্ন হয়। দীননাথ তদীয় পিতা মাধবচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই জলমগ্ন চামড়া খুব অল্প মূল্যে খরিদ করেন। পরে সেই চামড়া বিক্রয় করিয়া বহু লাভ হয় এবং এই অর্থই মূলধনস্বরূপ পাইয়া তাঁহারা নিজ ব্যবসায়ে নানাপ্রকার উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হন। এখানে অনেক বৎসর কারবার-পরিচালনার পর সন ১২৭৪ সালে যখন বিডন ষ্ট্রীট নামক রাস্তাটি নূতন বাহির হয়, সেই সময়ে দীননাথ তথায় একখণ্ড জমি ক্রয় করেন ও ক্রমশঃ পাকা বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বসবাস আরম্ভ করিয়া দেন। তিনি উদ্যোগী হইয়া পিতা মাধবচন্দ্রকে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য করেন।

মাধবচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের নাম—শ্রীনাথ, দীননাথ, রসিকলাল ও নারায়ণদাস এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের নাম—নন্দলাল, রজনীকান্ত ও গুরুপ্রসন্ন।

মাধবচন্দ্র পুত্র দীননাথের সকল কার্য্যের অনুমোদন করিতেন। ব্যবসা দীননাথেরই উপদেশ-অনুসারে পরিচালিত হইত এবং তাহার ফলে ব্যবসার ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মাধবচন্দ্র দীননাথের কোনও কার্য্যে বাধা দিতেন না। ব্যবসায় যে টাকা লাভ হইত, দীননাথ সেই টাকায় কৃষ্ণবাগান, উল্টাডিঙ্গী, ধর্ম্মতলা, ও চোপদারবাগান প্রভৃতি স্থানে জমি ক্রয় করিতেন। চোপদারবাগান সে সময়ে অত্যন্ত নোংরা ছিল, এইজন্য এই অঞ্চলে জমি ক্রয় করা হইলে মাধবচন্দ্র দীননাথকে মৃদু তিরস্কার করিয়াছিলেন।

গোলকগত দীননাথ দাসের পত্নী স্বর্গীয়া চন্দ্রাবলী দাসী

দীননাথের এরূপ দূরদৃষ্টি ছিল যে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, কলিকাতার উপকণ্ঠে এক্ষণে তিনি অল্পমূল্যে যে সকল জমি ক্রয় করিতেছেন, উত্তরকালে সহরের পরিসর বর্দ্ধিত হইবে এবং এইসকল জমিও তখন সহরের এলেকার মধ্যে যাইবে, তখন তাহার এই অল্পমূল্যে ক্রীত জমি-সমূহের মূল্য বিশগুণ হইয়া দাঁড়াইবে। যখন তিনি এইসকল জমি খরিদ করিয়াছিলেন, তখন ঐসকল জমি উপেক্ষিত ছিল বটে, কিন্তু উত্তরকালে এইগুলি যে উপেক্ষার বস্তু থাকিবে না, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই দূরদর্শন শক্তির ফলেই তিনি পরে প্রচুর বিত্ত ও সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সপরিবারে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতেছে—ইহা দেখিয়া মাধবচন্দ্র নিরুদ্বেগ হন এবং তাঁহার হৃদয়ে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার বাসনা জাগিয়া উঠে। এই বাসনার কথা তিনি তদীয় পুত্র দীননাথের নিকট ব্যক্ত করেন। দীননাথ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন, তাঁহার এই বাসনা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পিতার জীবিতকালে এই শুভ বাসনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

দীননাথের পিতৃদেব মাধবচন্দ্র ১২৯৩ সালের ৯ই শ্রাবণ পরলোক গমন করেন। তদীয় জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ ও তৃতীয় পুত্র রসিকলালের মৃত্যু হইয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর দীননাথ তদীয় সহোদর ভ্রাতা নারায়ণদাস এবং বৈমাত্র ভ্রাতা নন্দলাল, রজনীকান্ত ও গুরুপ্রসন্নকে লইয়া বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন।

দীননাথ উচ্চশিক্ষিত না হইলেও কি উপায়ে সহজেই অর্থাগম হইতে পারে, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন এবং সকল কার্য্যে তাঁহার

পিতার সহিত পরামর্শ করিতেন। তিনি বহু চিন্তার পর যে কার্য্যে হাত দিতেন, সেই কার্য্যে সহস্র বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও উহা হইতে বিরত হইতেন না। তিনি স্থিরসঙ্কল্প ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি ছিলেন।

দীননাথ বহুদিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন এদেশে চামড়া ট্যানিং বা পরিষ্কার করিবার কারখানা নাই। এই জন্য বিদেশীয় ট্যান-করা বা পরিষ্কৃত চর্ম্ম ক্রয় করিয়া দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতে হয়। ইহাতে লাভের পরিমাণ খুবই কম হয়। এইজন্য তিনি প্রথমে মাণিকতলার অন্তর্গত লালাবাগানে চামড়া ট্যানিংয়ের কারখানা স্থাপন করেন। কার্য্যবিস্তৃতির সহিত এই কারখানা পরে উল্টাডিঙ্গী-দুর্গাপুরে স্থানান্তরিত হয়।

সেইসময়ে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রিণ্টিং ষ্টেশনারী ও ষ্ট্যাম্প আফিসে বই বাঁধাইয়ের জন্য চামড়ার প্রয়োজন হয়। দীননাথ ৬০ বৎসর যাবৎ এই চামড়া নিজ কারখানায় প্রস্তুত করাইয়া সরবরাহ করিয়া আসিতেছিলেন।

ব্যবসায় চালাইবার জন্য দীননাথকে বিস্তর চামড়া খরিদ করিতে হইত। এই জন্য তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। তখন কলিকাতার লোক মৃত গো মহিষাদি পশু ভাগীরথীবক্ষে নিক্ষেপ করিত। সেই কারণ কলিকাতায় ভাগীরথী-বক্ষে গো-মহিষাদি পশুর মৃতদেহ ভাসিয়া যাইত। ইনি এই মৃত পশুগুলি তীরে উঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ইজারা লন। এই সকল মৃত পশুর গাত্র হইতে চর্ম্ম উত্তোলন করাইয়া ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য তিনি হিন্দুস্থানী চর্ম্মকার নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে এই ইজারা দীননাথের একচেটিয়া ছিল, এইজন্য ইহাতেও তাঁহার প্রভূত অর্থাগম হইত। কারণ, ইহার ফলে বাহির হইতে অনেক টাকার চামড়া খরিদ করার দায় হইতে তিনি অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর দীননাথ পিতার ব্যবসায় পূর্ব্ববৎ দেখিতে

লাগিলেন। অবশ্য সকল ভ্রাতাকে লইয়াই তিনি এই কার্য্য করিতেন। কিন্তু এই ব্যাপারে এক্ষণে একটী ব্যাঘাত ঘটিল। দীননাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণদাস উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগবিলাসী হইয়া পড়িলেন। তিনি কাজকর্ম্ম দেখিতেন না। কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই নারায়ণদাস প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকা উড়াইয়া দেন।

দীননাথ বহুবার নারায়ণদাসকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ অধঃপতনের পথে চলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। দীননাথ নানারূপ সদুপদেশ দিয়াছিলেন এবং অনেক রকমেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই এ সকল গ্রাহ্য করিলেন না।

দীননাথ আর কি করিবেন? সকল ভ্রাতাকে ডাকাইয়া একত্র করিলেন এবং বলিলেন—আমরা একান্নবর্ত্তী হইয়া সকলে এক সংসারে আছি; কিন্তু নারায়ণ যেভাবে পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আমাদের সকলকেই ২।১ বৎসরের মধ্যে পথে বসিতে হইবে। সুতরাং বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য তোমরা সকলে পৃথক হও, নহিলে আর রক্ষা নাই। ইহা ১২৯৬ সালের কথা।

এই কথা বলিবার সময়ে দীননাথের চক্ষু দিয়া দরদর-ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছিল। ভ্রাতাদিগকে তিনি প্রাণের তুল্য ভালবাসিতেন। তাঁহাদিগকে পরস্পর পৃথক করিয়া দিতে তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃগণ যখন বুঝিলেন যে, পৃথক হওয়া ব্যতীত অপর উপায় কিছুই নাই. তখন অগত্যা তাঁহারা পৃথক হইলেন। সকলেই পৈতৃক সম্পত্তি যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া লইলেন। গুরুপ্রসন্ন নাবালক ছিল, তাহার সম্পত্তি-রক্ষার আইনসঙ্গত ব্যবস্থা হইল।

শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ জিউর শ্রীমন্দির। কলিকাতা

বিদায়ে যোগদান করেন নাই। এইজন্ত তখন তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গোস্বামিপ্রভুদের নিকটে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অনেকে সে সময়ে দীননাথের নিকট অর্থসাহায্য লইতে ইতস্ততঃ করিতেন না বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত কোনও সৎকার্য্যে যোগ দিতেন না।

অদ্বৈতবংশ পতিতপাবন গোস্বামী প্রভুরা সকল জাতিকেই শিষ্য করেন, এমন কি, জাতিহীনা বারাঙ্গনাগণকেও শিষ্যত্ব অস্বীকার করেন না; কিন্তু রুইদাসদিগকে দীক্ষা দান করেন নাই। এইজন্য 'অধিকারী' বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে তাহাদিগকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। এই 'অধিকারী' বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। কারণ, ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে বৈষ্ণব-সমাজে তাঁহাদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইত। 'অধিকারী' বৈষ্ণব-সমাজের এই কপট ব্যবহারে দীননাথ অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হন।

এদিকে পিতার ঈপ্সিত বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার বাসনা দীননাথের অন্তরে বলবতী হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে মাণিকতলা - ৬০নং সিমলা রোডে তিনি একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। যে স্থানে মন্দির প্রস্তুত হয় সে স্থানের নিকটে মুসলমানদের একটি মসজিদ বিদ্যমান ছিল। মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে পূজার সময়ে শঙ্খঘন্টাদির রোলে নমাজের ব্যাঘাত ঘটিবে এবং তাহার ফলে নানারূপ হাঙ্গামার সূত্রপাত হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দেবোদ্দেশে নির্ম্মিত উক্ত মন্দিরে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ইহা ১৩১৫ সালের কথা। কিন্তু দীননাথের হৃদয়ের বাসনা-স্রোত রুদ্ধ হইবার নহে। নবোৎসাহে, নবোদ্যমে রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীটে এক ভূমিখণ্ডের উপর তিনি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দির নির্ম্মাণে তাঁহার প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে

দীননাথ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করেন।

সন ১৩২১ সালে ফাল্গুন মাসে দীননাথের মধ্যম পুত্র অদ্বৈতচরণ দাসের মৃত্যু হয়। তিনি পুত্রশোকে কাতর না হইয়াও পূর্ব্ববৎ স্বয়ং মন্দির-নির্ম্মাণের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন এবং ১৩২২ সালে বৈশাখ মাসের শেষে মন্দির নির্ম্মিত হইল; কিন্তু বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য দীননাথের হৃদয় যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য দিবারাত্র শ্রীভগবানের নিকট করুণভাবে প্রার্থনা করিতেন এবং বলিতেন, "হে প্রভু! এই দাসানুদাসের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া দিন।"

শ্রীভগবানকে কাতরকণ্ঠে ডাকিতেন, আর তাঁহার দুই নয়ন দিয়া ভক্তি-অশ্রু প্রবাহিত হইত। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আকুলি-বিকুলি করিয়া বেড়াইতেন। মন্দিরে বিগ্রহ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই জন্য তিনি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও উদারচেতা (এক্ষণে স্বর্গীয়) মাণিকচাঁদ গোস্বামীর শরণাপন্ন হন। দীননাথ তাঁহাদের নির্দ্দেশ-মত বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করাইবেন এবং এই মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিকট বিশুদ্ধভাবে যথাবিধানে নিবেদিত দ্রব্যাদি গোস্বামী প্রভুরা সেবা করিবেন—এই বাসনাটি প্রকাশ করিলে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী হঠাৎ কোনও সিদ্ধান্ত না করিয়া গোস্বামী প্রভুগণের এক সভা আহ্বান করেন। পরে কলিকাতা সহরের সিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ এটর্ণী শ্রীযুত পান্নালাল দে মহাশয়ের ভবনে এক প্রকাশ্য সভা হয়। এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন বটতলার শ্রীযুক্ত গোবিনচাঁদ গোস্বামী। সেই সভায় স্থির হয়:—

১। শ্রীপাট খড়দহ ও কলিকাতার সমস্ত গোস্বামী প্রভুসন্তান এই মন্দিরে সেবা গ্রহণ করিবেন।

২। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, (এক্ষণে স্বর্গীয়) মাণিকচাঁদ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত রাইচন্দ্র গোস্বামী নিজেদের পরিচিত ব্রাহ্মণ, পূজারী, টহলিয়া প্রভৃতি নিযুক্ত করাইয়া শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, ভোগরাগাদির ব্যবস্থা ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

৩। নিত্যানন্দ বংশীয় ৺শরচ্চন্দ্র গোস্বামীর পুত্র শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামীর নামে সঙ্কল্প করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি হইতে মাসিক ১০৲ করিয়া বৃত্তি প্রদত্ত হইবে।

৪। খড়দহের শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউর নাটমন্দির-সংস্কার-উদ্দেশ্যে দীননাথ দাসকে ২০০০৲ দুই সহস্র টাকা প্রদান করিতে হইবে।

আরও স্থির হয় যে, গোস্বামিগণের সেবা-গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দুই হাজার টাকা শ্রীযুক্ত পান্নালাল দে এটর্ণী মহাশয়ের নিকট জমা থাকিবে।

বলা বাহুল্য, গোস্বামী প্রভুরা এইসকল প্রস্তাবে সম্মত হন। দীননাথ দেড় লক্ষাধিক মুদ্রার (তখনকার মূল্য দেড়লক্ষ ছিল, এক্ষণে ৫।৬ লক্ষ টাকা) সম্পত্তি তাঁহার উল্টাডিঙ্গীর বাজার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-জীউর নামে উৎসর্গপত্র দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে দেবত্র করিয়া দিয়াছিলেন এবং দীননাথ আনন্দের সহিত সভার এইসকল অভিমত গ্রহণ করেন এবং সেগুলি কার্য্যে পরিণতও করেন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর শ্রীমূর্ত্তি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দাইহাট গ্রাম হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। ইহা ভাস্করের কার্য্যের জন্য বিখ্যাত।

সন ১৩২২ সালের ১৬ই আষাঢ় নবনির্ম্মিত মন্দিরে সভার নির্দ্দেশ মত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামীর নামে সঙ্কল্প করিয়া বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য যথাবিধানে সম্পন্ন হয়। রামচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের পুরোহিত তাঁহার

সঙ্কল্প-মন্ত্রাদি পাঠ করান। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও স্বর্গীয় মাণিকচাঁদ গোস্বামী উভয়ে উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। দৈবকার্য্যের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী ও পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ উপস্থিত থাকেন এবং খড়দহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিকিশোর গোস্বামী শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামি-প্রমুখ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকিয়া পণ্ডিত বিদায় করেন।

৩০শে আষাঢ় গোস্বামি-সেবার দিন ধার্য্য হয়, কিন্তু শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গোস্বামী দীননাথের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে তাঁহারা ভেকধারী বৈষ্ণবের জাতিবিচার না করিয়া উহাদের হাতে জলগ্রহণ করেন এবং সেই প্রথা সমাজে নিন্দনীয় নহে বলিয়া প্রচলিত থাকায় যদি দীননাথ দাস ভেক গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেবা-গ্রহণে তাঁহাদের আপত্তি নাই এবং সমগ্র খড়দহবাসী নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামিসন্তানগণ উপস্থিত হইয়া উক্ত দিবসে সেবা গ্রহণ করিবেন।

এই কথা শুনিয়া দীননাথের আশঙ্কা হয়—বুঝি বা তাঁহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত গোস্বামিসেবা পণ্ড হয়। এই ভাবিয়া তিনি কাতরভাবে ভাগবতধর্ম্মমণ্ডলে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে গমন করেন এবং তথায় অবগত হন যে, ভেক গ্রহণ করার অর্থ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হওয়া। কিন্তু দীননাথ সন্ন্যাসী নহেন—গৃহী, সংসারী এবং তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অভিলাষী নহেন। সুতরাং তিনি খড়দহবাসী গোস্বামিগণের অভিমত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গোস্বামিসেবার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত গোস্বামি-মণ্ডলে বিস্তর তর্ক বিতর্ক হয়; কিন্তু সেবার দিন সন ১৩৩২ সালে ৩০শে আষাঢ় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপায় সকল বাক্‌বিতণ্ডার অবসান হয় এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দিরে গোস্বামী প্রভুগণের সেবা সুসম্পন্ন হয়। এইদিন খড়দহবাসী ৩জন, ভদ্রকালী-

গ্রামবাসী ১জন, কলিকাতাবাসী ৪১জন গোস্বামী দীননাথ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া সেবা গ্রহণ করেন। দেবালয়মধ্যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামী উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেক গোস্বামী প্রভুকে ২৫৲ টাকা প্রণামী ও যথাযোগ্য পাথেয় স্বহস্তে প্রদান করেন। গোস্বামী প্রভুগণের সহিত যে সকল ব্রাহ্মণ অথবা ভৃত্য আসিয়াছিলেন তাহারাও প্রণামী ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই অর্থ দীননাথ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

ইহার তিন মাস পরে বৈষ্ণবসেবা হয় এবং কতিপয় গোস্বামী প্রভুর নেতৃত্বে বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। এই নগর-সঙ্কীর্ত্তন কলিকাতার কয়েকটী প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে ভাগবতধর্ম্মমণ্ডল "মঙ্গল-নির্ঘোষ" নামে একখানি পুস্তিকা সাধারণ্যে প্রচার করেন, ইহাতে বৈষ্ণব-সমাজের অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল।

অতঃপর এই ব্যাপার লইয়া গোস্বামি-সমাজে দলাদলি আরম্ভ হয়। কলিকাতায় শ্রীযুক্ত পান্নালাল দে এটর্ণী মহাশয়ের বাটীতে প্রকাশ্য সভায় শ্রীযুক্ত গোবিনচাঁদ গোস্বামী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি গোস্বামি-সেবার দিন দীননাথের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরে উপস্থিত হন নাই।

বিরুদ্ধবাদীর দল সেবাগ্রহণকারী গোস্বামী প্রভুগণকে জব্দ করিবার জন্য নানারূপে উৎপীড়িত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন, সভা-সমিতি করিয়া তাঁহাদের নিন্দাবাদসূচক মন্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা "বাগবাজার সামাজিক সভা" নাম দিয়া উহার দুইটি অধিবেশন করিলে গোস্বামি-সম্পর্কিত কুলীন ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কিঞ্চিৎ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। এইহেতু কুলীন ব্রাহ্মণগণ এতদ্‌সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ১৩২২ সালের ২রা আশ্বিন

বাগবাজারে স্বর্গীয় নন্দলাল বসু মহাশয়ের ভবনে "বাগবাজার সামাজিক দ্বিতীয় অধিবেশনের মীমাংসা" নাম দিয়া এক সভা আহ্বান করেন। এই আহ্বানপত্রে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ৪৭ জনের স্বাক্ষর ছিল।

সেই সভায় কি মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত হয় তাহা জানিবার জন্য প্রায় পাঁচশত কুলীন ব্রাহ্মণ, বহু গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ এবং কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভায় নিম্নলিখিত চারিটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল :—

প্রথম প্রস্তাব—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামিগণের পক্ষে অধম শূদ্রগণের মধ্যে ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত তৎকার্য্যসিদ্ধির অনুষ্ঠান বিগর্হিত নহে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—অধম শূদ্রের অর্থ বিনির্ম্মিত দেবমন্দির দেবত্ররূপে সমর্পিত হইলে এবং সেই দেবমন্দিরে সৎব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবশাস্ত্র-বিধানানুসারে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত এবং তৎকর্ত্তৃক সেবাদি পরিচালিত হইলে, তৎস্থানে সদ্‌ব্রাহ্মণবংশীয় বৈষ্ণবগণ বিশেষতঃ নিত্যানন্দবংশীয়গণ সেবাদি গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সমাজবিরুদ্ধ কোন গর্হিত কার্য্য করা হয় না।

তৃতীয় প্রস্তাব - বৈষ্ণবধর্ম্ম দ্বারা হিন্দুসমাজের অতি নিম্নস্তরের ব্যক্তিদিগের মধ্যেও ভগবদ্ভক্তি প্রবর্ত্তন করার শাস্ত্রসঙ্গত বিধি ব্যবস্থা এবং আচার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। যাহাতে এই অনুষ্ঠান দিন দিন প্রসারিত হয় হিন্দুসমাজের পুষ্টিসাধনকল্পে প্রত্যেকেরই সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

চতুর্থ প্রস্তাব—বর্ত্তমান সভায় আলোচিত বিষয়ে যে ব্যক্তিবর্গের এবং গোস্বামিবর্গের মতভেদ আছে, যথাবিহিত বিনয়সম্ভাষণসহকারে

তাঁহাদিগকে এই প্রয়োজনীয় বিষয়ের আবশ্যকতা ও শাস্ত্রসিদ্ধতা মর্য্যাদাসূচক ভাষায় বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য।

এই সভায় উক্ত চারিটী প্রস্তাব যথারীতি শাস্ত্রসঙ্গতভাবে আলোচিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নিমাইলাল মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিলাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সভাস্থলে বক্তৃতা করিয়াছেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কুলীন ব্রাহ্মণগণের আহূত দুইটী সামাজিক সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম বলিয়া এই তৃতীয় সভায় সভাপতির কার্য্য-গ্রহণে অসম্মত ছিলাম। কিন্তু সেই দুই সভায় কোনও যুক্তি বা শাস্ত্রসম্মত বিচারপদ্ধতি প্রদর্শিত না হইয়া ক্রোধপ্রকাশক ও বিদ্বেষমূলক মীমাংসা হইয়াছিল বলিয়া সেই দুই সভার সিদ্ধান্ত মূল্যহীন বলিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছিল। তাই আমার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও যখন তৃতীয় বার কুলীন-সন্তানগণ কর্ত্তৃক আহূত হই, তখন প্রকৃত বিবরণ জানিবার মানসে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। এক্ষণে রেজিষ্টারীযুক্ত একরারনামা দলিল দ্বারা দেখা গেল যে, দীননাথ শাস্ত্রবিধি-অনুসারে এবং আইনসঙ্গতরূপে তাহার দেবালয় দেবত্র অর্পণ করিয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামী দ্বারা এবং তাঁহার নামে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়া গোস্বামীদিগকে তথায় সেবা গ্রহণ করার জন্য উক্ত গোস্বামী দ্বারা আহ্বান করাইয়াছিল। নিশ্চয় এ কথা বলিতে হইবে যে, বেশ্যালয় অপেক্ষা উক্ত দেবালয় পবিত্র স্থান এবং তথায়

গোস্বামী প্রভুগণ সেবা গ্রহণ করিয়া কোনও নিন্দনীয় কিংবা দোষের কার্য্য করেন নাই। তবে এত আন্দোলন কেন? তাহার উত্তর— ভ্রান্তি ও বিদ্বেষ। গোস্বামী প্রভুগণ মুচির বাড়িতে সেবা গ্রহণ করিয়াছেন—এই রটনা সম্পূর্ণ অলীক। এক্ষণে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও গোস্বামী প্রভুদিগের চিরপ্রচলিত আচারের কথা শ্রবণ করিয়া এই সভা কর্ত্তৃক এই মীমাংসা হইল যে, "বাগবাজার সামাজিক সভার একপক্ষ-মতে মীমাংসা রহিতযোগ্য এবং তাহার কোন ফল নাই।" সে কারণ আমি অনুতাপ প্রকাশ করিয়া এক্ষণে বলিতেছি যে, যে সকল গোস্বামী দীননাথের পবিত্র দেবালয়ে সেবা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কোনও দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার ব্যবস্থা

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা ও ভোগ রাগাদির জন্য ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও ভৃত্য নিযুক্ত আছে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নামে একটি বাজার আছে। এই বাজারের আয় হইতে ঠাকুরবাড়ীর সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিম্নরূপ পূজা, আরত্রিক ও ভোগাদি হইয়া থাকে :—প্রত্যূষে মঙ্গল আরতি; বেলা ৮ ঘটিকার সময় নিত্যধ্যানপূজা; বেলা ১১ ঘটিকার সময় ভোগ; অপরাহ্ণ চারিটার সময়ে বিগ্রহের গাত্রোত্তোলন কার্য্য-সমাধান; সন্ধ্যার সময়ে আরত্রিক; মঙ্গল আরতির সময়ে বহুবিধ ফল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি; বেলা ৯টার সময়ে আতপ তণ্ডুল, ছানা, ক্ষীর, মিষ্টান্ন; ভোগের সময়ে আতপ তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত, সৈন্ধবলবণ, নানাবিধ ব্যঞ্জন, পিষ্টক, পায়স ও মিষ্টান্ন; সন্ধ্যায় গব্য ঘৃতে ভাজা লুচি, সুজি, মিষ্টান্ন, ক্ষীর, ছানা এবং ফলমূল।

রাধা গোবিন্দ জুট দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের কোয়াটারস্। হজুটীপাড়া।

ব্রাহ্মণগণ। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসাদ বিতরণ করেন। কেহ প্রসাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ঠাকুরবাটীতে বসিয়া প্রসাদ খাইতে চাহিলে সেইরূপ ব্যবস্থা আছে, আর যাঁহারা প্রসাদ লইয়া চলিয়া যাইতে চাহেন তাঁহাদের জন্য তদ্রূপই ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কোনও ব্রাহ্মণ প্রসাদ খাইবেন বলিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পাদ-প্রক্ষালনের জল যোগাইয়া দিয়া থাকে ও তাঁহার বসিবার জন্য আসনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। দেবালয়ে দৈনিক ৩০।৪০ জন অতিথি-সেবা হইয়া থাকে।

শ্রীবিগ্রহের সকল কার্য্যই পবিত্র গঙ্গাজলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৈদেশিক কোনও দ্রব্য ঠাকুরের কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না।

বহু ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া এই ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা চাকুরীর সন্ধানে আসিয়া দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রসাদপ্রার্থী হইলে কাহাকেও বিফল-মনোরথ হইতে হয় না।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে দ্বিপ্রহরে ও সায়ংকালে দীননাথ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের মন্দিরে আসিয়া সকল কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন করিতেন। এক্ষণে দীননাথের যোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাসও পিতার মত মন্দিরের কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। এইজন্য দেবালয়ের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরপ্রাঙ্গণে কয়েকটি সভাও হইয়া গিয়াছে। সেইসকল সভায় সমাজহিতৈষী বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে এই দেবালয়ে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়ার গান হইয়া গিয়াছে।

দীননাথের পিত্রালয় বর্দ্ধমান জিলায় বামুনআড়ার নিকট রতনপুরগ্রামে স্থায়ীভাবে শারদীয়া পূজার ব্যবস্থাআছে।

প্রতি বৎসরই মহাপূজার সময়ে দীননাথ সপরিবারে এখানে আসিতেন এবং মহাদেবীর চরণে প্রণাম করিতেন। এক্ষণে তৎপুত্র দেবেন্দ্রনাথ তথায় যাইয়া থাকেন।

লোকহিতকর কার্য্যে দান

বীরভূমের নওয়ানগর বোর্ড মধ্য-ইংরাজী স্কুল-প্রতিষ্ঠার সময়ে দীননাথ দাস মহাশয় সার্কল অফিসার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দান করিয়াছিলেন। নওয়ানগরের উত্তর প্রান্তে শরডাঙ্গা নামক স্থানে এই মাটীর স্কুল-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ভীষণ ঝড়ে স্কুল-বাটীটী নষ্ট হইয়া যায়। এই দুঃসংবাদ দীননাথের গোচর করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি পুনর্বায় স্কুলের জন্য নূতন পাকা বাটী স্বব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। যথাসময়ে তিনি এই স্কুলের জন্য নূতন পাকাবাটী তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছিলেন।

দীননাথ দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস ও তাঁহার সুযোগ্য ম্যানেজার (বোলপুরের ভূতপূর্ব্ব সার্কল অফিসার) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ কোনও কার্য্য-উপলক্ষে বীরভূম জেলাবোর্ডে উপস্থিত হন। সেই সময়ে জেলাবোর্ডের তদানীন্তন চেয়ারম্যান হেতমপুরের রাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় পাইয়া তখনই তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন 'আপনার পিতা দরিদ্রের ব্যথা ও বেদনা আর তাঁহাদের অভাব বুঝেন এবং দরিদ্রের দুঃখ-মোচনের জন্য

তিনি মুক্তহস্ত। সম্প্রতি তিনি স্বব্যয়ে নওয়ানগর স্কুলের গৃহ পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। এই জেলাবোর্ডের অধীন একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে ; উহার পরিচালনার সুব বস্থা আপনারা করিয়া দিন।” দেবেন্দ্রনাথ মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন—“আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে যেন আপনাদের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি।” দেবেন্দ্রনাথের এই কথায় উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রশংসাবাদ ও তাঁহার পিতৃদেবের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ পিতার নিকট তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াও তুমি যে এই মহৎ কার্য্যের ভার লইয়াছ এজন্য আমি গৌরবান্বিত। ভগবান তোমার এইরূপ মতিগতিই করুন।

সন ১৩৩২ সালে শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজার পর দীননাথ রতনপুর গ্রাম হইতে পদব্রজে সাত ক্রোশ পথ জল-কাদার মধ্য দিয়া ৮২ বৎসর বয়সে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া খুজুটীপাড়ায় গমন করেন। তদুপলক্ষে তথাকার ৺ধর্ম্মরাজতলায় এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় দীননাথ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন পাটনা কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ। তিনি দীননাথ দাস মহাশয়কে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। দানশৌণ্ড দীননাথ এই অনুরোধরক্ষায় সম্মত হইলেন। সভায় স্থির হইল—খুজুটীপাড়ার রাজাসায়র নামক পুষ্করিণীর পাড়ে স্কুল-গৃহের জন্য ভূমি গ্রহণ করা হইবে। অবশেষে এইস্থানেই নূতন মধ্য ইংরাজী স্কুল-গৃহের জন্য জমি ক্রয় করা হইল। বলা বাহুল্য, এই টাকা দীননাথবাবুই প্রদান করিলেন। অতঃপর ইহার উপর তাঁহারই অর্থব্যয়ে স্কুলগৃহ ও পরে দাতব্য চিকিৎসালয়ের

জন্য পাকা ইমারত তৈয়ারী হইল। তিনি ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের থাকিবার জন্য ইমারতও করিয়া দিয়াছেন। দীননাথবাবুর ইচ্ছানুসারে স্কুল-বাটীর ও ডাক্তারখানার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণ দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রমতে সম্পন্ন হইয়াছিল। সন ১৩৩৫ সালের ২রা বৈশাখ তারিখে খুজুটীপাড়া গ্রামে দীননাথ-নির্ম্মিত এই নূতন মধ্য-ইংরাজী স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তি-স্থাপন-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে বীরভূমের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, সদর মহকুমা-হাকিম প্রভৃতি ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে দেবেন্দ্রবাবুও তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী দেবেন্দ্রবাবুই জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়কে বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন, এই উপলক্ষে তিনি একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

"যে উপলক্ষে এই সভার অধিবেশন, তাহাতে স্কুলের সেক্রেটারীর পক্ষে রিপোর্ট পাঠ করাই চিরাচরিত রীতি। কিন্তু আপনাদের অনুমতি লইয়া আমি এই রীতি কিঞ্চিৎ ভঙ্গ করিতেছি রিপোর্ট পাঠ করিবার পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমি আপনাদিগকে শুনাইতেছি। প্রায় ৮৫ বৎসর হইল, আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব এই খুজুটীপাড়া গ্রামের সংলগ্ন ছাতিনগ্রামে তাঁহার মাতামহের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন সেই গ্রামের পাঠশালায় তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয়। প্রায় ৭০ বৎসর হইল, আমার পিতৃদেব ব্যবসা-সূত্রে কলিকাতায় বসবাস স্থাপন করিয়া তথাকার স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার জন্মভূমি—সেই ক্ষুদ্র পল্লী ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলির প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ রহিয়াছে। বহুবার তিনি এতদঞ্চলের অধিবাসীদিগকে অর্থসাহায্য ও ঋণদান

রাধা গোবিন্দ জিউ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। খুজুটীপাড়া।

করিয়াছেন। কেবল আমাদের স্বজাতিবৃন্দকেই যে তিনি অর্থ সাহায্য ও ঋণদান করিয়াছেন তাহা নহে, অপরাপর-জাতীয় ব্যক্তিরাও তাঁহার নিকট হইতে উক্তরূপ সাহায্য লাভ করিয়াছেন। খুজুটীপাড়ায় একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রথমে আমার পিতৃদেবের হৃদয়েই সঞ্চারিত হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বোলপুরের তদানীন্তন সার্কল-অফিসার সম্মানভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ কলিকাতায় গমন করিয়া আমার পিতৃদেবকে বলেন,—একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুল-স্থাপনের জন্য বাটী নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে চাঁদা-সংগ্রহ হইতেছে; আপনি এই শুভকার্য্যে ৫০০৲ টাকা প্রদান করুন। পিতৃদেব তৎক্ষণাৎ ৫০০৲ টাকা প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত স্থানীয় অধিবাসীরাও চাঁদা দিয়াছিলেন এবং জেলা-বোর্ডও কিছু অর্থদান করিয়াছিলেন। এই টাকায় স্কুলের জন্য দুইটী চালাঘর তৈয়ারী হয় এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে স্কুলের কার্য্যারম্ভ হয়। এই সময় হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত জেলা-বোর্ড স্কুল পরিচালনা করেন। পরে উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাস হইতে স্কুলের পরিচালন-ভার একটি পরিচালন-সমিতির উপর ন্যস্ত হয় এবং জেলা-বোর্ড মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিতে থাকেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে ভীষণ ঝড়ে স্কুলের চালা-ঘর পড়িয়া যায়। দুঃখের বিষয় স্কুল-পরিচালন-সমিতি উহা পুনর্নির্ম্মাণে অসমর্থ হন। অতঃপর এই অঞ্চলের কতিপয় অধিবাসী আমার পিতৃদেবের নিকটে গমন করেন এবং স্কুল-গৃহ পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। পিতৃদেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তিনি দেবেন্দ্রবাবুকে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন; দেবেন্দ্রবাবু রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। দেবেন্দ্রবাবু ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর অবিনাশবাবু উভয়েই পিতৃদেবকে স্কুল-গৃহটী পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া পিতৃদেব সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে স্কুলটীর জন্য পাকা বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিতে সম্মত হন। চিকিৎসালয়ের জন্য পাকা বাটী নিজ ব্যয়ে তৈয়ারী করিয়া দিতে এবং উহার পরিচালনার জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থদান করিতেও তিনি প্রতিশ্রুত হন। জেলা-বোর্ডকে এই কথা জানাইলে তাঁহারাও ইহাতে সম্মত হন এবং বাড়ীর নক্সা পাঠাইয়া দেন। এ পর্য্যন্ত বাটী-নির্ম্মাণে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

স্কুল-বাটীটি ঝড়ে পড়িয়া যাইবার পর জেলা-বোর্ড স্কুলের সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন। ইতিমধ্যে পিতৃদেবের অনুরোধে মধ্য-ইংরেজী স্কুলটী একটি ভাড়া-বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। তদবধি স্কুলটীর পরিচালনার জন্য পিতৃদেব প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করিয়া আসিয়াছিলেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে নূতন পরিচালক-সমিতি গঠিত হয়, আমি সেক্রেটারী নিযুক্ত হই। আমি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া দেখি, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৯২৫ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এবং ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত জেলা-বোর্ড এই স্কুলে অর্থসাহায্য করেন নাই। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের সাহায্যও পাওয়া যায় নাই। আমি আশা করি, জেলা বোর্ড সত্বর এই সাহায্যের টাকাগুলি স্কুলে পাঠাইয়া দিবেন।

১৯২৮ সালের মার্চ্চ মাসে যে বর্ষ শেষ হইয়াছে সেই বর্ষে স্কুলের আয়-ব্যয় নিম্নরূপ ছিল :—

আয়

ছাত্রদের বেতন বাবদ	১০১৫৲
জেলা-বোর্ডের সাহায্য	৩০০৲
সেক্রেটারীর দান	২০৩৲
	মোট ১৫১৮৲

ব্যয়

শিক্ষকদের বেতন বাবদ	১৩৮৪৲
পারিতোষিক ও পাঠাগার	১১৪৲
খুচরা খরচ	২০৲
	মোট ১৫১৮৲

এই স্কুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে প্রতি বর্ষে আমি আমার পিতৃদেবের নামে একটি করিয়া রৌপ্যপদক প্রদান করিব বলিয়া ঘোষণা করিতেছি।”

উক্ত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় দীননাথ নিজ গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দজীউর নামে অভিহিত করিয়াছেন। পরে উক্ত বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইলে তাহার এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহকল্পে তাঁহার কলিকাতার দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে বাৎসরিক ২০০০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ এস ই ষ্টিভেন্স এই উপলক্ষে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন।

দীননাথের মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে খুজুটীপাড়ার এই মধ্য ইংরেজি স্কুলটিকে তিনি উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত করিয়া দেন। স্কুলটির

নাম এক্ষণে "রাধাগোবিন্দজীউ এইচ-ই স্কুল" হইয়াছে। এই স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়-স্থাপনে দীননাথ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

দীননাথ দাস মহাশয় দুই চারিদিন খুজুটীপাড়ায় অবস্থান করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। কিছুদিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেট দীননাথবাবুকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন :—আপনার সৌজন্যে আমি প্রভূত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। এক্ষণে বোলপুর হইতে খুজুটীপাড়া পর্য্যন্ত একটি রাস্তা জেলা-বোর্ড হইতে মঞ্জুর হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গছত্র হইতে খুজুটিপাড়া যাইবার জন্য রাস্তার সুবিধা না থাকায় আপনি উহা তৈয়ারী করিয়া দিন; কারণ আপনার সাহায্য-ব্যতিরেকে এই রাস্তা-নির্ম্মাণ সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের এই পত্রের উত্তরে দীননাথবাবু এই লোকহিতকর কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে সম্মত হইলেন এবং অতীব বিনীতভাবে এই মনোভাব ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন। দীননাথবাবু এই রাস্তাটি তৈয়ারী করিবার জন্য জেলা-বোর্ডে ১০০০৲ এক হাজার জমা দিয়াছিলেন। এই রাস্তাটী হইয়া গিয়াছে; এই অঞ্চলে রাস্তা ছিল না; বর্ষাকালে পথের অভাবে লোকের যে কি কষ্ট হইত, তাহা বলা যায় না। দীননাথের অর্থসাহায্যে এই পথটি নির্ম্মিত হওয়ায় এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

দীননাথ নারিকেলডাঙ্গা জর্জ্জ ইন্‌ষ্টিটিউটে ১০০০৲ টাকা ও নারিকেলডাঙ্গা বালিকা-বিদ্যালয়ে ৫৫০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলন-ভবনে তিনি বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা দান করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় দীননাথ দাসের পুত্র, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস।

দীননাথের সদনুষ্ঠানের অন্ত ছিল না। পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা অন্ন-হীনকে অন্নদান, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা, স্বজাতীয় বহু দরিদ্র বিদ্যাশিক্ষার্থী বালককে প্রতিপালন, লাইব্রেরীতে সাহায্য দান প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্য তিনি করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথই তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন।

দীননাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাছারীতে বসিয়া থাকিবার সময়ে ব্রাহ্মণ, অতিথি, স্বজাতি ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে দান করিতেন।

স্বজাতীয়গণের কল্যাণকল্পে দীননাথ সন ১৩১৩ সালে "বঙ্গীয় রুইদাস (ঋষি) সমিতি"র প্রতিষ্ঠা করেন।

দীননাথ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হইলেও তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি নিরতিশয় প্রবল ছিল। তিনি প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া আহ্নিক ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন। তার পর নিজ কাছারীতে বসিয়া বিষয়-কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। বৃথা অন্ন তিনি গ্রহণ করিতেন না। তিনি শেষ জীবনে প্রায় ৩০ বৎসর কাল যাবৎ নিরামিষ-ভোজী ছিলেন। দীননাথ হিন্দুর যাবতীয় তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

কার্য্য-পরিচালনায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় পিতার সাহায্য করিতেন। মাধবচন্দ্রের পুত্র দীননাথ যেরূপ পিতৃভক্ত ও বাধ্য পুত্র ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথও তদ্রূপ পিতৃভক্ত ও পিতার অনুগত। পিতার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি সততই প্রস্তুত।

ধনীর পুত্র হইয়াও দেবেন্দ্রনাথ বিলাসব্যসনগ্রস্ত নহেন। তিনি পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ, চরিত্রবান্, বিনয়ী ও সদাচার-সম্পন্ন। তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্। চর্ম্ম-ব্যবসায় এদেশে হীন বলিয়া

বিবেচিত হইলেও, সদাচার রক্ষা করিয়াও যে সেই ব্যবসায় প্রশংসনীয়-ভাবে পরিচালন করা যায়, স্বর্গীয় দীননাথ ও দেবেন্দ্রনাথ উহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। নিপীড়িত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে কৃতী ও ধনী ব্যবসায়ী হওয়া যায় এবং স্বাধীনভাবে অর্জ্জিত সেই ধনের দ্বারা যে দেশের ও দশের প্রভূত উপকার করা যায় এবং জনসাধারণের নিকট সম্মানের আসন লাভ করিতে পারা যায়, স্বর্গীয় দীননাথ ও দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

লোকহিতপরায়ণ সদাচারশীল, ধর্ম্মাত্মা, পরমবৈষ্ণব এবং দরিদ্রের সহায় দীননাথ দাস মহাশয় পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব এবং বিপুল কীর্ত্তিসম্ভার পশ্চাতে রাখিয়া ১৩৩৭ সালের ৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার রাত্রি ১ ঘটিকার সময়ে তাঁহার কলিকাতা-স্থিত ভবনে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করেন।

শোক-সভা

দানবীর দীননাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তদীয় শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিবার জন্য ১৩৩৭ সালের ১৭ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে তাঁহার বাটীর সংলগ্ন ৪বি রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরেএক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীপ্রমুখ বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য লোক এই শোক-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহন করেন।

প্রথমে হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল মহাশয় বক্তৃতায় বলেন:—দীননাথ নিঃস্বার্থ দেশসেবা দ্বারা আত্মোন্নয়নের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। কয়েকজন লোকে
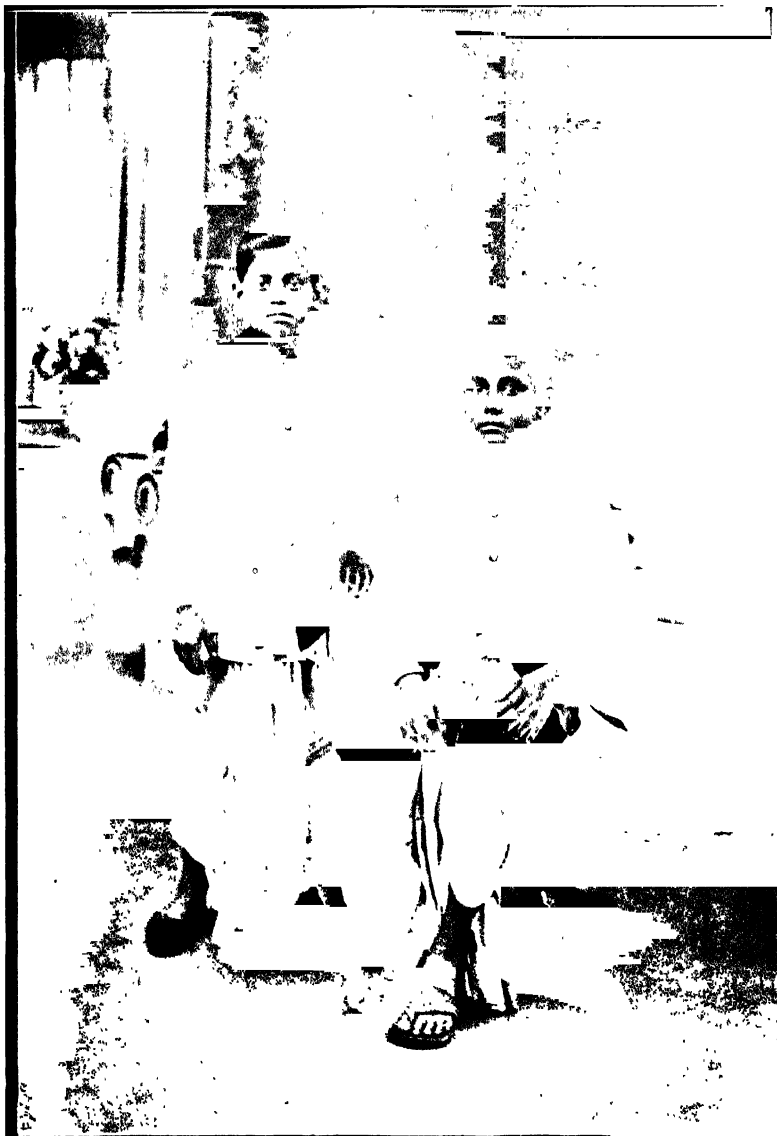
স্বর্গীয় দীননাথ দাসের পৌত্র, শ্রীমান্ কমলকৃষ্ণ দাস ও শ্রীমান্ ধনকৃষ্ণ দাস।

তাঁহাকে উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত, এম-এ বলেন:—দীননাথ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সম্পূর্ণ স্বব্যয়ে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী'র 'মিলন-মন্দির' বৈদ্যুতিক আলো ও পাখায় সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নীরব কর্ম্মী এবং নিঃস্বার্থ জনসেবক ছিলেন। তিনি কেবল ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, কোনও প্রকার আড়ম্বর ভালবাসিতেন না।

আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বাঙ্গালার যুবকগণকে দীননাথের আদর্শ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া বলেন:—দীননাথ শতচ্ছিন্ন মলিনবসনে সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং এখানে আসিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের পত্তন করিয়া তিনি এরূপ প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন যে, দেশের মঙ্গলের জন্য নানা সদনুষ্ঠানে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। দীননাথ ধনী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সাহেবপাড়ায় গিয়া বসতবাটী তৈয়ারী করেন নাই, অথবা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ হাঁটুর উপর কাপড় পরিতেন তিনিও সেইরূপ হাঁটুর উপর কাপড় পরার অভ্যাস ত্যাগ করেন নাই অর্থাৎ আড়ম্বর বা জাঁকজমকের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। টাকা হইলেই মানুষ ভোগবিলাসী হয়, আড়ম্বরশীল হয়; দীননাথ একেবারে নিরাড়ম্বর ছিলেন। তিনি নীরবকর্ম্মী ছিলেন; ঢাক পিটাইয়া দান-খয়রাত করিতেন না। নাম-বাজানো তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি ব্যবসায়-সূত্রে কলিকাতায় থাকিতেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার জন্মভূমি—সেই পল্লীগ্রামটিকে ভুলেন নাই। তাঁহার আদর্শ বহুলপরিমাণে মহাত্মা গান্ধীর অনুরূপ ছিল। তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামে খুজুটিপাড়ায় একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; ইহাতেই বুঝা যায়—তিনি

নামের বা যশের প্রয়াসী ছিলেন না। তাঁহার দান সম্বন্ধে ইংরেজ কবির ভাষায় বলা চলে—

"Did good by stealth,
Blushed to find it flamed."

অর্থাৎ তিনি পরোপকার বা লোকহিত করিতেন গোপনে, কিন্তু ইহা কেহ জানিতে পারিলে তিনি লজ্জিত হইতেন।

দীননাথের ধারণা ছিল, ঈশ্বর তাঁহাকে যে ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি উহার মালিক নহেন; এই ধন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তের দুঃখ ও অভাবমোচনের জন্যই বিধাতা উহা তাঁহার নিকট জমা রাখিয়াছেন। এই বিপুল সম্পত্তির তিনি ন্যাসরক্ষক মাত্র। উপাধি-ব্যাধি কখনও তাঁহাকে আক্রমণ করে নাই। তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি সকলের হৃদয়েই জাগরুক থাকিবে।

প্রভুপাদ পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ গোস্বামী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন:—শ্রীচৈতন্যের উপদেশ-অনুসারে বলিলে বলিতে হয়, দীননাথ ব্রাহ্মণেরও অধিক ছিলেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ বার্দ্ধক্যে অসমর্থ হইলেও সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন:—"আমার জ্যেষ্ঠতাত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট দীননাথ একবার গিয়াছিলেন। শিশিরকুমারের দেখা পাইবামাত্র দীননাথ তাঁহার পদতলে পতিত হইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শিশিরকুমার তখনই তাঁহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলেন, তুমি পরম বৈষ্ণব, আমার মাথার মণি।"

স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ,বি-এল বলেন:—আমার হৃদয় আজ আনন্দে এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে, মুখে কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যে

ভক্তির আলোক দীননাথের হৃদয়ে জ্বালিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়েও তিনি সেই ভক্তির আলোক জ্বালিয়া দিউন।

বৈষ্ণব-সম্মিলনীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক বলেন:—দীননাথের সহিত যতদিন আমার পরিচয় হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কখনও তিনি কাহারও নিকট তাঁহার জাতি গোপন করেন নাই।

বিবেকানন্দ সোসাইটী ও কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণ-চন্দ্র দত্ত বলেন:—শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর এই মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার সময়ে গোঁড়া হিন্দুরা উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু অদ্যকার শোক সভায় সকল শ্রেণীর লোকের সমাবেশে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আপত্তির বা প্রতিবাদের কারণ দূর হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-গণের মনে করা উচিত দীননাথ তাঁহাদের ভাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—মানুষেরা সকলে ভাই ভাই।

স্বর্গীয় তারক প্রামাণিক মহাশয়ের ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুত নিত্য-গোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন:—কেমন করিয়া লোক ঈশ্বর-সেবা এবং নিঃস্বার্থ জনসেবা দ্বারা স্পৃশ্য হইতে পারে, দীননাথ তাহা দেখাইবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার হিন্দু-সভার সম্পাদক শ্রীযুত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন:—দীননাথের মৃত্যু হয় নাই। তাঁহার আত্মা এই শ্রীমন্দিরে এই সভাস্থলে বিরাজ করিতেছেন। নিঃস্বার্থ জনসেবা ও দানের দ্বারা তিনি দেশে এক মহৎ আদর্শ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

এডভোকেট শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দীননাথের বিবিধ গুণের উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন:—

"কলিকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-মূলক এই সভা কলিকাতা কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ অফিসারকে অনুরোধ করিতে-

ছেন যে, তিনি যেন উল্টাডিঙ্গী অঞ্চলের কোনও একটি রাস্তার নামকরণ দীননাথ দাসের নামে করেন।”

এই প্রস্তাব সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল।

শ্রীযুত রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন:—অভাবে পড়িয়া অনেকেই দীননাথের নিকট টাকা ধার লইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সে টাকা পরিশোধ করেন নাই। দীননাথ এজন্য তাগাদা করিতেন না বা কখনও কাহারও নামে নালিশও করেন নাই।

শ্রীযুত মনোমোহন দাস বলেন:—দীননাথ তাঁহার স্বজাতীয়গণের কল্যাণের জন্য প্রভূত শ্রম করিয়াছিলেন।

অতঃপর সভাপতি শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি সাশ্রুনয়নে বলেন:—দীননাথ আমার নিকট ভাগবত শুনিতেন। ভাগবত শুনিতে শুনিতে তিনিও কাঁদিতেন এবং আমিও কাঁদিতাম। তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। তাই এমন করিয়া তিনি মানুষের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

সভাপতির অনুরোধে শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহের সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হন এবং দীননাথের পরলোকগত আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করেন।

রাত্রি দশটার সময় সভাভঙ্গ হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী এম-এ, অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস ও স্বর্গীয় দীননাথ দাস মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত হরিহর দাস কীর্ত্তন করেন।

সমবেদনা-জ্ঞাপক চিঠি-পত্র

দীননাথ দাস মহাশয়ের পরলোক-গমনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী, বেলেঘাটা সান্ধ্য-সমিতি, উল্টাডাঙ্গা সেবা-সঙ্ঘ, উল্টাডাঙ্গা লাইব্রেরী, নারিকেলডাঙ্গা জর্জ্জ হাই স্কুল, বৃন্দাবন সেবাকুঞ্জের শ্রীযুক্ত ভক্তিচরণ

দাস, বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস, রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর (বীরভূম জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান), খুজুটীপাড়া রাধাগোবিন্দ এইচ-ই স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যজীবন পাল, উত্তর চাতরা কো-অপারেটিভ এণ্টী-ম্যালেরিয়া সোসাইটি (গোবরডাঙ্গা) প্রমুখ সভা সমিতি ও ব্যক্তিবর্গ সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধ

১৩৩৭ সালের ৫ই, ৬ই ও ৭ই চৈত্র স্বর্গীয় দীননাথ দাস মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য অনুষ্ঠান সবিশেষ সমারোহের সহিত তদীয় পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় সুসম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে প্রত্যেক গোস্বামীকে একটী করিয়া গিনি ও প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ৫৲ টী করিয়া টাকা, দীননাথের নাম-খোদিত পিতলের বাল্‌তি, ধুতি ও চাদর এবং একখণ্ড করিয়া গীতা দেওয়া হইয়াছিল। পুরোহিতগণ রৌপ্য-কলস, রৌপ্যের থালা ও বাটি, কাপড়-চোপড়, বহুমূল্য খাট-বিছানা, পর্য্যাপ্ত দক্ষিণা এবং ভোজ্যদ্রব্যপূর্ণ পিতলের বাল্‌তি পাইয়াছিলেন। দূরদেশ-সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাধু ও পুরোহিতবর্গকে যথাযোগ্য পাথেয়ও দেওয়া হইয়াছিল। প্রসিদ্ধনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গোস্বামিগণ রূপার গেলাস, ঘৃত, ময়দা, ফলমূল ও অন্যান্য আহার্য্যসামগ্রী পাইয়াছিলেন। ৭ই চৈত্র অন্যূন ৫০০ ব্রাহ্মণকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল এবং উপযুক্ত দক্ষিণাও দেওয়া হইয়াছিল। দীননাথের স্বজাতীয় প্রায় ৪০০০ নর-নারীকে ঐ দিন তদীয় পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পরিতোষ-সহকারে আহার করাইয়াছিলেন। চারি সহস্রের অধিক কাঙ্গালীকে লুচি সন্দেশ এবং প্রত্যেককে দুই আনা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া দীননাথের ৪০০ শতের অধিক আত্মীয়-

কুটুম্ব এবং বন্ধুবান্ধব নানা স্থান হইতে শ্রাদ্ধবাটীতে সমাগত হইয়াছিলেন এবং প্রায় এক সপ্তাহকাল তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে ধুতি চাদর এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোককে একখানি করিয়া সাড়ী দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ইঁহাদের প্রত্যেককে পাথেয়ও দান করা হইয়াছিল। শ্রাদ্ধবাসরে সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ-প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে "দি রিফিউজ' বা কলিকাতা অনাথ আশ্রমের দরিদ্রনারায়ণগণকে ভূরি-ভোজে পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল।

বীরভূম—খুজুটীপাড়া রাধাগোবিন্দ হাই স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন

দানবীর দীননাথ স্বীয় জন্মস্থান ছাতিনগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসিগণের অজ্ঞানান্ধকার দূর ও রোগার্ত্তের সেবার জন্য খুজুটীপাড়া গ্রামে ৫০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী উক্ত স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের নব-নির্ম্মিত অট্টালিকা-সমূহের উদ্বোধন এবং দীননাথ দাস মহাশয়ের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন হয়। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এডভোকেট শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তথায় গিয়াছিলেন। বীরভূমের অনেক কৃতবিদ্য লোকও অনুষ্ঠানে যোগদান

করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বীরভূম জেলা-বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দোপাধ্যায় অন্যতম। বীরভূমের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস ও স্যর দেবপ্রসাদ যথাক্রমে স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন। দাতা দীননাথের পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সমাগত অতিথিবর্গের যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনদিন যাবৎ তিনি বহু ছাত্র ও গ্রাম-বাসীকে ভোজে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। স্যর দেবপ্রসাদ ভাব-গদ-গদকণ্ঠে বলেন:—আমি দীননাথকে প্রায় ৪৫ বৎসর যাবৎ চিনিতাম এবং তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাও করিতাম। সেই শ্রদ্ধাবশতঃই সুদূর কলিকাতা হইতে এত দীর্ঘপথের ক্লেশ সহ্য করিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে খুজুটিপাড়ায় আসিয়াছি। তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে দীননাথের পূতচরিত্রের আদর্শ অনুসরণ করিতে উপদেশ দান করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাসের অসুস্থতা-নিবন্ধন শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী বার্ষিক ইংরাজী রিপোর্ট বঙ্গানুবাদ করিয়া পাঠ করেন। সেই রিপোর্ট-পাঠে জানা যায় যে, দীননাথ ৫০,০০০৲ হাজার টাকা ব্যয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং যাহাতে প্রতিষ্ঠান দুইটির কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে, তজ্জন্য বার্ষিক ৩ হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ছাত্রগণ নানাপ্রকার কবিতা, শ্লোক প্রভৃতি আবৃত্তি করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। অতঃপর সভাপতি মিঃ গুরুসদয় দত্ত মহাশয় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া ছাত্রগণকে অনেক সদুপদেশ দান করেন।

এই উপলক্ষে দেবেন্দ্রবাবু ছাত্রগণের শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের জন্য একটি রেডিও সেট নিজব্যয়ে বিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রবাবু প্রায় ৬০০৲ টাকা ব্যয়ে জনসাধারণ ও স্কুলের ছাত্রগণ যাহাতে সুপেয় পানীয় জল পায় তাহার জন্য স্কুলের নিকটে এক নলকূপ করিয়া দিয়াছেন।

ছাত্রাবাসের জন্য দেবেন্দ্রবাবু অন্যূন ১৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে তদীয় পিতৃদেবের আদেশানুযায়ী ইমারত নির্ম্মাণ করিতেছেন।

দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি-সভা

১৩৩৮ সালের ২৩শে ফাল্গুন সোমবার সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ জীউর মন্দিরে দীননাথ দাস মহাশয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি-সভা হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভা আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই সভাক্ষেত্রে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি-এ, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্, এম্-এল্-সি, কবিরাজ শ্রীযুত কিশোরী-মোহন গুপ্ত, এম্-এ, ব্যাকরণতীর্থ, বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা হিন্দুসভার সম্পাদক শ্রীযুত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, এডভোকেট শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ স্বর্গীয় স্যর গুরুদাসের পুত্র শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, অধ্যাপক শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকে অতি সুললিত বক্তৃতা করিয়া দীননাথ দাস মহাশয়ের বদান্যতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। দীননাথ দাস মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত হরিহর দাস উদ্বোধন ও সমাপ্ত-সঙ্গীত গান করেন।

শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বলেন, তিনি দীননাথ দাস মহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন বলিয়াই আজ এই বৃদ্ধবয়সেও সভাক্ষেত্রে আসিয়াছেন

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী বলেন,—এক একজন লোক এক এক যুগে আসেন, তাঁহারা জগতে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। দীননাথও এইরূপ একজন আদর্শস্থানীয় মহাপুরুষ ছিলেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত, এম-এ, ব্যাকরণতীর্থ ভাব-গদ্গদকণ্ঠে বলেন,—দীননাথ ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় ভাবুক ভক্ত ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবমাত্রেরই নমস্য ও প্রণম্য।

এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল বলেন,—তিনি সম্প্রতি খুজুটিপাড়ায় গিয়া তথায় দীননাথের যে কীর্ত্তি-কলাপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বোলপুর হইতে ১৫ মাইল পথ মাঠের মধ্য দিয়া কড়ি বরগা বহিয়া লইয়া ছাত্র ও রোগীদের জন্য হাই স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যে কত উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অন্যান্য বক্তৃগণও অনুরূপ বক্তৃতা করিয়া দীননাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় একটী উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, তিনি আজ এই সভায় আসিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। দীননাথ দাস মহাশয়কে তিনি চিনতেন এবং কিরূপে আজ দরিদ্র অবস্থা হইতে তিনি ধনৈশ্বর্য্যের শীর্ষস্থানে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন, তাহাও তিনি জানেন। কিন্তু দীননাথের মনে কোন প্রকার অভিমান ছিল না।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলেন,—সভাপতি মহাশয় স্যর গুরুদাসের অভাব আজ পরিপূরণ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক শিষ্টাচারী লোক আজকালকার শিক্ষিত সমাজে অতি কমই দৃষ্ট হয়।

রাত্রি ৯ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

তৎপর দিবস হইতে তিন দিন যাবৎ সহস্র সহস্র স্বজাতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালী ভোজনের দ্বারা দীননাথের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

বংশলতা

কান্তমোহন

গৌরমোহন হরিমোহন রাধামোহন কৃষ্ণমোহন ব্রজমোহন

স্বর্গীয় লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়

জেলা হুগলীর অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তারকেশ্বরের কিয়দ্দূরে বনপুর নামে এক অকিঞ্চিৎকর অধুনা-ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট বিরল-বসতি গণ্ডগ্রাম অবস্থিত আছে। এক্ষণে যে বি-পি রেলওয়ে তারকেশ্বর হইতে মগরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে তাহাতে পূর্ব্বে বনপুর ও এক্ষণে কাণানদী নামক ষ্টেশনে নামিয়া এই গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়। ই আই রেলপথের তারকেশ্বর লাইন হইবার বহু পূর্ব্বে এই বনপুর-গ্রামে এক চট্টোপাধ্যায় বংশ প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইঁহারা অবসতি গঙ্গানন্দ ঠাকুরের সন্তান, ফুলে মেল। স্বভাব-কৌলীন্য এই বংশে শম্ভূদেব প্রথম ভঙ্গ করেন। ইঁহাদের অবস্থা তাৎকালিক সাধারণ ব্রাহ্মণদিগের মতই ছিল অর্থাৎ দারিদ্র্যই ছিল তখন ব্রাহ্মণদিগের গৌরব ও সৌন্দর্য্য; সামান্য জমিজমার উৎপন্ন হইতে ও জাতি-ব্যবসায় হইতে ইঁহারা আপনাপন ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং একমাত্র লক্ষ্য—শান্তিলাভ করিতেন।

এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের ঊর্দ্ধতন প্রবর্ত্তক শম্ভূদেবের পূর্ব্বের মহাত্মাগণের পরিচয় ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে। এ কারণ তাঁহাদের বিষয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অবতারণা করা যাইবে না। এই শম্ভূদেবই কৌলীন্যের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে নিম্নে অবতরণ করেন ও স্বকৃত-ভঙ্গ উপাধি লাভ করেন।

শম্ভূদেবের তিন পুত্র গোপীকান্ত, জগন্নাথ ও কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে গোপীকান্ত ও জগন্নাথের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের দুইটী পুত্র; জ্যেষ্ঠ বিপ্রদাস ও কনিষ্ঠ পঞ্চানন।

বিপ্রদাসের পুত্র অভয়চরণ ও তস্য পুত্র অবিনাশচন্দ্র। ইনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পোষ্ট অফিস, আর-এম-এস ছিলেন। ইনি পেনসন গ্রহণ করতঃ কিছুদিন পরে দুইটী পুত্র ও একটী বিধবা কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইঁহার প্রথম পুত্রের অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হয় ও দ্বিতীয় পুত্র তারকনাথ শিবপুর সাকিনের ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এক্ষণে বনপুরগ্রামে বসবাস করিতেছেন।

পঞ্চাননের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র ও কনিষ্ঠ কৈলাশচন্দ্র। কৈলাশচন্দ্রের তিন পুত্র—উমেশ, অঘোর ও ত্রৈলোক্য; ইনি পরিণত বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহাদের একটী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন, নাম জগদীশ।

ঈশ্বরচন্দ্র বনপুরগ্রামের সন্নিকটে সোমসাড়া নামক গ্রামে নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের ভগিনী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু অতি অল্প বয়সে ইনি জ্বরে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার মৃত্যুকালে বিশ্বেশ্বরীদেবীর গর্ভজাত একটি মাত্র ২॥• বৎসর বয়সের শিশুপুত্র জীবিত থাকে। ইনিই অতঃপর লোকনাথ নামে অভিহিত হইয়া স্বকৃত উপার্জ্জন দ্বারা বনপুরের চট্টোপাধ্যায়-বংশের নাম সমুজ্জ্বল ও সুবিখ্যাত করেন। এই বংশে শক্তি-উপাসনা প্রচলিত ও বনপুর বাস্তুভিটায় স্মরণাতীত কাল হইতে শারদীয়া দুর্গোৎসব হইয়া আসিতেছে।

একান্নবর্ত্তী হিন্দুপরিবারে উক্ত বিশ্বেশ্বরী দেবী স্বীয় শিশুপুত্রকে সম্বল লইয়া বৈধব্য লাভ করিলে স্বামি-ত্যক্ত সামান্য জমি-জমার আয় হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সাংসারিক নানা কারণে ও জমিজমার আয় লইয়া সরিকানগণের সহিত মনো-মালিন্য হওয়ায়, বিশ্বেশ্বরীর ভ্রাতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় আপন ভগিনী ও ভাগিনেয় লোকনাথকে সোমসাড়ায় নিজ বাস-ভবনে লইয়া যান।

মধুসূদনের সন্তানাদি না থাকায় ভাগিনেয় লোকনাথকে তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে থাকেন। লোকনাথ পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে মাতুল মধুসূদন তাহার বিদ্যারম্ভ করাইয়া স্থানীয় পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। বালক পাঠশালার যাবতীয় বিদ্যা অর্জ্জন করিলে তৎকালীন বাঙ্গালা স্কুলে পাঠে নিযুক্ত হইয়া স্কুলের বিদ্যা সমাপন করেন। এই পাঠ্যাবস্থার কিছুকাল সোম-সাড়ায় অবস্থান করিয়া লোকনাথ মাতা বিশ্বেশ্বরীর সহিত বনপুরের পৈত্রিক ভিটায় আসিয়া থাকিতে বাধ্য হন। কারণ, তাঁহার মাতা তাঁহার মামীর সহিত বিবাদ-বচসা উপস্থিত করিলে সংসারে বিশেষ অশান্তি উপস্থিত হইত।

কিশোর বয়স হইতেই লোকনাথ বিশেষ পরিশ্রমী, একনিষ্ঠ ও মনে যোগী ছিলেন। মাতুল-মাতুলানীর দৈনিক দেব সেবার পুষ্পাদি সংগ্রহ তাঁহার পাঠ্যাবস্থার একটী অতিরিক্ত কর্ত্তব্য ছিল। বনপুর পৈত্রিক বাসভবনে মাতাকে লইয়া বাস করিলেও তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ১॥ ক্রোশ দূরে সোমসাড়া গ্রামে যাইয়া মাতুলের পুষ্প-সংগ্রহ-কার্য্য সমাধা করিয়া আসিয়া নিজের পাঠাভ্যাস করিতেন ও পরে স্কুলে যাইতেন। এই বয়সেই তাঁহার সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, পরদুঃখ-কাতরতা ও কর্ম্মক্ষমতা এতই পরিস্ফুট হয় যে, মাতুল-মাতুলানী কেন — গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা লোকনাথকে নিতান্ত প্রিয়জনের মত ভালবাসিতেন।

মাতুল মধুসূদন কলিকাতা বড়বাজারে হুগলী জেলার সাটথিনা-নিবাসী ভজকৃষ্ণ মল্লিকের সহিত কারবার করিতেন। লোকনাথ বাঙ্গালা স্কুলের পাঠ সমাপন করিলে মাতুল কলিকাতার বাসায় তাঁহাকে রাখিয়া ইংরাজি এণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিছুকাল যাবৎ ইনি পাঠাভ্যাসে মনোযোগী থাকেন এবং এই সময়ে ছুটী হইলে দেশে

মাতা ও মাতুলানীর নিকট গিয়া থাকিতেন। মাতা ও মাতুলানীর কলহের সংবাদ মধ্যে মধ্যে তাঁহার মাতা পত্র দ্বারা তাঁহাকে কলিকাতায় জ্ঞাপন করিলে তিনি বাড়ী যাইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতেন বটে; কিন্তু উহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইত না; মাতা মাতুলের বাসভবন ত্যাগ করিয়া স্বামিগৃহে আসিয়া থাকিতেন। এই অশান্তির মধ্যে তিনি অর্থোপার্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়া কর্ম্মজগতে প্রবেশ করিবার প্রস্তাব মাতুলের নিকটে উত্থাপন করেন। কিন্তু মাতুল অল্প বয়সে পাঠাভ্যাস ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলে তিনি কিছুদিন নিরস্ত থাকেন। এই সময়ে পাঠ্যাবস্থায় তিনি অবকাশ পাইলে মাতুলের কারবারে কালক্ষেপ করিয়া কাজ-কর্ম্মের খুটিনাটি মনোযোগের সহিত দেখিতে থাকেন। পরে তিনি মাতুলকে সবিনয় অনুরোধ করিয়া বলেন যে, কতকাল আর তাঁহার গলগ্রহ হইয়া থাকিবেন, তদপেক্ষা তাঁহাকে সামান্য এক কারবার করিয়া দিলে তিনি নিজের সংসারের ভার গ্রহণ করেন। মাতুল ইহাতে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে চাকুরী করিতে উপদেশ দেন এবং তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন দোকানদারের ঘরে বিনা বেতনে ২।৪ মাস মাত্র একটী চাকরীতে নিযুক্ত করেন। তাঁহার স্বাধীন চিত্ত এই দাসত্বে আবদ্ধ থাকিতে বিরোধী হইলে তিনি মাতুলের কারবারের অংশীদার ভজকৃষ্ণ মল্লিককে অনুরোধ করেন যাহাতে তাঁহার মাতুল তাঁহাকে দালালি কর্ম্ম করিতে অনুমতি দেন। লোকনাথের সরলতা, কর্ম্মদক্ষতা, শ্রমোপযোগিতা, একনিষ্ঠা ও স্বাধীনভাব দেখিয়া তিনি মধুসূদনের নিকট দালালি কার্য্য করিবার অনুমতি সংগ্রহ করিয়া দেন এবং তাঁহাদের পরিচিত বাজারের দোকানদারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এইরূপে মাতুলের বাসায় তাঁহার অন্নসেবী হইয়া লোকনাথ দালালী কার্য্য করিতে থাকেন। পাঁচ ছয় মাস এইরূপে কর্ম্ম করিলে

একদিন কোন ওজর করিয়া মাতুলকে দেশে লইয়া যান ও মাতা বিশ্বেশ্বরীকে পিত্রালয় হইতে মাতুলালয়ে লইয়া আসেন এবং উহাদের উভয়কে ও মাতুলানীকে একস্থানে উপবেশন করাইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে তাঁহার প্রথম উপার্জ্জনের টাকা সমস্তই অর্পণ করেন। ইহাতে তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করেন। মাতুল ঐ টাকা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া তাহা আপন ভগিনীর হস্তে তুলিয়া দেন এবং মাতা বিশ্বেশ্বরী উহা পুত্রের মঙ্গলার্থ দেবতার পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদিতে ব্যয় করেন। এই সময়ে মাতা বিশ্বেশ্বরী পুনরায় সোমসাড়ায় ভ্রাতৃভবনে আসিয়া থাকেন।

কিছুকাল এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া লোকনাথ অর্থসাহায্য পাইলে দোকান খুলিবার প্রস্তাব মাতুলের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি উহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন; কিন্তু অধ্যবসায়ী লোকনাথ পূর্ব্বের ন্যায় মাতুলকে অনুরোধের জন্য ভজকৃষ্ণ মল্লিককে বলেন। মাতুলকে অর্থসাহায্য করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া ভজকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপচন্দ্র মল্লিককে অংশীদার করিয়া লোকনাথকে লোহার কারবার করিয়া দিতে প্রস্তুত হন; তখন মাতুল অনিচ্ছায় পাঁচ শত টাকা মূলধন দেন এবং ভজকৃষ্ণও ঐ পরিমাণ টাকা দিয়া একটী marine store অর্থাৎ জাহাজ-সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যাদির কারবার আরম্ভ করেন। ভজকৃষ্ণ অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপচন্দ্র বড়লোকের ছেলের যেমন হওয়া উচিত তেমনি সৌখীন, আলস্যপ্রিয়, কর্ম্মে অমনোযোগী ও উদাসীন থাকেন। কাজেই লোকনাথ একাই কারবারের যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। কিছুদিন কাজ চালাইবার পর পুনরায় টাকার প্রয়োজন হইলে ভজকৃষ্ণ কারবারের প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা না করিয়া টাকা দিতে অসম্মত হইলে

তাঁহাকে যাবতীয় হিসাব দেখাইয়া ২।৫ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় ঋণস্বরূপ কিছু টাকা দেন ও পরে উহা কারবারের লাভ হইতে শোধ হয়। কলিকাতা ষ্ট্রাণ্ড রোডে হাওড়ার পুলের নিকটে প্রসিদ্ধ "প্রতাপচন্দ্র মল্লিক এণ্ড কোং" এইরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম দুই বৎসর ১০।১৫ হাজার টাকা মুনফা হয়; তাহা হইতে সরিকানগণের আপনাপন বাসা-খরচ বাদে বক্রী সমস্ত টাকাই কারবারের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়। দুই বৎসর গত হইলে মাতুলের দত্ত পাচ শত টাকা মূলধন তাঁহাকে ফেরত দিবার জন্য লোকনাথ উপস্থিত হইলে মাতুল তাঁহার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তাঁহার সন্তান নাই, ঐ টাকা তিনি আর ফেরত লইবেন না।

এই সময়ে ১৭।১৮ বৎসর বয়সে বনপুরের সন্নিকট ঘনরাজপুর গ্রামে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। তত্রস্থ রাধারমণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। এই সময়ে মাতা বিশ্বেশ্বরী বনপুরে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন; "প্রতাপচন্দ্র মল্লিক এণ্ড কোং" নামক কারবার আরম্ভ হইবার পর হইতে লোকনাথ ২।১ মাস অন্তর মাতাকে দেখিতে আসিতেন ও তাঁহাকে কিছু অর্থ দিয়া যাইতেন। ঐ সময় ই-আই রেলের বৈদ্যবাটী ষ্টেশন হইতে হাঁটা পথে বনপুর যাইতে হইত; তারকেশ্বর লাইন তখনও সৃষ্টি হয় নাই। কিছুকাল পরে উক্ত কারবারে উন্নতি আরম্ভ হইলে মাতা বিশ্বেশ্বরী গঙ্গার সন্নিকটে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দেশে জ্ঞাতিগণ লোকনাথের অবস্থার কিয়ৎ পরিবর্ত্তনেই ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়ে। জ্ঞাতিদিগের বিরোধ হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য এবং মাতার সদিচ্ছাপূরণের জন্য তিনি কলিকাতার অপর পারে গঙ্গার পশ্চিম কূলে কর্ম্মোপলক্ষে পরিচিত শিবপুর নামক গণ্ডগ্রামের দুই একজন ভদ্র-

লোককে একটী বাটী ভাড়া করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ বনপুরগ্রামে ভূমিষ্ঠ হইবার পর এক বৎসর মধ্যেই তিনি মাতা বিশ্বেশ্বরী ও পত্নী লক্ষ্মী দেবীকে লইয়া শিবপুরে ভাড়া-বাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। তখন হাওড়ার পুল হয় নাই; শিবপুর হইতে নৌকা-যোগে পার হইয়া কলিকাতা যাইতে হইত। এইরূপে যাতায়াত করিয়া কারবারে কিছু উন্নতি হইলে শিবপুরে যে ভাড়া-বাড়ীতে বাস করিতেন উহা বিক্রয়ের প্রস্তাব হয়। তিনি উহা খরিদ করিয়া ঐ বাটীর উন্নতি সাধন ও অর্থাগমের সহিত ঐ গ্রামেই কিছু কিছু ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করেন।

সন ১২৭১ সালে প্রসিদ্ধ "আশ্বিনে ঝড়" হয়। ঐ সনের পূর্ব্বে বহুতর টাকার চেন, নঙ্গর প্রভৃতি জাহাজের আবশ্যক দ্রব্যাদি বিলাত হইতে আনানো ছিল এবং পোর্ট কমিশনারের নিকট হইতে অতি অল্পমূল্যে বহুতর টাকার চেন, নঙ্গর আদি তিনি খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঝড়ের সময় ঐ সকল মাল তাঁহার গুদামে মজুত থাকে। এই ঝড় শেষ হইলে কলিকাতা ও অপরাপর বন্দরে চেন, নঙ্গর প্রভৃতি দ্রব্যের চাহিদা এত বাড়িয়া গেল যে, ঐ সকল মজুত মাল বহু উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। ইহাতে বহুতর টাকা লাভ হইলে তিনি কলিকাতার জনৈক ধনী বলিয়া পরিচিত হন। অতঃপর "প্রতাপচন্দ্র মল্লিক এণ্ড কোং" কলিকাতার একটি বিখ্যাত কারবারে পরিণত হয় ও দেশী লোকের কারবার হইলেও আমুটী কোং, হার্টন কোং প্রভৃতি বিলাতি লোকের কারবারের সহিত প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। তিনি এই কারবারে ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখেন এবং এই কারবার হইতে ক্রমশঃ রসি প্রস্তুতের কুঠী, বিলাতী কয়লার আমদানী প্রভৃতি নানা-প্রকারের কারবার আরম্ভ করেন। লোকনাথের মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে

"প্রতাপচন্দ্র মল্লিক এণ্ড কোং" কারবারে প্রতাপচন্দ্র মল্লিকের যে ॥• আনা অংশ ছিল তাহা তিনি খরিদ করিয়া ঐ কারবারের ও তৎসংক্রান্ত অপরাপর কারবারের ষোল আনার মালিক হন। আর্থিক উন্নততে তাঁহার দেব-প্রকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই তিনি যে সরলতা, সত্য ব্যবহার, পরদুঃখ-কাতরতা ও কর্ম্মক্ষমতা লইয়া জীবনে ব্রতী হন তাহা পরিবর্ত্তিত না হইয়া বরং দৃঢ়রূপে তাঁহার চরিত্র অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে উন্নত পুরুষ বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল। ইনি জেলা হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, খুলনা ও ২৪ পরগণা প্রভৃতি নানা জেলায় বহু বহু জমিদারী খরিদ করিয়া জমিদার-আখ্যা লাভ করেন। সহর কলিকাতায়ও তিনি ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। কলিকাতা বড়বাজারে যে ভূমি ক্রয় করেন তাহা হইতে ৴১ কাঠা জমি শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন। ঐ ঠাকুর-মন্দির এক্ষণে উডমণ্ড ষ্ট্রীটের সন্নিকট ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর অবস্থিত আছে ও উহার সেবা এখনও চলিতেছে

লোকনাথের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর গর্ভে ৩টী পুত্র ও ৪টী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। প্রথম পুত্র যোগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রনাথ ও তৃতীয় পুত্র কামাখ্যানাথ এবং প্রথমা কন্যা এলোকেশী, দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা, তৃতীয়া নবীনকালী ও চতুর্থা নৃত্যকালী।

যোগেন্দ্রনাথ জনাই সাকিমের তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিনোদিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার ৪টী পুত্র ও ১টী কন্যা। প্রথম পুত্র প্রমথনাথ কলিকাতা বহুবাজার সার্পেণ্টাইন লেনের হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা মৃণালিনীকে বিবাহ করেন। ইঁহার একটি পুত্র নলিনকুমার ও একটী কন্যা ইন্দুপ্রভা। ইন্দুপ্রভার শিবপুর সাকিমের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

পুত্র সচ্চিদানন্দের সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু মৃণালিনী ও ইন্দুপ্রভা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র মন্মথনাথের ৺কাশীধাম-নিবাসী নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা নীহারবালার সহিত বিবাহ হয়। ইঁহাদের চারিটী পুত্রসন্তান; প্রথম বিদ্যুৎকুমার, দ্বিতীয় সরোজকুমার, তৃতীয় নির্ম্মলকুমার (ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ), চতুর্থ বিমলকুমার। তৃতীয় পুত্র অনাথনাথের খিদিরপুর-নিবাসী প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা জীবনবালার সহিত প্রথম বিবাহ হয় ও পরে গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা অমিয়বালার সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়; এই বিবাহের দুইটী কন্যা আছে। চতুর্থ পুত্র অমিয়নাথ কুমার-ব্রতাবলম্বী। যোগেন্দ্রনাথের কন্যা বাণীদেবীর শিবপুর-নিবাসী নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয় কিন্তু তাঁহাকে অকালে বৈধব্য গ্রহণ করিতে হয়। যোগেন্দ্রনাথ সন ১৩০৮ সালে ২২শে কার্ত্তিক (ইং ৮ই নভেম্বর ১৯০১) পরলোক গমন করেন।

লোকনাথের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রনাথের কলিকাতা ভবানিপুর নিবাসী যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা সরস্বতী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। ইঁহাদের ২টী পুত্র ও ৩টী কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা গিরিবালার জনাই সাকিমের জমিদার নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের মহাশয়ের পুত্র মিহির-লালের সহিত বিবাহ হয়। দ্বিতীয়া কন্যা শৈলবালার উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত মনোহর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মণীন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হয়। ইঁহাদের ৪টী পুত্র—কানাইলাল, বলাইলাল, নিতাইলাল ও বুকী এবং ১টী কন্যা বনমালা। তৃতীয়া কন্যা উমাশশীর উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র বরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হয়। ইঁহাদের ১টী পুত্র মানসকুমার।

পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মণীন্দ্রনাথ অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং দ্বিতীয় পুত্র ধনীন্দ্রনাথ জেলা বীরভূম কুণ্ডলাগ্রামের জমিদার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের দুইটী কন্যা প্রথমা স্নেহময়ী ও কনিষ্ঠা জ্যোৎস্নাময়ী। মহেন্দ্রনাথ সন ১৩১৫ সাল ১৮ই আশ্বিন (ইং ১৯০৮ সাল ৪ঠা অক্টোবর) পরলোক গমন করেন।

লোকনাথের তৃতীয় পুত্র কামাখ্যানাথের ভবানীপুর-নিবাসী যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপরা কন্যা পান্নাশশীর সহিত বিবাহ হয়। ইঁহাদের ২টী পুত্র ও ৫টী কন্যা। প্রথম পুত্র হরেন্দ্রনাথ চিরকুমার-ব্রতাবলম্বী। দ্বিতীয় পুত্র অমরেন্দ্রনাথ আপন ভ্রাতা ও ধনীন্দ্রের সহিত একত্র কলিকাতায় বাস করেন। কামাখ্যানাথের প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ী জেলা বর্দ্ধমান শ্রীধরপুর-নিবাসী অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ইন্দুকুমারকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া কন্যা কাদম্বিনী বহুবাজার ২।১নং অভয় হালদার লেন-নিবাসী নাদবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র রাধাচরণ মুখোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। তৃতীয়া কন্যা জ্ঞানদা বেনেটোলা-নিবাসী চণ্ডীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র তারাশঙ্করকে বিবাহ করেন। চতুর্থা কন্যা অর্পণাবালা ৪৮নং কিয়ার্স লেন-নিবাসী কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বিজয়কৃষ্ণকে বিবাহ করেন। পঞ্চমা কন্যা অম্বুজবালা জেলা নদীয়ার কুড়লগাছি গ্রাম-নিবাসী সারদাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুশীলকুমারকে বিবাহ করেন। কামাখ্যানাথ ৪২ বৎসর বয়সে সন ১৩১৩ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ, (ইং ১৯০৬ সালের ৫ই জুন) তারিখে পরলোক গমন করেন।

লোকনাথের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাতা প্রথমা কন্যা এলোকেশীর উত্তরপাড়া-নিবাসী রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র গুরুদাসের সহিত বিবাহ হয়। ইঁহাদের ৩টী পুত্র—১ম আশুতোষ

অপুত্রক ; ২য় সন্তোষকুমার অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগত হন এবং ৩য় কানাইলালের ১টী মাত্র কন্যা।

প্রথম পক্ষের ২য়া কন্যা অন্নপূর্ণা, কলিকাতা খিদিরপুর বাকুলিয়া হাউস্-নিবাসী রায় বাহাদুর অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। ইঁহাদের ৮টী পুত্র ও ২টী কন্যা। পুত্রগণ—ননী-গোপাল, ব্রজগোপাল, ক্ষিরোদগোপাল, বিনোদগোপাল, রামগোপাল, ধনগোপাল, জয়গোপাল ও প্রাণগোপাল। পুত্রগণের মধ্যে ব্রজগোপাল অকালে প্রাণত্যাগ করেন। ১মা কন্যা সুশীলার বঁড়িসা-নিবাসী বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র নন্দলালের সহিত বিবাহ হয় এবং ২য়া কন্যা চারুশীলার প্রসিদ্ধ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়।

প্রথম পক্ষের ৩য়া কন্যা নবীনকালী আগড়পাড়া-নিবাসী দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র মহেন্দ্রনাথের প্রথমা পত্নী। মহেন্দ্রবাবু খুলনার সরকারী উকিল ছিলেন। ইঁহাদের ১টী মাত্র পুত্র নেপালচন্দ্র ও ২টী কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা সুকুমারীর কালীঘাট-নিবাসী সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। কনিষ্ঠা রজৎকুমারী।

প্রথম পক্ষের ৪র্থা কন্যা নৃত্যকালীর ভবানীপুর বেলতলা-নিবাসী রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র নীরদচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। ইঁহাদের ২টী পুত্র। জ্যেষ্ঠ বিনোদবিহারী রায় বাহাদুর রামসদয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ২য় পুত্র পুলিনবিহারী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

লোকনাথের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী পরলোকগতা হইলে তিনি বর্দ্ধমানজেলার মেমারী ষ্টেশনের সন্নিকট শ্রীধরপুর-নিবাসী ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী গজগামিনীকে বিবাহ করিয়া নিজের বাটীতে আনিলে সাত দিবসের মধ্যেই ঐ পত্নী কালগ্রাসে পতিত হন।

তিনি আর দারপরিগ্রহ করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলে তাঁহার মাতার ও বন্ধুগণের একান্ত অনুরোধে ও প্রথম পক্ষের শিশুসন্তানগণের পরিচর্য্যার লোকাভাব-বশতঃ তৃতীয় বার হুগলী জেলার জনাইগ্রাম-নিবাসী নকুড়-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ২য়া কন্যা কুসুমকুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার ৩টী পুত্র ও ৩টী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রগণ—নগেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যাগণ পার্ব্বতী, ভুবনেশ্বরী ও সাবিত্রী।

দ্বিতীয় পক্ষের ১ম পুত্র নগেন্দ্রনাথ বাগবাজার-নিবাসী নন্দলাল মুখোপ্যাধ্যায়ের পৌত্রী ও দেবেন্দ্রনাথের যমজ কন্যার জ্যেষ্ঠা বসন্তকুমারীকে ও ২য় পুত্র রাজেন্দ্রনাথ ঐ যমজ কন্যার অপরা শরৎকুমারীকে বিবাহ করেন। নগেন্দ্রনাথের ২টী কন্যা ; জ্যেষ্ঠা তুষারময়ীর হাওড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র অপূর্ব্বপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-বি'র সহিত বিবাহ হয়। ইঁহাদের দুইটি পুত্র—জ্যেষ্ঠ সুধাংশুপ্রকাশ ময়মনসিংহ হেমনগর-নিবাসী জমিদার হেরম্বচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা সাবিত্রীকে ও কনিষ্ঠ পুত্র হিমাংশু কলিকাতা মনোহরপুকুর-নিবাসী প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছেন। ২য়া কন্যা বিভাময়ীর কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র অনিলচন্দ্র, এম-বি'র সহিত বিবাহ হইয়াছে। বসন্তকুমারী সন ১৩২৬ সালের ২১শে কার্ত্তিক (ইং ১৯১৯ সালের ৭ই নভেম্বর) পরলোকগতা হন।

দ্বিতীয় পক্ষের ২য় পুত্র রাজেন্দ্রনাথের ৩টী পুত্র—রবীন্দ্র, রথীন্দ্র ও রমেন্দ্র এবং ১টি কন্যা দুর্গাদেবী। ১ম পুত্র রবীন্দ্র মজঃফরপুরের জমিদার চারু-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও মন্মথনাথের কন্যা সেফালিকাকে বিবাহ করেন। কন্যা দুর্গাদেবীর বেহালা-সাপুর-নিবাসী কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণের পুত্র জগজ্জ্যোতি, এম-বি'র সহিত বিবাহ হইয়াছে।

ইঁহাদের ১টি পুত্র অশোককুমার ও ১টী কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী। রাজেন্দ্রনাথের পত্নী শরৎকুমারী সন ১৩১৯ সালে ২রা পৌষ (ইং ১৯১২ সালে ১৭ই ডিসেম্বর) পরলোক গমন করেন।

দ্বিতীয় পক্ষের ৩য় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ জনাই-নিবাসী (হাল শ্যামপুকুর নিবাসী) প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের দুই পুত্র—সুধীন্দ্র ও শৈলেন্দ্র এবং ২ কন্যা ফুল্লাব্জকুমারী ও লীলাব্জকুমারী। সুধীন্দ্র পটুয়াটোলা-নিবাসী নিত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা বীণাপাণির পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কন্যা ফুল্লাব্জ-কুমারীর ইউ-পি সীতাপুর-নিবাসী যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার রামচরণের সহিত বিবাহ হইয়াছে এবং বেহালা সাকিমের কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র হরিদাসের সহিত লীলাব্জের বিবাহ হইয়াছে। ফুল্লাব্জের ২টি কন্যা ও লীলাব্জের ২টী পুত্র ও ১টি কন্যা।

দ্বিতীয় পক্ষের ১মা কন্যা পার্ব্বতী জোড়াসাঁকো চাষাধোপাপাড়া-নিবাসী কালীধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ৫ম পুত্র রাজেন্দ্রনাথকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের ২টি পুত্র—যোগিনীরঞ্জন চিরকুমার ও রমণীরঞ্জন নিরুদ্দিষ্ট এবং একমাত্র কন্যা অমিয়বালা সালিখা-নিবাসী সীতানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র চুণীলাল মুখোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। ইঁহাদের ২টি পুত্র—নির্ম্মলকুমার ও বিমলকুমার। নির্ম্মলকুমার ভবানীপুর সাকিমের হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের ২য়া কন্যা ভুবনেশ্বরীর গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর সাকিমের রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীগোপালের সহিত বিবাহ হয়। ইঁহাদের একমাত্র কন্যা হরিদাসী ভবানীপুর নিবাসী কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র ও কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শশাঙ্ক ভূষণকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের ২টী পুত্র ও ১টী কন্যা। ১ম পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ ও ২য় পুত্র ভবানীচরণ।

দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয়া কন্যা সাবিত্রী কলিকাতা গ্রে ষ্ট্রীট-নিবাসী কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র মণীন্দ্রনাথকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের একটিমাত্র কন্যা বিনোদিনী। বিনোদিনীর বৈঁচি-নিবাসী দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

লোকনাথের পবিত্র জীবনে অশেষ গুণাবলি পরিস্ফুট হয়। তিনি পরদুঃখ-নিবারণে বহু অর্থ-দান করেন; কিন্তু দানের পরিচয় অপ্রকাশ রাখিতে তিনি বিশেষ সাবধান হইতেন। প্রতি বৎসর পৌষমাসে গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধু-সন্ন্যাসীগণকে গঙ্গা-সাগর-যাতায়াতের পাথেয় ও শীতবস্ত্র কম্বলাদি দিতেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মন্দিরের শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবকে নিবেদিত মালপা প্রসাদ ও সিধা প্রভৃতি অকাতরে বিতরণ করিতেন, এই কার্য্যে বহু অর্থব্যয় হইত। তিনি পরিণত বয়সে ধনী হইলেও বাল্যের দারিদ্র্যের আস্বাদ বিস্মৃত হন নাই এবং নিজে ইচ্ছামত বিদ্যার্জ্জন করিতে পারেন নাই বলিয়া কলিকাতার একটি বাসা-বাড়ীতে বহু ছাত্রকে রাখিয়া প্রতিপালন ও বিদ্যাভ্যাস করাইতেন, তন্মধ্যে অনেকে পরে কর্ম্মজগতে খ্যাতনামা হয়। ইনি স্নেহপ্রবণ, দয়ার্দ্রহৃদয় ও সামাজিক ছিলেন। শিবপুরগ্রামের অভিজাত বংশের সকলেই তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁহার ভদ্রাসনের সংলগ্ন সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রাণ সবজজ অমৃতলাল পাল মহাশয়কে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার পিতা নিমাইচরণ পাল মহাশয় পরলোক গমন করিলে ইনিই পিতার ন্যায় তাঁহার সকল কার্য্যের সহায়তা করিতেন। এই দুইটী সংসারের এরূপ সৌহার্দ্দ্য আজকালকার দিনে বিরল হইয়া পড়িতেছে। ইঁহার গুরুপুরোহিতগণের সাংসারিক-শ্রী ইঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত সমভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠার পরিচয় তাঁহার সমস্ত কর্ম্মে

তাঁহাদের উপদেশ লওয়া হইতে পাওয়া যায়। তিনি এরূপ নিরভিমান ছিলেন যে, কারবারে কোন দুরূহ বিষয়ের পরামর্শ সামান্য বেতনভোগী চাকরের সহিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাঁহার কারবার-গুলিতে যে সব লোক সংশ্লিষ্ট ছিল তাহারা সকলেই পরে অংশশালী হয়। আমতা ও নিজগ্রাম বনপুরের বহুলোক তাঁহার কারবারে কার্য্য করিত। তন্মধ্যে আমতা-নিবাসী দীননাথ সরকার ও তস্য পুত্র যদুনাথ সরকার শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও মতিলাল চট্টোপাধ্যায় আপন আপন আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি করেন। কেবল উল্লিখিত অমৃতলাল পাল মহাশয়ের শ্বশুর আমতা সোড়েলা-নিবাসী ধার্ম্মিকপ্রবর কৈলাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও বাগবাজার-নিবাসী নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি করেন নাই। তাঁহার জ্ঞাতিগণ তাঁহার অবস্থার প্রতি ঈর্ষান্বিত থাকিলেও তিনি কর্ম্মক্ষমগণকে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া এবং অপারগগণকে গোপনে অর্থসাহায্য করিয়া যে আদর্শ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অতি বিরল। তাঁহার মাতা বিশ্বেশ্বরীর সহোদরার কন্যা মোক্ষদা দেবী ও তাঁহার স্বামী কালীচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সংসারে থাকিয়া নিজের লোকের মত বহুকাল যাবৎ প্রতিপালিত হইতেন এবং তাঁহার সঙ্গলাভেই উঁহাদের আর্থিক উন্নতি হয়। উক্ত মোক্ষদা দেবীর ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ও তাঁহার নিকট বহু সাহায্য লাভ করেন। তাঁহার খুল্লতাত অভয়-চরণ তাঁহার শিবপুরের বাটীতে থাকিয়া তাঁহার জমিদারী ও কারবারের কাজ করিতেন এবং তাঁহার পুত্র অবিনাশচন্দ্র প্রতিপালিত হইয়া ও বিদ্যার্জ্জন করিয়া সরকারী চাকুরী করেন।

লোকনাথ গম্ভীরপ্রকৃতি, মিতাচারী, মিষ্টালাপী ও চিন্তাশীল ছিলেন। বহুকাল যাবৎ কলিকাতার ও হাবড়ার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের

কর্ম্ম সুদক্ষতার সহিত করিয়াছিলেন। ইনি বহু জেলায় জমিদারী অর্জ্জন করেন; সে সকলের সুবন্দোবস্ত ও উন্নতির কার্য্যে তিনি প্রভূত সৎসাহস, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণের পরিচয় দেন। যখন হুগলী জেলার কোনও প্রসিদ্ধ জমিদার মকদ্দমায় তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া স্বয়ং তাঁহার সকাশে আসিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করেন তখন তাঁহার ঐ সকল গুণ বেশ বুঝিতে পারা যায়।

অল্প বয়স হইতে অমিত পরিশ্রম দ্বারা উন্নতি করিয়া পরিণতবয়সে কারবার সমুদয় ও জমিদারী আদি একাকী পরিদর্শন-কার্য্যে তাঁহার অকালে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। মধ্য বয়সে প্রস্রাবের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইহার গণ্ডস্থলে বিস্ফোটক হয়; তাহার ফলে সন ১২৯০ সালের ২১শে পৌষ তারিখে ৫৩ বৎসর মাত্র বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার মাতা বিশ্বেশ্বরী ইঁহার মৃত্যুর বহু পরে সন ১৩০২ সালের ভাদ্র মাসে এবং তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী কুসুমকুমারী সন ১৩২৮ সালের ৬ই ফাল্গুন তারিখে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

বংশলতা

৺শম্ভু দেবশর্ম্মা (চট্টোপাধ্যায়)
গোপীকান্ত
জগন্নাথ
কৃষ্ণচন্দ্র
বিপ্রদাস
অভয়চরণ
অবিনাশচন্দ্র
তারকদাস
পঞ্চানন
কৈলাসচন্দ্র
উমেশ
সিদ্ধেশ্বর
অঘোর
ত্রৈলোক্য
জগদীশ
ঈশ্বরচন্দ্র
বিশেশ্বরী দেবী
লোকনাথ
১মা লক্ষ্মী দেবী
২য়া গঙ্গাগামিনী
৩য়া কুসুমকুমারী

লোকনাথ
১মা লক্ষ্মী দেবী
যোগেন্দ্র
বিনোদিনী
প্রমথ
পালিনী
মন্মথ
নীহারবালা
অনাথ
(১)জীবনবালা
(২)অমিয়বালা
২ কন্যা
অমিয়
রাণীদেবী
সত্যচরণ বন্দ্যো।
নলিনকুমার
ইন্দুপ্রভা
সচ্চিদানন্দ
বন্দ্যো।
বিদ্যুৎকুমার
সরোজ
নির্ম্মল
(সত্যানন্দ)
বিমল
মহেন্দ্র
সরস্বতী
মণীন্দ্র
ধনীন্দ্র
আনন্দময়ী
গিরিবালা
মিহির মুখো
শৈলবালা
মণীন্দ্র মুখো
উমাশশী
হবেন্দ্র
কানাই
বলাই
নিতাই
বুকী
বনমালা
মানসকুমার
কামাখ্যা
পান্নাশশী
হরেন্দ্র
ও মহেন্দ্র
হিরণ্ময়ী
ইন্দুকুমার মুখো
কাদম্বিনী
রাধাচরণ মুখো
জ্ঞানদা
হারাশঙ্কর মুখো
অপর্ণা
বিজয়কৃষ্ণ মুখো
অনুজা
সুশীলকুমার রায়

১মা লক্ষ্মী দেবী
এলোকেশী
গুরুদাস মুখো
অন্নপূর্ণা
অখিলচন্দ্র মুখো
নবীনকালী
মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যো
নৃত্যকালী
নীরদচন্দ্র বন্দ্যো
আশুতোষ
সন্তোষ
কানাই
কন্যা
নেপাল
সুকুমারী
রজতকুমারী
বিনোদ
পুলিন
ননীগোপাল
ব্রজগোপাল
ক্ষিরোদগোপাল
বিনোদগোপাল
রামগোপাল
প্রাণগোপাল

লোকনাথ
কুসুমকুমারী
নগেন্দ্র
বসন্তকুমারী
রাজেন্দ্রনাথ
শরৎকুমারী
সুরেন্দ্র
কৃষ্ণপ্রিয়া
পার্ব্বতী
বাজেন্দ্র বন্দ্যো
তুষারময়ী
অপূর্ব্বপ্রকাশ গঙ্গো
বিভাময়ী
অনিলকুমার মুখো
রবীন্দ্র
শফালিকা
যতীন্দ্র
রমেন্দ্র
দুর্গা
জগজ্জ্যোতি
সুধীন্দ্র
বীণাপাণি
শৈলেন্দ্র
ফুল্লাঙ্গ
বামাচরণ
ভট্টাচার্য্য
ললিতাঙ্গ
হরিদাস
বন্দ্যো
যোগিনী
রঞ্জন
রমণী
রঞ্জন
অমিয়বালা
চুণীলাল
সুধাংশু
সাবিত্রী
হিমাংশু
শকুন্তলা
জ্যোতির্ম্ময়ী
অশোককুমার
মিণ্টু
চিনু
অরুণ
মিনু
সন্তোষ
নির্ম্মল
বিমল
ভুবনেশ্বরী
শ্রীগোপাল
হরিদাসী
শশিশেখর মুখো
সাবিত্রী
মণীন্দ্র মুখো
বিনোদিনী
ক্ষুদীরাম
ভবানী
বুড়ী

গোঁড়পাড়ার সিংহ-বংশ

সিংহদিগের আদিপুরুষ লক্ষ্মণ সিংহ। কথিত আছে, লক্ষ্মণ সিংহ কোন বিশেষ পদে নিযুক্ত হইয়া দিল্লীশ্বর আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহের সহিত দিল্লী হইতে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। বঙ্গের বিস্তীর্ণ সুসভ্য ক্ষত্রিয় কায়স্থ-সমাজ দেখিয়া এবং উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে বসবাস সুখকর বিবেচনা করিয়া হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বন্দীপুরগ্রামে বাস করেন। তাঁহার পৌত্র মধুসূদন সিংহ রায় চৌধুরী মহাশয় একজায় করিয়া গোষ্ঠীপতি হন এবং বঙ্গীয় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ-সমাজে মিশিয়া যান। তাঁহার বংশধর মুরারিধর সিংহ রায় চৌধুরী সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নদীয়া জেলার অন্তর্গত খিস্‌মা গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। অদ্যাপি খিস্‌মায় ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জনার্দ্দনের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

মুরারিধরের কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অন্তঃপাতী গোঁড়পাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। গোঁড়পাড়ার সিংহেরা ইঁহারই বংশধর। দয়া, দাক্ষিণ্য ও অতিথি-নারায়ণের সেবার জন্য গোঁড়পাড়ার সিংহ-বংশ সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

রামগোপালের প্রপৌত্র ধরণীধর ও শ্রীধর ভক্তিমান্ পরিবারের ভক্ত-সন্তান ছিলেন। সিংহেরা পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও শ্রীধর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ধরণীধরের পুত্র ৺ভুবনেশ্বর সিংহ তৎকালে একজন সুবিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সুপণ্ডিত বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল।

ইঁহার দুই পুত্র—বিনোদবিহারী ও বঙ্কুবিহারী। কনিষ্ঠ বঙ্কুবিহারীও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা কলিকাতা চাঁপাতলায় বাস করেন।

শ্রীধরের পুত্রেরা প্রথমে হাওড়ায় অপুত্রক মাতামহের আলয়ে আসেন; পরে রামকৃষ্ণপুরে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান। শ্রীধরের পুত্রগণ হইতেই সিংহেরা রামকৃষ্ণপুরের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামাচরণের তিন পুত্র অনাদিচরণ, পুলিনবিহারী ও জীবনবিহারী। ডাঃ জীবনবিহারী গোঁড়পাড়াতেই বাস করেন এবং তথায় চিকিৎসা-ব্যবসায় করেন। শ্রীধরের মধ্যমপুত্র তারাচরণ হাওড়ার বহুজন-পরিচিত অবৈতনিক বিচারক ছিলেন। তাঁহার দয়ালু ও পরদুঃখকাতর হৃদয় তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। ইঁহার নিরহঙ্কার সহৃদয় সামাজিকতা এখনকার দিনে দুর্লভ। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত তিনকড়ি সিংহ হাওড়ার সুপরিচিত নাগরিক ও অন্যতম অবৈতনিক বিচারক। শ্রীধরের কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার অম্বিকাচরণ অল্পবয়সেই দেহত্যাগ করেন। এই অল্পবয়সেই তিনি অস্ত্রচিকিৎসকরূপে হাওড়ায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন তাঁহার দয়ালু ও সহৃদয় ব্যবহারের জন্য। ফি লওয়া দূরে থাকুক, দরিদ্র রোগীদিগকে তিনি বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য দান করিতেন। যাঁহারা ফি দিতে পারিতেন না তাঁহাদের গৃহে প্রয়োজনের অতিরিক্তবার রোগী দেখিয়া আসিতেন; পাছে তাহাদের কোন দুঃখ থাকিয়া যায় যে, অর্থাভাবে চিকিৎসক আনাইতে পারেন নাই। ইঁহারা চারি ভ্রাতাই সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিজেরাও সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেন। ইঁহাদের একমাত্র ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল হুগলী-শ্রীপুরের মুস্তৌফি-বংশের ৺উমেশচন্দ্র মুস্তৌফীর সহিত।

সিংহ-বংশের উজ্জ্বল রত্ন স্বর্গীয় রায় চারুচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, ডাঃ

অম্বিকাচরণের একমাত্র পুত্র। মাত্র দেড় বৎসর বয়সকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা শরৎকুমারী ও জ্যেষ্ঠতাত তারাচরণের স্নেহ-চ্ছায়ায় তিনি মানুষ হইয়া উঠেন। বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। বৃত্তি লইয়া হাওড়া জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ডবল অনার্স লইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে এম্-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে ১ম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাওড়া কোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন। ওকালতি আরম্ভ করার পর কলিকাতা পটলডাঙ্গানিবাসী স্বর্গীয় শশিভূষণ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃঃ ইনি হাওড়ার সরকারী উকীল নিযুক্ত হন। ইনি হাওড়া উকীল-সভার সভাপতি ছিলেন।

হাওড়ায় এরূপ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান অল্পই আছে যাহার সহিত চারুচন্দ্র কোনও না কোনও রূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ২৭ বৎসর স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য এবং ৯ বৎসর ইহার বে-সরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন।

শিক্ষা-প্রচারে তাঁহার উৎসাহ ছিল অসাধারণ। তাঁহার চেষ্টাতেই মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক প্রথম অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ইহা ব্যতীত বহু বে-সরকারী বিদ্যানিকেতনের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হাওড়ার অন্যূন ৪।৫টি বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন সভাপতি। এতদ্ভিন্ন হাওড়ার বহু লাইব্রেরী, অবৈতনিক বিদ্যালয় ও দরিদ্র-ভাণ্ডারের তিনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক।

চারুচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অক্লান্তকর্ম্মী, সহৃদয় পুরুষ। তাঁহার মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। জননীকে তিনি সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞান করিতেন। পুরুষানুক্রমিক দানশীলতা যেন তাঁহার জীবনে

পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দরিদ্র প্রার্থীকে তিনি বিমুখ করিতে পারিতেন না। বহু অনাথা বিধবা ও দরিদ্র ছাত্রের তি'ন পিতৃস্বরূপ ছিলেন। বহু দরিদ্র ছাত্রকে তি'নি মাসিক সাহায্য করিতেন। তিনি কত দরিদ্র ছাত্রের পুস্তক কিনিয়া দিয়াছেন; পরীক্ষার ফি দিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্তই তিনি নীরবে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে ক'রতে ভালবাসিতেন।

যদিও তিনি বর্ত্তমান কংগ্রেস-নীতির সহিত একমত ছিলেন না, তথাপি তাঁহার স্বদেশপ্রেম ছিল অনন্যসাধারণ। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি বালগঙ্গাধর তিলকের নীতিতেই বিশ্বাস করিতেন। কংগ্রেসের বহু অধিবেশনেই তিনি প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকিতেন। বঙ্গভঙ্গের সময় হইতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে বিদেশী বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গভূষণ ছিল খদ্দর। তিনি হাওড়া টাউন হলে মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে অভিনন্দনপত্র দিয়াছিলেন। মাজুতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি এবং বহুভাবে এই সম্মিলনীকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পারস্পরিক সহযোগী সদস্য-রূপে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও প্রবেশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা-পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পরামর্শ-সমিতি প্রভৃতি বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য ছিলেন। প্রথম জীবনে মাতুলালয় শান্তিপুর থানা হইতে একবার রাণাঘাট লোকাল বোর্ডের সদস্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

গত ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ইনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ইঁহার চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ পান্নালাল বর্ত্তমানে হাওড়া কোর্টে ওকালতি করিতেছেন; কলিকাতার কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছেন, ইঁহাদের একটী মাত্র পুত্র শ্রীমান্ শুভেন্দু-

কুমার। চারুচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র নন্দলাল অল্পদিন হইল, মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রলাল সম্প্রতি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অচীন্দ্রলাল বর্ত্তমানে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন।

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র

কলিকাতাব সুপ্রতিষ্ঠ ও সর্ব্বজনপরিচিত চক্ষু-চিকিৎসক ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, এম-বি মহাশয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার তাঁহার মাতুলালয় নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালির নিকটবর্ত্তী তেবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় পঞ্চানন মৈত্র; পিতামহ স্বর্গীয় উমাকান্ত মৈত্র; প্রপিতামহ স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ মৈত্র; বৃদ্ধ প্রপিতামহ স্বর্গীয় কালীচরণ মৈত্র। ডাক্তার যতীন্দ্রনাথেব মাতার নাম শ্রীযুক্তা কামিনীসুন্দরী। ইহার বয়স এক্ষণে ৮১ বৎসর। এই বর্ষীয়সী ও মহীয়সী মহিলা আজিও জীবিতা আছেন।

যতীন্দ্রনাথ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের সুবিখ্যাত কুলীন মধুমৈত্রের বংশধর। এই বংশের পরিচয় এই বংশের অন্যতম বংশধর দেশ-বিশ্রুত ঐতিহাসিক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রমহাশয় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ আমরা নিম্নে সমুদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে উপলব্ধ হইবে যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে ইঁহাদের স্থান কত উচ্চ :—

"মধু তাঁহার সমসাময়িক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের একজন গণ্যমান্য সভাপতি ছিলেন। তৎকালে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ কুলীন এবং শ্রোত্রিয় নামক দুই শাখায় বিভক্ত ছিল। মধু বৃদ্ধ বয়সে সত্যরক্ষার্থ গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের দুহিতার পাণিগ্রহণ করায়, তাঁহার প্রথম পক্ষের প্রথম দুই পুত্র ভিন্ন অন্য পুত্রগণ পিতৃসংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা মধুব প্রতাপে কুলচ্যুত হওয়ায় "কাপ" নামক আর একটি শাখার উৎপত্তি হয়। অনেক কুলীন কাপ হওয়ায় এবং

শ্রীযুক্তা কামিনী সুন্দরী দেবী।

কেহ কেহ কাপ হইয়া পরে শ্রোত্রিয় হওয়ায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে কুলীনের সংখ্যা ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এখনও কৌলীন্য-মর্য্যাদা ভোগ করিতেছি। নরসিংহ প্রভুপাদ শ্রীমদদ্বৈত গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। "অদ্বৈতপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে নরসিংহের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কাপোৎপত্তির উল্লেখ আছে, যথা—

"নরসিংহ নাড়িয়াল আরু অঝার নাতি।
যাঁহার কন্যার বিভায় কাপের উৎপত্তি॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা
গৌড়ীয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে ছিল রাজা॥"

এই বিবাহসূত্রে অদ্বৈতবংশের সঙ্গে মধু মৈত্রের বংশের যে আত্মীয়তা সংস্থাপিত হয়, অদ্যাপি তাহা উভয় বংশের বংশধরগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে মধু মৈত্রের বংশ-ধরগণের সামাজিক আভিজাত্যের ইহাই একটী উল্লেকযোগ্য মূল। এই বংশে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বহু বংশধর প্রতিভায় ও কৃতিত্বে সুপরিচিত। তন্মধ্যে নাটোর-রাজবংশধরগণ, স্যর আশুতোষ চৌধুরী ও তদীয় ভ্রাতৃগণ অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বংশ কাশ্যপ-গোত্র-সম্ভূত এবং কান্যকুব্জাগত সুষেণ মুনির বংশ বলিয়া পরিচিত।"

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথের পিতামহ উমাকান্ত তিনটী বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রী ফরিদপুর জেলার রুকুনী গ্রামের ভদ্রাসনে বাস করিতেন, মধ্যমা পাবনার অন্তর্গত তাঁতিবন্দে বাস করিতেন, কনিষ্ঠা ফরিদপুরের অন্তর্গত সুখদেবপুরে বাস করিতেন। প্রথমার পৌত্র স্বর্গীয় অক্ষয়-কুমার মৈত্র রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকীল, সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও বঙ্গভাষার অন্যতম সুলেখক ছিলেন। মধ্যমার একমাত্র পৌত্র দুর্গাপতি এখন সস্ত্রীক কাশীবাসী; তাঁহার দৌহিত্রগণ কলিকাতাবাসী। ডাক্তার

যতীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠার পৌত্র; যতীন্দ্রনাথ তদীয় ভ্রাতৃগণসহ কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন।

যতীন্দ্রনাথেরা পঞ্চ সহোদর। জ্যেষ্ঠ—হেমচন্দ্র, দ্বিতীয়—সুরেন্দ্রলাল; তৃতীয়—যতীন্দ্রনাথ, চতুর্থ—ফণীন্দ্রলাল এবং পঞ্চম বা সর্ব্বকনিষ্ঠ—নলিনীকান্ত।

যতীন্দ্রনাথের তিন ভগিনী; জ্যেষ্ঠা—বসন্তকুমারী, মধ্যমা—শরৎ-কুমারী এবং কনিষ্ঠা—হেমন্তকুমারী।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সহোদর এবং মধ্যমা ও কনিষ্ঠা সহোদরা এক্ষণে পরলোকগত।

সহোদরগণ মধ্যে হেমচন্দ্র বি-এ, সুরেন্দ্রলাল বি-ই, ফণীন্দ্রলাল বি-এল এবং নলিনীকান্ত এম-এ উপাধিধারী। যতীন্দ্রনাথ, এম্ বি।

যতীন্দ্রনাথের পিতা স্বর্গীয় পঞ্চানন মৈত্র মহাশয় জমিদারী এষ্টেটের উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। তিনি নাটোর রাজ এষ্টেট সদর নায়েবের কর্ম্ম, দীঘাপতিয়া এষ্টেটে নায়েবের কর্ম্ম এবং সরকাটিয়া-এষ্টেটে ম্যানেজারের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নাটোর মিউনিসিপাল স্কুল হইতে প্রথমবিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজসাহী কলেজ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০৲ টাকা সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ঐ সালে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এল্-এম্-এস্ ও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী কার্য্যে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি চাঁদনী হাসপাতালের হাউস্ সার্জ্জন, মেও হাসপাতালের সিনিয়র হাউস্ সার্জ্জন এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষুবিভাগের সিনিয়র হাউস্ সার্জ্জনরূপে কার্য্য করেন। শেষোক্ত স্থানে কার্য্য করিবার সময় তিন তিনবার তাঁহার কার্য্য-

ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ডাক্তার মৈত্রের সহোদরগণ

জ্যেষ্ঠ স্বর্গীয় হেমচন্দ্র মৈত্র, বি এ ২। মধ্যম স্বর্গীয় সুরেন্দ্রলাল মৈত্র বি

৩। ডাক্তার শ্রীসতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি

৪। স্বর্গীয় ফণীন্দ্রলাল মৈত্র বি. এল ৫। শ্রীনলিনী কান্ত মৈত্র এম. এ

কাল বৰ্দ্ধিত করা হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী কার্য্যে ইস্তফা প্রদান করেন এবং নিজে স্বাধীনভাবে চক্ষু-চিকিৎসা আরম্ভ করেন। এক্ষণে তিনি শুধু চক্ষু-চিকিৎসাই করিয়া আসিতেছেন। Calcutta Medical Journal ও অন্যান্য মাসিক পত্রে তিনি চক্ষুরোগ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। তিনি "উপদংশে দৃষ্টিশক্তির পরিবর্ত্তন" "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় চক্ষুর পীড়া" প্রভৃতি প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। সেই সময় তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল:—(১) মন্ত্রীর বেতন হ্রাস। (২) স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার। (৩) জেলা-বোর্ডকে ম্যালেরিয়া-বিনাশের জন্য অর্থদান (৪) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বয়সের নির্দ্দিষ্টতা রহিতকরণ (৫) ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে জেলা-বোর্ডের বে-সরকারী সভ্য মনোনীতকরণ (৬) ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে জেল-পরিদর্শক মনোনীতকরণ (৭) রেডিয়াম-যোগে চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা-করণ (৮) মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে বে-সরকারী ডাক্তারদিগকে অনারারি সার্জ্জন ও চিকিৎসক নিযুক্ত-করণ (৯) মেডিকেল স্কুল ও কলেজে ছাত্রগণকে গুণানুসারে ভর্ত্তি-করণ। (১০) বাঙ্গালায় আরও মেডিকেল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠাকরণ (১১) জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কলিকাতা ট্রপিকাল স্কুলে যোগ্য লোককে নিযুক্তকরণ (১২) ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য (১৩) পুলিশের ব্যয়-হ্রাস (১৪) চাঁদপুর দুর্ঘটনার প্রতীকার (১৫) নূতন ট্যাক্স ধার্য্যের বিল বাতিল-করণ।

ফরিদপুর 'জেলে'র রাজবন্দিগণের প্রতি বেত্রাঘাত-সম্বন্ধে তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র বঙ্গদেশে ও বাঙ্গলার বাহিরে মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯২২

সালের জানুয়ারি মাসে মহাত্মা গান্ধী এই রিপোর্টের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহা Amrita Bazar Patrika 2nd January 1922 তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ফরিদপুর জেলার পদ্মানদীর তীরে বেলগাছি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট সুখদেবপুরে যতীন্দ্রনাথের আদিবাস। এখানে যতীন্দ্রনাথ একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কলিকাতায় ১৬৭ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের উপরে তাঁহার নবনির্ম্মিত ভবনে তিনি এক্ষণে বসবাস করিতেছেন।

যতীন্দ্রনাথ জীবনে আরও যে যে কার্য্য করিয়াছেন নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল।

(১) ১৮৯৯—১৯০০ উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম পারিতোষিক পান (২ ১৯০২—১৯০৩ স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম অনার্স সার্টিফিকেট ও অস্ত্রচিকিৎসায় সুবর্ণ পদক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্ত্রীবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ পদক প্রাপ্ত হন। (৩) কলেজে পাঠকালে তিনি বরাবরই বৃত্তি পাইয়াছিলেন। (৪) ১৯০৪—০৬ পর্য্যন্ত চাঁদনা হাসপাতালের হাউস সার্জ্জন ও মেও হাসপাতালের সিনিয়র হাউস সার্জ্জন। (৫) ১৯০৬—১০ মেডিকেল কলেজের চক্ষু-বিভাগের সিনিয়র হাউস সার্জ্জন। (৬) ১৯১০ —১৩ কলিকাতার কলেজ অব ফিজিসিয়ান্সে চক্ষুতে অস্ত্রোপচার-সম্বন্ধীয় লেক্‌চারার। (৭)কলিকাতা রাণী ভবানী স্কুলের অনারারি সেক্রেটারী।(৮)কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও বেঙ্গল মেডিকেল এসোসিয়েসনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মেম্বর। (৯) ১৯১৭-৩২ বেঙ্গল কাউনসিল অব মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেসনের সভ্য। (১০) সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলে এব বঙ্গীয় Retrenchment Committeeতে ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্য ও স্যানিটারী বোর্ডের সভ্য (১২) ১৯২০ সালে ফরিদপুর হইতে বঙ্গীয়

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। (১৩) দুইবার কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। (১৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বা সদস্য (১৯২২—২৭)। এবং ১৯ ২ :৯৩৭ পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মুসলমানগণ যখন শতকরা ৫০টা চাকুরীর জন্য কর্পোরেশনে প্রস্তাব আনয়ন করেন ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ তখন ঐ প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা এমন বিশদভাবে দেখাইয়াছিলেন যে, ঐ বিষয় আর উচ্চবাচ্য করিতে কেহ এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন নাই।

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগের চেয়ারম্যান (২বার) এবং জল-সরবরাহ কমিটির (Water Supply Committee) চেয়ারম্যান এবং সার্ভিস কমিটির সদস্য। ১৯৩২ সালে কর্পোরেসনের মেয়র-পদ প্রার্থী ছিলেন।

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ পাবনা জেলার তাঁতিবন্দ গ্রামের স্বর্গীয় গোপাল-চন্দ্র লাহিড়ীর কন্যা শ্রীমতী সুকুমারী দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর গোপালচন্দ্র অকালে পরলোকগত হন এবং তাঁহার শ্বশ্রূদেবীও এক্ষণে ইহজগতে নাই।

যতীন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রগণের নাম—জিতেন্দ্র-নাথ, জগদীন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ. ইঁহাদের মধ্যে জগদীন্দ্র বি-এস-সি ও রবীন্দ্রনাথ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা সরোজলক্ষ্মী,মধ্যমা পুষ্পবাণী এবং কনিষ্ঠা কমলা। প্রথমা ও মধ্যমা কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের স্বামিদ্বয়ের নাম—ডাক্তার শরদিন্দু সান্ন্যাল, এম্-বি এবং শ্রীযুত নীরদকুমার লাহিড়ী, এম্-এ। শরদিন্দুর পিতা স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সান্ন্যাল মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। নীরদকুমার শান্তিপুর-অদ্বৈত-বংশসম্ভূত।

যতীন্দ্রনাথের মাতুল রায় বাহাদুর ডাক্তার কুঞ্জলাল সান্ন্যা

সিভিল-সার্জ্জন ছিলেন ; ইনি এখনও জীবিত। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর। পূর্ব্ববঙ্গে :—ঢাকা ও বরিশালে তিনি বহুবৎসর asst Surgeon ছিলেন। তাঁহার চিকিসা নৈপুণ্যে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ অকপট স্বদেশ-ভক্ত। তিনি যে কেবল চক্ষু-চিকিৎসায়ই বিশেষজ্ঞ তাহা নহেন, তিনি দেশ ও জাতির সর্ব্বপ্রকার কল্যাণদায়ক কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় এবং কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি ও স্বজাতি-প্রেমের পরিচয় দেশবাসী পুনঃ পুনঃ পাইয়াছেন। দেশ ও জাতির সেবায় তিনি যে একনিষ্ঠ এবং স্বার্থলেশশূন্য, ইহা তাঁহার অতি বড় শত্রুও অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী, মাতৃ-ভাষার পরম অনুরাগী ও বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত এবং অপরের জ্ঞান-চর্চ্চায় প্রভূত উৎসাহ দান করিয়া থাকেন। তিনি দরিদ্র—বিশেষতঃ দরিদ্র ছাত্রগণের পরম বন্ধু।

ফরিদপুর জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতির পদে বৃত করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিল। সেই সম্মিলনীতে (১৩৩৫ সালের ৮ই বৈশাখ) তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অকপট দেশপ্রীতি, বিপুল অভিজ্ঞতা, প্রভূত রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সেই উপদেশবাণী জনগণের কল্যাণ-বিধায়ক হইবে মনে করিয়া আমরা উহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম :— *

"অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ, সহযোগী কর্ম্মিবৃন্দ ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী :—

আজ আমাকে এই সভার নেতারূপে বরণ করিয়া আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে যে পরিমাণে উৎসাহিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাদিগকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব তাহার উপযুক্ত ভাষা আমি

* এই সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের পরিবার বর্গ

প্রথম পংক্তিতে (বাম হইতে দক্ষিণে)—৪র্থ পুত্র রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজলক্ষ্মী দেবী, ৩য় পুত্র মনীন্দ্রনাথ মৈত্র।

দ্বিতীয় পংক্তিতে (বাম হইতে দক্ষিণে)—২য় পুত্র জগদিন্দ্রনাথ মৈত্র, ডাঃ যতীন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীযুক্তা সুকুমারী দেবী, জ্যেষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্রনাথ মৈত্র

তৃতীয় পংক্তিতে (বাম হইতে দক্ষিণে)—দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী পুষ্পরাণী দেবী, তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী কমলা দেবী, কনিষ্ঠ পুত্র সত্যেন্দ্র নাথ মৈত্র।

ডাক্তার মৈত্রের কালিম্পঙের বাটী
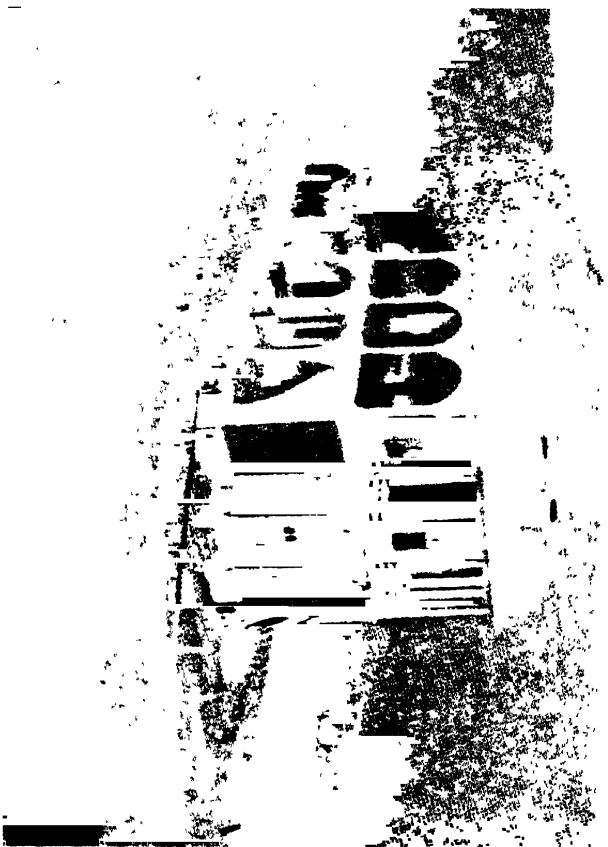
খুঁজিয়া পাইতেছি না। প্রবাসে থাকিয়াও যে আপনাদের স্মৃতিপট হইতে একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া আপনাদের অসীম করুণার নিদর্শন পাইয়াছি ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেছি। আজ এই সভা যাঁহাদের উপস্থিতিতে সমুদ্ভাসিত—যাঁহাদের প্রতিভা কর্ম্মকুশলতা ও কীর্ত্তি দিক্‌দিগন্তব্যাপী—যাঁহাদের সংযম, শিক্ষা ও আত্মত্যাগ আমাদের জননীজন্মভূমির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সন্তানগণের সমক্ষে সভাপতিত্বে বরিত হইয়া আজ আমি সত্য সত্যই নিরতিশয় কুণ্ঠা বোধ করিতেছি। ভরসা করি, আপনাদের সমবেত শুভকামনা ও আন্তরিক সাহচর্য্য আমার অক্ষমতা আবরণ করিয়া এই সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত সংসাধন করিবে।

এই ফরিদপুর জিলার একটি ক্ষুদ্র পল্লী আমার জন্মভূমি। শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে আমার উদ্বেলিত হৃদয়ের কত যে তরঙ্গোচ্ছ্বাস এই স্থানের মাটীর, এই স্থানের জলের এই স্থানের বৃক্ষ-বনস্পতির উপর গভীর রেখাপাত করিয়া রাখিয়াছে—পরবর্ত্তী কালেও তাহারই মধুর স্মৃতি উৎসবে ও ব্যসনে, আহারে ও বিহারে, আনন্দে ও বিষাদে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। 'সকল দেশের রাণী' এই আমার জন্মভূমির উত্তরে ও পূর্ব্বে কলকলনাদিনী বেগবতী পদ্মা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে খরস্রোতা মধুমতী সমগ্র স্থানটীকে মেখলার মত ঘেরিয়া রাখিয়াছে। চন্দনা ও কুমারের করুণাধারাসিক্ত শত শত উর্ব্বর পল্লীপ্রান্তর যদিও এখন তাহাদের পূর্ব্বগৌরবের সম্পূর্ণ দাবী করিতে পারে না, তথাপি এখনও আমাদের দেশ আংশিকভাবে সত্য সত্যই সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা—এখনও আমাদের 'হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে' এবং আমাদের দেশের বাতাস এখনও 'ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়।' Mr. O'malley এই ফরিদপুর সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—

"The luxuriant crops and the green verdure of the

vegetation are a relief to the eye after the arid sunbaked plains of the other parts of India." Mr. Lovat Fraser একদিন পূর্ব্ববঙ্গের নদীবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন :—

'One is voyaging in the midst of an entirely new India—an India almost beyond the imagination. The huge rivers, in places two miles wide even in dry season, have nothing in common with the bare brown plains of the Deccan, the placid luxuriance of Madras, and the burning deserts of Rajputna. They have a charm that never fades. In the faint opalescence of early dawn when the great squaresailed country craft drift past in dim and ghastly silence, they recall memories of unforgettable hours upon the Nile. Even in the full glare of noon-tide. the abiding beauty of the scene remains undiminished.'

আজ এই সভায় প্রবেশ করিয়া প্রথমেই একটা বিষয় স্মরণ করিয়া আমার মন অত্যন্ত বিষাদিত হইয়াছে। একদিন এইস্থানেই ফরিদপুর Provincial Conference-এর সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বজ্রগম্ভীর বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল এবং আমার দেশবাসী সেই অক্লান্ত কর্ম্মবীরের বুকভরা স্নেহ ও প্রীতি, উৎসাহ ও আনন্দ উপভোগ করিবার সেই শেষ সুযোগ পাইয়াছিল। আত্মা যদি সত্য সত্যই অবিনশ্বর হয়, তাহা হইলে সেই মহাপুরুষের আত্মা আজও এখানে তাঁহারই মর্ম্মগাথায় আমাদিগের সকলকে অনুপ্রাণিত করিবে, ইহাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস। স্বর্গীয় দেশবন্ধুর পুণ্যস্মৃতি জাগ্রত রাখিতে হইলে তাঁহারই উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার জ্বলন্ত স্বার্থ-ত্যাগ আমাদের প্রত্যেককে সর্ব্বতোভাবে অনুকরণ করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমরা তাঁহার আরব্ধ ব্রতের সম্যক অধিকারী হইতে পারিব।

ডাক্তার মৈত্রের কলিকাতাস্থ বাটী

(চিত্তরঞ্জন এভিনিউ)

আমার রাজনৈতিক গুরু স্বনামধন্য—দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক অম্বিকাচরণ মজুমদার আজ পরলোকগত। অম্বিকাচরণের মৃত্যুতে কংগ্রেসের একজন পুরাতন কর্ম্মীর, একজন প্রবীণ দেশসেবক ও দেশপ্রেমিকের তিরোভাব হইয়াছে। এই ফরিদপুরের এমন কোনও জনহিতকর এবং দেশহিতকর অনুষ্ঠান ছিল না, যাহার সহিত সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট না ছিলেন। তাঁহার আবক্ষ-বিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু, তাঁহার দীপ্তিপূর্ণ নয়নযুগল, তাঁহার দীর্ঘ বপু, আজানুলম্বিত বাহু এবং প্রশান্তগম্ভীর মূর্ত্তি যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি কখনই তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। বঙ্গদেশে দেশাত্মবোধ-বিকাশে তৎকালে যাঁহারা কংগ্রেসের প্রধান স্তম্ভরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, অম্বিকাচরণ তাঁহাদেরই অন্যতম। তাঁহার বাগ্মিতা, তাঁহার উদ্যম, দেশের কাজে তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার পুত্র-পৌত্র-স্থানীয় আমাদের মত লোককেও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিল। তাঁহার অভাব আজ আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহার আত্মার কল্যাণ হউক ইহাই আজ ভগবানের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ফরিদপুরের আরও দুইটী জ্যোতিষ্ক আজ কক্ষচ্যুত। একজন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এবং অপর আমার সোদরপ্রতিম বন্ধু পৃথ্বীশ-চন্দ্র রায়। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় গত ফাল্গুনমাসে বহরমপুরে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুর জিলার প্রাণপুর গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থাবান্ ছিলেন। তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং হিন্দুধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধেও তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ আছে। তিনি কর্ম্মজীবনের শেষ ভাগে ভাগীরথী-তটে একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও তৎসংরক্ষণে আত্মনিয়োগ

করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনে আমার জন্মভূমি এই ফরিদপুর জিলায় সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরম সমর্থক নিষ্ঠাবান্ একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের তিরোভাব হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রচারকরূপে পণ্ডিত শশধরের স্মৃতি বঙ্গের হিন্দুসমাজে চিরজাগরূক থাকিবে। পৃথ্বীশচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালার সাংবাদিক জগতে একজন প্রাচীন কর্ম্মীর তিরোভাব হইয়াছে। পৃথ্বীশচন্দ্র কেবলমাত্র সাংবাদিক ছিলেন না, তিনি একজন প্রথিতনামা সাহিত্যিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ছিলেন। পৃথ্বীশচন্দ্র বঙ্গের আধুনিক সমস্যাগুলির সমাধানের নিমিত্ত অনেক যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন এবং তিনি নির্ভীক ও স্পষ্ট কথায় সরকারের অবস্থার সমালোচনা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। পৃথ্বীশচন্দ্র একজন পূর্ণ দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

এখানে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ভারতের জাতীয় জীবনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ ৺ গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ফরিদপুর জিলারই কারণাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ২৪ পরগণায় বিবাহ করেন এবং তৎপুত্র খ্যাতনামা চিকিৎসক ৺ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথের পিতা। সুরেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসভূমি এই ফরিদপুর—ইহা স্মরণ করিয়া আজ আমি অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিতেছি।

ফরিদপুর জিলার বিবরণ

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ঢাকায় ২ জন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন– একজন ঢাকার জন্য এবং অন্যজন ঢাকা জালালপুরের

জন্য। উভয় বিচারকই ঢাকাতে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ঢাকা জালালপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে পদ্মার পশ্চিমতীরস্থিত কতক স্থানের এবং পূর্ব্বতটের জাফরগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ থানার কায্য সম্পন্ন হইত। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা-জালালপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস ঢাকা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ফরিদপুরে সংস্থাপিত হয় এবং চন্দনা নদীর পূর্ব্বতীরস্থ স্থান যশোহর হইতে খারিজ হইয়া এবং গোপীনাথপুরের থানা বাখরগঞ্জের অধীন হইতে খারিজ হইয়া ঢাকা-জালালপুরের অন্তর্গত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ঢাকা-জালালপুর জিলার নাম ফরিদপুর জিলা নামে পরিবর্ত্তিত হয়। তৎকালে আধুনিক ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমা ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ছিল; ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উহা ফরিদপুর জিলা হইতে খারিজ হইয়া ঢাকার অধীন হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জিলার কতকগুলি গ্রাম ফরিদপুর জিলাব শিবচর থানার অধীনে আইসে। বর্ত্তমান সময়ে নদীয়া জিলা হইতে ৩৩ তেত্রিশ খানি গ্রাম ফরিদপুর জিলার অন্তভুক্ত হইয়াছে, গোয়ালন্দ মহকুমার সীমা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত হয় এবং তৎকালে পাবনা জিলা হইতে পাংশা থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। মাদারীপুর মহকুমা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া সৃষ্ট হয় এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জিলার অধীনে আইসে। গোপালগঞ্জ পূর্ব্বে মাদারীপুরের মধ্যে ছিল; পরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নূতন মহকুমারূপে পরিণত হইয়াছে।

লোকসংখ্যা

১৯২১ সালের আদম-সুমারী হইতে জানিতে পারা যায় যে, সমগ্র ফারদপুর জিলার লোকসংখ্যা মোট ২২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮ শত ৫৮। এই লোকসংখ্যা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮ শত ৫১ এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ শত ৬ ছিল। সুতরাং

১৯২১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে সে বিষয় কোনই সংশয় নাই। প্রথম আদম-সুমারী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আদম-সুমারীর রিপোর্টগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সমগ্র ফরিদপুর জিলার লোকসংখ্যা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যাহা ছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সেই লোকসংখ্যা শতকরা ৮·৫ জন, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৯·৯ জন, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৬·২ জন, এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৮·৬ জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীর রিপোর্ট পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎকালে ফরিদপুর জিলায় শতকরা ৪০ জন হিন্দু এবং ৬০ জন মুসলমান ছিল; কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীর রিপোর্টে শতকরা ৩৬ জন হিন্দু, ৬৩ জন মুসলমান এবং ১ জন অন্যধর্ম্মাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪ জন কমিয়া গিয়াছে এবং মুসলমানের সংখ্যা শতকরা [illegible] জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র ফরিদপুর জিলায় বর্ত্তমানে

জাতি	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
হিন্দু	৪,০৯,২০৬	৪,০৬,৪২৮	৮,১৫,৬৩৪
মুসলমান	৭,৩৫,২০০	৬,৯২,৬৩৯	১৪,২৭,৮৩৯
খ্রীষ্টান	৩,২৮৭	৩,০১২	৬,২৯৯
অন্যান্য জাতি	৪৯	৩৭	৮৬
	১১,৪৭,৭৪২	১১,০২,১১৬	২২,৪৯,৮৫৮

ফরিদপুর জিলার ৪টী মহকুমার মধ্যে গোয়ালন্দ মহকুমার লোক-

সংখ্যা অন্যান্য মহকুমার সহিত তুলনায় সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গোয়ালন্দ মহকুমায় যে লোকসংখ্যা ছিল, ঐ সংখ্যা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ প্রায় ২০ বৎসরের ভিতরে শতকরা ৯ জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু পরবর্ত্তী ১০ বৎসরে শতকরা ৯.২ জন করিয়া কমিয়া যায়—অর্থাৎ গোয়ালন্দ মহকুমায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যে লোকসংখ্যা ছিল, ১৯০১ খৃষ্টাব্দ তাহা হইতেও লোকসংখ্যা কমিয়া যায়। এই সংখ্যা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ঠিক একই ভাবে ছিল। তৎপরে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ লোক-সংখ্যা শতকরা আরও ১.৩ করিয়া কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সমগ্র ফরিদপুর জিলায় গত ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর লোক-সংখ্যা যদিও শতকরা ৪৪ জন করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু গোয়ালন্দ মহকুমার লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়াই যাইতেছে। গত ৫০ বৎসরের ভিতর সমগ্র ফরিদপুর জিলায় মুসলমান শতকরা ৫০ জন এবং হিন্দু মাত্র শতকরা ২০ জন করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে ফরিদপুরের আয়তন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বাঙ্গলার (Bengal Proper) ১/১৬ ছিল এক্ষণে তাহা ১/৩৫ এবং লোকসংখ্যাও যাহা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বাঙ্গলার ১ ভাগ ছিল এক্ষণে তাহা ১/২৬। এই ফরিদপুর জেলায় প্রায় সাড়ে চারি হাজার গ্রাম এবং গ্রামের শতকরা ৯৭ জন লোক এখনও গ্রামেই বাস করে এবং তাহাদের মধ্যে শতকরা আশীজন কৃষিজীবী। আমাদের জিলার উর্ব্বরতা পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ হইতে অধিক এবং পূর্ব্ববঙ্গেরও অন্যান্য জিলা হইতে নিকৃষ্ট নহে। ইহার কারণ Sir W. Hunter এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"Thousands of square miles in Lower Bengal annually receive a top dressing of virgin soil brought free of expense a quarter of a year's journey from the

Himalayas— a sys'em of natural manuring which renders elaborate tillage a mere waste of labour and which defies the utmost power of over-cropping to exhaust its fertility."

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই সোনার বাংলা যাহা এক সময়ে ভারতের প্রধান শস্যভাণ্ডার বলিয়া পরিগণিত ছিল, যাহার উর্ব্বরতা, সমৃদ্ধি পূর্ব্বে বিদেশী বণিকের বিস্ময় ও ঈর্ষা উৎপাদন করিত, সেই বাংলাদেশ আজ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট! বাংলার জন্য আজ রেঙ্গুন হইতে চাল, বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে ডাল ও তৈলবীজ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতে হয়। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত, বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিম বঙ্গে তাহার ২১'৮, মধ্য বঙ্গে ২১'০ উত্তর বঙ্গে ১২'০ পূর্ব্ববঙ্গে ৭'২ পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা দেশের কৃষিসমস্যা আজ একটী শ্রেষ্ঠ সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধানের সহিত আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট।

মৃত্যু

১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ভিতর সমগ্র ফরিদপুর জিলায় এক কলেরা ব্যারামেই ৩৭ সাঁইত্রিশ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯০১ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ভিতর হাজারকরা ৩৫ পঁয়ত্রিশ জনের এবং পরবর্ত্তী ১০ বৎসরে হাজারকরা ৩৬ ছত্রিশ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ইহা নিবারণের জন্য আমরা কিম্বা আমাদের শাসনকর্ত্তারা কতটুকু করিয়াছি?

১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র ফরিদপুর জিলায় মাত্র ২৩টী হাসপাতাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই ২৩টী হাসপাতালের ভিতর Indoor

Patientদের নিমিত্ত ফরিদপুর সদর হাসপাতালে ২৭টী Bed, গোয়ালন্দ ঘাট হাসপাতালে ৫৪টী Bed রাজবাড়ী হাসপাতালে ২১টী Bed, মাদারীপুর হাসপাতালে ৮টী Bed ও গোপালগঞ্জ হাসপাতালে ১২টী Bed তৎকালে নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে এই Bed-সংখ্যা কোনও কোনও হাসপাতালে কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যে ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বাৎসরিক আয় প্রায় চার লক্ষ টাকা—যে জেলায় এক কলেরা ব্যারামে বৎসরে প্রায় ৫০০০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেই জিলার পানীয় জলের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ব্যয় করিয়াছেন ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে ৯॥ সাড়ে নয় হাজার টাকা, ১৯২৬-২৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬॥ সাড়ে ছয় হাজার টাকা এবং ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে ছয় হাজার চারি শত টাকা অর্থাৎ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আয়ের মাত্র $\frac{1}{64}$ পানীয় জলের জন্য এই তিন বৎসরে ব্যয়িত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আমার স্বদেশের প্রতিনিধি দ্বারাই পরিচালিত!!

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ফরিদপুরের চারিটী মহকুমার মধ্যে গোয়ালন্দ মহকুমার মৃত্যু-সংখ্যা জন্ম-সংখ্যার অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহার জন্য প্রতি বৎসরেই গোয়ালন্দ মহকুমার লোকসংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। কিন্তু এ কথাও এখানে বলা আবশ্যক যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর মৃত্যু-সংখ্যাই অনেক বেশী। ম্যালেরিয়াই যদি এই মৃত্যু-সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রধান কারণ হয়, তাহা হইলে যে সমস্ত কৃষক রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, মশকাদির অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া, অর্দ্ধাশনে কিংবা অনশনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে—যাহারা ঔষধ, পথ্য, মশারি, বসন-ভূষণ কিছুরই ধার ধারে না, তাহারাও হিন্দুদের অপেক্ষা মৃত্যুমুখে কম পতিত হয়—ইহার কারণ খুব কম লোকেই চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন। এ বিষয়ের সম্যক গবেষণা করিলে ধ্বংসপ্রায় হিন্দুজাতির আজ কিছু কূল-কিনারা হইতে পারে।

আমার নিজের মনে হয়, সারহীন পুরাতন চাউলের পরিবর্ত্তে সারযুক্ত মোটা চাউল, চিড়া, মুড়ি, টাট্‌কা শাক-শব্জী ও পেঁয়াজ প্রভৃতি Vitamin-সংযুক্ত খাদ্যের ব্যবহার ভূমিকর্ষণের উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম এবং সুনিদ্রা ইত্যাদি মুসলমানগণের জীবনীশক্তি হিন্দুদিগের জীবনীশক্তির চেয়ে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। হিন্দুদিগের আপনাদের আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি করিতে হইলে এই সমস্ত বিষয়ে তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিয়া চলিতে হইবে।

শিক্ষায় ফরিদপুর

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীতে এই জিলায় বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট (literate) লোকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫ শত ২০ ছিল অর্থাৎ সমস্ত জিলার শতকরা ৯ জন। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯ শত ১৯ জন পুরুষ এবং ২০ হাজার ৬ শত ১ জন স্ত্রী। শুধু পুরুষের হিসাব করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র জিলার পুরুষের মধ্যে শতকরা ১৫.৬ জন এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২২ জন লিখিতে পড়িতে জানে। অন্যান্য জিলার সঙ্গে তুলনায় দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের ১৩টী জিলা ফরিদপুর জিলা অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত এবং অপর ১৩টী জিলা এই জিলা হইতে অল্প শিক্ষিত। ৯০১ সালে ইংরাজী-শিক্ষিত হাজারকরা ৯ জন ও ১৯১১ সালে হাজার-করা ৩১ জন। মুসলমান পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৭ জন ও মুসলমান স্ত্রীলোকদের মধ্যে হাজারকরা ৪ জন এবং হিন্দু পুরুষের মধ্যে শতকরা ৩০ জন ও হিন্দু স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ৫ জন লিখিতে পড়িতে জানে। বাইশরসীর জমিদার স্বর্গীয় রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী স্বনামধন্য দেশনায়ক অম্বিকা-চরণের উদ্যোগে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়া পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে

ফরিদপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই ফরিদপুর জিলায় একমাত্র উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। সমগ্র জিলায় ১৯০ -২ খৃষ্টাব্দে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ২৩টী, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৪০টী, মধ্যবাংলা ৩৭টী, উচ্চ প্রাইমারী ১ শত ৭৫টী, নিম্ন প্রাইমারী ১ হাজার ১৫টী ও বিশেষ স্কুল ৬৭টী, একুনে ১ হাজার ৩ শত ৫০টি বিদ্যালয় এবং তাহাতে সর্ব্বসমেত ৪০ হাজার ৩ শত ৬৮ ছাত্রসংখ্যা ছিল। এতদ্ব্যতীত ১ শত ৩০টী প্রাইভেট স্কুল এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা ১ হাজার ৪২ ছিল। ২০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই জিলায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ৪৬টী, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৭৮টী, মধ্য বা লা ৮টি, উচ্চ প্রাইমারী ৭৩টী, নিম্নপ্রাইমারী ২ হাজার ৩ শত ১৫টী ও বিশেষ স্কুল ১ শত ৬টী ; একুনে ২ হাজার ৬ শত ২৬টী সাধারণ (public) বিদ্যালয় হইয়াছে এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা ৬৭ হাজার ৯ শত ৫৮। ইহা ছাড়া প্রাইভেট স্কুল ৫৮টী আছে এবং তাহার ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ১ হাজার ৭ শত ৯৫ জন। Australian Baptist Mission কর্ত্তৃক পরিচালিত ফরিদপুরে একটী Industrial school আছে, ইহার ছাত্রসংখ্যা ৭৮টী। এই বিদ্যালয় হইতে যে সমস্ত শিল্পকার্য্য হয় তাহার বার্ষিক মূল্য সাতাশ হাজার টাকারও অধিক এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের Calcutta Exhibitionএ এই বিদ্যালয় একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছিল। ওড়াকান্দীতে Miss Tuck কর্ত্তৃক পরিচালিত একটী Widows' Home প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ছাত্রীসংখ্যা ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে ৩১টি ছিল। মুসলমানদের মধ্যে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১২ বার হাজার জন লিখিতে পড়িতে জানিত কিন্তু গত ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ৪৬ হাজার ২ শত ৫৬তে দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া মুসলমানদের জন্য কোরাণ স্কুল, মোক্তাব এবং মাদ্রাসা ও হিন্দুদের টোল স্থানে স্থানে এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহা হইতে

আপনারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, শিক্ষাবিষয়ে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদিগের আগ্রহ ও উদ্যোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যদিও হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা এখনও মুসলমান ছাত্রসংখ্যা হইতে অনেক বেশী, তথাপি আমার বিশ্বাস যে, হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ে উদ্যোগের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃই জড়তা ও ঔদাসীন্য যেন আসিয়া দেখা দিতেছে।

ফরিদপুরের নদী

ফরিদপুর জিলায় নদীর অভাব নাই। এই জিলার নদীর সংখ্যাধিক্য দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ফরিদপুর জিলা এক সময়ে কি আভ্যন্তরিক, কি বাহ্যিক সব দিক দিয়াই বেশ একটী নদীমাতৃক দেশ ছিল। পদ্মা, কীর্ত্তিনাশা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ, কুমার, ভুবনেশ্বর, মধুমতী, চন্দনা, নয়াভাঙ্গনী ও শীতলাক্ষ ফরিদপুর জিলার প্রধান নদী। ইহাদের ভিতর কয়েকটী নদীতে এক বর্ষাকাল ভিন্ন বৎসরের অন্য কোন সময়ে মোটেই জল থাকে না এবং প্রায় নদীই বৎসরের অধিকাংশ সময় কচুরীপানায় সমাচ্ছন্ন থাকে। এই কচুরীপানা কৃষি, বাণিজ্য ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের এতই বিঘ্নকারী যে, বর্ত্তমানে ইহা ফরিদপুরের একটী প্রধান সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উৎপন্ন দ্রব্য

এই জিলার উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান্যই প্রধান। সমগ্র জিলার প্রায় চৌদ্দ আনা চাষী জমীতে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আউস, আমন ও বোড়ো ধান্যের চাষই সর্ব্বত্র করা হয়। ধান্য ব্যতীত পাট, তিল, সরিষা, মটর, খেসারী, মসূর, কলাই, ইক্ষু, নারিকেল, সুপারী, তরমুজ, ফুটী, শসা, খেজুর, তাল, আম, কাঁঠাল প্রভৃতিও এই জিলায় প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে

সমস্ত ফরিদপুর জিলায় ২ লক্ষ ৫৮ হাজার একার জমীতে পাটের আবাদ করা হইয়াছিল। এই পাটের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে। বিদেশীয় বণিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই পাটের মূল্য নিরূপণ করিয়া থাকেন এবং তাহার ফলে দরিদ্র কৃষকগণ তাহাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য কখনও পায় না। চিন্তাশীল দেশনায়কগণের এবং শিক্ষিত দেশবাসীর নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, পাটের চাষের আর যাহাতে দেশে বিস্তৃতি না হইয়া ক্রমশঃ তাহার সঙ্কোচ হয় তাঁহারা যেন সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এবং পাটের চাষের উপকারিতা ও অপকারিতা তাঁহারা যেন কৃষকদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। ইক্ষুর চাষ ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে হাবাসপুর, মৃগী, কালীমেহের, গোবিন্দপুর, খোয়াজপুর, ভোটনাজ, কালকিনী, মাথাভাঙ্গা, বিনোদপুর, কার্ত্তিকপুর, সোণাকান্দর, লক্ষ্মীকোল প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে ইক্ষুর চাষ সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে মাত্র।

শিল্পদ্রব্য

মাদুর, কাপড়, পিতল ও কাঁসার বাসন, ছিট, ইক্ষুগুড়, পাতক্ষীর ঘৃত, বাঁশের নানাবিধ জিনিষ ও শীতলপাটী ফরিদপুর জিলার প্রধান শিল্পদ্রব্য। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমগ্র ফরিদপুর জিলায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার লোক ব্যবসা-বাণিজ্য ও শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। ফরিদপুরের কার্পাস-বস্ত্র বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এতদিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ২০ বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যবসাদ্বারা ৫৩ হাজার লোকের জীবিকার্জ্জন হইত, বর্ত্তমানে এই ব্যবসা দ্বারা মাত্র ৩৪ হাজার লোকের কায়ক্লেশে জীবিকার সংস্থান হইয়া থাকে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারী

হইতে জানা যায় যে, সমগ্র ফরিদপুর জিলায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭ হাজার ৯ শত ৬২ খানি তাঁত (Hand-loom) চলিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা ধুতি, সাড়ী, লুঙ্গি, গামছা ও বিছানার চাদর তৈয়ারী হয়। ভূষণা থানায় শীতলপাটী সামান্য পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া থাকে। বিলাস খাঁ, দশরথ, কাটিলবাড়ী এবং বাথিরা গ্রামে পিতল ও কাঁসার তৈজসপত্র তৈয়ারী হয় এবং তদ্দ্বারা প্রায় ৭০টি পরিবার জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। হাবাসপুর, মৃগী, কার্ত্তিকপুর, মাথাভাঙ্গা, কালকিনী প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুগুড় উৎপন্ন হয়। সমগ্র ফরিদপুর জিলায় মৎস্য-ব্যবসায় দ্বারা প্রায় ৪৭ হাজার লোকের আহার্য্য-সংস্থান হইয়া থাকে।

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, ফরিদপুর জিলায় গভর্ণমেণ্টের আবগারী আয় শতকরা ৭০৲ সত্তর টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা আয় ছিল কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের ১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের পরস্পরের ভিতর মামলা-মোকদ্দমার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের আয় আরও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯২১ সালের আদম-সুমারীতে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর এক মামলা-মোকদ্দমা হইতেই গভর্ণমেণ্টের আয় ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা হইয়াছিল; ইহার বিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ বিষয় হইতে গভর্ণমেণ্টের আয় মাত্র তাহার অর্দ্ধেক ছিল। সমগ্র ফরিদপুর জিলায় মাত্র ৬ শত ৪৮ জন লোক আয়কর (Income-Tax) দিয়া থাকেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যদিও আমাদের দেশের লোকের আয় অত্যন্ত কম, তাহা হইলেও মামলা-মোকদ্দমাতে তাহাদের আয়ের একটী বৃহৎ অংশ খরচ হইয়া যায়।

কৃষি-সমস্যা

সমগ্র বঙ্গদেশের ৪ কোটী ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত লোকের মধ্যে চাষী লোকের সংখ্যা ১ কোটী ১২ লক্ষ ৪১ হাজার ২ শত এবং তাহাদের পোষ্য ২ কোটী ৪৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ১ শত। এতদ্ব্যতীত তাহাদের বেতনভোগী ভৃত্যের সংখ্যা ১৮ হাজার ৯ শত এবং দিনমজুরের সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ২১ হাজার ১ শত। ইহা ছাড়া ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫ শত লোক বিশেষ বিশেষ শস্য এবং শাকশব্জীর চাষে নিযুক্ত থাকে এবং তাহাদের পোষ্যের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫ শত যাঁহারা এই জমী হইতে জীবিকাসংগ্রহ করেন, সেইরূপ জমীদার বা তালুকদার প্রভৃতির সংখ্যা ১৩ লক্ষ ১ হাজার ৭ শত এবং তাঁহাদের ম্যানেজার, নায়েব প্রভৃতির সংখ্যা ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬ শত।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে এই জমিদার-তালুকদার-বংশের শতকরা ৯ জন হিসাবে বৃদ্ধি হইয়াছে আর প্রজার সংখ্যা শতকরা ৩ জন হিসাবে বাড়িয়াছে অর্থাৎ জমিদার-বংশের বৃদ্ধি প্রজাবংশের বৃদ্ধির ৩ গুণ দাঁড়াইয়াছে। ৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শতকরা ২৩ জন হিসাবে বৃদ্ধি হইয়াছিল।

বাংলা দেশের চাষের জমীর পরিমাণ ২ কোটী ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮ একার এবং পোষ্য বাদে সর্ব্ববিধ কৃষকের সংখ্যা . কোটী ৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক কৃষকের চাষের জমীর পরিমাণ দুই একার বা দুই একারের কিছু বেশী অর্থাৎ ৭ বিঘা। এই ৭ বিঘা জমীতে প্রায় ৩০ মণ ধান জন্মিয়া থাকে এবং উহার মূল্য প্রায় ৬০৲ টাকা। অন্য ফসল হইলেও দাম প্রায় তদনুরূপ।

পূর্ব্ববঙ্গের জলা জমীতে কিছু বেশী ফসল জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি স্থানবিশেষে ফসলের বিঘ্ন-

কারক হইয়া থাকে এবং সেই জন্য মোটের উপরে কৃষকের ২ বৎসরের আয় ৩ বৎসরে ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রত্যেক চাষার আয় বৎসরে ৪০৲ টাকা মাত্র।

জমীদারের খাজনা, চাষের খরচা প্রভৃতি বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহা দ্বারা কৃষকের নিজের এবং তাহার পোষ্যবর্গের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হয়। ৭ বিঘা জমী চাষ করিতে বৎসরের মধ্যে ১ মাসের অধিক সময় লাগা উচিত নয়। দেশে কলকারখানা ও শিল্প-কার্য্যের সুবিধা থাকিলে কৃষকগণ এই অবসর-সময়ে তাহাতে কর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে কিন্তু এ দেশে সে সুবিধা এখনও সম্পূর্ণ ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে কৃষকের চাষের জমীর পরিমাণের অত্যল্পতাকেই কৃষকের দরিদ্রতার মূল কারণ বলা যাইতে পারে।

এই কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহাকে বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর জ্ঞান দিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের কৃষকের আয় এ দেশের কৃষকের আয় অপেক্ষা অনেক বেশী; যথা—ক্যানাডার কৃষকের আয় ৫৫০৲ টাকা, ইংরাজ কৃষকের আয় ৭২০৲ টাকা এবং প্রত্যেক কৃষকের গড়ে জমীর পরিমাণ বাংলার প্রত্যেক কৃষকের জমীর পরিমাণের ১০ গুণেরও বেশী।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইউরোপের কৃষকের সংখ্যা সমস্ত লোকসংখ্যার শতকরা ১১ জন মাত্র কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের জমীর পরিমাণ ৪৬০ একার এবং তাহাদের কৃষির উপযোগী জমী বাংলার কৃষকের জমীর ৮ গুণেরও বেশী।

গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লণ্ডে যতখানি জায়গা, ভারতবর্ষে ততখানি জায়গায় ধানের চাষ হয়। চীন দেশেও ধান প্রচুর জন্মে। কিন্তু একার ফসলের হার সব চেয়ে স্পেন ও ইটালীতেই অধিক। সমগ্র

ইংলণ্ডের পরিমাণ যত ভারতে তদপেক্ষা অধিক ভূমিতে গমের চাষ হয়। ইক্ষুর আবাদেও ভারতের কম ভূমি আবদ্ধ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে একার প্রতি ১ টন মাত্র নিকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয় আর জাভা ও মরিশশে প্রতি একারে ৪ টন উৎকৃষ্ট চিনি পাওয়া যায়।

Agricultural Statistics of Bengal, 1919-20 হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সমগ্র বাঙ্গালার পরিমাণফল ৫ কোটী ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫ শত ২০ একার এবং ইহার মধ্যে ১৯১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২ কোটী ৪৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮ শত একার ভূমি আবাদ করা হইয়াছিল ও ৪৮ লক্ষ ২০ হাজার ৬ শত একার আবাদের উপযোগী ভূমি পতিত ছিল। আরও জানা যায় যে, ৫৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯ শত ৫ একার ভূমি যত্ন ও চেষ্টা করিলে আবাদ হইতে পারে কিন্তু তাহা বরাবরই পতিত পড়িয়া আছে। ১ কোটী ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭ শত ৬৬ একার ভূমি আবাদের অযোগ্য এবং ৪২ লক্ষ ৭২ হাজার ৪ শত একার ভূমি বন ও জঙ্গলাকীর্ণ। ঐ বৎসর নিম্নলিখিত রূপ ফসলের আবাদ করা হইয়াছিল :—

ধান্যের আবাদ	২ কোটী ৯ লক্ষ ৪০ হাজার	একার
পাট	২৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯ শত	,,
তূলা	৫০ হাজার ১ শত	,,
গম	১ লক্ষ ১৬ হাজার ১ শত	,,
সব্জী ও ফলমূল	৬ লক্ষ ৬ হাজার ৪ শত	,,
চিনি গুড়	২ লক্ষ ৭৪ হাজার ২ শত	,,
তিল সরিষা	১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭ শত	,,
পশুর খাদ্য	১ লক্ষ ১৪ হাজার ৪ শত	,,

রাজস্ব

ব্রিগ সাহেব প্রণীত ফিরিস্তির প্রথম খণ্ডের ৩৭৪ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই যে, সম্রাট আলাউদ্দীনের সময়ে উৎপন্ন শস্তের অর্দ্ধেক প্রজার বাৎসরিক রাজস্বরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। সম্রাট আকবরের সময়ে ভূমির কর-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর পুনর্সংস্কার করা হয়। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে জরীপপ্রথা সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। এই সময়ে কৃষকগণকেই ভূমির একমাত্র মালিক বলিয়া স্বীকার করা হইত এবং রাজা ও প্রজার ভিতর তৎকালে জোতদার বা তালুকদার-শ্রেণীর লোকের স্থান মোটেই ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের শেষভাগে এই জোতদার ও তালুকদার-শ্রেণীর লোকের প্রথম অভ্যুদয় ঘটে এবং তাহাদের রক্ষণের নিমিত্ত ভূমির উপর আবার নানাপ্রকার নূতন কর নির্দ্ধারিত হয়, যথা—নজরাণা মোকররী, জায় মাথট, মাথট ফিলখানা, আবওয়াব ফৌজদারী ইত্যাদি। এই বিভিন্ন প্রকার কর হইতে নবাব সুজা খাঁ বৎসরে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করিতেন। নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর সময়ে প্রজার উপর চৌথ মারাঠা, আহুক ও নজরাণা-মনসুরগঞ্জ নামক আরও তিনটী নূতন করের পত্তন করা হয় এবং বলা বাহুল্য, এই নব-নির্দ্ধারিত কর হইতে রাজ-সরকারের বাৎসরিক আয় প্রায় ২২ লক্ষ টাকার উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নবাব মীরকাশিম আবার নূতন করিয়া আরও চারি রকম কর প্রজাদিগের উপর ধার্য্য করেন এবং তদ্দ্বারা প্রায় ২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বাৎসরিক রাজস্ব আদায় হইতে থাকে। সম্রাটগণ যেমন কোনও প্রকার সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বিবিধপ্রকার কর ধার্য্য করিয়া জমিদার ও তালুকদারগণের নিকট হইতে অহোরাত্র কেবল অর্থশোষণে ব্যাপৃত থাকিতেন, জমীদার ও তালুকদারগণও তাদৃশ তাহাদের প্রজাদের উপর

মাঙ্গন, নাজাই, পার্ব্বণী, পুলবন্দী প্রভৃতি বিবিধ কর ধার্য্য করিয়া নানা প্রকারে প্রজার নিকট হইতে অর্থশোষণ করিতে মোটেই কোনও রূপ সঙ্কোচ উপলব্ধি করিতেন না। অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ৫৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ৩০ ত্রিশ টাকা ৯ আনা বাৎসরিক রাজস্ব-নির্দ্ধারণে তৎকালীন নবাব নাজিমুদ্দৌলার নিকট হইতে বঙ্গ-দেশের দেওয়ানী গ্রহণ করেন এবং এই সময় হইতেই বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের মূলপত্তন হয়। নবাবী গবর্ণমেণ্টের অধঃপতনের সময় যে সকল অন্যায় অবৈধ অতিরিক্ত কর প্রজাকে রাজসরকারে দিতে হইত, কোম্পানীর গবর্ণমেণ্ট সেইগুলিতে ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ মানিয়া লইয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এক নূতন Regulationএর সৃষ্টি করেন। তদ্দ্বারা প্রজাদিগকে জানান হয় যে—

"The prescribed restrictions as stated in the Regulation are that persons appointed to collect rents are to get authority by a written Amlanama that all cesses (abwahs mathot mango &c) are to be consolidated with the substantive rents in one sum and that no new cesses are to be imposed. (Sec. 52, Regulation VIII of 1793)" অর্থাৎ পূর্ব্বে নবাবী আমলে যে সমস্ত নূতন কর আকস্মিক বিপদের জন্য অস্থায়ীভাবে দেশবাসীর উপরে ধার্য্য করা হইয়াছিল ইংরাজ শাসনের সময়ে তাহা উঠিয়া না গিয়া প্রজার রাজস্বের সহিত মিশিয়া যায় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে উহাকে স্থায়ীভাবে জমীদারগণের লাটের খাজনার অংশীভূত করিয়া লওয়া হয়।

জমিদারের প্রবলতা ও রায়তের দুর্ব্বলতার জন্য প্রজাকে আবওয়াব প্রভৃতি অতিরিক্ত কর দিতে বাধ্য হইতে হয়। জমিদারগণও মনে করেন যে, তাহাদের পিতা-পিতামহের আমল হইতে যখন প্রজাগণ

এই সমস্ত অতিরিক্ত কর দিয়া আসিতেছে তখন তাহাতে তাঁহাদের রীতিমত পৈতৃক স্বত্বই জন্মিয়াছে। গবর্ণমেন্টের রিপোর্টেই প্রকাশ যে, অনেক জমীদারেই মনে করেন যে, তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের বেতন, তাঁহাদের হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ক্রয় করিবার খরচ, তাঁহাদের সেরেস্তার আনুসঙ্গিক যাবতীয় ব্যয়ভার সমস্তই তাঁহাদের প্রজাদেরই দেওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত সময় সময় গোয়ালার নিকট হইতে দুধ, কলুর নিকট হইতে তেল, ময়রার নিকট হইতে মিষ্টান্ন, তাঁতীর নিকট হইতে পরিধেয় বস্ত্রও জমীদারগণের ন্যায্য প্রাপ্য-হিসাবে আদায় করা হইয়া থাকে। পর্ব্ব উপলক্ষে, পূজাব্রতাদি উপলক্ষে, সন্তানের জন্ম উপলক্ষে এবং পুত্রকন্যাবিবাহ উপলক্ষেও প্রজাগণ জমীদারের সাহায্যার্থে কিছু না দিয়া পারে না। এই সব কারণে প্রচলিত খাজনার হার উৎপন্ন শস্যের মূল্যের অধিক হইয়া দাঁড়ায়। তাহার ফল দেশে বাকী খাজনার মোকদ্দমার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে ও অনেক কৃষককে জোত জমা বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে এবং পরে জোত-জমার অভাবে তাহাদিগকে দিনমজুরী খাটিতে হইতেছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে দিনমজুরের সংখ্যা ছিল ১ কোটী ৮৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ২ শত ৬, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৩ কোটী ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার ৬ শত ৮১, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৪ কোটী ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩ শত ৩৫। এখন দেখা যাউক, ভারতবাসীদের অবস্থা অন্যদেশবাসীদের তুলনায় কিরূপ। বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর লয়েড জর্জ্জের অনুমান ভারতবাসীদের বার্ষিক আয় গড়ে জন প্রতি ৪৯ উনপঞ্চাশ টাকা। Under-Secretary Mr. Richard বলেন, ভারতবাসীদের আয়ের পরিমাণ গড়ে ৬০৲ ষাট টাকা। ক্যানাডায় জন প্রতি বাৎসরিক আয় ৫৫০৲ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা এবং খাস ইংলণ্ডের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় গড়ে ৭২০৲ সাত শত কুড়ি টাকা। ইহার তাৎপর্য্যের বিশদভাবে ব্যাখ্যার আর কি কোনও প্রয়োজন আছে?

কৃষি-সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের কি উপায় অবলম্বন করা উচিত ?

কৃষির উন্নতির উপায়

(১) আবশ্যক জল-সেচন-পূর্ত্ত [Irrigation]।

(২) উন্নত কৃষি-যন্ত্রাদির পরিচালন।

(৩) সার।

(৪) ভাল বীজ।

(১) আবশ্যক জল-সেচন-পূর্ত্ত (Irrigation) :—

আবশ্যক জল-সেচন-পূর্ত্ত বিষয়ে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়া গিয়াছেন :—"What India wants now is an extensive system of Irrigation and we have suggested that a crore of Rupees out of the crore and half of the famine grant may be spent annually on the protective irrigation works. In this connection the Famine Commission of 1878 said "That most of the protective railways have now been constructed and that under the existing circumstances greater protections will be afforded by the extension of irrigation works." Public Works Deptএর Dredger Divisionএ গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি Dredger কিনিয়া অকর্ম্মণ্য অবস্থায় ফেলিয়া রাখার দরুণ সেগুলি খারাপ হইয়া যাইতেছে। ৫ খানি Dredgerএর ভিতর মাত্র ১ খানি কি ২ খানি Dredger কাজে লাগিয়া থাকে। এই রকম অকর্ম্মণ্য অবস্থায় ফেলিয়া রাখার দরুণ শুনিতে পাই যে, বহু টাকা মূল্যে খরিদ "রোনাল্ডসে" "বর্দ্ধমান" "কাউলী" নামক Dredgerগুলি একেবারে কাজের

বাহির হইয়া যাইতে বসিয়াছে। ১৮৬৪-১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলায় যে দুরন্ত ম্যালেরিয়া দেখা দেয়, তৎপ্রতীকারকল্পে গভর্ণমেণ্ট তৎকালে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া স্থির করেন যে, দামোদরের শাখানদীগুলির মুখ বাঁধের দ্বারা বন্ধ হইয়া যাওয়া এবং তাহাদের দামোদর নদী হইতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে প্লাবনের জল না পাওয়াই ম্যালেরিয়া-উৎপত্তির একটা প্রধান কারণ। গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রায় দশলক্ষ টাকা ব্যয়ে 'এডেন ক্যানেল' নামক একটী খাল খুঁড়িয়া এইসমস্ত শাখানদীতে যথোপযুক্ত দামোদরের জল সরবরাহ করার বন্দোবস্ত করা হয় এবং এতাবৎ কাল দামোদরের শাখানদীগুলিতে ঐরূপ ভাবেই জল সরবরাহ করা হইতেছে। এই উপায় অবলম্বন করার দরুণ বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলা আজ ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছে এবং স্বাস্থ্যেরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আমাদের নদীমাতৃক বঙ্গদেশে মাথাভাঙ্গা, বড়ল, ইছামতী চন্দনা, কুমার প্রভৃতির মুখ পদ্মানদীর বালির চরে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণে স্বাদু জল সব সময়ে তাহাতে প্রবাহিত না হওয়ায় নদীয়া, রাজসাহী, পাবনা, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জিলাগুলি ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, উদরাময় ও কলেরার প্রকোপে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। আমার মনে হয়, এইসমস্ত নদীর মুখ খনন করিয়া স্থির রাখা এবং তাহাতে জল সরবরাহ করা সব সময়ে সম্ভবপর না হইলেও এইসমস্ত নদীর মুখে উপরোক্ত কার্য্যবিহীন Dredgerগুলির দ্বারা বৎসরের ডিসেম্বর মাস হইতে মে মাস পর্য্যন্ত যদি জল pump করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এইসমস্ত নদী গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত থাকিয়া দেশেরও প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারে এবং কাজে ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ Dredger গুলিও কর্ম্মক্ষম থাকে। গভর্ণমেণ্টের স্থিরভাবে এ বিষয়ে বিবেচনা

করিয়া ইহার উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। আমার বিবেচনায় মাথাভাঙ্গা এবং চন্দনা নদীর মুখে 'রোনাল্ডসে' ও 'কাউলী' নামক বড় Dredger দুইখানিতে বসাইয়া দিয়া অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

(২) উন্নত কৃষিযন্ত্রাদির পরিচালন:—পাশ্চাত্য জগতে জমি কর্ষণের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে 'মটর ট্রাক্টর' প্রভৃতি বিবিধ কৃষি-যন্ত্রাদির আবিষ্কার হইয়াছে বটে কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ঐ সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করিবার সময় এখনও আমাদের দেশে আইসে নাই। আমাদের বর্ত্তমান কর্ষণ-পদ্ধতিই আমাদের পক্ষে উপযুক্ত কর্ষণ-পদ্ধতি বলিয়া মনে হয়।

(৩) সার:—গোময়, হাড়, খইল প্রভৃতি জমীর অত্যুৎকৃষ্ট সার। আমাদের দেশে প্রথমটী পর্য্যাপ্তপরিমাণে পাওয়া যাইলেও হাড় ও খইল জিনিষটী ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। বিদেশে হাড়ের রপ্তানীই এই দুষ্প্রাপ্যতার একমাত্র কারণ। মানুষ এবং পশুপক্ষীর দৈহিক উপাদানের ভিতর তাহাদের হাড়গুলিই বিশেষ আবশ্যকীয় পদার্থ। Phospheric Acid হাড়ের একটী বিশেষ উপাদান। এই Phospheric Acid সাধারণতঃ Nitrogen, Carbon Potash প্রভৃতি প্রকৃতির উপাদানের মত জমীতে সচরাচর পাওয়া যায় না। ইহা মনুষ্য-পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীর মৃত্যুর দ্বারা জমীতে সঞ্চিত হয় এবং তাহাই আবার বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরস্থিত কার্ব্বনিক এসিড প্রভৃতি দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া জমীর সাররূপে উদ্ভিজ্জ ও মৎস্য মাংস প্রভৃতির ভিতর দিয়া খাদ্য-সামগ্রীরূপে জীবজগতে পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা হাড়ের পুষ্টি সাধন করে। এইরূপে জমীর Phospheric Acidরূপ সমতার সংরক্ষণ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই হাড়ের উপকারিতা আমাদের দেশ এ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারে নাই। বৈদেশিক বণিকগণ লোক নিযুক্ত করিয়া যে যে স্থানে হাড় পাওয়া যাইতেছে তথা হইতে হাড় সংগ্রহ করিয়া বিদেশে চালান করিতেছে। Political Economyর একটী মহান্ সূত্র এই যে, কোন দেশের ধন এবং শস্যভাণ্ডার লুট করিলেও সে দেশের তত বেশী ক্ষতি হয় না, যত তাহার জমীর সার লুট করিয়া লইয়া গেলে৷ হয়। Phospheric Acid বা হাড় যে জমীর একটী উৎকৃষ্ট সার, ইহ না জানেন এমন লোক এদেশে খুব অল্পই আছেন অথচ এই সারটী অবাধে এই দেশ হইতে বিদেশে অপসারিত হইয়া যাইতেছে। শরীরাভ্যন্তরস্থ "লিউকোসাইট" নামধেয় জীবাণুগুলি—যাহা সব সময়ে আমাদিগকে বাহ্যিক জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে —তাহাদের কার্য্যশক্তি বৃদ্ধিকরণের Phospheric Acid যে একটী প্রধান উপকরণ ইহা অভিজ্ঞ শরীরতত্ত্ববিদ্মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং এই কারণ-বশতঃই ক্ষয়কর প্রত্যেক ব্যারামেই Phospheric Acid কোন না কোন প্রকারে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই Phospheric Acid এক হাড় ভিন্ন অন্য কোনও কিছুতে এদেশে পাওয়া যায় না। এই হাড়গুলির অপসারণের নিমিত্ত দেশের স্বাস্থ্য পক্ষান্তরে ভূমির উৎকর্ষতা যে দিন দিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আইনের দ্বারা এ দেশ হইতে বিদেশে হাড়ের রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত এবং Phospheric Acid বা Phosphates বাংলাদেশের কোন্ জমীর ভিতর কি পরিমাণে আছে ও ইহার উপকারিতা কি সে বিষয়ের বিস্তারিত গবেষণাও একান্ত আবশ্যক। হাড়ের ন্যায় খইলও প্রতি বৎসর বহুলপরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে এবং ইহাও দেশের ভিতর ক্রমে ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। খইল যাহাতে বিদেশে চালান হইতে না পারে, সে দিকেও

আমাদের গভর্ণমেণ্টের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ৭মণ খইল, ৭মণ হাড় ও ১০ মণ তৈল-বীজ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

•(৪) উত্তম বীজ :— বীজই ফসলের মূল। যে বীজ যত উত্তম তাহার ফসলও তাদৃশ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তম বীজ সংগ্রহ ও তাহার পরীক্ষার নিমিত্ত দেশের ভিতর নানাপ্রকার Co-operative Societyর প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক যথা— Co-operative Production Society, Co-operative Distribution Society ইত্যাদি। Agricultural Bank স্থাপন করিয়া কর্ষণব্যাপারে কৃষকের অনেক সাহায্য করা যাইতে পারে। ইহাদের এক একটী কেন্দ্র করিয়া সেখান হইতে জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং সেই নির্দ্ধারিত মূল্যের কমে সেই জিনিষ কেহ বিক্রয় করিতে পারিবে না। স্বাস্থ্যের অভাবে, ব্যাধিব পীড়নে ও বার্দ্ধক্যে এইসমস্ত দরিদ্র কৃষকের কে সাহায্য করে ও করিবে? সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে কিংবা তাহার অকাল মৃত্যু হইলে শুধু যে তার পোষ্যবর্গই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন এমন নহে, রাজা ক্ষতিগ্রস্ত হন, জমীদার ক্ষতিগ্রস্ত হন, মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হন, শিল্পী ক্ষতিগ্রস্ত হন, বণিক ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং যে তাহার শ্রমোৎপন্ন ধনের সামান্য পরিমাণেও ফলভোগ করিয়া থাকে, তাঁহারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। কর্ত্তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে এই দরিদ্র কৃষকই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাজসরকারের বেতন যোগায়, জমিদারকে খাজনা দেয়, মহাজনকে সুদ দেয়, বণিককে লাভ দেয়, শিল্পীকে তার শিল্পের উপকরণসংগ্রহ করিয়া দেয় এবং সর্ব্বসাধারণকে অন্ন দেয়। সুতরং সেই কৃষকের স্বাস্থ্যভঙ্গে যে সমগ্র জাতির এবং সমগ্র দেশের ক্ষতি সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কৃষকের এই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাহার পর্য্যাপ্তপরিমাণে আহার্য্য, বিশুদ্ধ

পানীয় এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থান চাই। বঙ্গদেশের নিরক্ষর লোককেও আধুনিক স্বাস্থ্যনীতি শিখিতে হইবে। পানীয় জল দূষিত হইলে বহু-বিধ সংক্রামক ব্যাধি জন্মে, যথা —কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি। পুষ্করিণী খনন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি থাকিলেও অনেক সময় জমিদারের নিকট হইতে জমি পাওয়া যায় না এবং অনেক জমিদার কৃষক-দিগকে বাগান করিবার জমিও জমা দিতে চাহেন না। আপনারা শুনিয়াছেন বঙ্গদেশে গড়ে প্রতি কৃষকের চাষ করিতে হয় মাত্র ৬।৭ বিঘা জমি। এই সামান্য জমি চাষ করিয়া তাহাদের যথেষ্ট সময় থাকে এবং এই অবসর-সময়ে যদি তাহারা অল্পভাবে ফলের চাষ, ফুলের চাষ এবং মৎস্যের চাষ করে, তাহা হইলে তাহাদের উদরপূর্ত্তিও হয় এবং আয়ও বাড়ে।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

Compulsory Free Primary Education অর্থাৎ বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বদেশেই আছে। এখান-কার বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রাবাসে বাস করা দরিদ্রের পক্ষে নিতান্ত কঠিন। কৃষিবিদ্যা কৃষকসন্তানদিগকে নিজের ক্ষেতে হাতে কলমে শিক্ষা করিতে হইবে এবং তজ্জন্য এক শ্রেণীর ভ্রমণশীল শিক্ষক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। রেভিনিউ বোর্ডের ১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দের Cess Report অনুসারে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার প্রজার নিকট জমিদারগণ যে খাজনা আদায় করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ ১৬৷৷০ কোটী টাকা এবং তাহারা গভর্ণ-মেণ্টকে দিয়াছিলেন ৪ কোটী টাকা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রজাগণ রাজসরকারে ৮ শত কোটি টাকা রাজস্ব

দিয়াছেন 'কিন্তু তথাপি যখন এই সব কৃষকের ক্লেশনিবারণের জন্য, কৃষির উন্নতির জন্য, ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিকারের জন্য, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য বৎসর বৎসর কর্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন-নিবেদন করা হয়—তখন তাঁহারা অম্লানবদনে বলেন যে, যদিও তাঁহাদের এ বিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতি আছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের রাজকোষে মোটেই অর্থ নাই—অথচ আপনারা সকলেই জানেন, পুলিশ ও সমর-বিভাগের জন্য প্রায় প্রতি বৎসরেই খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে। "Where there is a will there is a way" এই প্রবাদ বাক্যটা তাঁহাদেরই দেশের কথা। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি তাঁহাদের কোন্ কথাটী সত্য ?

সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজ দেখা যাইতেছে, ভারতেও আজ তাহার একটি ঢেউ আসিয়াছে। বহু কালের পরাধীনতায় এতাবৎ কাল আমাদের মনের ভাব সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু তড়িৎতরঙ্গের মত আকাশ ভেদ করিয়া আসিয়া সেই তরঙ্গ আজ আমাদের মনকে স্পন্দিত করিয়া, জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা যাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য সহযোগীরূপে কৃষকের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হওয়া বর্ত্তমানে একান্ত আবশ্যক। কৃষক এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহারা এদেশে শতকরা ৮০ জন এবং তাহারই এদেশের একমাত্র মেরুদণ্ড। দুঃখবিমুক্ত হওয়া, স্বাবলম্বী হওয়া, প্রকৃত মানুষ হওয়া এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করাই এখন তাহাদের একমাত্র দাবী। কে কতকাল স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে ? সংঘশক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নাই।

সাইমন কমিশন

(Simon Commission)

এইবার সাইমন কমিশন সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, ১৮৮৫ সালে যে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধন হয় তাহার সদস্যগণ প্রতিবৎসরই আমাদের দেশে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনেব দাবী করিয়া আসিতেছেন। জাতীয় জীবনের আন্দোলনে ইহা বহুদিন হইতে প্রদর্শিত হইতেছে যে, ভারতের রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে উত্তরোত্তর খর্ব্ব করিয়াই আসিতেছেন। এই দেশে কি কি আইন করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের ন্যায্য অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এস্থলে তাহার বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যদিও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এ দেশের প্রজাদিগের অধিকাংশই শান্ত, শিষ্ট, তবুও তাঁহারা Indian Penal Code, Civil Procedure Code প্রভৃতির শৃঙ্খলে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াও আজ নিশ্চিন্ত নহেন—যতই দিন যাইতেছে ততই তাঁহারা নূতন নূতন আইনের শৃঙ্খলে আমাদিগকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যথা—

(1) East India Company Act 1780 enacted that the Governor-General & Council of Bengal shall not be subject to the Supreme Court.

(2) East India Company Act 1793, in which the Governor-General may issue warrants for securing persons suspected of dangerous correspondence

(3) The Bengal State Offences Regulation of 1804

provides for the declaration of Martial Law under very stringest circumstances in certain areas of British India—(Martial Law was declared in Cuttack in 1861. Malerkotla in 1872 and in the Punjab in April, 1919).

(4) The Bengal State Prisoner Regulation 1818. (Regulation III of 1818),

(5) State Prisoners Act 1850.

(6) State Offences Act 1857.

(7) State Prisoners Act 1858.

(8) Act XXV of 1867—An Act for the regulation of printing presses and newspapers for the preservation of copies of books printed in British India and for the registration of such books.

(9) The Seditious Publications Act of 1882.

(10) Indian Telegraph Act 1885.

(11) Act XV of 1889—An Act to prevent the disclosure of official documents and informations.

(12) Notification No 2651—1, dated the 25th June, 1891—An order respecting the publication of newspapers and other printed books in places administered by the Governor-General in Council but not forming part of British India.

(13) Act VII of 1903—An Act for the prevention of incitement to murder & to other offences in newspapers.

(14) Act XIV of 1908—An Act to provide for the more speedy trial of certain offences and for the prohibition of associations dangerous to the public peace (Indian Criminal Law Amendment Act, 1908).

(15) Act I of 1910—An Act to provide for the better control of the Press.

(16) Act X of 1911—An Act to consolidate & amend the Law relating to the prevention of public meetings likely to promote sedition or to cause a disturbance of public tranquility.

(17) Act V of 1915—An Act to provide for special measures to secure the public safety and the defence of British India and for the more speedy trial of certain offences.

(18) Act XI of 1919—An Act to cope with anarchical and revolutionary crime.

(19) Ordinance.

সপাহীবিদ্রোহের সময় Lt. Col. John Coke লিখিয়াছেন "Our endeavour should be to uphold in full force the separation which exists between the different races and religions, not to endeavour to amalgamate them. *Divide et Impera* should be the principle of the Indian Government" অর্থাৎ "ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর এবং জাতির মধ্যে যে বিবাদ রহিয়াছে তাহা পূর্ণমাত্রায় বাজায় রাখা এবং উহা কোন মতেই না মিটান আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত। ভেদ-নীতিই

ভারতসরকারের সারনীতি হওয়া আবশ্যক।" ইহা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের প্রচেষ্টাতেই হউক, আর কয়েকটী স্বদেশী যুবকের আত্ম-বলিদানের জন্যই হউক, কিম্বা ইউরোপের মহাসমরে ভারতের সাহায্য আবশ্যক বলিয়াই হউক, গত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারত-সচিব প্রচার করেন—"The policy of His Majesty's Government with which the Government of India are in complete accord is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of the self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible Government in India as an integral part of British Empire." ইহার পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ আরও বলিয়াছিলেন, যে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ও ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে East India Companyর কর্ত্তৃত্বাধীনে ভারতবাসীর সুশাসনের নিমত্ত আইন প্রচলিত হয়—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীদের সরকারী চাকরী দিবার বিধান করা হয়—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের শাসন East India Companyর হাত হইতে সরকার নিজেই গ্রহণ করেন—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্বায়ত্তশাসনের বীজ ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম রোপিত হয় এবং সেই হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে স্বায়ত্তশাসন জীবনীশক্তি লাভ করে—১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যাহা করা হইল তাহাতে প্রজাদের প্রতিনিধি শাসন-পরিষদের সভ্য হইতে পারিবেন এবং ইহার পরে এই ক্ষমতা ক্রমশঃ আরও বিস্তৃতি লাভ করিবে। এই সম্পর্কে আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট আরও বলিয়াছিলেন যে "There is one gift which yet remains and without which the progress of a country cannot be consummated. That is the right of her people to direct

her affairs and safeguard her interest." কালে কালে সেই সমস্ত ক্ষমতা আমরা উপযুক্ত হইলে পাইব তাহাও আমাদের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ইহার ফলে যে শাসন-পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে ভারতবাসীদের প্রকৃত ক্ষমতা এতই সামান্য দেওয়া হইয়াছিল যে, কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষগণ স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং কার্য্যতঃ দেখা গিয়াছে যে, যখনই ভারতের প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাদের আপন আপন পরিষদে ইংরাজ-স্বার্থের ব্যাঘাতজনক কিম্বা দেশবাসীদের উন্নতিমূলক কোনও প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট আপনার খুসী অনুসারে তাহা অনায়াসেই নাকোচ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আসল মতলবে আজ দেশবাসী সম্পূর্ণ আস্থাহীন। কথা ছিল, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পরে পুনরায় Royal Commission আসিয়া আমাদের কি কি ভাবে শাসনপরিষদের ক্ষমতা প্রসারণ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এই অজুহাতে Simon Commissionএর সৃষ্টি হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংরাজ সরকার আমাদের জাতীয় উন্নতির বিধানের জন্য প্রস্তাবিত সময়ের দুই বৎসর পূর্ব্বে Commissionটী এদেশে পাঠাইয়াছেন—ইহাই আমাদের সন্দেহের প্রথম কারণ। অযাচিত সহৃদয়তা চিরকালই সন্দেহমূলাত্মক। কিন্তু এই অযাচিত সহৃদয়তা মুখে প্রকাশ করিলেও কার্য্যতঃ ভারতের কোন নরনারীর স্থান এই কমিশনে দেওয়া হয় নাই—ইহা আমাদের সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ। যে সমস্ত ভারত-সন্তান একাগ্রমনে ইংরাজ দাসত্বকেই আমাদের জাতীয়জীবনের একমাত্র উন্নতির উপায় বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যেও ইংরাজ সরকার এমন একজনকে খুঁজিয়া পান নাই যাঁহার উপরে এই কমিশনের সদস্য হইবার মত বিশ্বাস তাঁহাদের আছে। তাহাতেই আমাদের সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছে যে,

এই কমিশনে এমন বিষয় কিছুও আলোচিত হইবে এবং ইংরাজ দপ্তরের এমন গোপনীয় কাগজপত্রাদির প্রকাশ হইবে যাহা ইংরাজ সন্তান ছাড়া অপর কাহারও জানা ইংরাজের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নহে। আমাদের পূর্ব্বসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড এক সময়ে Lord Mintoকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন – যাহা সিডনি লী-প্রণীত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের জীবনচরিতে দেখিতে পাই—তাহা এই—"However clever the native might be and however loyal you and your Council might consider him to be, you never could be certain that he might not prove a very dangerous element in your Councils and impart information to his countrymen which, it would be very undesirable, should go further than your Council Chamber."

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মুখে আদর ও যত্ন দেখাইলেও গুহ্য বিষয়ের পরামর্শের সময়ে ব্রিটিশ-জাতি ভারতে একজনকেও বিশ্বাস করেন না। সুতরাং এই Simon Commissionএর দ্বারা যদি কোন লোক ভারতের উন্নতির সুস্বপ্ন দেখেন তাহাকে ভ্রান্ত ছাড়া আর কি বলিতে পারি? এই কমিশন সম্বন্ধে আমাদের আর একটি প্রধান আপত্তির কারণ **ইহার ব্যয়**।

১৯১০-১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানাবিধ কমিশন ও কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল এবং তাহাদের ব্যয় হইয়াছে ৬৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। তাহাদের মধ্যে যেগুলিতে এক লক্ষ টাকার অধিক খরচ হইয়াছে তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জেল কমিটি ১৯২০-২১	২,২৮,১১১৲
রেলওয়ে পুলিস কমিটি	১,৭৮,১৭২৲
রয়েল কমিশন্ অন্ পাবলিক সার্ভিস	১০,৫২,৮৮৫৲
রিফরমস কমিটি ১৯১৮-১৯	৬,২৯,২২১৲
আকওয়ার্থ কমিটি	৪,৪৪,৫৬৪৲
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন	৫,৬৯,৬৬১৲
ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস্কমিটি	১,৭০,০৪৫৲
ইণ্ডিয়ান ফিস্‌ক্যাল কমিশন	৫,১৫,০০০৲
মারক্যানটাইল ম্যারাইন কমিটি	১,০০,০০০৲
ইণ্ডিয়ান সুগার কমিটি	২,৭০,৩৪৫৲
The Committee on Co-operation in India	১,৯০,১৪৭
Stores Purchase Committee	১,৬১,৫০০৲
Indian Industrial Commission	৫,০০,৯০৯৲
The Chemical Services Commitee	১,৫১,১৫৪৲
Royal Commission on Indian Finance	১,২০,৬৮২৲
Indian Currency Committee	২, ৮,১৬৲
Retrenchment Committee	১,৬২,০০০৲
Public Works Dept. Re-organisation Committee 1916-17	১,১৯,৪৪৮৲

উল্লিখিত ১৮টী কমিশন ও কমিটী বাদে ঐ সময়ে আরও ৪৭টী কমিটী গঠিত হয় এবং এই ৬৫টী কমিটী ও কমিশনে ব্যয় হইয়াছে ৬৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। এই সম্পর্কে Lord Inchcape দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"From a perusal of the list we cannot but feel that their appointment has not in all cases been justified and that the results obtained have not always been commensurate with the expenditure involved. We recommend that this elaborate and expensive procedure for the settlement of current problems be resorted to only in exceptional cases."

এই Inchcape Committee আরও দেখাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের ব্যয়—যাহা ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ১০৪ কোটী ২৬ লক্ষ ৩২ হাজার ছিল—মাত্র নয় বৎসরে তাহা ২২১ কোটী ৪৫ লক্ষ ৮৩ হাজারে দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ ৯ বৎসরে গবর্ণমেণ্ট-পরিচালনের ব্যয় বাৎসরিক ১১৭ কোটী ১৯ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহারা ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ইহার মধ্যে ১৯ কোটী ৫২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকার ব্যয় সহজেই বন্ধ করা যাইতে পারে। এই টাকা ভারতের তেত্রিশ কো লোকের অনুপাতে গড়ে মনুষ্য প্রতি ৷৷০ আট আনা করিয়া ধরিলে এবং বাংলা দেশের প্রায় পৌণে পাঁচকোটি লোকের উন্নতির জন্য ব্যয় করিলে প্রতি বৎসরে আড়াই কোটী টাকা ব্যয়িত হইতে পারে। এই ২৷৷০ কোটী টাকা দিয়া বৎসরে বৎসরে বাংলাদেশে কত জনহিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। যে অস্বাস্থ্যতার জন্য সোনার বাংলা আজ শ্মশান পরিণত হইতে বসিয়াছে যে দেশে গড়ে আয়ূ মাত্র ২৩ বৎসর, যেখানে শিক্ষা-বিস্তারের অভাবে শতকরা ৯০ জন সম্পূর্ণ মূর্খ, যে দেশে শতকরা ৮০ জন কৃষিকার্য্য করে এবং মাত্র মাসিক ২৷৷০ হইতে ৩৷৷০ টাকা আয়ের দ্বারায় নিজের স্ত্রীর ও পুত্রকন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেই হতভাগ্য দেশের কত উন্নতির বন্দোবস্ত বাৎসরিক ২৷৷০ কোটী

টাকা ব্যয়ে করা যাইতে পারে। প্রজার সম্পদই রাজার সম্পদ। প্রজা সুখী হইলে, প্রজা সুস্থ হইলে, প্রজা জ্ঞানী হইলে, প্রজা ব্যবসা ও বাণিজ্যে উন্নতি করিলে কবে কোন্ দেশে রাজা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন? Lord Inchcape যিনি এই Retrenchment Committeeর অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এবং তৎসহকর্মীগণ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন— "Since 1913-14 new taxation estimated to yield Rs. 49 crores annually has been imposed and the extent to which it is possible to impose futher burdens on the taxpayer is now very limited. While, therefore, it is evident that an improvement of something like 20 crores will have to be obtained in order to make the position secure, it is no less evident that the main source of relief must be looked for in the retrenchment of expenditure".

এই রিপোর্ট আজ প্রায় ৫ বৎসব প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু জানি না গবর্ণমেণ্ট এই রিপোর্টের নির্দ্দেশমত তাঁহাদের ব্যয় কিছুমাত্র সংক্ষেপ করিয়াছেন কি না। পরন্তু আমার বিশ্বাস গবর্ণমেণ্ট উত্তরোত্তর ব্যয় বৃদ্ধিই করিয়া যাইতেছেন।

এই Inchcape কমিটির কথা সত্ত্বেও এবং ইহার কালি শুখাইবার পূর্ব্বেই আরও অনেকগুলি কমিশন ও কমিটী হইয়া গিয়াছে, তাহার খরচ ধরিলে ব্যয় প্রায় আরও ২৫।৩০ লক্ষ টাকার উপর বাড়িয়া যাইবে।

যদি বুঝিতাম এই কমিশন ও কমিটীর প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করা হইবে, তাহা হইলেও আমাদের ব্যয় সার্থক হইতে পারিত কিন্তু অতি অল্প ক্ষেত্রেই তাহাদের কথা গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন

—বিশেষতঃ যেখানেই প্রস্তাবগুলি ইংরাজ-স্বার্থের অনুকূলে হয় নাই সেইখানেই তাহা নানা অজুহাতে কার্য্যেও পরিণত করা হয় নাই। Simon Commissionএর সপ্তরথী ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন, সম্প্রসারণ কিম্বা সঙ্কোচনের জন্য আসিয়াছেন এবং Sir John Simon বারম্বার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা আমাদের উপকার করিবার ইচ্ছাতেই এদেশে আসিয়াছেন। ধরা যাউক তাঁহাদের এই কথা সত্য। কিন্তু যখন পূর্ব্বাপর Commission ও Committeeগুলিতে আমাদের দেশহিতকর প্রস্তাবগুলি প্রায়শঃই উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, আমরা কি করিয়া বিশ্বাস করিব যে এবারে তাঁহাদের সেই দেশ-হিতকর প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হইবে? কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে কোনও উপকার হউক বা না হউক, আপাততঃ আমাদের দেশের প্রায় আট লক্ষ টাকা ঐ প্রস্তাবের উপক্রমণিকাতেই ব্যয় হইতে বসিয়াছে।

মন্তব্য

আজ কয়েক বৎসর হইল, আমাদের জাতীয়জীবনের উন্নতি-বিষয়ক নানাবিধ প্রবন্ধ বাহির হইতেছে এবং বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে দেশের উন্নতির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষাকেই আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ বা এই দেশের নানাবিধ ধর্ম্মমত ও জাতিগত পার্থক্যকেই লক্ষ্য করিয়া একতার প্রধান অন্তরায় বলিয়াছেন, কেহ বা নৈতিক জীবনের অধঃপতনই দেশের অধঃপতনের মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেহ বা আবার সুজলা সুফলা

শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির অস্বাস্থ্যতাকেই জাতীয় জীবনের অবনতির প্রধান কারণ বলিয়াছেন, আবার কেহ কেহ আমাদের দেশের দারিদ্র্যকেই আমাদের দেশের অবনতির একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন্‌টী প্রধান এবং কোন্‌টী অপ্রধান কারণ সে বিষয়ে সম্যক্ পর্য্যালোচনা করা যতই যুক্তিসঙ্গত হউক না কেন, তাহার জন্য যথেষ্ট সময়ের আবশ্যক, অনেক তথ্যসংগ্রহের আবশ্যক এবং পরিশেষে কোনও চরমসিদ্ধান্তে (conclusion) উপস্থিত হইলে তাহাও যে সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইবে সে বিষয়েও কোন সম্ভাবনা বা নিশ্চয়তা নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? যদিও ধরা যায় যে অধীনতাই আমাদের অবনতির একমাত্র মুখ্য কারণ, তাহা হইলেও আমাদের এই অধীনতা যতদিন দূর না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কি নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বসিয়া থাকিব?—না, আমরা সুধীজনের নির্দ্দেশমত আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জাতিগত বৈষম্য, নৈতিক উন্নতি, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি সমস্যাগুলির সমাধানের যে সমস্ত পন্থা আছে তাহার অনুসন্ধান করিব? আমারা পরের ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপাইয়া দিয়া যতই তৃপ্তি লাভ করি না কেন, এ কথা খাঁটি সত্য যে আমাদের নিজের দোষ দূরীকরণে সচেষ্ট হইবার পূর্ব্বে অপরের দোষ ধরিবার চেষ্টা আমাদের বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মোটে মনে হয় না। আমরা আমাদের দেশের শিক্ষাসম্বন্ধে কি করিয়াছি? যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি পরিমাণে দেশে সনাতন শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন? যদি সত্য সত্যই আজ আমরা হৃদয়ে শিক্ষার অভাববেদনা অনুভব করিয়া থাকি, তাহা হইলে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আজ আমরা নিজেরা আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে কি পারি না? Unemploy-

ment Questionএর সমাধান আজ দেশের একটী প্রধান সমস্যায় পরিগণিত হইয়াছে এবং বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আজ বেকার বসিয়া আছেন। ইহাতে আমি বাস্তবিকই নিরতিশয় লজ্জা অনুভব করিয়া থাকি। ২০।২৫ জন শিক্ষিত যুবক একমনপ্রাণ হইয়া অনায়াসেই বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন এবং ছাত্র-বেতন হইতে তাঁহারা যাহা সঙ্গত সেই প'রমাণে পারিশ্রমিক লইয়া আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে পারেন। এইরূপ হইলে দেশের ভিতর শিক্ষা-বিস্তারের একটী পন্থাও ক্রমশঃ সুগম হইয়া উঠে এবং শিক্ষিত বেকার ভদ্রলোকদিগেরও অন্নসমস্যার একটী সমাধান হয়। তাঁহারা মনপ্রাণ দিয়া যদি বালকবালিকাগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষাও ভাল হইবে এবং তাঁহাদেরও আর্থিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত শিক্ষায় যে উদ্ভাবনী শক্তি নিহিত থাকে চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সেই উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ আমি কি আশা করিতে পারি না ?

আজকাল আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই যে আমাদের দেশে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে তাহা যে অত্যন্ত সুখের বিষয় সে সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে বর্ত্তমানে আমাদের দেশের ভিতর যে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, এই জাগরণ সুনিদ্রার পরে জাগরণ—না অনিদ্রা বা স্বল্পনিদ্রার পরে জাগরণ ? আমরা দেখিয়া থাকি যে সুনিদ্রার পরে জাগরণে মন স্বভাবতঃ প্রফুল্ল হয়, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়, দেহে বলসঞ্চার হয় এবং জ্ঞানবিকাশের পন্থা সুগম হয়—আর অনিদ্রা বা স্বল্প নিদ্রার পরের আকস্মিক জাগরণ দেহে বলহীনতার, মস্তিষ্কদুর্ব্বলতার, মানসিক বিষণ্ণতার ও অজ্ঞানতার হেতু হইয়া থাকে। ধরিয়া লওয়া যাউক যে আমাদের দেশের এই জাগরণ সুনিদ্রার পরের

জাগরণ। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সুনিদ্রার পরের জাগরণের লক্ষণগুলিও নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয়জীবনে পরিস্ফুট হইতে দেখা যাইবে। কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ যখন দেখিতে পাই যে, আমরা পরস্পরের ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া তিলকে তাল করিয়া তুলি, হিন্দু-মুসলমান সামান্য স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের মস্তকে কুঠারাঘাত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না, তখন আমাদের মস্তিষ্ক শীতল এ কথা কেমন করিয়া স্বীকার করিতে পারি? গত ২০ কুড়ি বৎসরে এই ফরিদপুর জিলায় মামলামোকদ্দমায় ৭৫ লক্ষ টাকার উপর খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই কি আমাদের জাতীয়জীবনের জাগরণের নিদর্শন? যখন দেখি শিক্ষিতসম্প্রদায় ক্রমশঃ শিক্ষার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন—যখন দেখি শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ক্রমশঃ বাৎসল্যভাব বিদূরিত হইয়া বাণিজ্যের আকার ধারণ করিয়াছে—যখন দেখি ছাত্রদের ভিতরে সনাতন গুরুভক্তির পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য অশিষ্টাচার ও ঔদ্ধত্য দেখা দিতেছে, তখন শুধু যে লজ্জা হয় তাহা নহে, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয়জীবন ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। আজ গুরুশিষ্যের ভিতরে অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে যে পরিখা খনিত হইতেছে, আমার আশঙ্কা হয় কালে ইহা একান্ত দুর্লঙ্ঘ্য হইবে এবং এই অনিয়ন্ত্রিত বাল্যজীবনের বিষময় প্রতিক্রিয়া অচিরাৎ পিতামাতা, অন্যান্য গুরুজন এবং স্বদেশের উপরে তাহার গভীর রেখাপাত করিবে। যদি ইহাই আজ দেশের জাগরণ হয় তাহা হইলে এই জাগরণে ও উন্মত্ততায় পার্থক্য কি? জাতীয়জীবনে আজ যে উত্তাল তরঙ্গ দেখা দিয়াছে, তাহার ঘাত-প্রতিঘাত হইতে জাতীয়জীবনকে রক্ষা করিতে হইলে জীবনকে সুদৃঢ় করিতে হইবে। সংযম হইবে তাহার ভিত্তি, ভক্তি-প্রেম-পবিত্রতা-সদাচার ও সত্যনিষ্ঠা হইবে তাহার ধর্ম্ম, জ্ঞান হইবে তাহার প্রেরণা,

বুদ্ধির বিকাশ তাহার পরিচালক এবং ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস তাহার শক্তি। আদর্শজাতির সৃষ্টি করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে এই নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিতে হইতে হইবে। নতুবা এই জাগরণ সার্থক না হইয়া সমগ্র জাতির উপরে বিষময় ফল প্রদান করিবে। তবে এ কথাও সত্য যে তরুণহৃদয়ের স্পন্দন, তরুণহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দ কিম্বা মর্ম্মান্তিক ব্যথা ও বেদনার অভিব্যক্তি করুণাধারাসিঞ্চিত না করিয়া যদি কেহ সেই উৎস অকালে নীরস, শুষ্ক ও চেতনাহীন করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে তিনি যে শুধু শিক্ষকতায় অনুপযুক্ত তাহাই নহে, তিনি দেশের ও জাতির একটী স্থায়ী সম্পদ বিনষ্ট করিবার অপরাধে অপরাধী। তরুণদিগের উচ্ছৃঙ্খল তখনই বলিতে পারি যখন তাহারা সংযমের গণ্ডী সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিয়া যায়, যখন তাহারা ভক্তি-প্রেম-পবিত্রতার দোহাই মানিতে চাহে না, যখন তাহারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষের (culture) অন্তরায় হয়। কিন্তু দেশসেবাব্রতে যাহারা ব্রতী, যাহারা স্বদেশের ধূলি সত্য সত্যই 'স্বর্ণরেণু' বলিয়া মনে করে, যাহারা আকাশে বাতাসে দেশমাতৃকার মৃদুকরস্পর্শ অনুভব করে, যাহাদের অস্থিমজ্জায় দেশের সনাতন ধর্ম্ম, দেশের ভাষা, দেশের আচারব্যবহার, দেশের বেদ, দেশের উপনিষদ, দেশের পুরাণ ও ইতিহাস প্রিয় হইতেও প্রিয়তর, তাহাদের সেই আকুল আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করিয়া তাহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খল বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় মাত্র।

এবার কংগ্রেসের সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। জাতীয় কংগ্রেস অপেক্ষা বৃহত্তর সংঘ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই এবং একমাত্র ইহাই আমলাতন্ত্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অজস্র বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এতাবৎকাল প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে ও দরিদ্র

প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ইহাই এ দেশের একমাত্র জাগ্রত প্রহরী। এই কংগ্রেসের এবং অন্যান্য ছোট বড় জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি কিংবা অবনতি তাহার কর্ম্মীবৃন্দের কঠোর কর্ত্তব্যপালনের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। যেখানেই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধি করিবার জন্য এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সোপানরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই-খানেই দেশের সার্ব্বজনীন স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপরে চিন্তাশীল ও বিজ্ঞলোকের মধ্যেও কেহ কেহ সন্দিহান হইয়াছেন এবং কংগ্রেসের কর্ম্মীদিগকে 'বাক্যবীর" বলিয়াও অনেকে আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কুৎসার প্রতিবাদ করা তখনই সঙ্গত ও সার্থক হইবে যখন আমরা অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিব যে, আমরা প্রকৃতই নির্দোষ। কংগ্রেসের পতাকাতলে বসিয়া একজন লোকও যদি নীচস্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থকে প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে পদদলিত করে, তাহা হইলে তাহার জন্য সমগ্র জাতিকে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয় এবং দুই এক জনের অপরাধেই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র না হইয়া কুৎসারই যোগ্য হয়। কর্ম্মী হইতে হইলে স্বার্থকে বলি দিতেই হইবে। কর্ম্মীগণের মধ্যে আবার যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী— যাঁহাদের চরিত্র স্ফটিকের মত নির্ম্মল – যাঁহারা কুশাগ্রবুদ্ধি, তাঁহারাই কেবলমাত্র দেশনায়কের পদের দাবী করিতে পারেন। আশা করি কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজেরা আদর্শস্থানীয় হইয়া আদর্শ কর্ম্মীর সৃষ্টি করিবেন এবং তাহা হইলেই তাঁহারা দেশবাসীগণের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

রাজনৈতিক চর্চ্চা আমি বেশী দিন করি নাই। তাহা হইলেও এই অল্পদিনের মধ্যে আমি যাহা দেখিতে পাইয়াছি, অপ্রিয় সত্য হইলেও তাহার গুটিকতক কথা আমাকে আজ বলিতে হইবে।

যাহা বলিতেছি তাহা আমার ব্যক্তিগত কথা সুতরাং তদ্বিষয়ক দোষ-গুণের জন্য আমাকেই দায়িত্বভার বহন করিতে হইবে। বঙ্গসন্তান-গণের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, লালমোহন, উমেশচন্দ্র, আনন্দ-মোহন প্রভৃতি দেশনায়কগণ সর্ব্বপ্রথম এই জাতীয় জীবনের উদ্বোধন করিয়া যান। ইংরাজজাতির অনুগ্রহ লাভ করিয়া দেশোন্নতির পন্থা ক্রমশঃ সুগম করাই তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এবং দেশের অভাব-অভিযোগের কথা দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণের গোচরীভূত করিয়া তাঁহারা দেশের নানাবিধ কল্যাণের আশা করিতেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের সেই নিয়ন্ত্রিত পথ অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি মনীষিগণ অতিক্রম করিয়া কঠোরতর বিধানের পন্থা নির্দ্দেশ করেন এবং তখন এই নবদল Extremist নামে এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ পর্ব্বসম্প্রদায় Moderate-নামে আখ্যা প্রাপ্ত হন। আরও পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বর্ত্তমানযুগের রাষ্ট্র-নীতির পরিচালনাভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা আসমুদ্র-ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র দেশটীকে কংগ্রেসের পতাকাতলে আনিয়া স্বরাজলাভই আমাদের জাতীয়-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে দেশে প্রকৃত মানুষের সৃষ্টি হইলে এবং শক্তি ও সামর্থ্য অনুকূল হইলে এবং প্রকৃত কর্ম্মীগণ সংঘবদ্ধ হইলে স্বরাজ লাভ যে সম্ভব হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু তাহার প্রারম্ভে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে প্রকৃত মানুষ আছে কি না—থাকিলে কি পরিমাণ আছে এবং না থাকিলে তাহা সংগঠন করিবার নিমিত্ত কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। কবি

দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন :—'আবার তোরা মানুষ হ"। 'মনুষ্যদেহ ধারণ করিলেই মানুষ' হইতে পারা যায় না। গীতার ছত্রে ছত্রে মানুষ হইবার পন্থা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। মানুষ হইতে হইলে প্রধানতঃ তিনটী বিষয় আবশ্যক—যথা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি। প্রথমেই জ্ঞানের বিকাশ আবশ্যক। যে সমস্ত বিদ্যাবলে আজ অন্যান্য স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, আমাদের জাতিকে সর্ব্বপ্রথম সেই সমস্ত বিদ্যা করায়ত্ত করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, আজ আমাদের দেশে প্রকৃত জ্ঞানী ও কর্ম্মী লোকের এতই অভাব যে আমরা এদেশে আমাদের নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা ছাড়া কার্য্যে তাহার খুব অল্পই পরিচয় পাইয়া থাকি। Aeroplane, Wireless Telegraphy, Telegraph, Telephone, Gramophone, Phonograph, Steam Engine, Motor car তো দূরের কথা, এমন কি একটী Electric bulb এ দেশে তৈয়ারী হয় না। চিকিৎসা-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞানবিষয়ক পুস্তক সংকলন, অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতি-বিষয়ে শিক্ষা-প্রদান, নানাপ্রকার কলকব্জা প্রভৃতির নির্ম্মাণকার্য্য এ দেশে হয় না এবং কি ইংরাজশাসকবৃন্দের দ্বারা, কি দেশীয়নেতৃবৃন্দের দ্বারা এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত এ পর্য্যন্ত এ দেশে ঘটিয়া উঠে নাই। যৌথ কারবার করার মত একনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতা, যাহা পাশ্চাত্য জাতি আজ আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছে, তাহাও এ দেশে দুর্লভ। আধুনিক সভ্যজগতের বাসোপযোগী কোন জিনিষই বাণিজ্যাকারে (Commercial Scale) এ দেশে তৈয়ারী হয় না। নৈতিক জীবনবিষয়ে আমাকে অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এ দেশের পিতামাতাদিগকে শৈশবকাল হইতে সন্তানগণের নৈতিক-শিক্ষা বিষয়ে মোটেই কোনও প্রকার চেষ্টা পাইতে দেখা যায় না—শুধু সমাজবন্ধনের নিয়ম দ্বারা আমাদের বাল্যজীবন কতক পরিমাণে

সংনিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে পাশ্চাত্য জগতের দোষটুকুর শুধু অনুকরণ করিয়াছি এবং গুণগুলি সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছি। আর সেরূপ করিলে চলিবে না। "আমাদের দেশে মানুষ হইবার উপকরণ একেবারে নাই"—ইহাই বুঝান আজ আমার উদ্দেশ্য নয়—আমার বলিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আমাদিগকে চরম লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া আমাদের দেশে প্রকৃত মানুষ গঠন করিতে হইবে এবং কোনও কাজেই আমাদিগকে আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। পর-নির্ভরতার চেয়ে জাতীয়জীবনের আর কোনই মহান্ অন্তরায় দেখা যায় না। এই পরাধীনতা আমাদের দেশের যে প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে—আমাদের জাতীয়জীবনকে যে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে—আমাদের দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের যে বিশেষভাবে সঙ্কোচ করিয়াছে এবং আমাদের প্রত্যেক কাজেই যে আত্মপ্রত্যয়বিহীনতা (Slave mentality) আনয়ন করিয়াছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, পরনির্ভরতা আমাদের দেশের শিক্ষিতসমাজের মধ্যেই বেশী। পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষকগণ কিম্বা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত গরীব ভদ্রলোকগণ এখনও সহরের বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া যায় নাই এবং এখনও গ্রামস্থ গরীব কুটীরবাসী গৃহস্থগণ স্বদেশজাত মোটা কাপড়ই লজ্জা-নিবারণের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ফরিদপুর জিলায় পূর্ব্বে তাঁতের ব্যবসাতে প্রায় ৬০ হাজার লোকের অন্নসংস্থান হইত কিন্তু আজ তাহা অর্দ্ধেকে পরিণত হইয়াছে। এই বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, স্বদেশী বস্ত্রব্যবহারই আমাদের এখন সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৬০ কোটী টাকার বিদেশজাত বস্ত্রের আমদানী হইয়া থাকে। শুধু স্বদেশী বস্ত্র গ্রহণ করিলেই

আমাদের এই ৬০ কোটি টাকা আমাদের দেশে থাকিয়া যায় অধিকন্তু আমরা এই বিষয়ে বিশেষ লাভবান হইতে পারি :— প্রথম লাভ হইবে আমাদের আত্মনির্ভরতারূপ শক্তি-সঞ্চয়, এবং দ্বিতীয় লাভ হইবে আমাদের মজ্জাগত বিলাসিতার মূলোচ্ছেদ।

স্বদেশী-গ্রহণই প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক নরনারীর জাতীয়জীবনসংরক্ষণের একমাত্র উপায়। এ বিষয়ে ইংরাজ এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য স্বাধীন জাতির নিকট হইতে আমরা অনেক বিষয়ই শিখিতে পারি। এতৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের যে সমস্ত সমস্যা আজ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত, পরাধীনতার নিম্নেই দারিদ্র্য-সমস্যা তাহাদের ভিতর আমার নিকট সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে হয়। একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতে পনরটী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১২টী স্থানীয় এবং মাত্র ৩টী দেশব্যাপী পক্ষান্তরে গত দেড় শত বৎসরে ব্রিটিশ-রাজত্বে ৩২টী দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এবং তাহার সকলগুলিই প্রায় দেশব্যাপী। আপনাদের ভিতরে অনেকেই অবগত আছেন যে, বিভিন্ন দেশের দৈনিক আয় আমাদের দেশের দৈনিক আয় অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বেশী। ইংলণ্ডের জন প্রতি দৈনিক আয় ৩।৵০ তিন টাকা পাঁচ আনা কিন্তু ভারতবর্ষের জন প্রতি দৈনিক আয় মাত্র ⁄১০ ছয় পয়সা। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে এ দেশে এক বৎসরে যে শস্য উৎপন্ন হয়, বিদেশে রপ্তানী না হইলে তদ্দ্বারা একাদিক্রমে আমাদের ৮ বৎসর চলিতে পারে। এ দেশ হইতে প্রতি মিনিটে ১১৮ মণ চাউল, ৫০ মণ গম, ৬০ মণ মশূরীর ডাল, ৫০ মণ অরহরের ডাল—প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মণ খইল ও ০ মণ তৈলবীজ এবং প্রতি বৎসর ৭ লক্ষ সুস্থ গরু বিদেশে চালান হয়। পূর্ণ স্বরাজ পাইলে আমাদের এ অবস্থার উন্নতি অতি অল্প সময়েই হইতে পারে বটে কিন্তু পরাধীন থাকিয়াও যদি আমরা সঙ্ঘবদ্ধ

হইয়া নিজে দেশের খাদ্যোপযোগী দ্রব্যাদি রাখিয়া বিদেশে রপ্তানী বন্ধ অথবা তাহার সঙ্কোচ করি তাহা হইলে অন্ন-সমস্যার অবিলম্বে একটা সমাধান হইতে পারে। এই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বসনভূষণের জন্য নিজেদেরই স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহা হইলে বিদেশীর হাতে বৎসর বৎসর আমরা যে কোটী কোটী টাকা দিয়া থাকি তাহা বন্ধ হইয়া দেশের আর্থিক উন্নতি যথেষ্টপরিমাণে সম্পাদিত হইবে।

আপনারা সকলেই জানেন ইংলণ্ডের শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা ৯১.৫ আর বাংলাদেশের শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৯.৫। শিক্ষার ব্যয় ইংলণ্ডে জন প্রতি ৯৵০ নয় টাকা দুই আনা আর ভারতবর্ষে জন-প্রতি শিক্ষায় ব্যয় মাত্র ৵০ দুই আনা। এই শিক্ষাবিস্তার আমাদের দেশবাসীরা নিজেরাই অনেক পরিমাণে করতে পারেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প—এই তিন প্রকার শিক্ষার উন্নতিই আবশ্যক এবং উচ্চ-শিক্ষার জন্য দেশবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে প্রতিবৎসর বহু ছাত্রকে বিদেশে পাঠাইয়া বিশেষভাবে শিক্ষিত করিয়াও আনা যাইতে পারে। দেশের স্বাস্থ্য যে অতীব শোচনীয় তাহা বলা বাহুল্য কিন্তু ইহার প্রতিবিধান আমরা নিজেরাই অনেক পরিমাণে করিতে পারি। নিবার্য্য (Preventive) ব্যাধি দ্বারা বহু লোক বৎসর বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার প্রতিবিধান আমাদেরই হাতে। পল্লীতে পল্লীতে যদি আলোকচিত্রের সাহায্যে কর্ম্মীবৃন্দ পল্লীবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব কি এবং ব্যাধি-প্রতিকারের নিমিত্ত কি তাহা-দিগকে করিতে হইবে তাহা হইলেও মৃত্যুসংখ্যার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। খাল-বিল-পুষ্করিণী প্রভৃতির সংস্কার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের বন্দোবস্ত, কচুরি-পানার ধ্বংস—এ সমস্তই আমরা নিজেরা করিতে পারি। ইহাতে ইংরাজ-সরকার সাহায্য করেন ভালই—না করিলেও

আমরা একেবারে নিরুপায় নাই। এই সমস্ত করিতে হইলে আমাদের নিজেদের সমাজ-সংস্কার করাও অতীব সত্বর আবশ্যক। সামাজিক পেষণে পড়িয়া কত নিরীহ লোক যে আজ নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সামাজিক অত্যাচারের জন্য ভারতীয় নিম্নশ্রেণীর লোকগণ (Depressed class) উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের উপরে আজ বিশ্বাস হারাইয়াছে এবং এইজন্য দেশব্যাপী আন্দোলনে এবং জীবনমরণের সংগ্রামে আমরা তাহাদের সাহায্য ও সাড়া পাই না। সমাজের আবর্জ্জনাও বহু দিনের পরাধীনতায় পুঞ্জীভূত হইয়াছে। এই সমস্ত আবর্জ্জনার অপসারণ না করিলে আমাদের স্বরাজ-সংগ্রামে জয়ী হইবার কোনও আশা নাই। এই সমস্ত কার্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন হইতেছে উদ্যম। অতি প্রাচীন কাল হইতেই "উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি ॥ দৈব নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা। যত্নে কৃতে যদ ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ॥"—এই প্রবাদবাক্য চলিয়া আসিতেছে। এই কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে স্বাধীনতা কখনও কোনও জাতিকে দানস্বরূপ প্রদত্ত হয় নাই—কিন্তু উহা স্বকীয় উদ্যম, স্বকীয় ত্যাগ এবং স্বকীয় পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে পৌরুষসহকারে পুরস্কারস্বরূপ অর্জ্জিত হয়। ইহা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়েই ইহার প্রাপ্তি ঘটে না এবং ঘটিতে পারে না।

আমাদের এই জীবন-মরণের সংগ্রামস্থলে এমন একটী মহাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব না থাকিয়া মৈত্রই হইবে তাহার প্রধান ভিত্তি। বর্ণ, দেশান্তরভেদ, স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব, ধর্ম্ম বা আচরণ-ভেদ—বিশ্ব-সংগঠনকারী নব্যভারতের প্রাণে আর পার্থক্যের আসন রাখিলে চলিবে না। বুদ্ধের জ্ঞান, খ্রীষ্টের করুণা, শঙ্করের বৈরাগ্য হজরত মহম্মদের বিশ্বাস, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম, বিবেকানন্দের ত্যাগ—এই সব আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই মুমূর্ষু জাতির জাতীয়জীবনের

উদ্বোধন করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই এই প্রবুদ্ধ ভারত জগতে যে কোনও জাতির সমক্ষে আপন ন্যায্য আসন দাবী করিতে পারে। মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন যে, "ব্যক্তিমাত্রেরই নিজ নিজ কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব আছে। ভিতর হইতে কে যেন নিরন্তর বলিতেছে এই তোমার কাজ এই তোমার কর্ত্তব্য—তুমিই কেবল তোমার কৃতকার্য্যতা বা অকৃতকার্য্যতার জন্য দায়ী। যদি তুমি তোমার কর্ত্তব্য কাজ না কর তবে তুমি কেমন করিয়া আশা করিবে যে অপরে তোমার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য করিবে? যে লোক তাহার মনকে নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র রাখিতে শিখিয়াছে তাহার জীবনের লক্ষ্য নির্ম্মল ও সুস্পষ্ট। নীতিধর্ম্মানুগামী হইয়া জীবন-যাপনপূর্ব্বক নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র মনুষ্যজাতির উপকার করিয়া ভগবানের কার্য্য করাই শ্রেষ্ঠতম পূজা।" স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর অবস্থা দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন:—'এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, প্রাণে আশা নাই। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থ-সাধনে, জ্ঞান অনিত্য-বস্তু-সংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক-আচারে, কর্ম্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিতা কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে ও জঘন্য অশ্লীলতা-বিকীরণে'। আমিও আজ স্বামী বিবেকানন্দের কথাই আমার দেশ-বাসীকে পুনরায় বলিতেছি—"আপনাতে বিশ্বাস রাখ—প্রবল বিশ্বাসই জগতে বড় বড় কার্য্যের জনক। মহাউদ্যম, মহাসাহস, মহাবীর্য্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য

নহে ; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়া মাত্র ; ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী—ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী, আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই! ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও—মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর''।

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িকতার মোটেই পক্ষপাতী নহেন। তিনি উদার ; 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এই কথা বাক্যটী তাঁহার প্রতি সুপ্রযুক্ত হইতে পারে। যতীন্দ্রনাথ কোনও জাতি-বর্ণের নহেন—গুণের ও যোগ্যতার পক্ষপাতী। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর কলিকাতার আলবার্ট হলে যে 'আহমেদিয়া কনফারেন্স' হইয়াছিল তাহাতে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতিরূপে তিনি যে ইংরেজী ভাষায় লিখিত সুচিন্তিত ও সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা সবিশেষ আগ্রহের সহিত উদ্ধৃত হইল :—

GENTLEMEN,

Allow me to thank you from the bottom of my heart for having elected me your President to-night. When the organisers of this meeting approached me for the purpose, I hesitated as no one was more conscious than myself about my defects and shortcomings and being a follower of a different religion, I thought my ideas would not be acceptable to this assembly. But when my friend Mr. Abul Hossain Khan Choudhury asked me to say a few words on general lines only, I could not, with any propriety, decline the offer. Further, gentlemen, this is probably the first opportunity which has come to me to acquire a firsthand knowledge of the beauties of a sister religion which claims amongst its devotees full forty crores of population. Interchange of ideas is almost always a fruitful source of fostering mutual love and admiration and the more such mutual opportunitie are offered, the more will there be a unity of thought and action. Gentlemen, although an orthodox Hindu, I passed my younger days in close company of friends belonging to your religion. My first teacher was a Mahomedan, my first class-mate was a Mahomedan, and my early life was spent amidst environments of preponderatingly Mohamedan character so much so that

scarcely a day passed during the whole of my school career when I did not enjoy the happy companionship of my Mahomedan friends, one of whom is present here this evening, I mean, my dear friend Abul Hashem. These are my antecedents and if you think they entitle me to speak with some pretensions about the subjects, that are before us this evening, I shall feel greatly honoured.

Teaching Of The Prophets.

Ladies and gentlemen, the law which pervades the universe applies equally to different individuals, different clans and tribes to different sections of a particular community and to different communities and nations. God never deprives any one of the benefit of Sun, Moon, water or air and it is done irrespective of the fact whether he is His loyal and faithful follower or not. God never discriminates if he is a black, yellow or a white person. God punishes equally all those who break His laws. God never discriminates between a human being and a lower animal and God has provided all individual members of His creation with natural means of protection and self-defence against external and internal violence It is for these reasons that we call Him 'Just.' All distempers and diseases either in individuals or in corporate life are the result of dis-

obeying that law. Whenever a man-made law runs counter to the law of Nature, there is discontent and suffering. Applied to human societies and institutions, the only panacea for all evils is to strictly follow the laws of God. All human Governments should exercise the functions of God in miniature. They should see that the people under their care should all enjoy same privileges and advantages of their beneficent rule. There must be no discrimination in the treatment. Partiality in any form means negation of justice and negation of justice alienates all sympathy and support of the people from their Governments. This is the teaching of all Prophets in all countries. Nothing shakes the foundation of Governments more than partiality and injustice and nothing breaks the solidarity of any section or community to a greater extent than when their members feel that impartiality and justice are denied to them. It is the duty of all good Governments and all real leaders to see that the people under their care have no legitimate grievances about their justice and impartiality.

Behind The Scenes.

The root cause of the Hindu-Moslem differences in politics hinges mainly on the question of distribution of patronages by the Government and preferential

treatment in matters of public appointments. The solution of the problem has so far baffled the efforts of the leaders of both the communities and it will be no small presumption on my part to attempt it from my humble position. The more I think about it, the more I am convinced that all questions of safeguarding the rights of a particular nation, sect or community should be scrupulously avoided by the Government. The Government must not show any favour and preferential treatment to any community whether majority or minority as God never shows any preferential treatment towards any one in His creation. In the eyes of God there is no Brahmin or Sudra. no rich or poor, no white or black, no Hindu or Mahomedan, no Sikhs or Rajputs, no Burmese or Sindhis, no Christian or Jew and no touchables or untouchables. There must be one guiding principle which should be applicable to all irrespective of religion, caste, colour or creed—same facilities of education in all branches, same facilities for religious worship, same facilities for rich and poor, men and women, white and black and even to the loyals and disloyals. If God can tolerate sinners and criminals in His world, it will be worthwhile for the Government to emulate that example and good and impartial treatment to all,

in the long run, will win back their allegiance and, affection. Just as breakers of laws of health suffer from diseases aud meet with an early grave, the breakers of laws of Goverment have got to pay the penalty as they deserve. The Hindus should treat Mahomedans and other as their own kith and kin, share their joys and sorrows and stand by them whenever there is need for it. The same thing applies to the Mahomedans and Christians, Buddhists, Jews and Parsis—Indians and Europeans. This mutual love and tolerance are the only panacea for all public ills. In cases of communal quarrels, the leaders of one community should particularly befriend the other with honesty, sincerity and vigour and any one trying to widen the gulf should be brought to book. Trade facilities should be thrown open to all and justice should be no respecter of persons or positions. Even the humblest should feel that he is as much a member of the State as the most powerful. In God's creation there are mountains, hills and hillocks : oceans, seas, rivers and rivulets ; trees, shrubs and herbs ; animals and animalcules from the size of a smallest amoeba to a giant, both harmful and harmless and God not only tolerates their presence but actually assists them in their growth and full development without any preferential treatment. It is,

therefore, incumbent on all Gevernments to see that all nations, all communities, all sects, all religions under their care grow and prosper without any let or hindrance or suffer under preferential treatment.

The Blessing Of Unity.

If this is done, there cannot be any just cause for complaint. Heredity, talents, education, industry and health play a great part in differentiating one person from another and each of these has its own value for his future and the society or the State has got to correctly fix the price of all according to merit —taking merit in its most comprehensive sense. If survival of the fittest be the law of nature, all must strive hard to be fit for the life's mission in their respective spheres and must not seek favours which they do not deserve as the latter, in ninety-nine cases out of hundred, undermine their worth in the long run. I am aware that a tendril needs a support but that support must be of the right type, a type which will give vigour to its life and make it possible for it to blossom in full glory and effulgence in days to come. A suitable soil with proper manure is much more necessary for its growth and development. An artificial support in many cases instead of helping the growth actually retards it. My Mahomedan brethren have inherited a legacy of culture of which one

may justly be proud ; my Mahomedan friends have inherited social laws which contemplate no differential treatment. Why then should they insist on differential treatment, safeguards and reservation in political life ? If they have stood the test of centuries with their heads erect, there is no power on earth to check their onward march in future. Both of us, Hindus and Mohomedans, should realise once for all that united we stand but divided we fall. Instead of dissipating our energies by quarrelling over loaves and fishes everyone of us should strive hard to be fit for the struggle for existence so as to make it possible for both of us to proclaim to the world that we claim merit, we claim efficiency, we claim valour, we claim honesty, we claim sincerity, and above all, we claim unflinching devotion to God and I am sure God will not deny us. His favours in enabling us to realise our ends. be they for political gains or for spiritual salvation.

রাইট অনারেবল স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্র

কে-টি, পি-সি

স্বনামধন্য রাইট অনারেবল স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্র, কে-টি, পি-সি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের তৃতীয় পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ এটর্নী মিষ্টার এন-সি বড়ালের নিকট এটর্নীর কার্য্য শিক্ষা করিতে থাকেন। সেই সময়ে বড়াল মহাশয়ের এটর্নী অফিস মেসার্স এন্-সি বড়াল, পাইন এণ্ড শেঠ নামে অভিহিত ছিল। ইঁহাদের হাতে খুব বড় বড় মামলা পড়িত। যুবক বিনোদচন্দ্র অসাধারণ পরিশ্রমসহকারে এই সকল জটিল মামলার নথি-পত্র পড়িতেন এবং এটর্নীর কার্য্যের বৈশিষ্ট্য শিক্ষা করিতেন। কিন্তু এটর্নীর কার্য্যে তাঁহার তেমন মন বসিত না। এডভোকেট হইবার আকাঙ্ক্ষা তিনি অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেন। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি এটর্নী-অফিস হইতে আলিপুর জজ-আদালতের উকীল-শ্রেণী-ভুক্ত হয়েন। এইখানে তাঁহার আইন-প্রতিভা বিকশিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার সতীর্থগণ শীঘ্রই তাঁহার যোগ্যতা উপলব্ধি করিতে থাকেন। আলিপুরে কিছুদিন ওকালতী করিবার পর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ব্যারিষ্টারী শিখিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায়, স্বর্গীয় স্যর তারকনাথ পালিত এবং স্বর্গীয় এস-পি সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) তাঁহাকে বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার জন্য সমুৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া তিনি ব্যারিষ্টার মিষ্টার ডব্লিউ-এইচ্ আপজনের নিকট ব্যারিষ্টারী শিক্ষা করিতে থাকেন। মিষ্টার আপজন এক্ষণে বিলাতের প্রথম শ্রেণীর ব্যারিষ্টারগণের অন্যতম এবং বহুদিনের কে-সি (King's Councel) অর্থাৎ রাজকীয় ব্যবহারাজীব।

একদিন মিষ্টার আপজনের মুহুরী (clerk) বিনোদচন্দ্রের হাতে একটী মামলার নথি প্রদান করিয়া বলেন,—ইহা পড়িয়া শীঘ্রই আপনার অভিমত জ্ঞাপন করিবেন। বিনোদচন্দ্র উহা পাঠ করিয়া এক সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং স্বীয় অভিমতের সমর্থনার্থে কতকগুলি মামলার রায় নজীরস্বরূপ উদ্ধৃত করেন। পরদিন প্রাতঃকালে বিনোদচন্দ্রের অভিমত মিষ্টার আপজনকে দেওয়া হয়। প্রাতঃকালে উহা দেখিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। আদালত হইতে সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিনোদচন্দ্রের লিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেন। তিনি বিনোদচন্দ্রের মন্তব্য পছন্দ করিলেন না, কারণ তাঁহার অভিমত বিনোদচন্দ্রের অভিমতের বিপরীত ছিল। নথিটীতে দলিল দস্তাবেজ-সংক্রান্ত একটি জটিল সমস্যার বিষয় ছিল। দলিল-দস্তাবেজ-সম্বন্ধে মিষ্টার আপজনের অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। সে যাহা হউক, মিষ্টার আপজন বিনোদচন্দ্রের অভিমতকে একেবারে উপেক্ষা করিলেন না। তাঁহার মনে উহা লইয়া তোলাপাড়া চলিতে লাগিল। বাড়ী ফিরিবার সময়ে তিনি নথিপত্র ও বিনোদচন্দ্রের মন্তব্য সমস্ত সঙ্গে লইয়া যাইলেন। বাড়ীতে অভিনিবেশসহকারে উহা পাঠ করিলেন এবং আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—তাঁহারই

ভুল হইয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়াই তিনি যুবক বিনোদচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তিনি আসিলে বলিলেন—"মিত্র তোমার অভিমতই ঠিক; আমি ভুল করিয়াছি। তুমি আমাকে প্রথম পরাজিত করিলে।" এই বলিয়া মিষ্টার আপজান তাঁহার অভিমত-সঙ্কলিত কাগজপত্র পার্শ্ববর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিনোদচন্দ্র ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-শ্রেণীভুক্ত হন। হাইকোর্টে শীঘ্রই তিনি বিচারপতি মিষ্টার সেল ও বিচারপতি মিষ্টার জেনকিন্সের (পরে স্যর লরেন্স জেনকিন্স) মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-রূপে তাঁহার যোগ্যতা উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং তিনি ক্রমেই উন্নতি-শিখরে উঠিতে আরম্ভ করেন। তিনি কিছুদিন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় মিষ্টার এস্ পি সিংহের (পরে লর্ড সিংহ) সহকারী ছিলেন। পরে নিজ কৃতিত্বে নিজেই সাফল্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে থাকেন। তিনি যে মামলা হাতে লইতেন, উহার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ছিল অসীম, মামলা বুঝাইবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ ছিল; তাহার উপর আইনের জ্ঞান ছিল তাঁহার সুগভীর। সমস্ত বিষয় তিনি তলাইয়া না বুঝিয়া তাহাতে হাত দিতেন না।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে স্যর বিনোদচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কৌঁসুলি নিযুক্ত হন। এই সময়ে বাঙ্গালা গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন। ষ্ট্যাণ্ডিং কৌঁসুলি-হিসাবে তাঁহাকে হাইকোর্টের দায়রায় ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করিতে

হইত। এইজন্য হাইকোর্টের আদিম বিভাগের বহু দেওয়ানী মামলা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই স্যর বিনোদচন্দ্রকে বঙ্গদেশের অস্থায়ী এডভোকেট-জেনারেলের পদে নিযুক্ত করা হয়; এই নিয়োগে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবগণ এবং জনসাধারণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এডভোকেট-জেনারেলের পদে স্থায়ী করা হয় নাই বলিয়া হাইকোর্টের সকল শ্রেণীর আইন-ব্যবসায়ীগণ এবং দেশবাসী দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্যর রাসবিহারী ঘোষের মৃত্যুর পর স্যর বিনোদচন্দ্র ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আইনের মূলতত্ত্ব বুঝাইবার ও মামলা বিশ্লেষণ করিবার অদ্ভুত শক্তি, কঠিন বিষয় সরল করিয়া বুঝাইবার কৌশল এবং ব্যবহার-শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য ভারতের সকল প্রদেশে তাঁহার যশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের ধীরপন্থী দলের একদল প্রতিনিধি তদানীন্তন ভারত-সচিব মিষ্টার মণ্টেগুর নিকট উপস্থিত হন; স্যর বিনোদ এই প্রতিনিধি-সঙ্ঘের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

লর্ড সিংহের পর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে স্যর বিনোদচন্দ্র বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতি নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য, তাঁহার নিয়োগে ভারতবাসীমাত্রই আনন্দিত হইয়াছিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে তিনি শপথ গ্রহণ করিয়া বিচারপতির কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ছয় মাসের মধ্যেই তিনি বিচার-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া তাঁহার সতীর্থগণকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের এই উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের বিচারপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে বিচার-শক্তি ও ব্যবহারশাস্ত্রে সুগভীর

জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সতীর্থগণ তাঁহার প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিচারপতি লর্ড ডুরেডিন, বাকমাষ্টার ও লর্ড ব্ল্যানবরা বিশেষভাবে তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার রায় যেমন সুচিন্তিত, তেমনই সুলিখিত হইত; উহা সুস্পষ্ট ও জটিলতাশূন্য ছিল। তাঁহার রায়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং মামলার তাবৎ তথ্যের সমালোচনা থাকিত। তিনি যে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতি-পদের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে লণ্ডন সহরে স্যর বিনোদের পত্নী পরলোক গমন করেন। ইহার ঠিক দেড় মাস পরে—১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই স্যর বিনোদও লোকান্তরিত হন। হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ালোপই তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ।

স্যর বিনোদ ও তদীয় পত্নী পরস্পরের প্রতি এরূপ অনুরক্ত ছিলেন যে, কেহ কাহারও বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না! স্যর বিনোদ ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসে অল্প কয়েক দিনের জন্য সস্ত্রীক কলিকাতায় আসেন এবং লণ্ডনে ফিরিয়া যাইবার কিছুদিন পরেই তাঁহাদের মৃত্যু হয়।

স্যর বিনোদচন্দ্রের এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে শিক্ষিত সম্প্রদায় বিচলিত হইয়া পড়েন। কলিকাতা হাইকোর্ট বিনোদচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল; এইখানেই তাঁহার প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছিল। হাইকোর্টের সকল বিচারপতি প্রধান বিচারপতির কক্ষে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই মঙ্গলবার সমবেত হইয়া শোকপ্রকাশ করেন। এতদুপলক্ষে প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের কক্ষ সকল সম্প্রদায়ের ব্যবহারাজীবে পূর্ণ হইয়াছিল। এডভোকেট-জেনারেল ব্যারিষ্টারগণের পক্ষ হইতে বিচারপতিগণকে বলেন—স্যর বিনোদচন্দ্র বহুদিন ব্যারিষ্টারগণের

অগ্রণী বা নেতা ছিলেন। তিনি হঠাৎ লণ্ডনে পরলোক গমন করেন।

উকীলগণের পক্ষ হইতে ডক্টর শরৎচন্দ্র বসাক এবং এটর্ণীগণের পক্ষ হইতে স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীও গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

অবশেষে প্রধান বিচারপতি মহোদয় বলেন:—বহু বৎসর ধরিয়া স্যর বিনোদ এই ধর্ম্মাধিকরণের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ছিল যেমন বিশাল, তেমনই গভীর। ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহার যে অধিকার ছিল তাহা প্রকৃতিদত্ত বলিয়াই মনে হয়। ব্যবহারশাস্ত্রের অনুশীলনই ছিল তাঁহার পরম অনুরাগের সামগ্রী এবং তিনি সমগ্র জীবন উহারই চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। আমার বেশ মনে আছে—যখন আমি হাইকোর্টে প্রথম বিচারপতি হইয়া আসি, তখন যদি শুনিতাম যে, স্যর বিনোদ কোনও মামলায় আমার এজলাসে ব্যারিষ্টার-রূপে আসিবেন, তাহা হইলে আমার আনন্দ হইত। কারণ, তিনি কৌস্থলী হইয়া আসিলেও একজন অভিজ্ঞ বিচারপতিরও যে তিনি পরম সহায়-স্বরূপ হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিত না। তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবার পূর্ব্বেও আমি তাঁহার নিকট হইতে যে উপদেশ ও সহায়তা পাইয়াছিলাম সেজন্য আমি তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলাম। তিনি শিষ্টাচারপরায়ণ ও ভদ্র এবং করুণহৃদয় ও অত্যন্ত সরলপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি বিনয়ী এবং নম্রস্বভাব ছিলেন। তিনি লোকের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিতেন এবং যুক্তিযুক্ত বিষয় হইলে তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিতেন। আমার স্মৃতি-পটে কলিকাতার স্মৃতি যতদিন থাকিবে ততদিন স্যর বিনোদের স্মৃতি একটি সমুচ্চ স্তম্ভের মত তথায় বিরাজিত থাকিবে। এখানে যাঁহারা উপস্থিত রহিয়াছেন তাঁহাদের

কাহারও কাহারও নিকট স্যর বিনোদের মৃত্যু আজীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সখার মৃত্যু বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমরা আপনাদের সকলের সহিত তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের এই শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমার বিশ্বাস, তাঁহারা ভাগ্যের এই প্রবল আঘাত সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিবেন। স্যর বিনোদের স্মৃতি কেবল যে এই আদালতের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার-হিসাবেই জাগরূক থাকিবে তাহা নহে ; সহৃদয়, অকপট এবং কোমলহৃদয় বন্ধু-হিসাবেও তাঁহার স্মৃতি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তিনি যেরূপ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতেন তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। তাঁহার জীবনের সদ্ব্যবহার তিনি পর্য্যাপ্ত-পরিমাণেই করিয়া গিয়াছেন।

বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতিগণ স্যর বিনোদের আকস্মিক মৃত্যুর উল্লেখ-প্রসঙ্গে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্যর বিনোদের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা-জ্ঞাপনের সময়ে লর্ড ডুনেডিন, লর্ড ব্রানেসবরা, লর্ড এটকিন, লর্ড টমলিন, লর্ড থ্যাঙ্কারটন, লর্ড রাসেল, লর্ড ম্যাকমিল্যান এবং তিনটী বিচার-বিভাগের সকল বিচারপতি উপস্থিত ছিলেন ও তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যখন প্রবীণতম বিচারপতি লর্ড ডুনেডিন স্যর বিনোদচন্দ্রের মৃত্যুতে প্রিভি কাউন্সিলের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিতেছিলেন। সেই সময়ে আপীল-মকদ্দমা-পেশকারী বহু ব্যবহারাজীব দণ্ডায়মান হইয় তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতি হইবার পূর্ব্বে তিনি ৩১ বৎসর কাল কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি যে কেবল তাঁহার বহুসংখ্যক মক্কেলের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, বিচারপতিগণও তাঁহাকে অত্যন্ত

বিশ্বাস করিতেন। আইন-জীবিগণ বলিতেন—স্যর বিনোদচন্দ্র কলিকাতার শ্রেষ্ঠ আইন-ব্যবসায়ী, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই।

তাঁহার আকৃতি দেখিয়া মনে হইত না যে, তাঁহার প্রভূত দৈহিক শক্তি আছে। কিন্তু তাঁহার আকৃতি দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইত যে, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং তাঁহার প্রভূত মানসিক শক্তি বা মনোবল আছে।

তিনি কখনও কোনও বিচারপতির সহিত ঝগড়া করিতেন না। তিনি স্থির, ধীর ও গম্ভীর এবং অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। কখনও কোনও বিচারপতির নিকট তিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছেন—এরূপ কথা কেহ কখনও শুনেন নাই। তিনি বিনয়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বিনম্রকণ্ঠে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত আত্মমত প্রকাশ করিবার সাহস তাঁহার যথেষ্টই ছিল। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কোনও মামলায় কোনও বিচারপতি গোড়া হইতে তাঁহার প্রতিকূল; তথাপি তিনি দমিয়া যাইতেন না; কেবল যুক্তি ও নজীর প্রদর্শন করিয়া দৃঢ় অথচ ধীরভাবে তাঁহার মক্কেলের স্বার্থ রক্ষা করিতেন। নূতন নূতন নজীর একটির পর একটি করিয়া উপস্থিত করিয়া তিনি বিচারপতির প্রতিকূলতা খণ্ডন করিতে থাকিতেন। মক্কেলগণ এই গুণেই তাঁহার অনুরক্ত ছিলেন; তাঁহারা জানিতেন, স্যর বিনোদ তাঁহাদের জন্য শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করিবেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় যাহাই হউক, যুদ্ধের উপকরণের অভাবে যে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছে, এ কথা কেহ বলিতে পারিত না। আইন-যুদ্ধের উপকরণ এবং উদ্যোগ-আয়োজনে তাঁহার একটুও ত্রুটি থাকিত না।

আইন-জ্ঞানের অভাবে তিনি কোনও মামলায় পরাজিত হন নাই। মামলা-পরিচালনার রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতা ছিল। যে সময়ে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কৌঁসুলি ছিলেন,

সেই সময়ে দ্বায়রায় সার্জ্জেণ্ট হিলসের একটি মামলা হয়। এই মামলায় খুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। এই মামলার পরিচালন-ব্যাপারে স্তর বিনোদ যেরূপ কৃতিত্ব ও যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্তর লরেন্স জেন্‌কিন্স তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যে সময়ে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সুলি ছিলেন সেই সময়ে হাইকোর্টে কয়েক জন উচ্চদরের ব্যারিষ্টার ছিলেন। স্তর বিনোদ হাইকোর্টের আদিম বিভাগে ও আপীল বিভাগে—উভয় বিভাগেই মকদ্দমা-পরিচালনে সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। এই উভয় বিভাগে সমান প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জন অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তিনি স্তর চার্লস পল অথবা স্তর উইলিয়ম গার্থের মত বড় বাগ্মী ছিলেন না বটে; কিন্তু তিনি যাহা বলিতেন তাহা ওজন করিয়া বলিতেন। তাঁহার ভাষায় উচ্ছ্বাস থাকিত না; তিনি যুক্তি-প্রমাণ-সহ কথা কহিতেন। সেইজন্য বিচারপতিগণ তাঁহার কথা খুবই পছন্দ করিতেন। আইনে তাঁহার এরূপ অধিকার ছিল যে, বিচারপতিগণের নিকটে মামলাটির চমৎকার বিশ্লেষণ তিনি করিতে পারিতেন. মামলা বুঝাইবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ ছিল। যদি কোনও বিচারপতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার যুক্তিতর্ক তিনি মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করিতেন; কারণ স্তর বিনোদ নানারূপ নজীর না দেখাইয়া কথা কহিতেন না। ৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হয়; তদবধি যত মামলা হইয়াছে সে সকলের বিবরণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্তর ফ্রান্সিস মাক্‌লিন বলিতেন—He was a veritable walking Encyclopœdia of law অর্থাৎ স্তর বিনোদকে আইনের ভ্রাম্যমান কোষগ্রন্থ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।

স্থার বিনোদচন্দ্র মিত্র প্রধান বিচারপতি স্থার লরেন্স জেনকিন্স ও স্থর ফ্রান্সিস্ ম্যাকলিনের এজলাসে বহু মামলা পরিচালন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের এজলাসে প্রায়ই তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইত। তাঁহারা স্থর বিনোদের প্রগাঢ় আইন-জ্ঞানের প্রশংসা করিতেন ও তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। লর্ড সিংহের সহিত স্থর বিনোদের প্রায় ৩০ বৎসরের বন্ধুত্ব ছিল; তিনি বলিতেন,—স্বর্গীয় ডব্লিউ-সি বনার্জ্জি মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ছিলেন, কিন্তু আইনের অধিকার স্যর বিনোদের তাঁহার অপেক্ষা অধিক ছিল। স্যর রাসবিহারী ঘোষ এবং স্থর তারকনাথ পালিত মুক্তকণ্ঠে স্থর বিনোদের আইন-জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে স্থর বিনোদকেই সর্ব্বপ্রথম সরাসরি বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-হিসাবে তিনি কতকগুলি প্রসিদ্ধ মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন; যথা—

১। প্রসিদ্ধ ডুমরাঁও উত্তরাধিকার মামলা। এই মামলা ছয় মাস চলিয়াছিল। স্থর বিনোদ লর্ড সিংহের সহকারী-হিসাবে এই মামলায় দাঁড়াইয়াছিলেন।

২। পাতিয়ালা ও নাভার মহারাজার মধ্যে বিবাদ বাধিয়া যে প্রসিদ্ধ মামলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে স্থর বিনোদচন্দ্র পাতিয়ালার পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই সময়ে হাইকোর্টের বর্ত্তমান এডভোকেট-জেনারেল স্থর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার সহকারী ছিলেন।

৩। বিখ্যাত ধলভূম মামলা।

৪। ঢাকা ওয়াকফ্ মামলা। এই মামলায় ওয়াকফ্ এষ্টেটের কার্য্য-পরিচালনায় গলদ করিয়াছিলেন বলিয়া এই এষ্টেটের মাতোয়ালী ঢাকার নবাব অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্থর বিনোদ ঢাকার নবাবের বিরুদ্ধে ছিলেন। পরে এই মামলা মিটিয়া যায়।

৫। বগুড়া উত্তরাধিকার মামলা। হাইকোর্টের আদিম-বিভাগে এই মামলা চলিয়াছিল। এই প্রসিদ্ধ মামলা স্যর বিনোদ পরিচালন করিয়াছিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মানহানি করায় 'ষ্টেটস্‌ম্যানে'র বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। এই মামলায় সুভাষচন্দ্র স্যর বিনোদকে তাঁহার পক্ষে কৌঁসুলী নিযুক্ত করেন। 'ষ্টেট্‌সম্যানে'র পক্ষে তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্ট্যার মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস্‌ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্যর বিনোদ কয়েক দিন যুদ্ধ করিয়া 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' বিরুদ্ধে আনীত মামলায় জয়লাভ করেন।

স্যর রাসবিহারী ঘোষের মৃত্যুর পর স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্রই সমগ্র ভারতের ব্যবহারাজীব-সমাজের অগ্রণী বলিয়া স্বীকৃত হন। হায়দারাবাদের নিজাম, মহীশূরের মহারাজা, ত্রিবঙ্কুরের মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান সামন্ত নৃপতিগণ আইন-ঘটিত জটিল ব্যাপারে স্যর বিনোদের অভিমত গ্রহণ করিতেন।

স্যর বিনোদ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যখন কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল ও এডভোকেট-জেনারেল ছিলেন, সেই সময়ে সরকার-পক্ষ হইতে বহু মামলা তাঁহাকে পরিচালন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কোনও মামলাতেই প্রতিবাদী-পক্ষ বলিতে পারেন নাই যে, স্যর বিনোদ তাঁহাদিগের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টে নির্ম্মলকান্ত রায়ের মামলা খুবই প্রসিদ্ধ। এই মামলায় পরলোকগত প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ আর্ডলি নর্টন আসামী-পক্ষে এবং স্যর বিনোদ সরকার-পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি যে ন্যায়-নিষ্ঠার সহিত এই মামলা পরিচালন করিয়াছিলেন তাহা আজও আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই মামলায় তিনি জুরীদিগকে উদ্দেশ

করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা ন্যায়, সত্য ও নিরপেক্ষতায় অতুলনীয় বলিয়া অনেকে মনে করেন।

স্যর বিনোদের নিকট বহু নবীন ব্যারিষ্টার ব্যারিষ্টারের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যভাগ্য খুবই ভাল ছিল। ভারত সরকারের বর্ত্তমান ব্যবস্থা-সচিব স্যর বি-এল মিত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের বর্ত্তমান এডভোকেট-জেনারেল স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ, পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ পি-আর দাশ, মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস্,মিঃ এস-এন ব্যানার্জ্জি, মিঃ ডি-এন বসু, মিঃএস-সি রায়, স্যর বিনোদের পুত্র মিঃ এস্-সি মিত্র এবং মিঃ এস্-আর দাশ প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে সাধারণের নিকটে সুপরিচিত।

পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণধী ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও স্যর বিনোদের পাণ্ডিত্যের ও ন্যায়-নিষ্ঠার প্রশংসা এবং তাঁহার সহায়তা করিতেন।

স্যর বিনোদ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় ডাক্তার অক্ষয়কুমার দে মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চারুশীলাকে বিবাহ করেন। তিনি আদর্শ হিন্দু মহিলা ছিলেন। পতিভক্তি ও সন্তান-বাৎসল্য, আত্মীয়-পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও স্নেহ তাঁহার প্রচুরপরিমাণে ছিল। তিনি পরিবারস্থ সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখ জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার স্বামী সহস্র সহস্র টাকা প্রতি মাসেই উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু সেজন্য অর্থের অভিমান তাঁহার একটুও ছিল না। তাঁহার বিনয়নম্র আচরণে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক উইল করেন; সেই উইলে তিনি বলেন যে, তাঁহার সম্পত্তি হইতে ১০ হাজার টাকায় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে দুইটী "শয্যা"—একটি তাঁহার স্বর্গগত পিতা

অক্ষয়কুমার দে মহাশয়ের নামে এবং অপরটি তাঁহার স্বর্গীয় শ্বশুরমহাশয় স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের নামে করা হইবে।

স্যর বিনোদের পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ মিঃ এস-সি মিত্র কলিকাতা হাইকোর্টের সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। দ্বিতীয়—মিঃ সতীশ-চন্দ্র মিত্র বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এঞ্জিনীয়ার, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ষ্টেট এণ্ড ইনডাষ্ট্রিজ বিল অর্থাৎ সরকারী শ্রমশিল্প-সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করিয়াছিলেন; এই আইনের পাণ্ডুলিপি সর্ব্বসম্মতিক্রমে আইনে পরিণত হইয়াছে। তৃতীয়—মিঃ সুবোধচন্দ্র মিত্র "ইলেকট্রিক্যাল কনষ্ট্রাকসন কোম্পানী" নামক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালন করিতেছেন; ইনি কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র; ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর 'অনার্স' ও সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। চতুর্থ—মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ইনি ব্যারিষ্টারী অধ্যয়নের জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে হঠাৎ পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এক্ষণে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। পঞ্চম—মিঃ প্রভাতকুমার মিত্র—ইনিও ইঞ্জিনীয়ার; এক্ষণে ফ্রেঞ্চ মোটর কার কোম্পানীতে কার্য্য করিতেছেন।

স্যর বিনোদের জ্যেষ্ঠা কন্যা সিবিলিয়ান মিঃ কমলচন্দ্র চন্দ্রের পত্নী। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছে খিদিরপুরের মিঃ টি-পি ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র মিঃ নির্ম্মল ঘোষের সহিত। তৃতীয়া কন্যা ব্যারিষ্টার মিঃ আর-এন সরকারের পত্নী। চতুর্থা কন্যাকে বিবাহ

করিয়াছেন ব্যারিষ্টার মিঃ ডি-সি ঘোষ। পঞ্চম কন্যার বিবাহ হইয়াছে চন্দননগরের মিঃ এস-এস বসুর সহিত।

স্যর বিনোদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশ পুরুষানুক্রমে শিক্ষায় দীক্ষায় ও আচার-ব্যবহারে আদর্শস্থানীয় এবং ইঁহাদের সদ্‌গুণাবলী সকলের অনুকরণীয়।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু

চন্দননগরের যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় খলসিনির প্রসিদ্ধ বসু-বংশোদ্ভূত। খলসিনির বসু-বংশের পূর্ব্বপুরুষের বাসভবন ফরাসী ও ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানার মধ্যবর্ত্তী পরিখার পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত। এক্ষণে উক্ত বাসভবন প্রায় ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। চন্দননগর ষ্টেশন হইতে এই বাটীর দূরত্ব প্রায় ৩০০ গজ বা ৬০০ হাত।

এই বংশে রাসবিহারী বসু মহাশয় খলসিনির পুর্ব্বপুরুষের বাস্ত ত্যাগ করিয়া পরিখার পরপারে ব্রিটিশ অধিকারে আসিয়া একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই বাটীটী খলসিনির বসুগণের পুরাতন বাসভবনের মাত্র কয়েক ফিট উত্তরে অবস্থিত। রাসবিহারী বসু মহাশয় ব্রিটিশ সরকারের কমিশরিয়েট বা রসদ-বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। কর্ম্মসূত্রে তাঁহাকে মীরাটে থাকিতে হইত। শুনা যায়, তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় মীরাটেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে রেলওয়ে ছিল না। প্রকাশ,—তিনি অশ্বারোহণে মীরাট হইতে চন্দননগরে যাতায়াত করিতেন। তিনি অশ্বারোহণে গমন করিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী পালকীতে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেন। লোকশ্রুতি এইরূপ যে, তিনি একবার ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া খোঁড়া হইয়া যান।

রাসবিহারী বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের নাম নীলরতন বসু। নীলরতন দুইবার বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ৪টী কন্যার জন্ম হয় ;—

স্বর্গীয় যোগেন্দ্র নাথ বসু

প্রথম কন্যার সহিত খড়দহের প্রসিদ্ধ বিশ্বাস-বংশের বাবু কেদারনাথ বিশ্বাসের বিবাহ হয়।

হুগলীর রায় ঈশানচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপিন-বিহারী মিত্রের সহিত দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয়।

তৃতীয় কন্যার বিবাহ হয় প্রসিদ্ধ কাগজ-ব্যবসায়ী মেসার্স শম্ভুচন্দ্র সিংহ এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী ২৪নং কালিদাস সিংহ লেন-স্থিত ভরতচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহিত।

চতুর্থ কন্যাকে বিবাহ করেন বিধুভূষণ মজুমদার; ইনি ইঁহার পিতা বরাহনগর-নিবাসী সবজজ কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের একমাত্র পুত্র।

নীলরতনের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন :—

১। যোগেন্দ্রনাথ বসু

২। এককড়িনাথ বসু

৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

৪। তিনকড়িনাথ বসু

এবং—

প্রথমা কন্যার বিবাহ হয় কলিকাতা শুঁড়িপাড়া-নিবাসী উকীল শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষের সহিত।

দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন মহাভারতের অনুবাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ।

পিতা রাসবিহারী সিংহ যে বসতবাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন নীলরতন সেই বাড়ীতে বাস করিতেন; তিনি চাকুরী বা ব্যবসায় কোন কিছুই করিতেন না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কঠিন পীড়া হয়; সেই সময়ে যোগেন্দ্রনাথের বয়স প্রায় ২১ বৎসর।

গুরুজনগণের উপদেশে যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নিষ্ঠুর উপদেশে যোগেন্দ্রনাথের চিত্তে সবিশেষ ভাবান্তর উপস্থিত হয় এবং তাঁহার হৃদয় এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া নীলরতনের পীড়ার প্রশমন হইল এবং তিনি ক্রমে নীরোগ ও সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে আবার গুরুজনগণ উপদেশ দিলেন—যে রোগী গঙ্গাযাত্রার পর মৃত্যুকে আলিঙ্গন না করিয়া পুনরায় জীবিত হইয়া উঠে তাহাকে বাড়ীতে ফিরাইতে নাই। যোগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে প্রৌঢ় বয়সে তিনি বলিতেন,— এই অন্যায় সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস তত অল্প বয়সে আমার হয় নাই। গঙ্গাতীর হইতে তিনি তাঁহার পিতাকে কলিকাতায় লইয়া যান এবং তথায় গিয়া তখনকার কালের কয়েকজন সুশিক্ষিত জননায়কের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়। ইহার ফলে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হয়। নীলরতন অনেকটা সুস্থ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পুত্র যোগেন্দ্রনাথ গুরুজনগণের অন্যায় উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন। বাড়ীতে আসিবার পর আবার তিনি রোগাক্রান্ত হয়েন। রোগ সঙ্কটাকার ধারণ করিলে যোগেন্দ্রনাথ আর তাঁহার পিতাকে চিরাচরিত অন্যায় প্রথার সম্মান রক্ষা করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যান নাই; তৎপরিবর্ত্তে তিনি গঙ্গাতীরে একটি বাটী ভাড়া লইয়া তথায় তাঁহার পিতাকে লইয়া যান। সেই বাড়ীতে তদীয় পিতৃদেব নীলরতন বসুর মৃত্যু হয়।

গুরুজনগণের উপদেশক্রমে তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতার দানসাগর শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করেন। কিন্তু শ্রাদ্ধের সমুদয় অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি

প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই; বরং তিনি দেখিলেন যে, অনুষ্ঠান-গুলিতে ধর্ম্ম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, সমস্ত ব্যাপারটী একটি বাহ্যাড়ম্বর ও ব্রাহ্মণগণের প্রাপ্তির উপায়মাত্র। পরবর্ত্তী কালে তিনি বলিতেন,—মৃত্যুর পর জীবন আছে কি না তাহা আমি জানি না; যদি পরলোক থাকে, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তি তথায় সুখে স্বচ্ছন্দে কখনই অবস্থান করিতে পারেন না। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে শ্রাদ্ধে মৃত ব্যক্তির পুত্রগণ যেভাবে অর্থ ব্যয় করেন তাহাতে নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তি পরলোকে সুখে অবস্থান করিতে পারেন না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রচলিত প্রথানুসারে শ্রাদ্ধে অর্থব্যয় করিতে নিষেধ করেন, এমন কি, কাহাকেও তিনি অশৌচ পালন করিতেও উপদেশ দেন নাই। কারণ তিনি বলেন, মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ কাহারও নাই, ইহা প্রকৃতির বিধান। সুতরাং শূন্যপদে থাকিলে ও অন্যান্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করিলে মৃতের বা অশৌচ-পালনকারী কাহারও কোনও কল্যাণ হয় না। বিশেষতঃ কোনও পরলোকগত পিতামাতাই তাঁহাদের সন্তানকে অশৌচ-পালনের নামে, কোনও প্রকার উপকার-প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলেও, কষ্টভোগ করিতে দেখিলে নিশ্চিতই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। তিনি বলিতেন,—শ্রাদ্ধ ব্যাপারটাই ষোল আনা কাল্পনিক, মিথ্যা ও অদ্ভুত।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহাদের প্রাচীন বসতবাটী ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং উহারই উপর রেল লাইনের পার্শ্বে "রতন লজ" নামক নূতন বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই সুবৃহৎ সৌধ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দীর্ঘ ৫ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে লইয়া কলিকাতায় ৫০নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পরিবারবর্গ চন্দননগরে চলিয়া আসেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে অধ্যয়নার্থ অক্সফোর্ডে পাঠাইয়া দেন। কটক জেলায় তিনি একটী জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। পুত্র ইংলণ্ডে গমন করিলে তিনি স্ত্রী ও কন্যা সহ কটকে গমন করেন ও তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। উক্ত জমিদারীর উন্নতি ও শৃঙ্খলা-বিধানের জন্যই তিনি কটকে অবস্থান করেন।

প্রায় এই সময়ে তিনি জসিদিতে "Hill View" নামক বাটী নির্ম্মাণ করেন। এরূপ সুদৃশ্য ও সুরম্য বাটী তদঞ্চলে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরে এই বাটী তিনি স্যর ওঙ্কার মল জেটিয়াকে বিক্রয় করেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গ নিজেদের মধ্যে আপোষে পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লন। সেই সময়ে তাঁহাদের মাতৃদেবী জীবিতা ছিলেন বলিয়া যে বাটীতে মাতৃদেবী অবস্থান করিতেন সেই বাটীখানি তখনও এজমালিতে ছিল। মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর উহারও বণ্টন হয়। যোগেন্দ্রনাথের মাতৃদেবী শেষ জীবনে কাশীবাস করিয়াছিলেন; তথায়ই তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথের পুত্র সুধাংশুমোহন অধ্যয়ন শেষ করিয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি প্রত্যাগমন করিয়াই কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। ১৯০৬ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যোগেন্দ্রনাথ কটকে অবস্থান করিয়াছিলেন; তবে মধ্যে মধ্যে তিনি তথা হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বৎসরের ৯ মাস কলিকাতায় ও ৩ মাস কটকে অবস্থান করিতেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কটকে একটী বাটী ক্রয় করেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক উদ্যম-সহকারে এই বাটী-সংলগ্ন উদ্যানটী পরিষ্কার করেন ও

নূতন করিয়া উদ্যান-সজ্জা করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে সমগ্র কটক সহরে এরূপ সুন্দর ও সুরম্য বাটী বিরল।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ২২ নং বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করেন।

তিনি বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ ব্যতীত তিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সস্ত্রীক কাশ্মীর গমন করেন তৎপরে তিনি তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে তথায় প্রেরণ করেন। তিনি সপরিবারে উতকামন্দ শৈলে গমন করেন ও তথায় ছয় মাস অবস্থান করেন; এই সময়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের দর্শনযোগ্য স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে দুইবার ইংলণ্ডে গমন করেন—একবার ১৯২১খৃষ্টাব্দে আর একবার ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। ইংলণ্ডে অবস্থান করিবার সময়ে তিনি ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশসমূহ পরিদর্শন করেন। এইসকল দেশের অধিবাসীদিগের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও গৃহকর্ম্মে মিতব্যয়িতা তাঁহার মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইউরোপে তিনি যে সকল সমুন্নত গার্হস্থ্য পদ্ধতি দেখিয়াছিলেন, সেইগুলি তাঁহার গৃহস্থলীতে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন এবং কয়েকটী পদ্ধতি তিনি প্রবর্ত্তিতও করিয়াছিলেন। যে দুইবার তিনি ইউরোপে গিয়াছিলেন, প্রত্যেক বারই তিনি তথায় ৬ মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি এরোপ্লেন-যোগে লণ্ডন হইতে প্যারিসে গমন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার ইউরোপ পর্য্যটন করিয়া আসিয়া তাঁহার মনে এইরূপ সংশয়ের সঞ্চার হয় যে, বয়স্ক ছাত্রদিগকে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করা উচিত কি না অথবা যে শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে তথায় তাহারা সেই শিক্ষার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা লাভ করে কি না। তিনি বলিতেন, ইউরোপে গমন করিলে কিরূপ বাসগৃহ সুন্দর

করিতে পারা যায় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা হয়। তিনি দ্বিতীয় বার ইউরোপ পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে বিশেষ-ভাবে এইরূপ উপদেশ দিয়া ইউরোপে পাঠাইয়া দেন যে, তাঁহারা যেন তথাকার পাকশালা ও গোশালা মনোযোগ-সহকারে দেখিয়া আসেন।

তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। অলস চিন্তা কখনও করিতেন না। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন সে কার্য্য পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে তিনি পরিদর্শন করিতেন। প্রত্যেক কার্য্যের খুঁটিনাটি জানিবার জন্য তিনি প্রভূত আয়াস স্বীকার করিতেন।

কি করিয়া বাসভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করিতে পারা যায় ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল; এই সঙ্কল্পকে তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। বাড়ীর প্রত্যেক জিনিসটী তিনি বিশেষভাবে পরিষ্কার রাখিতে বলিতেন। তিনি বলেন, কেবল যে বাড়ীতে কোন অতিথি বা দর্শক আসিলে বাড়ী পরিষ্কার রাখিতে হইবে তাহা নহে সকল সময়েই বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। তিনি স্বয়ং প্রত্যহ বাটীর পাক-শালা পরিদর্শন করিতেন, যদি একটু ধূলা বা ময়লা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিত, এ সম্বন্ধে কাহারও কোনও কৈফিয়ৎ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার ভৃত্যগণকে এই ভাবে শিক্ষা দান করিতেন যে, তাঁহার বাড়ীর বা বাগানের কোথাও একটু ময়লা দেখিলে, কোথাও এক টুকরা কাগজ, এমন কি, গাছের একটা শুকনা পাতা পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিত। কেবল যে কলিকাতায় ও কটকে তাঁহার নিজের বাটী সম্বন্ধে তাঁহার এই নিয়ম ছিল তাহা নহে, কখনও কোনও বাড়ীতে সামান্য কিছুদিনের জন্য অবস্থান করিলেও এই নিয়ম কঠিনভাবে তিনি পালন করিতেন। বেশভূষাতেও তিনি সামান্যমাত্র মলিনতা সহ্য করিতে পারিতেন না।

সামাজিক ব্যাপারে তিনি নিরাড়ম্বর সংস্কারক ছিলেন। তিনি কোনও কুটুম্বকে 'তত্ত্ব' দিতেনও না; কোনও কুটুম্বের নিকট হইতে 'তত্ত্ব' লইতেনও না। যদি কাহাকেও কোনও উপহার দিবার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে তিনি তাহা স্বয়ং লইয়া যাইয়া দিয়া আসিতেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-প্রগতির উপকারিতায় তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার জীবিত কালে এই বিষয়ে তিনি তাঁহার সমসাময়িকগণ অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন। গার্হস্থ্য মিতব্যয়িতার হিসাবে তিনি পরিবারস্থ সকলকে একই সময়ে একত্র আহার করিবার উপদেশ দিতেন।

তাঁহার কণ্ঠস্বর সুউচ্চ ছিল এবং বালক বৃদ্ধ যুবক সকলেরই সহিত মিশিবার তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল। তিনি কতকটা স্পষ্ট-বাদী ছিলেন; কিন্তু বড় অতিথি-সৎকার-পরায়ণ ছিলেন।

৬৩ বৎসর বয়সে কয়েক দিন রোগ-ভোগের পর তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী, এক পুত্র ও দুই বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া যান

যোগেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু কলিকাতা পুলিশ কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এডভোকেট শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

যোগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কলিকাতা নেবুতলার স্বর্গীয় ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র ঘোষের এবং তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত শ্রীযুক্ত সরসীচন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার মিত্রের বিবাহ হইয়াছে।

যোগেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সিল।

ভাণ্ডারপুরের চৌধুরী-বংশ

জেলা রাজসাহীর নওগাঁ মহকুমার অন্তর্গত ভাণ্ডারপুরের চৌধুরী-বংশ উত্তরবঙ্গে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে সুপরিচিত এবং সম্ভ্রান্ত। ইঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কাপ; ইঁহাদের সামাজিক উপাধি মৈত্র। ভাণ্ডারপুরের পূর্ব্বে ইঁহাদের নিবাস ছিল রাজসাহী জেলার আত্রেয়ী নদীর ধারে—ই-বি রেলওয়ের বর্ত্তমান আত্রাই ষ্টেশনের নিক গুড়নই গ্রামে; ইঁহারা গুড়নইএর মৈত্র। ইঁহারা এককালে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিলেন। যদিও এখন সে প্রাচীন সমৃদ্ধি নাই, তথাপি এখনও ইঁহারা উত্তরবঙ্গে বিশেষ পরিচিত; সমাজে এখনও ইঁহাদের বেশ খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা আছে।

ইঁহাদের নিকট এক প্রাচীন কুর্শীনামা (বংশাবলী বা Genealogical Table); আছে তাহাতে দেখা যায়, মেধাতিথি নামে একজন ইঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত কিম্বদন্তী-অনুসারে এই মেধাতিথি অশেষ প্রতিপত্তিশালী পণ্ডিত ছিলেন এবং ইঁহারা বলেন, এই মেধাতিথিই হিন্দু আইনের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ মেধাতিথি। মেধাতিথির কয়েক পুরুষ পরে বৃহস্পতি নামে আর এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। বৃহস্পতির পুত্র অচ্যুতানন্দ; অচ্যুতানন্দের পুত্র শ্রীনারায়ণ; শ্রীনারায়ণের পুত্র যদুবীর। এই যদুবীরের সময় নবাব মুর্শীদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব ছিলেন। নবাব-সরকারে যদুবীরের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তখনকার কালে রাজা জমিদারের মালগুজারী খাজনা বাকী

পড়িলে, নবাবের আদেশমত তাঁহাদিগকে তলপ দিয়া মুর্শিদাবাদে হাজির করা হইত এবং অনেক সময় এই উপলক্ষে তাঁহাদিগকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগও যে না করিতে হইত, তাহা নয়। এইজন্য সাধারণতঃ রাজা-জমিদারেরা নবাব-সরকারে উপস্থিত হইতে অত্যন্ত ইতস্ততঃ করিতেন। যাহা হউক, কোন ঘটনা-উপলক্ষে দিনাজপুরের তদানীন্তন রাজা বাহাদুর যদুবীরের চেষ্টায় পরম সমাদরে নবাব-দরবারে গৃহীত এবং সম্মানিত হন। সেই হইতে রাজা বাহাদুরের সহিত যদুবীরের বিশেষ বন্ধুত্ব হয় এবং তিনি যদুবীরকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। এই সূত্রে পরে যদুবীরের প্রপৌত্র নীলকান্ত মজুমদার দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুরের এষ্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত হইযাছিলেন এবং কিছুদিন দক্ষতার সহিত দেওয়ানী করিয়াছিলেন। যদুবীরের দুই পুত্র হরিদেব মজুমদার ও শিবকৃষ্ণ চৌধুরী; এক পুত্র মজুমদার ও অপর পুত্র চৌধুরী। এই সময়ে তাঁহারা জ্ঞাতি-বিরোধে ও অন্যান্য নানা কারণে গুড়নই পরিত্যাগ করিয়া ভাণ্ডারপুরে আসিয়া বাস করেন। ভাণ্ডারপুর দিনাজপুরের মহারাজার জমিদারীর অন্তর্গত এবং তৎকালে খুব সমৃদ্ধ স্থান ছিল। ভাণ্ডারপুর এবং আরও পার্শ্ববর্ত্তী ৫ খানি গ্রাম মহারাজা বাহাদুর ইঁহাদিগকে ইস্ত-মুরার দান করেন। হরিদেব মজুমদারের দুই পুত্র—গঙ্গাহরি ও রমাকান্ত; রমাকান্তের পুত্র নীলকান্ত; এই নীলকান্তই দিনাজপুরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। অপর ভ্রাতা গঙ্গাহরির পুত্র রামকান্ত; রামকান্তের পুত্র রতিকান্ত; তাঁহার পুত্র রুক্মিণীকান্ত। রুক্মিণীকান্ত মজুমদার নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন এবং সেই সঙ্গে মজুমদার-বংশ লোপ হয়।

রতিকান্ত মজুমদারের স্বহস্ত-লিখিত 'শ্রীকবিকঙ্কণ' পুঁথি ইঁহাদের নিকট আছে। পুঁথিখানি বাঙ্গালা সন ১১৫৬ সালে রতিকান্ত

মজুমদার নিজ হাতে নকল করিয়াছিলেন। পুঁথির শেষে তিনি নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইল। পুঁথির শেষে তিনি লিখিতেছেন—

শিবদুর্গা পূজা করি * * কলম ধরি
সরস্বতী করিয়া স্মরণ।
প্রণমিয়া দ্বিজগণে ভরসা করিয়া মনে
লেখিলাঙ শ্রীকবিকঙ্কণ॥
দ্বিজ রত্তিকান্ত নাম পিতামহ গুণধাম
ধন্য গঙ্গাহরি মজুমদার।
তাঁর সুত রামকান্ত কৃতি অতি ভাগ্যবন্ত
ত্রিভুবন বিদিত সংসার॥
সগোষ্ঠী একত্র বাস ভাণ্ডারপুরে নিবাস
পরগণা মহাসিংহপুর।
মুকুন্দ রচিত পুথি কবিতা কৌশল অতি
দেখিলে দুর্ব্বুদ্ধি যায় দূর॥
লেখিলাঙ স্বাক্ষরে পঞ্চদশ মাস পরে
সাঙ্গ হল পচিশা শ্রাবণ।
সুমঙ্গল বার কিবা দ্বিতীয় প্রহর দিবা
তিথী ত্রয়োদশী সুশোভন॥
শোল শত সত্তর শকে তারিণী মঙ্গল সুখে
করিল নির্ঘণ্ট উপাক্ষণ।
কাল ব্যাজ হল্য এত তাহা বা কহিব কত
রাজকার্য্যে সদা থাকে মন॥

* * * *

দেওয়ান চএন রায় শুন্যা তুষ্ট হল্যা তায়
স্থবা আলীবর্দ্দী বাঙ্গলার।
খাজী পাটনায় রণে সমসের জঙ্গের সনে
আর শির কাট্যা লুটে ঘর।
এগার শত ছাপ্পান্ন সালে শা আমদ মহেন্দ্র কালে
নবীন হইল দিল্লীশ্বর।

* * * *

লিখনের থাকে দোষ দেখ্যা না করিবে রোষ
নিবেদন সাধু বরাবর।
বিষম বিষয়ে রহি শাস্ত্রে অভ্যাস নাহি
বয়ক্রম বাইশ বৎসর।
শাস্ত্রে অতি নাই জ্ঞান কত হব সাবধান
শান্ত চিত্ত কদাচিত নয়।
যে বা জন সাধু হয় দোষ ক্ষম্যা গুণ লয়
রামকান্ত সুত বচ্যা কয়॥"

শ্রীকবিকঙ্কণ পুস্তক সমাপ্ত॥
শকাব্দা ১৬৭০ সন ১১৫৬

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা সন ১১৫৬ সালে (ইং ১৭৪৯ সাল) শ্রাবণ মাসে রতিকান্তের বয়স ২২ বাইশ বৎসর; বাড়ী ভাণ্ডারপুর; পিতার নাম রামকান্ত; পিতামহ গঙ্গাহরি মজুমদার। তখন আহম্মদ সা দিল্লীর সম্রাট; আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব। তখনও পলাশীর যুদ্ধ হয় নাই; ইংরেজ-রাজত্ব তখনও আরম্ভ হয় নাই। রতিকান্তের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ যদুবীরের সময় মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন।

যদুবীরের অপর পুত্র শিবকৃষ্ণ চৌধুরী যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাবান্ এবং সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। কুর্শীনামাতে দেখা যায় যে, এই শিবকৃষ্ণই প্রথম চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার ৫ম পুত্র হরেরাম চৌধুরীও পিতার যশঃ ও খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। হরেরামের পুত্র শম্ভুরাম চৌধুরী। এই শম্ভুরামের সময় হইতেই ইঁহাদের প্রাচীন সমৃদ্ধি ক্রমেই ক্ষীণতর হইতে থাকে; ইনি যথেষ্ট সম্পত্তি ধ্বংশ করিয়া যান। শম্ভুরামের পুত্র রামলোচন চৌধুরী। রাম-লোচনের দুই পুত্র, রামকুমার ও রামজয়। রামকুমার চৌধুরী খুব বলবান্ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, রামকুমারের তিন পুত্র—রামা-নন্দ, রামতনু ও রামেন্দ্র। সর্ব্বকনিষ্ঠ রামেন্দ্র অল্প বয়সে নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। রামানন্দ ও রামতনু উভয়েই প্রতিভাশালী ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছিলেন।

৺ রামানন্দ চৌধুরী মহাশয়

বাঙ্গালা সন ১৩০৬ সালে ২৮শে পৌষ তারিখে প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। ইনি ঐ অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। জমিদারী কার্য্য-পরিচালনায় তাঁহার যথেষ্ট প্রতিভা ছিল। উত্তর বঙ্গে অনেক জমিদারী এষ্টেটের কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় এখনও আছে। তিনি উর্দ্দু এবং পারসী বেশ জানিতেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম ভক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগের বঙ্গদর্শনের একজন অনুরক্ত গ্রাহক ছিলেন। সেই কালে যখন উত্তর বঙ্গ রেল লাইন সম্পূর্ণ হয় নাই তখনও নানা রকম অসুবিধা স্বীকার করিয়া তিনি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নৈহাটী-কাঁটালপাড়া আসিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার

রাজেন্দ্র মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশবিখ্যাত মনীষীদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। তিনি বহুকাল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার ছিলেন এবং তৎকালে সাধারণের হিতকর অনেক কার্য্য তাঁহার চেষ্টায় সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহারই চেষ্টায় ভাণ্ডারপুরে দাতব্য-চিকিৎসালায়, পোষ্টাফিস প্রভৃতি তৎকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারই চেষ্টায় ভাণ্ডারপুরের বাজারের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তিনি ভারতের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য্যেও বিধাতা তাঁহার প্রতি কোন কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই; ইঁহার পুরুষোচিত সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত বক্ষ, প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী দেখিবার মত ছিল। সেই রকম শারীরিক গঠন এখন বাঙ্গালীর মধ্যে খুব কমই দেখা যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্যগুণ ছিল। ইঁহার আর একটী বিশেষ গুণ ছিল, গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা। এমন সুন্দর তিনি গল্প করিতে পারিতেন যে, লোকে মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিত। উকিল, হাকিম প্রভৃতি শিক্ষিত বন্ধুবর্গের মধ্যেও তিনিই বক্তা হইতেন, অন্য সকলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গল্প শুনিতেন। তাঁহার ৪ কন্যা ও ৪ পুত্র, দুই পুত্রের অকালে মৃত্যু হয়। এক্ষণে দুই পুত্র বর্ত্তমান—দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বি-এ ও ভূপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। নাটোর মহারাজা হাই স্কুলের প্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার ৺দুর্গানন্দ সান্যাল, বি-এ ইঁহার জামাতা ছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক ডাক্তার জে-এন মৈত্র মহাশয় ৺ দুর্গানন্দ সান্যাল মহাশয়ের ছাত্র। পাবনা সিরাজগঞ্জ হাই স্কুলের বিখ্যাত হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসন্ন চৌধুরী, বি. এ. (ভায়েঙ্গার চৌধুরী) ইঁহার অন্যতম জামাতা।

৺ রামতনু চৌধুরী মহাশয়

ইনি বগুড়ার মোক্তার ছিলেন। বাঙ্গালা সন ১২৯১ সালে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বগুড়া টাউনে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বেশ অধিকাব ছিল; ইংরেজীতে তিনি বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইংরেজী-জানা মোক্তার বলিয়া তাঁহার খুব নাম হইয়াছিল এবং মোক্তারী ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি বলিষ্ঠ এবং শারীরিক শক্তিতে খুব বিখ্যাত ছিলেন. তথাপি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচাবী ও অমনোযোগী থাকায় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি পবলোক গমন করেন। প্রথম জীবনে ইনি পুলিসের সাব ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন; পরে ইনি মোক্তারী ব্যবসা অবলম্বন করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা। বিবাহের পূর্ব্বেই একটী কন্যার মৃত্যু হয়। ৺ রমেশচন্দ্র, সতীশচন্দ্র ও উপেন্দ্রচন্দ্র—এই তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র রমেশচন্দ্র রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমায় মোক্তারী করিতেন; বাঙ্গালা সন ১৩৩৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সতীশচন্দ্র ও উপেন্দ্রচন্দ্র এখনও জীবিত কনিষ্ঠ উপেন্দ্রচন্দ্র কুসীদ-ব্যবসায়ে ও কৃষিকার্য্যাদিতে বেশ আর্থিক উন্নতি করিয়াছেন। তিনি একজন ভাল শিকারী। তাঁহার একমাত্র পুত্র ধীরেন্দ্রচন্দ্র এম-বি. পাশ করিয়া ডাক্তারী ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন; কালকাতা বালিগঞ্জের ৺ জগবন্ধু রায় মহাশয়ের এক পৌত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

৺ রামজয় ও ৺ রামদুর্ল্লভ

পূর্ব্বোক্ত ৺ রামলোচন চৌধুরীর অপর পুত্র ৺ রামজয় চৌধুরী। তাঁহার দুই পুত্র—রামদুর্ল্লভ ও রামকমল এবং একটী কন্যা। রামদুর্ল্লভ একমাত্র পুত্র সারদাপ্রসন্নকে রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। সারদাপ্রসন্ন এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র

কুলদাপ্রসন্ন চৌধুরী এম. এস-সি. বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রোফেসর। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান্ ছাত্র; আই. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

৺ রামজয় চৌধুরীর অপর পুত্র রামকমল চৌধুরী এখনও জীবিত আছেন। ইঁহার বয়স ৭০ বৎসরের উপর হইলেও স্বাস্থ্য এখনও বেশ ভাল আছে। যৌবনে যে ইঁহার যথেষ্ট শারীরিক শক্তি ছিল, এখনও ইহাকে দেখিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইং ১৮৯৯ সালে ইঁহার স্ত্রী পরলোক গমন করেন।

ইঁহার চারি পুত্র এবং তিন কন্যা। দুই কন্যা শৈশবেই পরলোক গমন করেন। সুরেশচন্দ্র, ৺ হেমচন্দ্র, কুমুদচন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র—এই চারি পুত্র; যে কন্যা জীবিতা আছেন তিনিই শেষ সন্তান; তিনি বিবাহিতা এবং তাঁহার কয়েকটী পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

সুরেশচন্দ্র চৌধুরী

রামকমল চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশচন্দ্র বগুড়া জেলায় ইং ১৯১১ সালে ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালতীতে ইঁহার উন্নতি বেশ আশাপ্রদ হইয়া উঠিতেছিল; এমন সময় মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইং ১৯২০ সালে ইনি ওকালতি পরিত্যাগ করেন এবং বগুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি-স্বরূপ কিছুদিন বগুড়ায় কংগ্রেসের কাজ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় স্বরাজ্যদল গঠন করিলে ইনি স্বরাজ্যদলভুক্ত হন এবং সেই সময় বগুড়া হইতে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় ইনি চাউলের মিল এবং অন্যান্য ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবসাতেই দুর্ভাগ্যক্রমে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। এখনও ইনি কংগ্রেসদলভুক্ত ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কংগ্রেসের কাজ করিতেছেন। সন ১৩২৯ সালে

উত্তর বঙ্গ যখন প্রবল বন্যায় বিধ্বস্ত হয় তখন ইনি বন্যার প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৩।৪ মাস কাল পর্য্যন্ত বন্যাপ্রপীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্যকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন হিন্দুসভা, হিন্দু মিশন, সেবাশ্রম প্রভৃতি দেশের অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত ইনি সংসৃষ্ট আছেন। ইনি বঙ্গদর্শন, ভারতী, নব্যভারত, ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিকপত্রের লেখক ছিলেন। ইহার রচিত কবিতা নব্যভারতে, ভারতবর্ষে ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইত। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করার পর হইতে ইনি সাহিত্য-চর্চ্চা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৮ হেমচন্দ্র চৌধুরী

রামকমল চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র হেমচন্দ্র চৌধুরী সন ১৩২৩ সালের ভাদ্রমাসে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে পরলোক গমন করেন। ইনি মোক্তারী পাশ করিয়া বগুড়া জেলার দমদমার জমিদার শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায় মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মচারীর কার্য্য করিতেন। ইনি অতি মিষ্টভাষী, সদালাপী এবং পরোপকারী ছিলেন। ইহার সংস্পর্শে যিনি আসিতেন তিনিই ইহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। ইংরেজীতে gentleman বলিলে যাহা বুঝায় ইনি তাহাই ছিলেন।

কুমুদচন্দ্র

রামকমল চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র কুমুদচন্দ্র চৌধুরী। ইনি বগুড়া জেলার পাঁচবিবি-দমদমা গ্রামে ব্যবসাদি উপলক্ষে বাস করিতেছেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী—এম, এল, সি

ইনি পাঁচবিবি কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট। তথাকার জন-হিতকর সমস্ত কার্য্যের সহিতই ইনি সংসৃষ্ট।

ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এম, এল, সি

রামকমল চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া বগুড়া টাউনে ডাক্তারী ব্যবসা করিতেছেন। চিকিৎসা ব্যবসাতে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন; উত্তরবঙ্গে তিনি একজন প্রতিষ্ঠা-বান্ সুচিকিৎসক। তিনি যে শুধু চিকিৎসা-ব্যবসাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহা নয়, অনেক জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তিনি Bengal Legislative Council-এর মেম্বর, বগুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান; বগুড়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান; অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট; বগুড়া মেডিক্যাল ষ্টোরের ম্যানেজিং ডিরেক্টার এবং পাঁচবিবি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। বগুড়া মেডিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ইনি বগুড়া উড্‌বারণ পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারি। বগুড়ার আরও অনেক অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংসৃষ্ট। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যে ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনিই বগুড়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান-স্বরূপে বগুড়া জেলার পল্লীগ্রামসমূহে প্রথমে নলকূপের (Tube-well) প্রবর্ত্তন করেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্যের ইনি অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। মফঃস্বল মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তায় জল দেওয়ার সমস্যা অত্যন্ত কঠিন সমস্যা, ভুক্তভোগীমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ইনি নিজে এক অভিনব উপায় কল্পনা করিয়া কলিকাতার রাস্তায় যেমন হোস্ পাইপ

দ্বারা জল দেওয়া হয় বগুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তাতেও সেই রকম ভাবে হোস পাইপ দ্বারা জল দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মফঃস্বলে এই প্রথা অন্ততঃ বাংলা দেশে এই প্রথম। ইনি বহু বৎসর হইল, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর সহিত সংস্পৃষ্ট আছেন।

ইঁহার কর্ম্ম-জীবন লক্ষ্য করিলে এ কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতে হয় যে, ইনি একজন অসাধারণ কর্ম্মী।

শারীরিক শক্তিতেও ইনি সৌভাগ্যবান্। ছাত্র-জীবন হইতেই ইনি ব্যায়াম-চর্চ্চার পক্ষপাতী; এখনও ইনি শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। একটী ফরাসী দেশীয় (French) ওস্তাদের নিকট ইনি মুষ্টিযুদ্ধবিদ্যা (Boxing) শিক্ষা করিয়াছিলেন; একটী ঘটনায় ইনি কয়েকটী উদ্ধত ইংরেজকে তাহাদের অভদ্রোচিত আচরণের জন্য উপযুক্তরূপে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

ইনি একজন ভাল শিকারী এবং Sportsman. বন্দুকে ইঁহার হাত বেশ ভাল; বাঘ বা অন্য কোন শিকারের সংবাদ পাইলে আর অবহেলা করিতেন না। তবে এখন কাজের ভিড়ে শিকারের আগ্রহ কমিয়া আসিয়াছে। প্রথম জীবনে ইনি দুর্দ্দম সাহসের সহিত বাঘ শিকার করিতে যাইতেন। পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাও ইঁহার অসাধারণ।

Boy Scout দলের সহিতও ইনি সংস্পৃষ্ট। ইনি Boy Scoutদের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার (District Commissioner)।

জেলা পাবনার জজ-আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ রায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইঁহার আট পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের নাম —আশীষকুমার,

সুকুমার, অরুণকুমার, হিমাংশু, সিতাংশু রবীন্দ্র, সন্তোষ ও সুভাষ। আশীষকুমার ডাক্তারী পড়িতেছেন।

ভগবান ইঁহার কর্ম্মময় জীবন সুদীর্ঘ করুন এবং আরও দীর্ঘ কাল ধরিয়া ইনি জনসাধারণের হিতকল্পে একান্তভাবে দেশের সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দাশ

'রসগোল্লার উদ্ভবক—বঙ্গদেশের প্রতিভাবান ও স্বনামপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন-শিল্পী নবীনচন্দ্র দাশ মহাশয় ১২৫২ সালের বৈশাখ মাসে নবশাখের অন্তর্ভুক্ত মোদক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় মধুসূদন দাশ। তাঁহারা কলিকাতার অন্তর্গত প্রাচীন সূতানুটী পরগণার আদিম অধিবাসী। নবীনচন্দ্রের জন্মের তিনমাস পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। এইজন্য শৈশবে ও বাল্যকালে তাঁহাকে জ্ঞাতিবর্গের আশ্রয়েই লালিত-পালিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার বাল্যজীবন অত্যন্ত কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহার অবস্থা বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে অনুকূল ছিল না বলিয়া তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পূর্ণ কৈশোরেই লেখাপড়া ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়। তখন নবীনচন্দ্রের বয়স ষোল বৎসর অতিক্রম করিয়াছে মাত্র। কর্ম্মশিক্ষাও হইবে এবং তৎসহ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জনও হইবে এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি প্রথমে কয়েক বৎসর একটি দোকানে কর্ম্ম করেন। ইহার ফলে মিষ্টান্ন-শিল্পে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। শিল্পের অনুরাগ ও আগ্রহ তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল; এইজন্য মিষ্টান্ন-প্রস্তুতে মিষ্টান্ন-শিল্পের কর্ম্ম তিনি স্বাভাবিক অনুরাগ-বশে প্রাণ্য দ্রুপে আরম্ভ করেন। তখন নবীনচন্দ্রের নবীন বয়স, হৃদয়ে নবীন আশা, নবীন আকাঙ্ক্ষা, নবীন উৎসাহ, নবীন উদ্যম এবং নবলব্ধ অভিজ্ঞতা। তিনি সঙ্কল্প করিলেন আর পরের অধীনে কর্ম্ম করিবেন না, স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। নবীনচন্দ্রের

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দাশ

জন্ম ১২৫২ সাল — মৃত্যু ১৩৩২ সাল

কর্ম্মের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠা, গভীর মনোযোগ এবং নির্ম্মল চরিত্র দেখিয়া তাঁহার সহিত অংশীদাররূপে কার্য্য করিবার জন্য এক ব্যক্তির বিশেষ আগ্রহ হইল। তাহার ফলে নবীনচন্দ্র উঁহার সহিত একযোগে একটি নূতন মিষ্টান্নের দোকান খুলিলেন। কিন্তু পরে অংশীদারের সহিত মনের মিল না হওয়ায় তিনি তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া নিজেই একটি সন্দেশের দোকান খুলিলেন এবং স্বাধীনভাবে নিজেই তাহা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা ১২৭৪ সালে বাগবাজারে তাঁহার এই নূতন নিজস্ব দোকান প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সময়ে কলিকাতার ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত সমাজে "সন্দেশ" ও "দানাদার" এই উভয়বিধ মিষ্টান্নেরই প্রচলন ছিল। নবীনচন্দ্র প্রথমতঃ এই দুইটী মিষ্টান্নের যতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে তাহা সম্পন্ন করিলেন। কলিকাতা সহরের ধনী ও সৌখীন সমাজের উপযোগী সন্দেশের বিভিন্ন 'পাক' তিনি সৃষ্টি করেন এবং এই কার্য্যে তখন তাঁহার সমকক্ষতা করিবার মত শিল্পী উত্তর কলিকাতায় আর কেহ ছিলেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নবীনচন্দ্র তরুণ বয়সেই মিষ্টান্ন-শিল্পে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। 'সন্দেশে'র উৎকর্ষ সাধন ও রকম-বৃদ্ধিতে, তিনি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তিনি 'দানাদারে'র উৎকর্ষ-সাধনে আপন প্রতিভা নিযুক্ত করিলেন। তিনি দেখিলেন, 'দানাদার' গতানুগতিক ভাবে বহুকাল হইতে তৈয়ারী হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ছানার সহিত সুজি মিশ্রিত থাকে এবং চিনির কড়া পাকে দিয়া উহার উপরে দানা বাঁধানো হইয়া থাকে। সুজি মিশ্রিত থাকার জন্য এবং উপরে চিনির [illegible] থাকার দরুণ ইহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে; এইজন্য [illegible] ব্যবহার করিতেন না। [illegible] 'দানাদারে'র [illegible] বিশেষতঃ প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরাও ইহা পছন্দ

করিতেন না। 'দানাদারে'র উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র উহার প্রধান দোষ— কঠিনতা দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন, সুজি মিশ্রিত থাকায় 'দানাদার' দুই একদিন থাকিলেই খারাপ হইয়া যায়। তিনি ছানাতে সুজি না মিশাইয়াই 'দানাদার' প্রস্তুতের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতে হইল। পরীক্ষা করিতে করিতে নবীনচন্দ্রের শিল্প-প্রতিভায় এক নূতন সামগ্রী প্রস্তুত হইল, তাহা যেমন কোমল, তেমনই রসালো, তেমনই উপাদেয় ও সুস্বাদু। এই নবোদ্ভাবিত পদার্থটী প্রতিভাবান্ মিষ্টান্ন-শিল্পী নবীনচন্দ্রের প্রতিভার দান। বাগবাজারের রসবিগ্রহী 'রসগোল্লা' তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও কীর্ত্তি। ইহাই মিষ্টান্ন-শিল্পী নবীনচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর তিনি এই নব-সৃষ্ট রস-সায়রে ভাসমান রসপূর্ণ রস-গোলকের নাম রাখিলেন 'রসগোল্লা। ১২৭৪ সালে নবীনচন্দ্র স্বয়ং স্বাধীনভাবে দোকান খুলেন; ১২৭৫ সালে তিন বৎসরে তিনি "রসগোল্লা'র উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই রসগোল্লার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমগ্র বঙ্গে—বঙ্গে কেন সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নবীনের 'রসগোল্লা'র সৃষ্টি হইয়াছে ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে; ইহার অনুকরণে বহু জনে রসগোল্লা তৈয়ারী করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু নবীনের 'রসগোল্লা'র বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে বঙ্গের এই প্রতিভাশালী মিষ্টান্ন-শিল্পী নবীন চন্দ্র দাশ মহাশয় ইহলোক হইতে মহাপ্রয়াণ করেন। কিন্তু 'কীর্ত্তি যস্য স জীবতি'; তাঁহার সৃষ্ট 'রসগোল্লা'ই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাশ

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দাশের একমাত্র পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র দাশ মহাশয়

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাশ

জন্ম ১২৭৬ সাল

১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলের ইংরাজী বিভাগে মাইনর শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হন। সেই সময়ে প্রাথমিক বিজ্ঞান (Primary Science) মাইনরের উচ্চ শ্রেণীর অবশ্যপাঠ্য ছিল। স্কুলে বিজ্ঞান-অধ্যয়নের সময়ে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অনুরাগের সঞ্চার হয় এবং তদবধি তিনি গৃহে উহার অনুশীলন আরম্ভ করেন। অতঃপর বিজ্ঞান-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জনের অভিপ্রায়ে তিনি বহুবাজার স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভায় (Science Association) প্রবেশ করেন এবং তথায় বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে থাকেন। অবসর-সময়ে তিনি তাঁহার পিতাঠাকুরের দোকান তত্ত্বাবধান করিতেন। তৎপরে তিনি ডাক্তার আর-জি কর-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলে প্রায় দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃদেব কঠিনপীড়াগ্রস্ত হইয়া দুই বৎসর শয্যাগত থাকেন। পিতার সেবা শুশ্রূষার ও কারবার দেখিবার জন্য তাঁহাকে মেডিক্যাল স্কুলও ত্যাগ করিতে হয়।

বিজ্ঞান-অনুশীলনের ফলে কৃষ্ণচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি বিকশিত হয় এবং তাঁহারও নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি কয়েকটী বস্তুর উদ্ভাবন করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন তিনি এদেশবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সোডাওয়াটারের কল উদ্ভাবন করিয়া পেটেণ্ট লন। কয়েক বৎসর পরে (Magneto Numerical Lock & Key) ও জহর লুমের পেটেণ্ট (Patent) লন। এই তাঁতই ভারতবর্ষের কাপড়ের কলকে যন্ত্রশক্তি সাহায্যে পরিচালিত করিবার প্রথম উদ্যম। ইহা বৈদেশিক মিলের তাঁত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু অর্থাভাবে বাজারে ইহা প্রচলিত করিতে সমর্থ হন নাই।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিভা মিষ্টান্ন-শিল্পেও নূতন সৃষ্টি করিয়াছে। 'রসোমালাই'

তৎকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত এবং ইহা তাঁহারই প্রতিভার দান। ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি ইহার উদ্ভাবন করেন। এই দুই বৎসরের মধ্যেই 'রসোমালাই'এর উপাদেয়তা ও সুস্বাদুতার খ্যাতি দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা—জোড়াসাঁকো অঞ্চলে ৮৪নং অপার চিৎপুর রোড 'রসোমালাই'এর দোকান খুলিয়াছেন। এই দোকানে মিষ্টান্ন-রক্ষার জন্য তিনি আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া ইহা আধুনিক মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীগণের অনুকরণ যোগ্য। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয় ও ভারতীয় সঙ্গীতবিভাগে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় মাধব চন্দ্র দে স্বনামধন্য কবিগায়ক ৺ভোলা ময়রার পুত্র।

কৃষ্ণচন্দ্রের পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র ও একমাত্র কন্যা বর্ত্তমানা। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মধ্যম একটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তৃতীয় পুত্রের নাম শ্রীমান্ তারিণীচরণ, চতুর্থ পুত্রের নাম শ্রীমান্ অ[illegible] ও কনিষ্ঠের নাম শ্রীমান্ [illegible]।

দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত